শারদোৎসব

১৪২৩

সুচীপত্র

সম্পাদকীয় 3

প্রবন্ধ

“.....ঋণী তত করেছ আমায়.....”	শুভা কোকুবো চক্রবর্তী	5
চোর দেবতা	শুদ্ধসত্ব ঘোষ	15
কলকাতার নাট্য-আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু কথা	মনোজ ভট্টাচার্য	154
বোঝার বোঝা!	রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়	161
অথ লাইব্রেরী কথা	অলোকা সরকার	221
বিটলসদের “মোনালিসা”	অধীশ চক্রবর্তী	224
আধুনিক বাংলা গানের ভাষা - মূলধারা এবং অন্য ধারা	সোমেন দে	232

উপন্যাস

ছায়া পূর্বগামিনী	আরাত্রিক মুখোপাধ্যায়	53
একলা শহর	প্রবুদ্ধ মজুমদার	273

কবিতা

চারটি উৎসবের কবিতা	পল্লববরন পাল	46
আমার দুর্গা	অনিকেত পথিক	49
কবিতা	মহান দাস	50
পুনর্জলোজন্ম	মধুশ্রী বসু	216
শব্দ ঝাঁপি	সমীর দাস	217
কবিতা	সুপর্ণা	219
অথবা সাতকাহন	কাকলি সেনগুপ্ত	220

গল্প

অকালবোধন	ঝড়	9
বহুজনহিতায়ঃ	মানব নারায়ণ সেন	22
অণুগল্প	সুবর্ণা রায়	30
পাড়াকাহিনী	রিনি চৌধুরী	40
সেই ব্যাগটা	জল	164
অস্তোদয়	উমালক্ষ্মী	168
প্রতিধ্বনি	অমিত সেনগুপ্ত	191
পেনসন বই	সুতপা সেন	254
প্রেম ও দাঁত	ভোঁদড়	259

ভ্রমণ

তোমার নাম, আমার নাম	কিকি	34
আমার মহারাণী দর্শন	শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	148
ঢেউয়ের গানের শব্দ	শিবাংশু দে	183
আমেরিকা আবার, শেষবার	মোহিতলাল	194
শিয়োক নদীর দেশে	ঋত্বিক কুমার লায়েক	261

নাটক

পঞ্চাঙ্ক	প্রিয়রঞ্জন অধিকারী	228

ফুড স্ট্রীট

পুজোর খাওয়াদাওয়া	শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	239
দিল্লি চাট	চঞ্চল দাশ	251

সম্পাদকীয়

শিউলি ফুল, ঢাকের আওয়াজ, কাশফুল - এগুলোর কোনোটাই আজকে আর শরতের বা দূর্গা পুজোর ডি ফ্যাক্টো অনুষঙ্গ নয়। শহর কলকাতায় শেষ কবে দেখেছেন শিউলি গাছ? শহরতলিতেও আজকাল কাশফুল তেমন দেখা যায় কি? হ্যাঁ, ঢাকের আওয়াজটা আজো হয়ত শরতের আগমন ঘোষনা করে, তবে তা শুধু বাংলার বাঙালীদের জন্য। আমাদের আড্ডাঘরের সদস্যদের মধ্যে সিংহভাগই প্রবাসি বাঙালী। পুজোর কটা দিন ছাড়া তাঁদের অনেকেরই আগের থেকে ঢাকের আওয়াজ শোনার নসীব হয় না। দেশের বাইরে থাকলে তো কথাই নেই - নির্ঘন্টকে গুলি মেরে পুজো সারতে হয় উইকেন্ডে।

তবু আজও একটা জিনিস আছে যা দূর্গা পুজোর অনুষঙ্গ হিসেবে দিব্যি খাপ খেয়ে যায় এহেন মানুষদের জীবনেও। শারদীয়া পূজাবার্ষিকী। আর তাই আমাদের এই প্রয়াস,এই দেখুন একেবারে আস্ত একখান পূজাবার্ষিকী রাখা হলো আপনাদের সামনে। অদ্ভূত সব আইডিয়ার সমাহার, একেবারে আভেন-ফ্রেশ লেখা সব। একবার পড়লেই দেখবেন লেখকদের ভালোবেসে ফেলেছেন।

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ, নাটক, খানাপিনা ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছি এই সংখ্যা। যেমন হয় আর কি পূজাবার্ষিকী! উৎরে গেছে কিনা জানানোর জন্য সাইটে এসে সকলকে মন্তব্য করার অনুরোধ রইল।

উৎসবের মরসুম সকলের খুব ভালো কাটুক - এইটুকু আশা নিয়ে শেষ করছি। শেষে আরেকবার - সংখ্যাটাকে নিয়ে কাটা ছেঁড়া করার জন্য চলে আসুন আমাদের ঠেক, www.banglaadda.com-এ। আমাদের মেইল আইডি pujorlekha@gmail.com

সালাম।

সম্পাদকীয় কাজকর্ম, অলঙ্করণ, অঙ্গসজ্জা: প্রবুদ্ধ মজুমদার এবং কৌশিক ঘোষ

প্রচ্ছদ: সোমা মুখার্জী

banglaadda.com-এর প্রয়াস

“.....ঋণী তত করেছ আমায়.....”

শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

মার্চ মাস,২০১১। মার্কিন অভিনেতা-কমেডিয়ান Gilbert Gottfried-এর একটা joke, "জাপানীদের বীচে যেতে হয়না স্নান করতে, সমুদ্রই তাদের কাছে আসে", পড়ে আঁৎকে উঠি। এ কেমন অমানবিক রসিকতা!

গত ১১ই মার্চ উত্তর জাপানের ম্যগনিচুড ৯.০র ভুমিকম্প আর ভয়ংকর tsunami সমস্ত জাপানবাসীকে স্তব্ধ করে দিল। ভেসে গেল হাজার হাজার প্রাণ আর যারা রইল তাদের কেউ না কেউ নিখোঁজ। মা আছেন তো বাবা নেই। কোথাও বা উল্টো। আবার মা-বাবা আছেন তো বাচ্চা নেই। কোথাও আবার পুরো পরিবারটাই গেছে ভেসে। বাড়ির পোষা কুকুরটা ভাঙাচোরা কাঠের জঞ্জালের পাশে থরথর করে কাঁপে রক্তাক্ত-কাদামাখা গায়ে। ত্রাণশিবিরগুলোতে জল নেই, খাবার নেই, আলো নেই, ঐ ঠান্ডায় কম্বল নেই। ফাটলধরা-ভাঙা পথে কেরোসিন আনা যাচ্ছেনা আর তাই হিটার জ্বালানোতেও চলছে রেশনিং।সঙ্গে শুরু হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর বিস্ফোরণ। জাপানবাসীদের দিন কাটে আতঙ্কের মধ্যে। তারই পাশাপাশি ত্রাণশিবিরে নতুন প্রাণের জন্ম হয়। দাদু আদর করে নাম দেন আকি। আই(ভালোবাসা)-এর "আ" আর কিবো (আশা)র "কি"। এই ২টো অক্ষর নিয়ে আকি। ছোট্ট ৩দিনের প্রাণটা হাই তোলে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঁদে। আশেপাশের নিস্তেজ মানুষগুলোর মনে বাঁচার ইচ্ছে জাগে নতুন করে।

জাপানে ১৫০তম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

সেনদাই এবং ফুকুশিমাতে অনুষ্ঠানের সুবাদে গিয়েছিলাম কয়েকবছর আগে। যে কোনো জায়গাতেই অনুষ্ঠান করতে গেলে সেই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যারা বিশেষভাবে জড়িত থাকেন, প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিতি হয়, তারপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব এমনকি আত্মীয়তাতেও পৌঁছয়।পরপর ফোন করতে থাকি। কিছুতেই কানেক্ট করতে পারিনা। ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি। ৪দিনের মাথায় যোগাযোগ হয়।

“কেমন আছো তোমরা?”
"ত্রাণশিবিরে আছি, ঠিক আছি।"
“খাবার-দাবার?”
"একটু অসুবিধে হচ্ছে, তবে সবারই অসুবিধে। সেটা ভাবলে অসুবিধেটা আর অসুবিধে বলে মনে হয়না।"
খবর পাই জুন (আমার কত্তা)-এর এক বন্ধুর দোতলা বাড়ির একতলার ছাদ ছুঁই ছুঁই জল। কোনোরকমে দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দোতলাতে দিন কাটাচ্ছে। ভাবি, এই দু:সময়ে একটু যদি ওঁদের পাশে গিয়ে ওঁদের সঙ্গী হতে পারতাম। যদিও প্রায়ই খবরে দেখছি, যে বা যারাই ওখানে একটু সান্ত্বনা দিতে গেছেন উল্টো তারাই সান্ত্বনা পেয়ে ফিরে এসেছেন। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে কে যেন যুগিয়ে দেয় অসীম মনোবল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল গত বছর থেকেই। একটা বাগানবাড়ি বুক করা হয়েছে। রিহার্সাল চলছে যথারীতি। এরমধ্যেই এই tsunami । অনুষ্ঠানের কাঠামোটাকে কিছুটা পাল্টে ফেলি তাড়াতাড়ি। টিকিট-সেল করে যে অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছিলাম সেটাকে করে দি ফ্রি। চ্যারিটি অনুষ্ঠানে Donation Box রাখি। নিরবতা পালনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান।শ্রদ্ধেয় সন্দীপ ঠাকুর স্বস্ত্রীক (আমাদের প্রিয় সন্দীপদা-এইকোবৌদি) সুদূর ওসাকা থেকে আমাদের আমন্ত্রনে উপস্থিত থাকেন।

একদিকে খোলা আকাশ, অন্যদিকে বিভিন্ন গাছগাছালি আর আছে নাম না-জানা একাধিক পাখীর ডাক। এককথায় নাগোয়ার শান্তিনিকেতন। আবহাওয়াও সেদিন আমাদের সঙ্গে বিট্রে করেনি। ১১ই মার্চের ঘটনার পর কিছু গান-নাচেরও পরিবর্তন করি। "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে....." গানের সঙ্গে ঠিক সেদিন আর নাচতে ইচ্ছে হয়না। বরং "বেদন বাঁশী উঠলো বেজে বাতাসে বাতাসে....." গানটা অনেক বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে হয় ভয়ঙ্কর tsunamiর ঠিক দুমাস পরের ঐ সন্ধ্যেটাতে।

নাগোয়া-র শান্তিনিকেতন

অনুষ্ঠান শেষে দর্শকেরা যে যার সামর্থমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, আমাদের Donation Boxটাও ভরে ওঠে। এই অনুঠানের তোড়জোড় করার সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ চালিয়ে যাই সেনদাই অঞ্চলের সঙ্গে। ঠিক হয় শিচিগাহামা গ্রামের ২টো স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে কয়েকঘন্টা করে কাটিয়ে আসবো।নাচ-গান-বাজনা, হৈ-হৈ-আনন্দ দিয়ে ওদের মনের ক্ষত যদি কিছুক্ষনের জন্য ভুলিয়ে দিতে পারি। ফোনে, ই-মেলে বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা জানতে চাইলে "আপনারা আসবেন অত দূর থেকে, আমরা-বাচ্চারা তাতেই খুশি" জানায় স্কুল-কর্তৃপক্ষ।
ঐ দুর্ঘটনার পর কেটে গেল ৩টে মাস। মার্চের ঠান্ডায় কম্বলের চাহিদা, বর্ষাতে ছাতা,রেইনকোট, গামবুটে গিয়ে দাঁড়ায়। আর এখনতো গরমকাল। ইন্টারনেটে ওখানকার বিস্তারিত খবরাখবর পড়ি প্রায় রোজদিনই।

Tsunami তে বাড়ি-ঘর উল্টেপাল্টে যে জঞ্জাল হয়েছে জাপান সরকার সেদিকে চোখ না দিয়ে প্রথমে ত্রাণশিবিরের মানুষজনকে অস্থায়ী বাসস্থানে (kasetsu juutaku)সরাবার সঙ্কল্প নিয়েছেন। ফলে এই গরমে ওখানে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে। আমার ট্রুপ-মেম্বারদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাচ্চাদের জন্য মশা-মাছি প্রতিষেধক স্টিকার (mushiyoke shiiru) কিনি। বিভিন্ন ক্যারেকটার (পিকাচ্যু, কিটি, আংপাংমাং) ছাপানো ছোট ছোট রুমাল কেনা হয়। আর কিশিমেনপাই। এটা নাগোয়ার কয়েকটা নামকরা খাবারের একটা। প্যাকেট না খুললে ২/৩মাস রেখে খাওয়া যায়, নষ্ট হয়না।

ভয়ঙ্কর tsunamiর ঠিক ৪মাস পূর্ণ হবার দিনটা ১১ই জুলাই। ঐ দিনই আমরা যাবো বাচ্চাদের স্কুলে। জিনিষপত্র নিয়ে রওনা হই ১০ই জুলাই বিকেল নাগাদ। গাড়ীতে প্রায় ১০/১১ঘন্টা পথ পেরিয়ে সেনদাই টোল-গেট থেকে বেড়িয়েই চোখে পরে ভাঙাচোরা দোকানের কোনোটাতে ব্লু-শীট লাগিয়ে বেচাকেনা চলছে। বেশীরভাগ দোকানপাটই বন্ধ। এমনকি সকালে একটু চা-কফির জন্য এদিকসেদিক ঘুরেও একটা কফিশপ পেলামনা। মেইন রাস্তা থেকে গাড়ি ছুটতে থাকে শিচিগাহামার দিকে। যতই সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ততই কমছে। গলা বন্ধ হওয়া দৃশ্য চারদিকে। ধানক্ষেতের ওপর কোন এক বাড়ির দোতলার অংশটা। এদিক সেদিক গাড়ি উল্টেপাল্টে মুখ থুবড়ে পরে আছে। ২টো স্কুলের প্রথমটাতে যেতে হবে সকাল ১০টায়। তাই তার আগে ঘুরে ঘুরে দেখি বিভিন্ন জায়গা। ওখানে কোকুসাই মুরা (international village)তে যাই। এখানেই ত্রাণশিবির হয়েছিল।

সুনামি-র তান্ডব

দুসপ্তাহ হোল সবাই যার যার ছোট ছোট অস্থায়ী বাসস্থানে শিফ্‌ট করেছেন। সেখানে জুনের সেই বন্ধু আসেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন। জায়গাটা সমুদ্রের কাছে কিন্তু একটু উঁচুতে। ওখান থেকে চারদিকটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, সারা শরীর দিয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে

গেল। মনে হোল মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখছি। জমিগুলো আছে, দেখলে বোঝা যায় এক একটা বাড়ির গন্ডি। অথচ বাড়িটা নেই। Tsunami একেবারে উপড়ে নিয়ে গেছে। খাঁ-খাঁ করা পরিবেশ। কিন্তু তারমধ্যেই রাস্তা সারানোর, জলের পাইপ সারানোর কাজ চলছে এদিক ওদিক।

মন শক্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগে স্কুলে পৌঁছে যাই। ওখানে আমার আরও দুই ছাত্রী মিট করে। গিয়ে বসি টিচার্স রুমে। ঠিক ১০টায় দো-তলার হলঘরে ঢুকতেই দেখি প্রায় ১৩০জন বাচ্চা সুন্দর লাইন করে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে শিক্ষিকারাও রয়েছেন।আর একদম পেছনে কয়েকজন বাবা-মা । সঙ্গে করে প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট লাল টিপ নিয়ে গিয়েছিলাম। সবার কপালে পরিয়ে দিই,শিক্ষিকারাও বাদ যাননা। ছোট ছোট ফুলের মত শিশুগুলোর কপালে লাল লাল টিপ...কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল! নাচ, গান, হৈ- হৈ, হাসি, খেলা, গল্প করে সময় কেটে যায় চট্ করে।

ফেরার পালা। বাচ্চাগুলো আবার সেই আগের মত করে লাইন করে আমাদের বিদায় জানায়। আমরা সকালে স্কুলে পৌঁছেই স্কুল-কর্তৃপক্ষের হাতে জিনিষগুলো তুলে দিয়েছিলাম। ওঁনারা ওগুলো আমাদের হাতে দিয়ে অনুরোধ করেন বাচ্চাদের হাতে তুলে দিতে। সামান্য ক'টা জিনিষ বাচ্চাদের হাতে দিয়ে বিদায় জানিয়ে নেমে আসি একতলায়। গাড়িতে উঠতে গিয়ে জোরালো গলায় "আরিগাতো গোzআইমাশিতা" শুনে পেছন ফিরে দেখি, বাচ্চাগুলোর কেউ কেউ দোতলা থেকে কেউ কেউ আবার নীচের বাউন্ডারি রেলিঙের ওপাশ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমরা হাত নেড়ে রওণা দিই পরের স্কুলের উদ্দেশ্যে। এখানেও একইরকম সবকিছু। ফেরার সময় বাচ্চারা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বারান্দায় এসে কোমড় অবধি মাথা নামিয়ে ধন্যবাদ জানায়। আমরা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়াই।

শিচিগাহামা-র স্কুলে

জানিনা ওদের কতটা আনন্দ দিতে পারলাম। এই ধন্যবাদ পাবার সত্যি উপযুক্ত কিনা আমি বা আমরা। কিন্তু আমার পাওয়া হোল অনেকটা। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা-ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা রইল সব্বার জন্য।

"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান, গ্রহন করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়....." বিশ্বকবির এই লাইনদুটো আওড়াই নিজের মনে মনে।

[ছবি: লেখক]

অকালবোধন

ঝড়

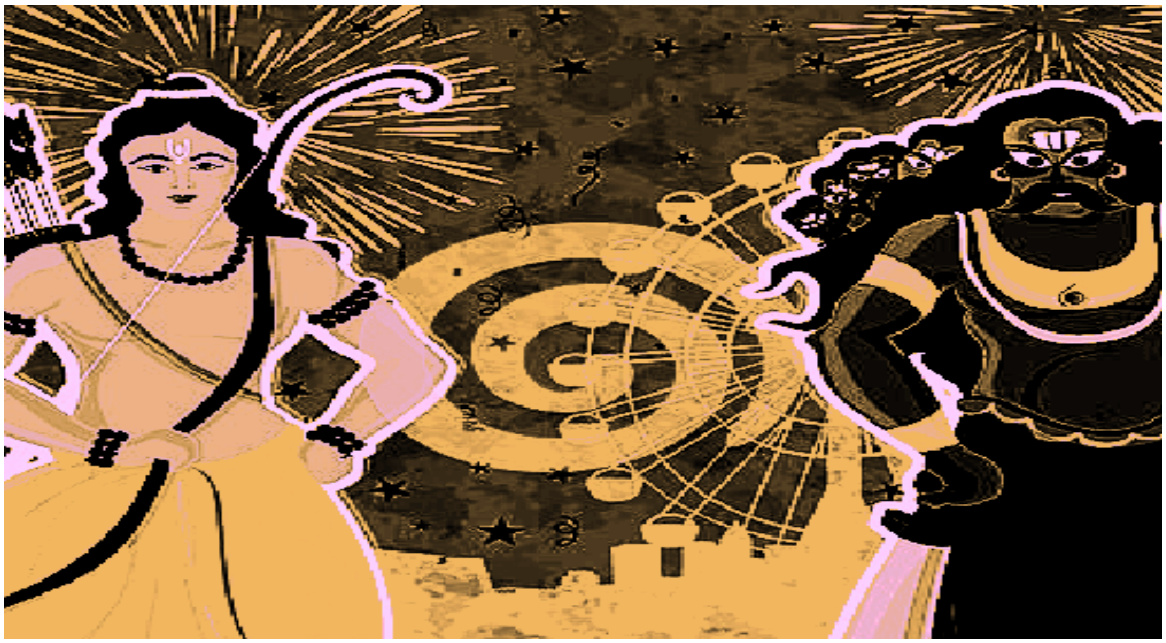

১ – হর গৌরী সংবাদ

"গৌরী আরে খেতে দাও – অ গৌরী!! অনেক বেলা হয়ে গেল। কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজেই ছুটতে হবে, ডাক এসেছে যে --"
"ডাক এসেছে মানে? কোথায় যাবে? এই বুড়ো বয়সে এত ছোটাছুটি কেন বাপু? কোথায় খেয়ে দেয়ে এটু ভাতঘুম দেবে – তা না! যত্তসব!"
"আহা রাগ কর কেন? একটু লঙ্কা যেতে হবে – দশাননের ডাক এসেছে যে।"
"আবার, আবার তুমি ঐ ম্লেচ্ছ যবন রাক্ষসটার কাছে যাচ্ছ? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছি? তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়ে জংলী ভুতটার বড় বাড় বেড়েছে!"
"আহ গৌরী – কাকে কি যা তা বলছ? তোমার মনে নেই? সেই যে গো কৈলাশে আমরা একটু ইন্টু সিন্টু করছিলাম – সে ব্যাটা এসে পুরো কৈলাশকেই বুড়ো আঙুলে তুলে ধরেছিল! বাব্বা কি শক্তি গো গায়ে – নেহাৎ আমি পা দিয়ে চেপে রেখেছিলাম কৈলাশকে, নাহলে তো কৈলাশ পুরো পপাত ধরনী চ!"
"হুঁ তা আবার মনে নেই? তার পর থেকেই তো সে তোমাকেই পুজো করতে লেগেছে। ঢং দেখে আর বাঁচি নে!"
"আহা ঢং হতে যাবে কেন? সত্যি তো সে এখন আমার একনিষ্ঠ ভক্ত। মহা ধার্মিক। আর শোনো নি? সহস্র বেদ কন্ঠস্থ করে সে এখন মহা পন্ডিতও বটে। এমনকি, এমনকি – সে নিজেও একটা বেদ নামিয়ে ফেলেছে।"
"তা অতই যদি পন্ডিত আর ধার্মিক তবে পরস্ত্রীর প্রতি অত ছোঁকছোঁকানি কেন বাপু? বেচারা সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে, হানিমুনেও পর্যন্ত যেতে পারেনি। রাজসিংহাসনে বসার আগেই সৎমার পলিটিক্সে বনবাসে

যেতে হল। তাও বনে এসে হানিমুনটা সেরে ফেলতে পারত, তাও পন্ড হল তোমার ঐ পাষন্ড ভক্তের জন্য। সাধু সেজে গিয়ে একেবার তুলে নিয়ে এল গা অমন চাঁদপানা ফুটফুটে বৌটাকে? কি দরকার ছিল তোর বাড়া ভাতে চাই দেওয়ার?"

"আহা এতে ওর কি দোষ? ও তো বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে অমনটা করেছে? কি দরকার ছিল তার নাক কান কেটে নেওয়ার? আহা মেয়েমানুষ - রাক্ষসী বলে কি মানুষ নয়? না হয় মদনদেবের দয়ায় মনে প্রেমের ফুল ফুটেছিল - তাই না সুপুরুষ লক্ষণকে দেখে প্রোপোজ করে ফেলেছে? তার প্রতিদান এমন ভীষণ?"

"তা দোষটা যখন লক্ষণের - প্রায়শ্চিত্ত তো তার করার কথা! তাকে শাস্তি না দিয়ে তার দাদার বৌটাকে ধরে আনার কি যুক্তি?"

"আহা কোনো সন্মানহানি তো করেনি - শুধু তো ধরে এনেছে। রাগ পড়ে গেলে ছেড়েও দেবে। তাছাড়া ও তো পুরো রাক্ষস নয় গৌরী - হাফ ব্রাহ্মণ বলে কথা! নাও, এবার খেতে দাও দিকি - পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে।"

"কি - কি বল্লে? হাফ ব্রাহ্মণ? ঐ কুলাঙ্গারটা হাফ ব্রাহ্মণ? সত্যি নাকি?"

"আরে তা না হলে বলছি কি? ও তো ঋষি বিশ্বশ্রবার ছেলে! ওর মা রাক্ষসী কৈকসা।"

"অ - এই শোনো না - এইটা না জানা ছিল না --"

"আবার কি হল গৌরী? তোমার গলার টোনটা তো ভালো ঠেকছে না - কোনো কিছু অন্যায় আবদার করার আগে এই টোনটা শোনা যায়!"

"তোমাকে না - তোমাকে না আমার একটা কাজ করে দিতে হবে - বল না - করবে তো?"

"যা ভেবেছিলাম! তা কি কাজ? আগে শুনি তো - তারপর --"

"উমমমম মানে ঐ রাক্ষসটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তো বৌকে বাঁচাতে? তাই ইয়ে মানে ঐ বেচারা না মনস্থির করেছে আমার পুজো করবে - যাতে যুদ্ধে হেরে না যায় - তাই আর কি --"

"হুম বুঝলাম, কিন্তু আমি সেখানে কি করব? পুজো করবে তো ভালো কথা - করুক না!"

"আরে সেখানেই তো মুস্কিল। পুজো করার মত যোগ্য পুরুত পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি যদি দশাননকে বলে কয়ে একটু রাজি করাতে পার - মানে আফটার অল হাফ ব্রাহ্মণ তো! আর ছেলের কূল গোত্র তো বাবার থেকেই আসে। ওতে কোনো দোষ নেই। তাই ও যদি একটু - মানে - পুজোটা করে দেয় -- কি হল? অমন হাঁ হয়ে গেলে কেন?"

"লে হালুয়া - যার সঙ্গে যুদ্ধ, তারই যুদ্ধজয়ের কামনায় পুজোর পুরুত হবে তার প্রতিপক্ষ? যা: শালা - এ আবার হয় নাকি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে গৌরী। অবাস্তব - অসম্ভব!"

"ও সব আমি কিছু জানি না, শুনতেও চাই না। দশানন তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত বলছিলে না? তো ও তোমার কথা কিছুতেই ফেলতে পারবে না। তুমি শুধু একবার ওকে বলবে - ব্যস। আর এই কাজ যদি না হয় - আমার পুজো যদি পুরুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় - তাহলে কিন্তু তোমারও নিস্তার নেই। এই বলে দিলাম।"

(মুখ ঘুরিয়ে গট গট করে গৌরীর প্রস্থান। মহাদেব ক্লীন বোল্ড। দাঁড়ি এবং মাথা চুল্কোতে চুল্কোতে তিনিও প্রস্থান করলেন লঙ্কাভিমুখে)

২ - লঙ্কাকান্ড

"দশানন, দশানন - বাড়ি আছ?"
"কে? ধুর শালা গাঁজার ধুমকিটা চটকে দিল। কে এই অসময়ে?"
দরজা খুলে দশানন ১৮০% অ্যাবাউট টার্ন।
গদ গদ কন্ঠে - "ওহ আপনি। দেখেছেন আপনাকে দেব বলে মণিপুর থেকে স্পেশাল কিছু পুরিয়া আনিয়েছি। তার একটা টেস্ট করতে গিয়ে -- "
"সে তো বুঝলাম, কিন্তু শুধুই কি ঐ মণিপুরী স্পেশাল মাল দেওয়ার জন্য আমাকে ডেকেছ, নাকি অন্য কোনো মতলব আছে?"
"হে হে, আপনি হলেন গিয়ে ত্রিকালজ্ঞ, আপনার থেকে আর কি লুকোনো? আসলে, ঐ ভিখারিটার সঙ্গে আজ বাদে কাল যুদ্ধ কিনা? তাই আপনার আশীর্বাদ চাই।"
"সে নাহয় হল, আমার আশীর্বাদ সব সময় তো তোমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একটা কথা সত্যি করে বল তো? সীতাকে কিডন্যাপ করার কি খুব প্রয়োজন ছিল?"

"এ আপনি কি বলছেন? আপনি জানেন না আমার বোনের কি হাল করেছে ঐ হতভাগা লক্ষণ? নাক, কান কেটে নিয়েছে। বেচারি তো আরেকটু হলেই সুইসাইড করতে যাচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করেছি। আর বেশ করেছি সীতাকে উঠিয়ে এনেছি। ঐ ভিখারি আর তার ভাইকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তারপর সীতাকে ছেড়ে দেব। চিন্তা করবেন না, সীতার কোনো ক্ষতি হবে না।"
"সে আমি জানি। আর চাইলেও তুমি ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি জানো না সীতা কে - জানো কি? রামের স্ত্রী ছাড়াও ওর কিন্তু আরেকটা পরিচয় আছে, ভুলে যেও না।"
"কেন হেঁয়ালি করছেন? ঝেড়ে কাশুন না?"
"তোমার মনে আছে দশানন, বহু বছর আগে মন্দোদরী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছিল?"

রাবণের চোখের সামনে ফ্ল্যাশব্যাক চালু --
সে এক অশান্ত সময়। দশানন তখনও এতটা ধার্মিক হয়ে উঠতে পারেন নি। দুনিয়াভর চলছে তার হিটলারি রাজ - সাধু সন্ন্যাসী দের মেরে তাদের রক্ত একটা কলসিতে ভরে রাখা - কেন? পরে সেই রক্তপান করে তাঁদের সমস্ত তেজ নিজের শরীরে ট্রানসফার করার জন্য। জানতেও পারেন নি, ঐ সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনের রক্তের সঙ্গে তাঁর বীর্যও মিশে ছিল। আর কি কুক্ষণেই মন্দোদরীকে ঐ কলসির রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন? কৌতুহল, অতি কৌতুহল - নারীচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যমাত্র। বার বার করে বারন করা সত্ত্বেও একদিন মেয়েছেলেটা কলসির ঢাকা খুলে আঁতকে উঠেছিল। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঢক্‌ঢক করে কলসির সমস্ত কন্টেন্ট চালান করে দিল নিজের পেটে! সাধে কি নাম - মন্দোদরী! আর তারপরেই তো ঐ শালা সন্ন্যাসীর বীর্যে পেটে বাচ্চা এসে গেল। কি অনাচার, কি অনাচার! তাও নাহয় মানা যেত, এই রকম ঘটনা তো আখছার ঘটত সেই সময়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রে ভয়ঙ্কর দু:স্বপ্ন, আর সেই সঙ্গে দৈববাণী - "মন্দোদরীর গর্ভজাত এই সন্তানই তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে দশানন, সাবধান!" আর তারপরেই তো কন্যাসন্তান জন্মাবার পরেই ---
"অত কি ভাবছ দশানন?"
ফ্ল্যাশব্যাকের সমাপ্তি।

"তার মানে – তার মানে – সীতাই সে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তাকে তো আমি জন্মের পরেই --"

"হ্যাঁ, জন্মের পরেই তুমি তাকে দূর কোনো এক মাঠে ফেলে দিয়ে এসেছিলে। কচি নিস্পাপ মুখটা দেখে আর নিজের হাতে মারতে পারো নি। ভেবেছিলে মাঠে ফেলে দিয়ে এলে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। অথবা না খেতে পেয়ে মরবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। পর দিন সকালেই মিথিলার রাজা জনক তাকে কুড়িয়ে পান, এবং নি:সন্তান রাজা নিজের কন্যা হিসেবে তাকে বড় করে তোলেন। সেই মেয়েই আজকের সীতা!"

"এইবার বুঝেছি, সীতাকে এত চেনা চেনা কেন লাগে? মন্দোদরীর সঙ্গে বেশ মিল আছে ছেমড়ির। আর সেই জন্যই ঐ ব্যাটা হনুমানও সীতার খোঁজে লঙ্কায় এসে মন্দোদরী কে দেখে গুলিয়ে ফেলেছিল। তাহলে মোদ্দা কথা কি দাঁড়াল? সীতা আমার মেয়ে, যদিও আমার ঔরসে তার জন্ম হয় নি, তবুও মন্দোদরীর মেয়ে তো আমারই মেয়ে! আর তার মানে এটাও দাঁড়ালো – ঐ ভিখারিটা আমার জামাই। বেশ। খেল জমেছে তাহলে!"

"অত উৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই দশানন। দৈববাণী ভুলে গেলে?"

"ধুর রাখুন তো! ওসব পরে দেখা যাবে। কিন্তু আপনি কি এই গুপ্তকাহিনী বলার জন্যই এখানে এসেছেন, নাকি অন্য কোনো ফন্দি আছে?"

"ইয়ে মানে – শোনো দশানন, তোমার জামাই অকালবোধনের আয়োজন করেছে। মানে তুমি তো জানো গৌরীর পুজোর সময় এটা নয়। তবুও যুদ্ধজয়ের জন্য অকালে পুজো করবে ঠিক করেছে। কিন্তু --"

"কিন্তু?"

"পুরুত পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তুমি যদি --"

"শালা – একেই মনে হয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস। যার সঙ্গে যুদ্ধু, তার পুজোর পুরুত নাকি আমি – হ্যা হ্যা হ্যা --"

"দেখ দশানন, হাজার হলেও রাম তোমার জামাই। তার পুজোতে একটু হেল্প নাহয় করেই দিলে। বলা যায় না, এই পুজো করার ফলেই হয়ত ঐ দৈববাণী মিথ্যে হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে, যান যান কোনো চিন্তা নেই। এই পুজো আমি করে দেব। কিন্তু এর বদলে আমারও কিছু চাই।"

"তোমার আবার কি চাই দশানন? আমার আশীর্বাদ তো আছেই তোমার সঙ্গে, আর সেই দৌলতে কোনো কিছুর তো অভাব নেই তোমার!"

"বুঝলেন কিনা, এ হল গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। এক হাত দো তো অউর এক হাত লো। আমার ডুয়াল প্রোটেকশন স্কীম চাই।"

"তুমি কি আমাকে ইনসিয়োরেন্সের দালাল ঠাউরেছ নাকি হে? কি সব ডুয়াল প্রোটেকশন স্কীম – খোলসা করে বল দেখি কি চাই?"

"ঘাবড়াবেন না দেবাদিদেব। প্রথম লেভেল অফ প্রোটেকশন আমার কাছেই আছে। আপনি তো জানেন ব্রহ্মার বরে আমি প্রায় অমর। নিজের নাভিতে অমৃতের একটা মিনি ফ্যাক্টরি নিয়ে ঘুরছি। যদ্দিন সেই ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন চালু, আমিও অমর। আমার দশ মাথা কেটে ফেললেও আবার নতুন মাথা গজিয়ে উঠবে। সেই ফ্যাক্টরির একমাত্র ওয়ার্কার এক ভ্রমর, যে টুয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অমৃত বানিয়ে চলেছে। এই সিক্রেট টা আর কেউ জানে না, এমনকি মন্দোদরীও না। কিন্তু ঐ বেইমান বিভীষণ জানে – আর তাই আমার ভয়, ও শালা ঠিক রেমোকে এই সিক্রেট বলে দেবে। তাই একটা সেকেন্ড লেভেল অফ প্রোটেকশন দরকার। আপনি আমাকে এমন এক অস্ত্র দিন, যেটা ছাড়া আমাকে মারা

সম্ভব হবে না। অমৃতের প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেলেও একমাত্র ঐ অস্ত্রের আঘাতেই আমার মৃত্যু হবে, নচেৎ নয়।"
"হুম – এমন একটা অস্ত্র আমার কাছে আছে বটে। ব্রহ্মাস্ত্র। একদিন ব্যাটা চারমুখো দেঁড়েল বুড়োকে এমন গাঁজা খাইয়ে আউট করে দিয়েছিলাম। তো গাঁজার ধুমকিতে সে ব্যাটা নিজের সমস্ত কেচ্ছা বলতে শুরু করল। পরে হুঁশ ফিরতেই ব্ল্যাকমেল করে ওর থেকে এই অস্ত্র করায়ত্ত করতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয় নি। কিন্তু দশানন, এই মৃত্যুবাণ খুব সাবধনে লুকিয়ে রেখ। কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়। নাহলে নিজের সর্বনাশ তুমি নিজেই ডেকে আনবে! অবশ্য এটাও মনে রেখো দশানন, এই হারেই কিন্তু তোমার জিত লুকিয়ে আছে।"

৩ – চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা

"লক্ষণ, আরে এই ব্যাটা লক্ষণ! পুজোর লগ্ন তো পেরিয়ে যায় – কোনো পুরুত পেলি?"
"পেয়েছি দাদা, এই বুড়োটা সকাল থেকে সমুদ্রের পারে ঘুর ঘুর করছিল। গলায় পৈতে দেখে সন্দেহ হল, তাই ধরে নিয়ে এলাম।"
"বটে! কিন্তু তুই সিয়োর হলি কি করে এ ব্যাটা ব্রাহ্মন? আজকাল যে সে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে পুরুতের ভেক ধরে ঘুরে বেড়ায়। এই যে বুড়ো – শাস্ত্র ফাস্ত্র পড়া আছে? দেবীর পুজো করার মত শ্লোক মুখস্থ আছে? নাকি খালি পৈতে ঝুলিয়ে যজমান ঠকাবার ধান্দা?"
"শ্লোক? কত চাই? শুনবেন নাকি একটা স্যামপেল?"
"বাব্বা – মনে হচ্ছে পুরো চতুর্বেদ মুখস্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ?"
"চতুর্বেদ তো আমার কাছে বাচ্চা – এমন শ্লোক শোনাব, বাপের জন্মেও শোনেন নি। নিন শুনুন –
য়দা য়দা হি ধর্মস্চ, গ্লানির ভবতি ভারত:
অভ্যুত্থানম অধর্মশ্চ, তদাত্মানম সৃজাম্মেহম
পরিত্রানায় সাধুনা, বিনাশয়া চ দুষ্কৃতম
ধর্মসংস্থাপনার্থয়, সম্ভবামী যুগে যুগে!"
"উরি: শালা! এটা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? আগে তো কোনোদিন শুনি নি!"
"শোনো ছোঁড়া, এটা এইমাত্র আমার মাথা থেকে বেরোলো। চাইলে টুকে রাখো। আর ভালো করে মুখস্থ কর, যাতে পরের জন্ম অবধি মনে থাকে। বলা যায় না, কখন কি পরিস্থিতি আসে – সুযোগ বুঝে ঝেড়ে দিতে পারবে। ভয় নেই, কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টে জড়াবে না। আমি কপিরাইট ক্লেইম করব না।"
"বুঝতে পারছি আপনি মহাপন্ডিত। কিন্তু এবার দয়া করে পুজোটা সেরে দিন – লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।"
"পুজোর মূল উপকরণ – ১০৮ টি নীল পদ্ম। কোথায় সেগুলো?"
"ঐ যে। ব্যাটা হনুমান অনেক কষ্টে গুনে গুনে জোগাড় করেছে।"
"হুম – হনুমান মানে বাঁদর? তো তার ঘটে কি অত বুদ্ধি আছে যে সঠিক গুনতি করবে? আমিই একবার গুনে দেখি বরং।"
সবার চোখ বাঁচিয়ে বুড়ো একটা পদ্ম সরিয়ে ফেলল নিজের ধুতির কোঁচায়।
"একি! একটা কম! ১০৭ টা আছে এখানে। নাহ, হল না – হল না। এ পুজো করা অসম্ভব!"
"এই ব্যাটা হনু – ঠিক ঠাক গুনেও আনতে পারিস নি। এখন কি হবে?"

হনুমান অদূরে বসে সবে একটা মর্তমান কলায় মোক্ষম কামড় বসাতে যাচ্ছিল, রামের হুঙ্কারে থতমত খেয়ে গোটা কলাটাই মুখে পুরে ফেলেছে। না পারছে গিলতে, না পারছে ওগড়াতে। সেই অবস্থায় কিছু বলতে গিয়ে বিষম খেয়ে টেয়ে একসা।

"স্যার, আমি তো গুনেই এনেছিলাম - কিন্তু কি করে একটা কমে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার!"

"ও পুরুতমশাই। এবার কি হবে? দেবীর পুজো বন্ধ হয়ে গেলে মহা বিপদ। আপনি কিছু উপায় বের করুন। প্লীজ - "

ব্যাটা রেমোকে পায়ে পড়তে দেখে পুরুতবেশী রাবণের মনে একটু বেশিই পুলক জাগ্রত হয়েছিল মনে হয়। তাই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য মনের ফুর্তি দমন করে তিনি বলে উঠলেন -

"শোনো বাছা। এখন একটাই উপায় আছে। একটা নীল পদ্ম কম পড়েছে, সেটাকে সাবস্টিটিউট করার জন্য একমাত্র তোমার চোখই কাজে লাগবে। মানে তোমার চোখদুটো তো নীল পদ্ম সদৃশ। তাই একটা চোখ তোমাকে উপড়ে দিতে হবে ডেফিসিট মেটানোর জন্য। যদিও এর পরে লোকজন তোমাকে নিয়ে একটু হাসি মজাক করতে পারে - কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন - হ্যা হ্যা হ্যা"

এর পরের ঘটনা আমরা সবাই জানি। রাম নিজের চোখ উপড়ে ফেলার আগেই দেবীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি রামকে নিরস্ত করে তাঁর যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হন। কিন্তু যেটা আমরা জানি না - তার আগে তিনি রামকে উদ্দেশ্য করে বলে যান --

"বাছা - তোমার পুজো তো সফল হল। কিন্তু তুমি এটা জানতেও পারলে না, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য তুমি এই পুজো করলে, সেই মানুষটাই কিন্তু পুজো কম্প্লিট করতে তোমাকে সাহায্য করল। অতয়েব, একটু হলেও তুমি তার কাছে ঋণী হয়ে রইলে।"

পুজোর পরে পুরোহিতকে প্রণাম করা বিধি। রাম সেই বিধির অন্যথা করেন নি। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন চরম শত্রু রাবণকে।

[ছবি: লেখক]

চোর দেবতা

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

সামনেই আসছে দূর্গাপূজো। অঢেল জামাকাপড়ে, অলঙ্কারে সেজে বাঙালি চলবে দিন কয়েক আনন্দ করে নিতে। রাত দশটাকে মনে হবে সবে সন্ধে ছ'টা। এমন দিন, খুড়ি রাতের সফরের পর যদি বাড়ি ফিরে দেখেন আলমারিটা হাট করে খোলা, জামাকাপড় ছড়ানো ছেটানো, লকারটা কেমন ট্যারাব্যাঁকা করে ভাঙা, সত্যি বলছি একদম দুঃখ পাবেন না। জানবেন যা হয়েছে তা দেব ইচ্ছেতেই হয়েছে।

ইন্দ্রমূর্তি নেপাল (পঞ্চদশ শতক)

এই অবধি পড়ে যদি রাগে গা কিড়মিড় করে, আমাকে কুবাক্য বলতে মন চায়, তাহলে তিষ্ঠআমি নিমিত্ত ! মাত্র। যা জেনেছি তাই বলছি। কী জেনেছি সেই ঝাল-গল্প বলি শুনুন। তারপরে না হয় রাগহবে।

একবার হল কী ব্রহ্মসরোবরের তীরে অগস্তের পদ্ম চুরি গেল। এবারে একে একে রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিরা ধর্মোপদেশপূর্ণ শপথ নিতে থাকলেন। অনেকজন শপথ নিয়েছেন বলে অতজনের কথা বলছি না। জনা কয়েকের উল্লেখ করছি এখানে।

- ভৃগু - পদ্মচোর কড়া কথা শুনে কড়া কথা বলবে। মার খেয়ে পাল্টা মারবে এবং অন্যের পিঠের মাংস খাবে।
- বশিষ্ঠ - চোর স্বাধ্যায় থেকে বিচ্যুত হবে এবং কুকুরের সঙ্গে শিকার করবে আর গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করবে।
- বিশ্বামিত্র - পদ্মচোর বৈশ্যের চাকর হয়ে তার ক্ষেত্রে বর্ষা হতে বাধা দেবে এবং রাজার পুরোহিত হবে।
- পুরু - চোর চিকিৎসা ব্যবসা করবে, স্ত্রীর উপার্জিত অন্নে প্রতিপালিত হবে এবং শ্বশুরালয়ের ধনে জীবন নির্বাহ করবে।

আগে এই চারজনের শপথ এবং অবস্থানের ব্যাখ্যা করে নিই সামান্য। নইলে এই শপথগুলোর মানে ঠিক স্পষ্ট হবে না।

প্রথমে ভৃগু। পুরাণে নিশ্চই জেনেছেন যে বেশ রাগী লোক। সব ঋষিরা যখন ঠিক করতে পারছেন না ত্রিদেব অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মধ্যে কাকে প্রধান যজ্ঞভাগ দেওয়া উচিত তখন ভৃগুকেই দেওয়া হল সে দায়িত্ব। তিনি চললেন ব্রহ্মলোক। গিয়ে ব্রহ্মাকে বেশ অপমান করলেন। ব্রহ্মা রেগে

ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছিলেন আর কী !এমন সময় মহা সরস্বতী ব্রহ্মাকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। কিন্তু ভৃগু ছাড়েননি। অভিশাপ দিয়ে এলেন কলিযুগে কেউ ব্রহ্মাপূজো করবে না।সেখান থেকে গেলেন কৈলাস। শিব আর পার্বতী তখন রমণে মত্ত। নন্দী তো ঢুকতে দেবে না কিছুতেই। অতএব ভৃগু রেগে অভিশাপ দিলেন যে শিব শুধু লিঙ্গ হিসেবেই পূজিত হবেন। এরপর চললেন বৈকুন্ঠধাম। কারোর অনুমতি না নিয়ে সোজা ঢুকে গেলেন। বিষ্ণু তখন গভীর ঘুমে। ডাকলেন ভৃগু। তবু উঠলেন না বিষ্ণু। তখন বুকে এক লাথি মারলেন। ঘুম ভাঙল বিষ্ণুর। বিষ্ণু ঘুম ভেঙে সব বুঝে বললেন, তাঁর বুক খুব শক্তপোক্ত, কিন্তু মহর্ষির পা তত শক্ত না। পায়ে লেগেছে কী না তাই জানতে চাইলেন !ব্যস, ভৃগু ঠিক করলেন যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।
এ অবধি পড়ে আপনারা ভাবতে পারেন তেলে কী না হয় !ভগবানে ভক্তকেও তেল দেয় দরকার মত। সে ভাবুন, তেলের কথা তো আসবেই এখানে। এখন কথার কথা হল আসলে ভৃগু এমন রাগী। অতএব এই যে মারবে মার খেলে, নর মাংস খাবে আবার পতিত হবার জন্য, এ সব কল্পনা তাঁর মাথাতে আসতেই পারে। তাঁর চরিত্রানুগ বৈশিষ্ট্যে তিনি শপথ নিয়েছেন, অতএব চোর না।

বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের লড়াই বহুপ্রাচীন। সেই যে বশিষ্ঠের কামধেনু দেখে রাজা বিশ্বামিত্র সে সম্পদ চেয়েছিলেন, নিয়ে গিয়েছিল একদিন গায়ের জোরে, আবার বশিষ্ঠ তাঁর অনুগতদের বাহিনী নিয়ে কেড়ে এনেছিলেন, সেই আমলের পারস্পরিক বিদ্বেষ। অতএব বশিষ্ঠ স্বাধ্যায় থেকে বিচ্যুত হতে বলবেন চোরকে। কুকুর নিয়ে শিকার করে শিকারী জনজাতিরা। ক্ষত্রিয়রা সে পর্যায়ের পরের লোক। মানে সোজা কথায় অবৈদিক অসংস্কৃত হবে চোর। যেমন বিশ্বামিত্র রাজা থেকে রাজর্ষি হতে গিয়ে বশিষ্ঠকে নরমাংসও খাইয়েছিলেন, আবার তাঁর অনুগত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে জায়গা দেওয়া হবে না শুনে সেই রাগে একেবারে আলাদা লোক বানিয়ে দিয়েছিলেন নিজের জোরে, এমন একেবারে যা তা হবে আর কী। এবং আস্তে আস্তে বশিষ্ঠ এবং তাঁর বংশ যেমন বিশ্বামিত্রের সব শিস্যদের নিজের করে ফেললেন, তেমন করে ভিক্ষা ছাড়া কোনো রাস্তা অবশিষ্ট রাখবেন না।

বিশ্বামিত্রও তাই পাল্টা দিলেন। চোর বৈশ্যের চাকর হবে। এই পূর্বভারতের এবং উত্তর সীমান্ত ঘেঁষা রাজারা সব বৈশ্য। এমন কী জনক রাজাও বৈশ্য। দুই জনক এক কী না বলা মুশকিল। তবে সীতার বাবাও বৈশ্য, আবার ব্রাহ্মণ গৌতমদের প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান দান করা জনকও বৈশ্য। সেই সব বৈশ্যদের চাকর হবে চোর। যেহেতু উপস্থিত সবাই মহর্ষি বা রাজর্ষি, তাই এ পালাতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় চোর। কিন্তু তা হলেও তাই গতি হবে তার। ব্রাহ্মণ চাকর? বর্ণশ্রেষ্ঠ চাকর? শুধু এতেই থামলেন না, সঙ্গে আবার জুড়ে দিলেন রাজার পুরোহিত হবে। যেমন বশিষ্ঠ জনকের এবং এমন অনেক রাজার পুরোহিত হয়েছিলেন। মানে ও কাজটা নিতান্তই ছোট কাজ বলে বুঝিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্র। ওখানে সাধনা-টাধনা কিছু নেই, খালি যজ্ঞ করে দক্ষিণা নাও, লালায়িত হও সম্পদের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান লাগবে না এদের।

এবারে পুরুর কথায় আসি। বুঝতেই পারছেন বাবাকে, মানে যযাতিকে যৌবন-টৌবন দিয়ে রাজ্যাধিকার লাভ করতে হয়েছিল। বহু বছর, যখন যৌবনকাল তখন বুড়ো হয়ে কাটাতে হয়েছিল। এ সব নষ্টের মূল চিকিৎসকরা। ব্যাটারা কিস্যু জানে না। কী করে যৌবন অনন্ত হয় জানলে ওঁকে এত কষ্ট করতে হত? এতেই রাগ কমেনি। যে ব্যাটা রাজা হবে না, যে ব্যাটা এমন বজ্জাত চিকিৎসক, তাকে আরো শাস্তি দিতে চান। তাই স্ত্রী-র উপার্জিত অন্নের কথা। যদি নিম্নবিত্ত হন, তাহলে স্ত্রী তবু কায়িক শ্রমে,

ক্ষেতে বা অরণ্য থেকে কাঠ-ফল-মূল সংগ্রহ করে উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে কায়িক শ্রম ভয়াবহ অনাচার। ব্রাহ্মণ কৃষিকাজ করবে না, করবেই না, এ তো মনুস্মৃতি থেকে কৌটিল্য সবেতেই কড়া ভাষায় আছে। তাহলে? দাসীবৃত্তিও সে বংশে সম্ভব না। শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অতএব পূজার্চনাও হবে না। কিন্তু স্ত্রী-কেই যদি অর্থ উপার্জন করতে হয় তাহলে পূজার্চনা বাদে এর যে কোনোটা করতে হবে। তবে কী আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ রইল? এবং শুধু তাতেও যথেষ্ট উপার্জন সম্ভব নয় জানেন বলেই পুরু বলছেন শ্বশুরালয়ের ধনে বাঁচতে হবে।মানে রাগ হলে মুনি-ঋষি-রাজর্ষি কেউ-ই নিজের অবস্থার কথা ভুলে কথা বলেননি। এবং সেই জন্যই খেলাটা এমন। ধুন্ধুমার থেকে গালব, পর্বত এমন অজস্র নাম আছে এই শপথের তালিকায়।

সেই সব নামের শেষে রয়েছে ইন্দ্রের নাম। এবারে দেখি ইন্দ্র কী বললেন।ইন্দ্র বললেন, চোর ব্রহ্মচর্যব্রত পূর্ণ করে সমাগত যজুর্বেদী অথবা সামবেদী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে কন্যাদান করবেন। অথবা সেই ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অধ্যয়ন পূর্ণ করে শ্রীঘ্রই স্নাতক হবেন। তিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করবেন এবং পুণ্যাত্মা ও ধার্মিক হয়ে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক গমন করবেন।এ তো কোনো অভিশাপ না। এ তো আশীর্দবাদ। দয়া করে জানতে চাইবেন না যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেই কন্যাদান কী করে করা যায় !মানে কন্যার জন্ম হল তবে কখন? আচ্ছা, জানতে যদি খুব ইচ্ছেই করে তাহলে বলি, চতুরাশ্রম খুব কড়া কোনো বিষয় না। যেমন শোনা যায় সত্যিই তেমন হলে চতুরাশ্রম বা বর্ণ প্রথা ভাঙার জন্য অত শাস্তি-টাস্তি মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে রাখতে হত না। সে জন্যই ছোটবেলা ছাড়াও জীবনের কোন এক পর্যায়ে আপনি ইচ্ছে করলেই ব্রহ্মচর্যব্রত নিতে পারেন ক'দিন। এমনিই তো মধ্যবিত্ত পরিবারে দুই সন্তান বা এক সন্তান জন্ম হয়ে গেলে প্রায় ব্রহ্মচর্যব্রতই এসে দাঁড়ায়, কাজেই সে সময় ঘোষণা করে নিলে বেশ পূণ্যের সম্ভাবনা রইল কিন্তু। তা সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে এই আশীর্বাদ শুনেই উপস্থিত সকলে বুঝে গেলেন যে ইন্দ্রই চোর।

এই কাহিনী আছে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে চতুর্নবতিতম অধ্যায়ে ১৬ থেকে ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে। একই কাহিনী অন্য ঋষিদের নামে আছে এর আগে ত্রিনবতিতম অধ্যায়ে। সেখানে ব্রাহ্মণদের সকলের খাবার জন্য রাখা শ্রেষ্ঠ মৃণালগুলি চুরি হয়েছিল। আজ্ঞে পদ্ম খাওয়াও যায়। সেই যে বাংলা প্রবাদে আছে 'চৈত্ত মাসে প্রভু তুমি হাপলা) শাপলা (পাইলা কই'! শাপলা যদি খাওয়া যায়, তাহলে পদ্মও খাওয়া যায়। ভেবে দেখতে পারেন এবারে পূজোতে বাইরে রেস্টুরেন্টে যাবার বদলে বাড়িতে পদ্ম দিয়ে পদ বানাবেন এবং বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে তাক লাগাবেন কী না!

এ কথার ফাঁকে ভুলে যাবেন না যে স্বয়ং ইন্দ্র চোর। এবং শুধু ইন্দ্রই না, মহাভারত-এ অনুশাসন পর্বে ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের কাহিনীতেও আরেক চোর আছেন, তিনি রীতিমতো ঋষি। শুনঃসখ নাম তাঁর। দেবতা থেকে ঋষি সকলেই চুরিতে জড়িত। এবং ভাববেন না যে মহাভারত-এ এ সব পরের লোকরা বদমাশি করে যোগ করে দিয়েছে। কেন না স্বয়ং ঋগ্‌বেদ আমাদের সাক্ষ্য যে চুরি সেকালেও করেছে দেবতা। ইন্দ্রই করেছেন। পর্বতে বৃত্রাদির ধন চুরি করেছেন। প্রথম মন্ডলের একান্ন সুক্তে এ কথা বলা হয়েছে। মানে প্রক্ষিপ্ত দশম মন্ডলের বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

এই সেই বৃত্র যাঁকে অসুর বলে হত্যা করা হবে। ইন্দ্রই হত্যা করবে। বৃত্র কথাটি বাঁধ হিসেবেও প্রযুক্ত। যদি খেয়াল করা চলে তাহলে এর থেকে ইন্দ্রের বাঁধ ধ্বংসকারী রূপটি বেরিয়ে আসে। ইন্দ্র শুধু

বাঁধ ধ্বংস করে না, নগরও ধ্বংস করে বলে পুরন্দর। শুষ্ণের নগরগুলো ধ্বংস করার সময় ইন্দ্র তার সব ধন চুরি করেছিল।
ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে গেলে মনে করা যেতে পারে যে সে সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যে নগর সভ্যতার শেষ অবস্থা চলছিল) যাকে ল্যাটার হরপ্পান বলে ধরা যেতে পারে(, সেই কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নগরগুলিকে পশুপালক ইন্ডো-ইউরোপিয়ান বা ইন্ডো-ইরানিয়ানরা ধ্বংস করার কাজে লেগেছিল। তারা ছিল পশুপালক এবং কৃষি সভ্যতার সঙ্গে তাদের অঞ্চল দখলের যুদ্ধ চলছিল।এ ছাড়াও ইন্দ্রের আরো চুরির কথা আছে, আছে পণীদের চুরি করা গোধন উদ্ধারের কথা, আছে আরেক প্রাচীন দেব সূর্য কর্তৃক ঊষা হরণের কথা। অর্থাৎ গাভী থেকে নারী কোন চুরিই বাদ নেই। এবং যারা চুরি করে তারা আবার নিজেদের সামগ্রী রক্ষাও করে বা ছিনিয়ে আনে অন্য অপহরণকারীদের কাছ থেকে। এই সব গুণাবলী সভ্যতার ওই স্তরে ইন্দ্রকে দেব প্রধান করেছে অবশ্যই। যে কোনো গোষ্ঠী বা জাতিই বলশালী ও কৌশলী ত্রাতা খোঁজে। এঁরাও খুঁজেছেন।

এবং বেদে অবশ্যই আছে চোরেদের কথা। তারা কেমন বিষধর সে কথা আছে। তারা কেমন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে সে কথা আছে। আছে বিষধরদের বিষ সামলাবার জন্য ময়ূর আর সপ্তনরীর কথা। বারেবারে আছে চোর তাড়াবার জন্য নানা দেবতার কাছে প্রার্থনা। কী মজার বিষয়। যে শক্তি নিজেদের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করছে, অন্যের সেই শক্তিই মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ। সেই শক্তির মোকাবিলাতে নৃশংস হতে তার বাঁধে না।তাই কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছে, অগ্নি মলিন চোরেদের দাঁতের দ্বারা, তস্করদের জম্ভার দ্বারা, স্তেনদের হনুর দ্বারা পীড়ন করে ভক্ষণ করে। গুপ্ত কী প্রকট সব চোরদেরই গ্রামে, পথে অথবা বনে যারা লোকহিংসা করে তাদের পুড়িয়ে মারার নিদান আসলে। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন চোরের বিশেষণ হচ্ছে মলিন। যে চোর মলিন সে যে দরিদ্র তা নিশ্চই খুব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ প্রাচীন চুরির পেছনেও সেই দারিদ্র এবং অন্য পদ্ধতিতে উপার্জনে তা যাবার সম্ভাবনা না থাকাতে /অথবা যথাযথ শিক্ষা না থাকাতে চুরি। কিন্তু শাস্তি হল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া। কৃষ্ণযজুর্বেদের চতুর্থ কাণ্ড প্রথম প্রপাঠকের দশম মন্ত্র এটি।

এই বেদে এসে ইন্দ্র ছাড়াও, অগ্নি এবং বিষ্ণুও চোরদের ধরার দায়িত্বে এসে গিয়েছেন। আগেও অগ্নি ছিলেন চোরদের অনুসরণকারী। সোম ছিলেন চোরদের খবরাখবর রাখার লোক। কিন্তু চোর ধরার দেবতা তো হল, চোরের দেবতা কে?শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুই যজুর্বেদেই তস্কর ছাড়াও উল্লেখ আছে সেই চোরের দেবতার। সে দেব হলেন রুদ্র। রুদ্র অবৈদিক ও প্রাচীন দেবতা। এই উপমহাদেশে বসবাসকারী, সাধারণ কথায় যাঁদের অনার্য বলে চিনি তাঁদের দেবতা। শ্মশানে বা পর্বতে থাকেন। চিতাভস্ম তাঁর প্রসাধন। চোরেরাও বেশীরভাগ সেই অনার্য অথবা আর্যত্ব থেকে পতিত। তাঁরাও শ্মশানে গিয়ে ছাই লেপে নানা আভিচারিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের এই ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য ক্রিয়াকলাপ করে থাকেন।

অন্য এক মন্ত্রে বলা হচ্ছে চোরেরা অরণ্যের বনজ সম্পদ চুরির জন্য বনে অবস্থান করেন এবং চোরেদের অধিপতি হলেন রুদ্র। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলার আছে। সে সব বলার আগে আরেকটি মন্ত্রের কথা উল্লেখ করে যেতেই হবে। সেখানে ঠকবাজ, কপটবেশধারী, প্রভুর আত্মীয় সেজে চুরি করাদেরপ্রভু রুদ্রকে নমস্কার। খড়গধারী, তুণীরধারী, প্রকাশ্যে বজ্র দিয়ে হন্তারক, ক্ষেতের ফসল চুরি করা মানুষ, তরোয়াল হাতে রাত্রে মানুষ হন্তারকদের পতি রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র উষ্ণীষধারী, গিরিচর; রুদ্র বস্ত্রচোর, ভূমি বা কুলুঞ্চ চোর এবং গৃহচোর। এঁকেও নমস্কার জানান হয়েছে।চোরের দেবতাকে নমস্কার কেন?

কারণটা খুব দুর্বোধ্য না। এই যে চোরেদের কথা বলা হচ্ছে যাঁরা অরণ্য সম্পদ চুরি করেন তাঁরা কারা? তাঁরা এই উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব অবধি বিস্তৃত অরণ্যাণির সর্বাধিক পুরাতন বাসিন্দারা। সিন্ধু অঞ্চলের প্রতন্ততাত্ত্বিক খননে পাওয়া মানব কঙ্কালগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই অঞ্চলে আদি অস্ট্রালয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলয়েড, আল্পিনয়েড এই চারটি জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল এই সভ্যতা।
সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার শেষ স্তরে এঁরা অশ্বারোহী এবং লৌহ সভ্যতায় সমৃদ্ধ নবীন আগন্তুক পশুপালকদের কাছে ক্রমে জমি হারাতে শুরু করেন। ক্রমে ক্রমে সরে আসতে থাকেন উত্তর ভারত, মধ্য ভারত ইত্যাদি স্থানে। এঁরাই সেই অরণ্য চোর। এখনও যেমন হয়। জঙ্গলের আদত অধিবাসীদের নানা ছল ছুতোয় উচ্ছেদ করেই চলে সভ্যতা। তখনো এমনই হত। তো এই অধিবাসীদের দেবতা হলে রুদ্র।

প্রাথমিক পর্যায়ে নবীন আগন্তুকদের কাছে হেরে গেলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু বিষয়টা আর অত সহজ থাকেনি। কেন না যদি ভাল করে ঋগ্ বেদের বয়ানগুলোকে খতিয়ে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে ইন্দ্র যেমন চুরি করছে তেমন তাদেরটাও চুরি হচ্ছে। হচ্ছে বলেই তো এত এত মন্ত্র, আবেদন-নিবেদন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কারো জন্যই ভাল না। এবং শুধু তাই না, নবীন আগন্তুকরা যে সকলেই একেবারে হাড়ে-কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ তাও তো না। তাঁদের মধ্যেও নানা বিভাজন আছে। যেমন নাকি বেদে বিখ্যাত দশ রাজার যুদ্ধেই দেখা যায় যে সুদাসের বিরুদ্ধে যাঁরা জোটবদ্ধ তাঁদের মধ্যে তথাকথিত আর্য এবং অনার্য দুই-ই আছেন । কাজেই একটা সময় এসেছে যখন আগন্তুকরা এবং অধিবাসীরা একে অপরের সঙ্গে মানিয়েও নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখন এই অনার্য দেবদের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

এই জাতীয় আলোচনায় একটি কথা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে আগন্তুকদের দার্শনিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস শুধুমাত্র বেদ-এই সীমাবদ্ধ না।এবং বেদ মুখ্যত নানা ধাঁচের ধর্মীয় দার্শনিক চর্চার প্রাথমিক আকর। সে কারণেই বেদ বহুলাংশে পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়। বেদান্তের ব্রহ্মবাদের মূল যদি বেদে থেকে থাকে তাহলে বেদে তান্ত্রিকাচারও আছে। কাজেই একটি ধাঁচকেই বেদ ধরে নিলে বেদকেই আসলে অস্বীকার করা হয় মাত্র।বস্তুত যজুর্বেদের সময়কালের মধ্যেই দেব ভাবনার প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে আদি সাংখ্য। এই সাংখ্য পরবর্তী ঈশ্বরবাদী সাংখ্য নয়। এ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার উপায় নেই, পরিসর বেড়ে যাবে বলে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলার প্রয়োজন যে এই সাংখ্য নিরীশ্বর দর্শন। কাজেই নিছক সাদা-কালো আর্য-অনার্যের ছকে ফেলে এ বিরোধ দেখাটা বর্তমান কালে অনেকাংশেই অযৌক্তিক। বরং এ ভাবে দেখা ভাল যে সম্পদশালী অংশ, সাদাই হোক কী কাল, ক্রমে ক্রমে একটি ঈশ্বর-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা গড়ার পথে এগোচ্ছে। ধর্ম যেখানে সামাজিক আইনের কাজ করবে। এবং শুধু সম্পদই না, আপাত সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষিত হবে তার মাধ্যমে। বিপরীত লোকায়ত, সাংখ্যাদি স্রোতটিও সাদা-কাল নিরপেক্ষেই বিশেষ বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধ করছে।

এই পরিসরে দাঁড়ালে রুদ্রকে চোরদের দেবতা হিসেবে ভয়ে হলেও স্তুতি করার অর্থ পরিস্কার হয়। এবং ক্রমে আরো পরিস্কার হয়ে আসে যে রুদ্রকেও কেন চোরেদের দেবতা হিসেবে রাখা গেল না। রুদ্র ক্রমে ক্রমে মিলিত হয়ে গেলেন আরেক প্রাচীন দেব শিবের সঙ্গে। শিব দেবাদিদেব স্বীকৃতিও পেয়ে গেলেন কালে কালে। এবারে প্রয়োজন হল আরেক নতুন দেবতার। সেই দেবতা রুদ্রের সন্তান হিসেবে

জন্মালেন। অথর্ববেদে এঁর পরিচয় অগ্নিভূ। এরপর এঁকে পাওয়া যাচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র-পুত্র হিসেবে। কালে কালে এঁকে পাওয়া যাবে সংস্কৃত নাটকেও। যেমন শুদ্রক প্রণীত 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ পাওয়া যাচ্ছে শর্বিলক চারুদত্তের বাড়িতে চুরি করতে ঢোকার আগে কার্ত্তিকের স্মরণ নিচ্ছে। ভাসের নাটক 'চারুদত্তম্'-এ চোরের নাম হয়েছে সজ্জলক এবং সেও রাত্রের দেব কার্ত্তিককে স্মরণ করছে চুরির আগে।

রামায়ণ, মহাভারত বা স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকের একাধিক জন্মবৃত্তান্ত আছে। কিন্তু সবটাতেই যা আছে তা হল রুদ্র বা শিব পিতা। মাতা পার্বতী বা কালী। সকলেই অনার্য দেব-দেবী। কার্ত্তিকের কর্মের মধ্যে দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করে তারকাসুর বধ সর্বাগ্রে। কাহিনী অনুযায়ী এই কারণেই জন্ম নিতে হয়েছে কার্ত্তিককে। অতএব কার্ত্তিক তৎপরে দেব-সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র। এর আগে শত্রুদমন শক্র অর্থাৎ ইন্দ্রকে আমরা দেখেছি চুরি করতে। দেখেছি তস্করবৃত্তিতে পিছ পা না হতে। দেখেছি চোর ধরতে। কালে কালে কার্ত্তিকও সেই সব করবেন। অবস্থা সামাল দেবেন আর কী।

মুরুগন (রাজা রবি বর্মা)

সেই কার্ত্তিককে চোরেদের আরাধ্য বানাতে হলে চোরদের সম্পর্কে যে যে তথ্যগুলো আমরা বেদগুলো থেকে পেয়েছি সেগুলোকে আরোপ করার প্রয়োজন ছিল। কার্ত্তিক জন্মবৃত্তান্ত অনুসারে ছটি মুখের অধিকারী। যদিও এই বাংলার কার্ত্তিক পূজোতে কার্ত্তিকের ছটি মুখ থাকে না। কিন্তু আদিতে অন্যত্র তাই ছিল বলে কার্ত্তিকের অন্য নাম ষণ্মুখম। অর্থাৎ ছটি মুখ যাঁর। ছটি মুখ মানে, বারোটি হাত। বারোটি হাতে রয়েছে ত্রিশূল, শক্তি, খড়্গ, পাশ, ধনু, শর, পরশু, পতাকা, ঘন্টা, চক্র, মুদ্গর এবং করক। খেয়াল করে দেখুন এর আগে বেদের চোরদের আলোচনাতে এর বেশীরভাগ অস্ত্রই চোরদের এবং তাঁদের অধিপতি রুদ্রকে ব্যবহার করতে দেখেছি। বিষ্ণু আদি দেব থেকে এসেছে চক্র এবং মুদ্গর, দেবসেনাপতি হবার জন্য পতাকা, ঘন্টা। এভাবে নানা জায়গা থেকে আসছে কার্ত্তিকের অস্ত্র-শস্ত্র।

কার্ত্তিকের পরিধেয় নীল, রাতের অন্ধকারে দেখা যাবে না। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' নামের গদ্যকাব্যে বলা হচ্ছে চোরেরা নীল রঙের বস্ত্র পরিধান করবে, যাতে রাতে তাদের দেখা না যায়। বেদের রচয়িতাদের যেমন বিষভয়ের জন্য ময়ূর ও সপ্তনরীর কথা বলতে হয়েছে, তেমনই চোরদেরও সিঁধ কাটার জন্য সাপের ভয় থাকে, তাদের আরাধ্যের বাহন তাই ময়ূর।

চোরেরা কি খালি পায়ে আসবে? না। চোরেরা কী করবে এবং কী করবে না তা সম্পর্কে জানার জন্য একটি শাস্ত্রই এককালে রচিত হয়েছিল। যার নাম 'ষণ্মুখকল্পম্'। সেই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে চোরেরা মৃগচর্মের জুতো পায়ে দেবে। তা হলে তাদের আসা যাওয়ার শব্দ হবে না। কার্ত্তিকের পায়ের নাগরাইও মৃগচর্মের। এই নিঃশব্দে আসা কার্ত্তিকের জন্য নানা লোকাচারও জন্মেছে আমাদের এই বাংলায়। অনেকেই জানেন , রাতের অন্ধকারে বাড়িতে কার্ত্তিক ফেলে এলে পূজো করতেই হয় ,এমন বিধি আছে বিশ্বাসীদের জন্য। কোথাও কোথাও এটি সন্তানকামীদের বাড়িতে ফেলা হয় ,কোথাও কোথাও এমনিই ফেলা হয়। অবশ্যই কারো না কারো মাথা থেকে হয় উৎসবের আনন্দে ,কাউকে খরচ করিয়ে বাঁশ দেবার আনন্দে অথবা পূজো করিয়ে কিঞ্চিত উপার্জনের আনন্দেই এই কাজ এখন হয়ে থাকে। কিন্তু আদতে যদি মনে রাখেন চোরের দেবতা কার্ত্তিক ,তাহলে এ কথাও খেয়াল করবেন যে চোরমুক্ত থাকার ভয়ও ছিল গৃহস্থের। সেই ভয়কে ভিত করেই এই ব্যবস্থা।

আর্যত্বের প্রতিভূ ইন্দ্র থেকে অনার্য রুদ্রে এবং তার থেকে তার সন্তান কার্ত্তিকে চলে এল চোরের দেবতার গৌরব বা অগৌরব। বর্ণবাদী এবং ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় এমনই তো হবার কথা। মনসার মত এক আদি লৌকিক দেবীকে নইলে বাঁ হাতের পূজোতে সন্তুষ্ট করিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হয় ?কিন্তু এ কথার সঙ্গে এও মনে রাখতে অবে যে এতদ অঞ্চলে বসবাসকারীরা একদা নিজ সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেছিল বলেই না এমন সব দেব-দেবীর এই পন্থায় আর্যত্বে উত্তরণও মেনে নিয়েছিল। সুতরাং বিজয়ীর সংস্কৃতিকে ঠাঁই দিতে বিজিতেরও হাত আছে বৈ কী!

তা যা বলছিলাম ,যখন এবারে পূজোতে বেরোবেন তখন ঘরে যদি এমন হানার আশঙ্কা থাকে তাহলে মন খচখচ নিয়ে বেরোতে হবে তো। তারও নিদান আছে। হারা কার্ত্তিকের পূজো আছে। কিছু হারিয়ে বা চুরি গেলে কার্ত্তিককে প্রথমে মনে মনে স্মরণ করতে হবে। এবং তারপর যদি একবার ফেরত পেয়েছেন সে জিনিস তাহলে অবশ্যই মাটিতে নুন আর গ্লাসে জল দিয়ে হারা কার্ত্তিকের পূজো করবেন। পূজোর উপচারে নিশ্চই বুঝতে পারছেন এ পূজো অল্প খরচের পূজো। এতকাল এ সব পূজো চলে এসেছে পেছনে পেছনে অনাড়ম্বর।

যদি এই পূজোও করতে না পারেন ?তাহলেও চিন্তা নেই। একেবারে পুরো প্যাকেজ তো আছেই। কী প্যাকেজ ?আরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে থিমেরই হোক আর ডিমেরই হোক সপরিবারে দূর্গা তো দেখবেনই। সেই প্যাকেজেই তো কার্ত্তিকও আছেন। ঠুকে দেবেন নম ,যদি হারাবার ভীতি থাকে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ,তাই না ?কাজেই কে কী ভাবে চোরের দেবতা হল এবং একাধারে দেবতাদের সেনাপতিই যে আসলে চোরের দেবতা সে কথার মানে দেবতারা চোর পোষে ও সময় মাফিক কাজে লাগায় - এই সব না ভেবে মেনে নিন আর মানিয়ে নিন। দুর্জনে অনেক কিছু বলে। বলে বলুক তারা ,আপনি ভাববেনই না যে পূণ্যাত্মা দেববাহিনীর সেনাপতি আসলে অনার্য চোর।

ঋণ স্বীকার:

চৌর্যসমীক্ষা - ড. পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু

মহাভারতম্ (সম্পা:) - আচার্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য

মৃচ্ছকটিকম্ (সম্পা:)- অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত

ঋগ্বেদ সংহিতা (অনু:) - রমেশচন্দ্র দত্ত

কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা - ঐ

অথর্ববেদ সংহিতা – ঐ

বহুজনহিতায়ঃ

মানব নারায়ণ সেন

যে মহান ব্যাক্তি এই অ্যালার্মের স্নুজ নামক সুবিধাটি আবিষ্কার করেছেন তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরই সৌজন্যে আমি সকালে তিনবার ঘুম থেকে উঠে আবার তিনবার ঘুমাতে যেতে পারি। এর বেশি অর্থাৎ পাঁচবার কিংবা সাতবারের সুবিধাটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়ে ওঠেনি। কি জানি, হয়ত বেশি সুবিধা নিতে গিয়ে আর ঘুম থেকে ওঠাই হয়ে উঠবেনা আর সকালের ডিউটিটা শুধু শুধু কামাই হবে।তা সেদিনও এরকম তিনবারের বিশ্রামের শেষে চতুর্থবারের মত অ্যালার্ম বেজেছে। আমার গুনতিতে কিছুটা অবহেলার কারণেই হোক, কিংবা ক্লান্তিদোষেই হোক চতুর্থবারেও আমার ওঠা হল না।

হঠাৎ অনুভব করলাম অনেক্ষণ ধরে মোবাইলটা আর ডিস্টার্ব করছেনা। আজ কি তাহলে কালভৈরব আমার প্রতি সদয় হয়ে ঘুমানোর জন্য আর একটু সময় দিচ্ছেন এই ভাবতে ভাবতে নিতান্ত খেলার ছলেই চোখ চলে গেল মোবাইলের স্ক্রিণ-এ। ছটা-দশ। টুথপেস্ট এবং ব্রাশ পকেটে নিয়েই হেলমেটখানা বগলদাবা করলাম। সেফটি স্যু-এর ফিতেটা বাঁধাই থাকে। শুধু পরিশ্রমের মধ্যে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে মুখ মুছে মোজা আর জুতোটা পায়ে গলানো। তারপর দরজা লক করেই দে দৌড়।

অফিসের গাড়ি অনেক আগেই ভেগেছে। রাস্তায় একটা অটো পেয়ে সেটাতেই চেপে বসলাম।আমাদের মর্নিং শিফট শুরু হয় সকাল ছটায়। এখন সময় ছটা পনের। নাইট শিফটে যে ছিল সে এতক্ষণ কি গালমন্দ করছে তা ভাবতে ভাবতে টুথব্রাশে পেস্টটা লাগালাম। দাঁত মাজতে মাজতে একটু বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। ফোনটা এলো। কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন। ধরলেই সেই হাজারটা প্রশ্ন – কোথায় আছি, কেন এত দেরী, কিম্বা আদৌ আসব কিনা এইসব। মোদ্দা কথাটা হল, দোষ করেছি যখন,

কথা তো শুনতেই হবে। দুপাশে সবুজের সমারোহ, রয়েছে বাবলা, ফণিমনসা, ভুট্টার আহবান। এই তো সেই শিউলি সকাল যার ডাকে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠত অজানা আনন্দের ঢেউয়ে; এই তো সেই শরৎ যার আগমনে শিক্ষকদের মনে জাগরিত হত স্কুল ছুটির স্বপ্ন, আর ছাত্রদের মনে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার আতঙ্ক। এখন অবশ্য ইউনিট টেস্ট না কি যেন হয়েছে।

সে যাইহোক, এই হাওয়াটা আজ কেন জানিনা বড় চেনা লাগতে শুরু করল হঠাৎ করেই।'কাঁহা পে হো?' - ওপাশ থেকে বিরক্তিকর গলায় শোনা গেল রিতেশ এর গলা।এতক্ষণ মনে মনে অপরাধবোধ হলেও এবার মনে পুলক জাগল। দ্যাখ ব্যাটা কেমন জব্দ। রোজ বসের কাছে আমার নামে মিথ্যা নালিশ। আজ নাহয় একটা সত্যি কমপ্লেন ই কর। তোর কমপ্লেন শুনে বসের কানের পর্দা আর বসের খিস্তি শুনে আমার কানের পর্দা দুটোই এখন গণ্ডারের চামড়া। 'ভাই দশ মিনিট অউর।'তারপর সে কঠিন কঠিন হিন্দিতে কিসব বলল, যার অর্থটুকু অল্পবিস্তর যা বুঝলাম তা কবিতার ছলে লিখলে এরকম দাঁড়ায়,
'কেন করিস এত দেরী,
ঘুমের ঘোরে আমি মরি,
বসকে বললে যাবি ফেঁসে,
রিলিফ কর জলদি এসে।'

প্রায় মাঝরাস্তায় পৌঁছে গেছি। ঘর থেকে অফিস পৌঁছাতে মোটমাট কুড়ি মিনিট লাগে, আর এটা মাঝরাস্তা, সেই হিসাবেই আমি রিতেশকে বলেছি যে দশমিনিট লাগবে আরও। কিন্তু চায়ের দোকান দেখে আমার মনটা খচখচ করতে শুরু করল। ঠিক টাইমে(সাড়ে পাঁচটা) বাসে উঠলে আমিও রাস্তার ধারে বসে এই দোকানের স্বাদু চায়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম। নিজেকে কেমন যেন জাগতিক সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত মনে হল।আরও দশমিনিট পরে গেটে পৌঁছালাম। এত দেরীতেও এত লম্বা লাইন আর আমার একটু দেরী হলেই দোষ। কি অদ্ভুত এ দুনিয়া। আমি যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতাম তাহলে বোধহয়...আঙ্গুল স্পর্শ করালাম যথার্থ স্থানে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করল, হাতল সরে গিয়ে ভিতরে ঢুকবার পারমিশন দিল। কন্ট্রোল রুম এ হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছে দেখি রিতেশ হাওয়া। যা! ছেলেটা এরকম ভাবে কিছু না বলে চলে গেল? আগের শিফট এ কি হয়েছে না জেনে কাজ চালু করাটা তো ভাল নয়।

আমাদের কন্ট্রোল রুমটা থেকে পাওয়ার প্লান্টের দুটো ইউনিট কন্ট্রোল করা যায়। এক একটা ইউনিটে দুজন করে থাকি, একজন সিনিয়র, একজন জুনিয়র আর এই চারজনের উপরে একজন শিফট-ইন-চার্জ, যিনি সমস্ত কাজকর্ম তদারকির জন্য নিযুক্ত। আমরা জুনিয়ররা মুলত আদেশ পালন ই করে থাকি। মস্তিষ্ক থাকলেও তা চালনা করবার অনুমতি নেই সিনিয়রের সাথে কথা না বলে। এটা একদিকে যেমন ভালো, অন্যদিকে খারাপ একটা দিকও আছে। কোন কারণে সিনিয়র বাইরে গেছেন আর আমাকে খুব জরুরী কিছু করতে হবে; যেমন ধরা যাক ইয়া বড় একটা পাম্প চালু করতে চলেছে কোন সংস্থা, আর আমাকে তার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে, মোদ্দা কথাটা হল কয়লা বাড়িয়ে আরও বেশি মেগাওয়াট এর যোগান দিতে হবে – সিনিয়র নেই। ফোন করে করে হয়রান হয়ে নিজেই কোন অ্যাকশন নিয়েছ কি কেস খেলে।যাইহোক রিতেশ না থাকলেও সিনিয়র হিসাবে আমার ইউনিটে বসেছিলেন নিশান্ত

স্যার। বাংলায় যেমন বয়সে বড় হলেই নামের সাথে 'দা' কথাটা জুড়ে দিয়ে বেশ একটা মধুর সম্পর্ক তৈরী করে নেওয়া যায়, হিন্দীতে সেই সুবিধাটা নেই। হিন্দীতে 'ভাইয়া' কথাটা নাকি ব্যাকডেটেড। অর্থাৎ কাজের জায়গায় কাউকে ভাইয়া বলা অসম্মানের সামিল বলে মনে করা হয়। তাই সিনিয়র মানেই 'স্যার'।

নিশান্ত স্যার বললেন যে, ছেলেটা রাত জেগে ক্লান্ত ছিল তাই রুমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাল, এরকম সুবিধা আমি যে কেন পাইনা...ঘন্টা দুয়েক নির্বিঘ্নে কাটল। শুধু একটা দুঃখ, শিফট এ থাকলে বেশি বেশি জল কখনওই খেতে পারিনা। কারণ জল খেলেই চাপমোচনের জন্য ঘন্টায় নাহোক, দুঘন্টায় তো একবার চেয়ার ছাড়তেই হবে। অত্যাশ্চর্যভাবে ঠিক সেই সময়েই সিনিয়র মহাশয় থাকেননা। হয়ত তিনি তখন ব্যাস্ত হয়ে পড়েন কোন জনকল্যানমূলক কাজে, যেমন ধরুন ডিপার্টমেন্ট হেড-এর বাড়িতে জলের মিস্ত্রী পাঠানো, কিম্বা শিফট-ইন-চার্জ মহাশয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যালেন্স চেক করে দেওয়া ইত্যাদি। না দিনের মধ্যে আট ঘন্টা প্রায় জল না খেয়েই কাটাতে হয় – শুধুমাত্র ওয়াক-ই-টক-ই তে ফিল্ড এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কথা বলার জন্য গলা ভেজানোর মত যেটুকু না হলেই নয় আর কি!আহা, আবার আট ঘন্টাই বলি কেন, মাঝে মাঝে আবার পরের শিফটের লোকজন কাউকে কিছু না বলেই বেড়াতে চলে যান, ওই আট ঘন্টাটা তখন ষোল ঘন্টায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সবার সুবিধার্থে আমার কাজ সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিয়া রাখি, যাতে গল্পটা বুঝতে সুবিধা হয়। কয়লা দিয়ে বয়লার জ্বালানো হয়। সেই বয়লার এ জল গরম হয়ে বাষ্পীভূত হয়ে টারবাইনে যায়। আর টারবাইন ঘুরলে তার সাথে যুক্ত জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমাদের কাজ হল দাবি অনুযায়ী কয়লা বাড়িয়ে কমিয়ে পরিমানমতো বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া। এছাড়াও তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদি পরখ করে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি বয়লারের জলের টিউবে কোনো ছাই পাথরের আকারে জমা হয়ে আছে কিনা। সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চ চাপের স্টিম পাঠিয়ে ওই ছাই গুলোকে নিচে ফেলে দিই। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'সুট ব্লোয়িং'। এরকমই আরও অনেক কিছু করতে হয় যেগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।বলা বাহুল্য শুধুমাত্র কন্ট্রোল রুম এ বসেই আমরা এসব করি তা নয়, জিনিসগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গার মত বয়লারের পাশেও একজন বা দুজন রাখা হয় যাকে বয়লার অপারেটর বলা হয়। বয়লার অপারেটররা কন্ট্রোল রুম এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন সাধারণত।

যাইহোক একদম সাধারণভাবে প্ল্যান্ট চলছে সেদিন। অন্যান্য দিনের মত কাজের অত চাপও নেই তাই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। সত্যিই, লোড নিয়ে নিয়ে মাথাটা আজকাল এমন হয়ে গেছে যে ছুটির দিনে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ঘরে বসে থেকে। বাধ্য হয়ে দুঘন্টার বাস জার্নি করে উদয়পুর গিয়ে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করে আবার দুঘন্টা বাস জার্নি করে ফিরে আসি। জানলার ধারে বসে ঘুমানোর যে কি আনন্দ সেটা বলে বোঝানো যায়না। এরকম ঘুম সারাজীবন ধরে চললেও বোধহয় যথেষ্ট হয়না।উদয়পুর – আহা স্বপ্নের শহর একখানা – রাস্তাঘাটে জ্যাম নেই, বাসে করে আশেপাশে কোথাও যেতে গেলেই দুপাশে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর অপরূপ রূপ... এরই খাঁজে খাঁজে হয়ত' লুকিয়ে আছে ইতিহাস বই থেকে ছিঁড়ে যাওয়া কত পাতা। এই রাস্তা দিয়েই হয়ত একদিন চিতোর থেকে রাজধানীর স্থানান্তর হয়েছিল' এই শহরে, কিংবা সিটি প্যালেসের সামনে ওই লেক-টা, এখানেই হয়ত গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ঘোড়া নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন মহারাণা উদয়সিংহ, আর ওই ছাদে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন রাণীমা।তবে আমি নিতান্ত ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে সেখানে যাই না। যাই নিজের পেটদেবতার পূজাঅর্চনা সারতে।

একটু বিরিয়ানি হোক, একটু সুস্বাদু তরকারী, কিম্বা শেষ পাতে মিষ্টির হাল্কা আবেশ... এইটুকু তো দাবী।
অনেকদিন ধরে সবকিছু খারাপ চলতে চলতে যদি হঠাৎই ভালোভাবে চলতে শুরু করে নিজেরই কেমন যেন ভয় ভয় করে। মনেহয় এ যেন কোন অসময়ের আগমনের পূর্বাভাষ, কোন অশান্তির অশনিসংকেত। ভাবতে ভাবতেই পিছনের দিকে কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ। তাকিয়ে দেখি একজন লোক শাবল দিয়ে কাঁচের দেওয়াল ভাঙছেন এবং জন কুড়ি লোক আরও এগিয়ে আসছে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কন্ট্রোল রুম এর বাইরে ডবল লেয়ারের কাঁচের দেওয়াল এবং তার বাইরে টারবাইন এর কানফাটা শব্দ। এই শব্দ থেকে এতক্ষণ আমাদের রেহাই দিচ্ছিল ওই কাঁচের দেওয়াল। ভেঙ্গে যাওয়ার পর আর ওই শব্দ কোন বাধা না পেয়ে আমাদের কানেও পৌঁছাতে শুরু করল।

মাত্র আমরা চারজন ছাড়া বাকি যারা মাঝে মাঝে গল্প করতে আসতেন সবাই বাবা রে মা রে করে দৌড় লাগালেন। কিন্তু আমাদের থাকতে হবে। আমরা যে নির্বিঘ্নে জনগণকে বিদ্যুৎ যোগান দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাছাড়া কোনভাবে যদি বয়লারের মধ্যেকার চাপ বেড়ে যায়... বাইরে আগুন ছিটকে কতজনের যে প্রাণ যাবে তার কোন হিসেব নেই। আধুনিক প্রযুক্তিতে যদিও এটা হওয়ার আগেই প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে যাবে আপনা থেকে, কিন্তু যন্ত্র তো, যন্ত্রের অপকর্মকে ঢাকাই তো আমাদের কাজ।একটা আধলা ইঁট কানের পাশ দিয়ে শাঁই করে ছুটে গিয়ে সামনের কম্পিউটার স্ক্রিণ টাকে চুরমার করে দিল। একজন বয়লার অপারেটর এগিয়ে এসে যদি ব্যাপারটাকে না সামলাতেন তাহলে আমাদের মাথাগুলোও হয়ত গুঁড়ো হয়ে যেত। উনি এসে লোকজনদের বোঝালেন যে বয়লার ফেটে গেলে যারা ফিল্ডে আছেন তাদের চরম ক্ষতি হতে পারে, তাছাড়া একটু দূরেই খনিতে কাজ করছেন কয়েকশ' মানুষ। পাওয়ার কাট হয়ে গেলে ওদের প্রাণের আশঙ্কা...

লোকজন ব্যাপারটা বুঝল। পিছন থেকে একজন বলে উঠল, "কিন্তু আমরা মাত্র দুজনকেই থাকতে দেব, বাকি সবাই বেরিয়ে চল বাইরে।"সেইমত দুটো ইউনিট এ দুজন সিনিয়র থাকলেন, আর সবাইকে বের করে দেওয়া হল বাইরে। বাইরে বেরিয়ে মনে হল, এ কোন চক্রব্যূহে ফেঁসে গেলাম রে বাবা – এখন যদি এরা সবাই মিলে আমাদের গণপিটুনি দিতে শুরু করে, বাঁচার আর কোন আশাই নেই। ঘটনাক্রমে জানতে পারলাম, এখান থেকে আর একটু দূরে কোন ধাতু তৈরীর কারখানায় সুট ব্লোয়িং এর সময় বয়লারের জ্বলন্ত ছাই পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। যেহেতু আমরা সেই একই বাউন্ডারীর মধ্যে আছি তাই আমাদের উপর এই আক্রমণ। সেই সময় তিনজন ওখানে, মানে বয়লার এর পাশে কি করছিল, বা বয়লারের জানলা ওই সময় খোলা ছিল কেন, সেসব প্রশ্ন তখন আর কাকে জিজ্ঞেস করব...! একটু পরে আমাদেরকেও হয়ত ওই বয়লারে ফেলে দেওয়া হবে, এই ভেবে তখন আমার পুরনো দিনের একটা গান মনে পড়ল, "তোমার চোখের বয়লার-এ / জান যে আমার কয়লা রে।" এই গানটা গাইতে গাইতেই হয়ত আজ পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হবে।

ভিড় একটু ফাঁকা হতেই ভাবলাম বড় বড় ম্যানেজারদের কি অবস্থা তা একবার পরখ করে দেখে আসি। কিন্তু কোথায় ওনাদের অফিস। পুরোপুরি মিশে গেছে মাটিতে। আরে একি... ওদের গাড়িগুলোও তো দেখছি উল্টে পড়ে আছে। তাহলে ওরা নিশ্চয়ই গাড়ি ফেলে রেখেই দৌড় দিয়েছে। এদিকে আমরা ভয়ে নাজেহাল।যাইহোক এই বিপদের ত্রাতা হিসাবে দেখা দিলেন কোল বেল্ট এর অপারেটর কার্তিক জাঠ। কার্তিকবাবু একদম যাকে বলে সাত চড়ে রা নেই মানুষ... এক চড় মেরেই কেউ দেখাক আগে,

তারপর তো আসে সাত চড়ের গল্প। এহেন কার্তিকবাবুর কাজ হল কয়লার গাড়ি গুনে খাতায় লিখে রাখা। তিনি অবশ্য এটাকে কোন কাজের মধ্যেই ধরেন না। তাইতো সকাল, দুপুর বা রাত্রি যখনই ডিউটি থাকুক না কেন, সবসময়ই তাঁকে পাওয়া যাবে গাছের ছায়ায় নীচে খেতে বসার জন্য তৈরী ঘরের একখানি বেঞ্চে লম্বমান হয়ে থাকতে। কত গাড়ি কয়লা পাঠানো হল বয়লারে এটা সে ঠিক করত অভিজ্ঞতা থেকে; অর্থাৎ ঘড়ি ধরে কত ঘন্টা ঘুমালে কত গাড়ি কয়লা পড়বে, সে ব্যাপারে তার একান্তই নিজস্ব হিসাব ছিল। একদিন হন্তদন্ত হয়ে সে আমার কাছে এসে বলল, "ভাই খুব দরকার, দুশ' টাকা ধার দেবে?" আমার আবার দয়ার শরীর, দিয়েই দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।
সে বলল, "আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ফেরৎ দিয়ে দেব, কোন চিন্তা করবে না।"
(সেই টাকা সে আজও দিচ্ছে। যখনই দেখা হয়, সে বলে, "আরে ভূলে গেছি টাকাটা আনতে, কাল নিশ্চই আনবো।"সেই সাতদিন আজ ছমাসে এসে ঠেকেছে।)

তবে এই মুহূর্তে ওই টাকার থেকে আমার প্রাণের দাম যে অনেকখানি বেশি তা বেশ বুঝতে পারছি। তাই কার্তিক যেমন ব্যাপারটার কোন উল্লেখ করলনা, তেমনি আমিও ব্যাপারটা বেমালুম ভূলে থাকবারই চেষ্টা করলাম।চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য, তারই মাঝে হেঁটে চলেছি আমরা তিনজন, আমি, পুলক আর কার্তিক। এই লোকটার অনেক জানাশোনা আছে জানতাম, তবে ইনিই যে ঘটনার মুল উদ্যোক্তা তা জানতে পারলাম আর একটু পরে। লাইন দিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ধমক খেতে খেতে। আর আমরা চলেছি গল্প করতে করতে। কন্ট্রোল রুম থেকে মেন গেট দশ মিনিটের রাস্তা, কিন্তু সেটাই মনে হচ্ছিল জীবনের দীর্ঘতম পদযাত্রা... সময় যেন কিছুতেই কাটছেনা। রাস্তা যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। রাস্তার দুপাশে কত দামী দামী গাড়ি উল্টে পরে আছে। একটা গাড়িকে দেখলাম কয়েকজন মিলে ধরে কাত করে দিচ্ছে। এক একটা গাড়িকে শুধুমাত্র পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া, ব্যাস, তাতেই গাড়ির দফা রফা। দূরে হেটে চলেছে আর এক সারি জনতা, কিন্তু ওরা যেহেতু ফিল্ডের কর্মী, তাই ওদের কোন ভয় নাই। সেই লাইনে হঠাৎ একজন মেয়ের মুখ কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। আরে এ তো মাধুরী... কয়েকদিন আগেই তো ট্রেনি হিসাবে জয়েন করেছে।পুলককে দেখালাম, পুলক বলল, "আরে ও তো মাধুরীই বটে। কিন্তু প্যান্ট শার্ট ফরম্যাল ছেড়ে হঠাৎ শাড়ি পরে ধুলিমাখা ছদ্মবেশ কেন নিল মেয়েটা।"আমার মনে অল্প কবিতা জাগল, বলেই ফেললাম,

"কন্যা,
তোমাকে দেখেছি বয়লার ড্রামের পাশে
তোমাকে দেখেছি ডিউটির অবকাশে
নীল শার্টে আর ততোধিক নীল প্যান্টে
আজকে হঠাৎ কেমন যেন পালটে
গেলে তুমি,
মনে হয় যেন চাষযোগ্য কোন ভূমি।"

পুলক বক্রোক্তি করে বলল, "কি ব্যাপার ভাই? ব্যাথা নাকি? তবে শেষের লাইনটার কিন্তু বড্ড বাজে মিনিং। ওটাকে পাল্টানো দরকার।"পুলক আমার কলেজের বন্ধু, ওর সাথে এসব ঠাট্টা-রসিকতা চলতেই থাকে। কার্তিককে দেখলাম কেমন যেন বেজারমুখ করে থাকতে। হয়ত' আমাদের বাংলা কথা বলার সুবাদেই... বেচারা কিছু বুঝতে না পেরে মনে মনে গালাগালি দিচ্ছে। আসলে আমাদের "দ্বেষ" অত্যন্ত সহিষ্ণু কিনা, তাই মনে মনে...!তাহলে কি লিখবো, 'মনে হয় যেন আমার মাতৃভূমি?'তুইতো ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে যাবি, এইসব দাবিদাওয়া করলে নির্ঘাত বৌ ছেড়ে পালাবে, দেখে নিস। সবাই কি

আর সারদা মা হয়ে থাকতে পারে বল? এতক্ষণ আমাদের যা যা কথাবার্তা চলছিল, হিন্দিভাষী কার্তিকের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। অবশ্য আমরা চাইছিলামও না সেটা। বাংলার বাইরে থাকা বাঙালীদের এই এক সুবিধা, রাস্তাঘাটে মনের আনন্দে কথা বলা যায়। কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। তবে মাঝে মাঝে কেসও খেতে হয় বৈকি। সেসব কথা নাহয় পরে কখনও হবে। পাশ দিয়ে একসারি লোক হাসতে হাসতে চলে গেল, তাদের কথাবার্তার ধরণ মোটামুটি এইরকম, "শালারা আমাদের মাইনে বাড়ায় না, আজ অফিসের কাঁচ ভেঙ্গে সেইসব টাকা উশুল করেছি।"কেউ আবার বলে, "পুলিশের গাড়িটা পুড়িয়ে ব্যাপক মজা হল কিন্তু।"এইভাবেই বিভিন্ন ঘটনার সমারোহে গেট পর্যন্ত পৌঁছালাম। কিন্তু কোথায় গেট? কোথায় গার্ড? বাইরে আর ভিতরটা আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যে গেট দিয়ে একটা মোবাইল পর্যন্ত পারমিশন লেটার দেখিয়ে ভিতরে ঢোকানো যেত, সেই গেট দিয়ে বড় বড় ট্রাক্টর ভর্তি লোক আসছে। লক্ষ্য তাদের একটাই, ভাঙচুর।

এরকমই একটা ট্রাকটর এল গাড়ি ভর্তি লোক নিয়ে। সবার হাতে লাঠি, সবার চোখে স্বপ্ন, যদি একটাও কাঁচ বাকী থাকে ভাঙবার জন্য। তার সঙ্গে তালে তালে বাজছে, "ঝলক দিখলা যা..."কার্তিক আমাদের গেটের কাছে ছেড়ে দিয়ে রওনা দিল নিজের কাজে। নিজের কাজ বলতে জনসেবার কাজ। তিনি একাধারে যেমন স্ব-সেবক(নিজের সেবায় নিয়োজিত)... তেমনি জনসেবকও। তাইতো জনগণের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তিনি শুরু করলেন তার দৃঢ় গলায় বক্তৃতা। খুব একটা বুঝছিলামনা, কারণ সে তার প্রাদেশিক ভাষাতেই কথোপকথন সারছিল। তবে যেটুকু বুঝলাম তার থেকে এটা বেশ জানা গেল যে সে কোম্পানির বিরুদ্ধে বেশ বড় রকমের কোন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। কোম্পানি যাই করে থাকুক, আমাদের তো মাস গেলে কয়েকটা টাকাপয়সা দেয়, যেটা দিয়ে আমরা পেট চালাই, মুখও চালাই অবশ্য...এখনি যদি সে আমাদের ধরে মঞ্চে তুলে দেয় আর নিজের মহানতা জাহির করে, আমাদের চাকরীটা যাবে।

ভয়ে ভয়ে তার চোখের আড়ালে গেট পেরোলাম। গেটের বাইরে থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় না, এ রাস্তায় কোন যানবাহন চলবে বলে আশা করা বৃথা। বাধ্য হয়ে কোম্পানির হস্টেলে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করলাম। সেখানেই গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে মনস্থির করলাম আপাতত। পেটটা কেমন খালি খালি লাগছে। টেনশন হলে আমার আবার বড্ড খিদে খিদে পায়। যে কদিন এই হস্টেলে থাকতাম, রাম সিং এর ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া চলত। লোকটা এমনিতে খাবার বেশ ভালো বানায়, তবে যে পরিমানে গুঁড়ো লঙ্কা মেশায় তা জিভ কোনরকমে কন্ট্রোল করে ফেললেও পেট আর পারেনা। কিন্তু খিদে যখন পায় আর একমাত্র ওই খাবারই ভরসা হয় তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই খেতে হয়। রাম সিং আজ বানিয়েছে ছোলে-চাউল... এটা এই এলাকার বেশ বিখ্যাত খাবার। এ দিয়ে ঠিক ভালোভাবে খাওয়া যাবেনা দেখে একটা ওমলেট বলে দিলাম। ছোলার ঝোলে যা ঝাল, খিদেটা তার থেকেও বেশি ছিল, তাই কোনরকমে গলাধঃকরণ করছিলাম, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। হিউম্যান রিসোর্শ থেকে ফোন... গোপন সুত্রে খবর পাওয়া গেছে, কিছু লোক লাঠিসোটা নিয়ে এদিকেই রওনা দিয়েছে। তারমানে আরও অন্ততঃ পনের মিনিটের মধ্যে ওরা এদিকে পৌঁছে যাবে। খাওয়া মাথায় উঠল, সবাই যে যার মত কেক, বিস্কুট ঘরে যা ছিল নিয়ে থলিতে ভরেই বেরিয়ে পরা হল। বিনয় আবার ল্যাপটপটাকে পিঠে ঝুলিয়ে ফেলেছিল। সবাই মিলে তাকে বোঝালাম যে সামনাসামনি যদি দেখা হয়েই যায়, তাহলে এক্ষেত্রে আগে ল্যাপটপটাকেই ভাঙা হবে... তার থেকে ঘরে লোহার আলমারিতে রেখে দিলে ক্ষতির চান্সটা একটু কম। সেই অনুযায়ী ল্যাপটপটা রেখে দিয়েই সবাই মিলে রওনা দিলাম হস্টেল ছেড়ে... ঠিক রওনা দিলাম নয়, পালালাম বলাটাই এখানে অধিক প্রযোজ্য।

হস্টেলের চারিদিকে জনবসতির চিহ্ন সেরকম নেই। একটু দূরে প্ল্যান্ট, সেদিকে তো যাওয়া অসম্ভবই বলা চলে। আর অন্যদিকে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই। জঙ্গল বলতে বাবলা, ফণীমনসা, তেশিরাদের সমাহার – জনহীন প্রান্তর, আর পাথরের রাজত্ব। মাত্র কয়েকদিন আগের কথা, এই জঙ্গলেই নাকি তেন্দুয়ার দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তেন্দুয়া চিতাবাঘেরই মত আর একটি বিড়ালমাসির প্রজাতি। যদিও সেই তেন্দুয়া এখনও কারও কোন ক্ষয়ক্ষতি করেনি, তবুও সাবধানের তো কোন বিকল্প হয়না। আসন্ন অশান্তির ভয়ে আর এক অজানা অশান্তির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। ওদিকে জনগণের হইচই বেড়ে চলেছে। হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্ষুব্ধ জনগন এসে আমাদেরকে খবর বানিয়ে ছাপিয়ে দেবে।জঙ্গলের দিকে প্রায় দৌড়াতেই শুরু করলাম। আমার একটা বাতিক ছিল, হাইলি রিস্কের মুহূর্তগুলোকে বন্দী করে রাখা। মোবাইল ফোনের ক্যামেরাটা অন করলাম। দুচারটে ছবি তুললাম। কোনটায় সবাই দৌড়াচ্ছে, কোনটায় রাস্তায় ক্যামেরা রেখে আমি নিজেই দৌড়াচ্ছি এরকম অভিনয়ের ছবি ইত্যাদি। সোশাল মিডিয়াতে পরে এইসব ছবিগুলো আপলোড করলে অনেক লাইক আর কমেন্ট পাবে। শর্ত একটাই... যদি টিকে যাই এযাত্রা।কাঁটার বন দেখে অনেকটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি আমি। মাত্র পাঁচ মেগাপিক্সেল এর ক্যামেরা। তাতেই শখের অন্ত নেই। এদিক ওদিক ঘুরে একটার পর একটা ছবি তুলেই যাচ্ছি। খেয়ালই নেই কে কোন দিকে পালিয়ে গেছে।

সম্বিত ফিরতে দেখলাম, চারিদিকে জঙ্গল, আর আমি একা। কোনদিকে ফিরব তার একটা দিক অবশ্য নির্ধারণ করা যায় ওই উঁচু চিমনিটা দেখে... কিন্তু বলা বাহুল্য ওখান থেকেই যত ঝামেলার সুত্রপাত। উল্টোদিকে যাওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে হল।চলেছি তো চলেছিই। কাঁটায় লেগে প্যান্ট জামা বেশ ভালোরকম ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণটা হয়তো এযাত্রা বেঁচে যাবে, এই আশাতেই আরও ভিতরের দিকে চলেছি। একটা কুয়োর মত দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি, কুয়োই তো বটে। আশেপাশে কয়েকজন মহিলাও আছে। হ্যা মহিলাই তো বটে। সেদিকে তাকাতে গিয়ে পায়ে পাথরের একটা চরম ধাক্কা লাগল। ভাগ্যিস কোম্পানির দেওয়া সেফটি স্যু খানা ছিল। ধাক্কাটার হাত থেকে পা-টা রক্ষা পেল। কিন্তু ওরা কারা? ওদিকে যাওয়াটা কি ঠিক হবে আমার পক্ষে?

"মাধুরী! তুমি এখানে?" প্রচণ্ড আশ্চর্য হয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।"আপনি যে কারণে এসেছেন ঠিক সেই কারণেই আমিও..." স্বচ্ছন্দ হিন্দীতে বলল মাধুরী। মেয়েটা রাজস্থানী, কিন্তু ওদের ভাষাটা হিন্দীর থেকে সামান্য আলাদা। ওরা কেউ নিজেদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কথা বলতে শুরু করলে, আমার মত লোকের সামান্য কথ্য হিন্দী জ্ঞান নিয়ে তা বোঝা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। যেমন বুঝতে পারলামনা মেয়েটা বাকীদেরকে ঠিক কি বলাতে ওরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।তা এ কি অবস্থা? পাতলা শাড়ি, হাত ভর্তি শাঁখা?ছদ্মবেশ, এঁরা সব আমাদের ওখানেই কাজ করেন। এনারাই যোগাড় করে দিয়েছেন সব।

--তা তুমি কি এখানেই থাকবে নাকি...
--আপনার সঙ্গে গেলেও মন্দ হয়না। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।
আহা আপত্তি কেন থাকবে। গভীর জঙ্গলে কোন যুবতী মহিলার সঙ্গ, এতো জীবনের অনন্য পাওনা। ভগবানের এহেন দান আমি সহজে প্রত্যাখ্যান করব না। চল' বাকীদের খোঁজা যাক। একসাথে থাকলে অন্তত তেন্দুয়ার হাত থেকে তো বাঁচবো।দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎই রুক্ষ জমিতে

কেমন যেন প্রাণসঞ্চার হতে শুরু করল। উত্তপ্ত হাওয়াকে মনে হল যেন হৃদয়ের উষ্ণতা, কাঠফাটা রৌদ্র হয়ে উঠল শরত-এর সোনা রোদ্দুর। কাঁটাগাছের বন তখন আমার কাছে, রূপসী ক্যাকটাসের সারি।পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল মাধুরী। খপ করে ধরে ফেললাম তার হাতটা। হৃদয়ে কেমন যেন হাজার হাজার ভোল্টের বিভব-পার্থক্য দ্বারা সৃষ্ট তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার হল। ঠিক ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ওর গলা খাঁকারির শব্দে হাতটা ছেড়ে দিলাম। সে লজ্জা পাবে কি, আমারই মুখ-কান রাঙা হয়ে উঠল।

অদূরে একটা মন্দির দেখা যায়। ওখানে নিশ্চয়ই পূজো জাতীয় কিছু হয়। তাছাড়া এই নিরালা জঙ্গলের থেকে অন্তত একটু হলেও নিরাপদ হবে জায়গাটা। কাছে পৌঁছাতেই দেখলাম ছেড়ে যাওয়া সঙ্গীরা সেখানেই জড়ো হয়ে আড্ডা দিচ্ছে। আমাদের দেখে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। পুলক আবার কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু টিপ্পনি কেটে গেল।সে যে যাই বলুক কিছু যায় আসেনা।

সবথেকে বড় কথাটা হল ওদের কাছ থেকে দুটো বিস্কুটের প্যাকেট আর জল পাওয়া গেল।

আহ... ভগবানের কি অপার মহিমা... কি অপূর্ব প্রশান্তি...শান্তি... শান্তি...

হঠাৎ একজনের ফোন বেজে উঠল। বাহ বাহ! তাহলে এই মন্দির থেকে মোবাইলের নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। বাড়ি একটা ফোন করে নিই এই ভেবে পকেটে হাত দিয়েছি – অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, “এইচ. আর. ফোন করেছিল। ঝামেলা মিটে গেছে।”জানা গেল, যারা মারা গেছে, তাদের পরিবারের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে কোম্পানি রাজি হয়ে যাওয়ার সুবাদেই এই সিদ্ধান্ত।মাস দুয়েক কেটে গেছে। প্ল্যান্টের ভিতরে মোবাইল নিয়ে যাবার জন্য পারমিশন লেটার লাগে এখনও, সেই আগের মতই। পুলিশের গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে বেশ কয়েক মাসের জেল হয়েছে কার্তিক জাঠের। অবশ্য এতে খারাপ লাগার কোন কারণ নেই, কারণ নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের প্রতিপত্তি জেলের মেয়াদ অনুযায়ী বেড়ে যায়। দুঃখের ব্যাপার হল বেচারা কার্তিকের চাকরীটা চলে গেল। আর কোনদিন আমার দুশ’ টাকাটা ওকে চাইতে পারব’ না... আমার একদিনের ওভারটাইমের দুশ’ টাকা...

অণুগল্প

সুবর্ণা রায়

১: খেলা

লুঙ্গির গিঁট খুলতে খুলতে ধরিপদ গলা চড়ালো, "কই গো? হোলো?"
পাউডারের গন্ধ ছড়িয়ে, আঁটো খোঁপা বেঁধে, খসখসে নীল তাঁতের শাড়ি পরে হাসিমুখে এঘরে ঢুকলো সামান্য স্থূলকায়া সরস্বতী, "এই তো!" বলেই হাঁ হাঁ করে উঠল, "আহ্, ওই প্যান্টটা নয়, জিনসেরটা পরো!"
লজ্জা লজ্জা মুখ করে পঞ্চাশের ধরিপদ সবেধন জিনসটা হাতে নিয়ে পিছন ঘুরল।

সপ্তাহে একদিন ধরিপদ আর বৌ সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয়। আগে নমাসে ছমাসে একদিন ছিল। রেলগেটের পাশে, বড় বাসস্ট্যান্ডটার গা ঘেঁষে "বড়বাজার" খোলার পর, সপ্তাহে একদিন।

নপাড়ার গুটিকয়েক দোকানের একটা ধরিপদর। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই গুহবাগানের বাজার। আর একটু গেলেই রেলস্টেশনের পাশের হাটবাজার। তবু রাতবিরেতে অসময়ে দরকার পড়তেই পারে এক কেজি চিনি কিংবা দুশ ছোলার ডালের, তাই ধরিপদ দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে বহাল তবিয়তে।

হরিপদ কেরানীর যেবার ছেলে হল, তিন মেয়ের পর, ধন্যি ধন্যি করেছিল সবাই। ছেলে জন্মের পর থেকে শুধুই কাঁদে। চিৎকারে বাড়িতে কাক বসে না। হরিপদর বৌ, "আহারে, বাছার খিদে পেয়েছে" বলে দুধ খাওয়ানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার চিৎকার শুরু। এরকম চলেছিল প্রায় বছরখানেক। সেই সময় হরিপদর এক সাহিত্যিক বন্ধু এসেছিল নপাড়ায়। লোকে কথা বলবে কি, ছেলে চিলচিৎকারে মাতিয়ে রেখেছে সারা বাড়ি। এদিকে উঁচু গলায় কথা বলতে বলতে হরিপদর গলা বসে ফ্যাসফ্যাসে। চোখের জল আর বিরক্তি সামলে কোনোরকমে ছেলের সামনে হাতজোড় করে বলেছিল, "পায়ে ধরি, চুপ কর বাপ!" কবিবন্ধুটি সামান্য নীরবতার পর বলেছিলেন, "এ ছেলের নাম ধরিপদ রেখো হে হরি!"

সে হরিও নেই, সে কবিও নেই। ধরিপদ রয়ে গেছে।

কুলের টক করেছিল আজ সরস্বতী, বেরোনোর সময় একটা কুল মুখে দিয়ে মুখশুদ্ধির কাজ চালাচ্ছে। একবার এগাল, একবার ওগাল। একটা ট্রেন বিকট আওয়াজ করে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। সরস্বতী আলতো করে বরের হাতটা ধরল। এখনকার ছেলেমেয়েগুলো রাস্তাঘাটে এর ওর হাত ধরে কেমন হাঁটে, সরস্বতীর ভারী ভালো লাগে। ধরিপদ কিছু বলল না, হাত সরিয়েও নিল না। সুখটুকু গায়ে গায়ে জড়িয়ে দুজনে পাঁচতলা দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। বিশাল সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে "বড়বাজার"। অভ্যাসমতই বড় একটা ট্রলি নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুজনে। একে একে জামাকাপড়, মেক-আপ, রান্নার বাসন, তোয়ালে, ঘড়ি, ঘর সাজানোর জিনিস, জুতো, বিস্কুট, চানাচুর, চাপাতা, হাত ধোয়ার কল লাগানো সাবান, পাপোষ মিলে ডাঁই হয়ে উঠল ট্রলি।
ধরিপদ ট্রলি ঠেলে। সরস্বতী একটা একটা করে জিনিস নেয়, নেড়েচেড়ে দেখে, বরকে দেখায়, দুজনে সম্মত হলে ট্রলিতে রেখে নেয়।
এতো গেল যাওয়ার পথের কথা। ফেরার পথটাই বেশী উত্তেজনার, অনেক বেশী মজার। ভর্তি ট্রলি ঠেলে এবার সরস্বতী। ধরিপদ একটা একটা করে জিনিস তোলে ট্রলি থেকে, ফেরত রেখে দেয় টেবিলে বা তাকে। তবে সব উল্টোপাল্টা করে। যেমন মুড়ির প্যাকেট রেখে দিল থাক থাক সাজানো ব্র্যান্ডেড জামার মাঝে। সাবান রেখে দিল জুতোর ভিতর। ঘড়ি রেখে দিল লিপস্টিকের তাকে। রঙচঙে জামা রেখে দিল আটা ময়দার পাশে।
সরস্বতী হেসে হেসে মুখ লাল করে ফেলে। চোখ মোছে মাঝেমাঝে। ধরিপদর এইসময়টা থমকে থাকে, তারপর মনের কোণে জমা হয়ে যায়। সরস্বতীর মুখটা তখন তার কাছে সেরাসুন্দরীর। অদৃশ্য খেতাবের মুকুটটা পরিয়ে দিতে দিতে ধরিপদর বুকটা ভরে যায়।
ফেরার পথে খুব হাসছিল দুজন। ধরিপদ অত হাসে না, তবু আজ সেও হাসছিল। একটা কন্ডোমের প্যাকেট রেখে এসেছে সদ্যজাত বাচ্চাদের জামার পিছনে।
ছোট্ট মুদী দোকানটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ধরিপদ তালা ঠিক আছে নাকি দেখে নেয়, সরস্বতী সন্তানস্নেহ উজাড় করে হাত বুলিয়ে দেয় করোগেটের টিনে।

২: পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এই জায়গাটায় আসতে রাঘবের লেগেছিল মাত্র কুড়ি মিনিট। একটু নার্ভাস লাগলেও মিষ্টি উত্তেজনাটা চাপা থাকছে না। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে ঘুরে পানবিড়ির দোকানটার থেকে একটা সিগারেট কিনতে গেলে দোকানি আর আশেপাশের লোকেরা যে তাকে কৌতূহলের চোখে দেখছিল, রাঘব খেয়াল করল না। লোকেরা ওর বাদামী চুল, ছাইরঙা স্যুট আর পালিশ করা কালচে লাল জুতো দেখছিল। খুঁটিয়ে দেখছিল কোমরে চাপা নামী দরজির নিখুঁত কাটের কোট, বুকের পকেটে উঁকি মারা হালকা হলদে সিল্কের রুমাল।

রাঘব এসব খেয়াল করল না। ঘিঞ্জি বেমানান গলির সাথে মানানসই তাল মিলিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। দেয়ালগুলোতে সিনেমার পোস্টার, পুরনোর ওপরে নতুন – লাস্যময়ী নায়িকা, প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে নায়ক। ইটবাঁধানো রাস্তা বেশী চওড়া না হলেও, পরিষ্কার। জুতোর খটখট আওয়াজ যতটা সম্ভব চেপে হাঁটার চেষ্টা করছিল রাঘব। সেলিমচাচার ফোন পেয়ে প্রথম ফ্লাইটেই চলে এসেছে। ঠিকানাটা তিনবার কনফার্ম করেছিল। সেলিমচাচা খুব হেসেছিল। অস্বাভাবিক ক্রুর হাসিটা কানে লাগলেও রাঘব আমল দেয় নি সেরকম।

বত্রিশ নম্বর বাড়িটা পেরোনোর পরেই রাঘবের গতি নিজে থেকে কমে গেল। পরেরটাই তেত্রিশ। এরই দোতলার একটা ঘরে এতবছর বাদে বাবাকে দেখবে ও। বুকের ভিতর আওয়াজ বাড়ছে, গলা শুকিয়ে গেছে। মনে মনে ভাবল রাঘব, বাবাকে কি দেখেই জড়িয়ে ধরবে, নাকি আগে দেখবে বাবার রিঅ্যাকশন? ঠিক করতে পারছে না রাঘব।

তেত্রিশের রঙওঠা নীলচে কাঠের দরজা খোলাই ছিল, ভেজানো। ভিতরটা আধো অন্ধকার, অল্প স্যাঁতস্যাঁতে। সামনেই সিঁড়ি। দোতলায় উঠে সামনেই পেয়ে গেল তেত্রিশ বাই ওয়ান।মরচে ধরা পিতলের পুরনো নাম্বারপ্লেট। বাদামী দরজা। প্যানেলে সাদা কলিংবেল। বন্ধ দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়াল রাঘব। কলিংবেলের দিকে চোখ রেখে ছোটবেলা থেকে মধ্য পঁচিশ অবধি পুরো সময়টা ঝালিয়ে নিল একবার। হারিয়ে যাওয়া সময় থেকে টুকরো টুকরো জড়ো করে একটা মুখ আঁকল মনে মনে। একটা হাসি আঁকল, যাতে চোখের পাশে চামড়া কুঁচকে যায়। বাবা। খুব ধীরে হাত বাড়াল বেলের দিকে। বাইরে বেলা বেড়ে প্রায় বারোটা।

নামাজ পড়া শেষ। চোখদুটো টেনে বন্ধ করে বিড়বিড় করছে সেলিম। জাফরি দিয়ে চৌকো চৌকো আলো এসে পড়ছে মুখে। ধান্দার উসুল ছাড়া যায় না। আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন নিশ্চয়ই। সেলিমের সাম্রাজ্যে একবার ঢুকলে, বেরোতে হবে জনাজায়। তারপরেও জিতুটা শুনল না। বলে কি না, "ছেড়ে দাও সেলিমভাই, নাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা করব"!

সেলিমের চোখ কড়কড় করে, ভিতরটা মোচড়ায়। শাস্তিটা কড়া হয়ে গেল। কিন্তু এ জগতের তো এই নিয়ম। তবু জিতুকে ও মারতে পারবে না, "বেটা" বলত। ডানা কাটতে পারে শুধু। "আল্লাহ্, বাচ্চাটার যেন বেহেস্ত নসীব হয়!"

জানালা থেকে ফিরে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল জিতু। এক কামরার সাদামাটা ফ্ল্যাটে একটা বিছানা, একটা টেবিল, চেয়ার, কিছু বই, একটা ছোট টিভি। প্যাক করা একটা বড় ব্যাগ চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। ঘরে কোথাও কোনো সামান্য সাক্ষ্য ছেড়ে যাচ্ছে না জিতেন্দ্র সিং। নিশ্চিন্ত হল আবারো দেখে নিয়ে।
বারোটা বাজতে পাঁচ। মেঝেতে পদ্মাসনে বসে পড়ল জিতু। স্যান্ডো গেঞ্জি ফুঁড়ে পেশীবহুল চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি খেলে গেল মুখে। আটচল্লিশে এরকম ধরে রাখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সহজ কিছুই ছিল না জীবনে। কোনদিন না।

সেলিমভাই রাজী হয়েছে অবশেষে তাকে আগের জীবনে ফিরিয়ে দিতে। পদ্মাসনে চোখ বুজে রাঘবের মুখটা মনে করল জিতু। হস্টেলে হস্টেলে কেটে গেছে ছেলেবেলা, বড়বেলাও। এবার সব সুদে আসলে উসুল করে জীবনটা রাংতায় মুড়ে ফেলবে। মুক্তির আকাশে নির্ভয়ে উড়বে তাদের ইচ্ছের ছোট বড় বেলুনগুলো।
খসখস আওয়াজে ধ্যান ভেঙে গেল জিতুর। ছোট মেশিনটার সাইলেন্সার চেক করে নিয়ে শ্বাপদের ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার দিকে।

আজ বারোটায় শেষ কাজটা করে দিলেই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে শার্প শ্যুটার জিতেন্দ্র সিং। সেলিমভাই শিকারকে খাঁচায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার শুধু ট্রিগারের খেলা আর একটু বারুদের – নির্ভুল নিশানায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক।

তোমার নাম, আমার নাম

কিকি

১

"ভিয়েতনাম" অফিসিয়ালি যা "দ্য সোশালিষ্ট রিপাব্লিক অফ ভিয়েতনাম" নামে পরিচিত। ছোট্ট লম্বাটে দেশটা সাউথ চায়না সাগরের কোল ঘেঁষে রয়েছে। আমাদের কলকাতা থেকে পূর্ব দিকে যেতে শুরু করলে , বাংলাদেশকে ফেলে আবার আমাদের দেশের থেকে এগিয়ে বার্মা বা মায়ানমারকে পিছনে রেখে থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়ার পরেই পাওয়া যাবে দেশটিকে।

এই দেশে অল্প কিছুদিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সেই সুবাদে এই অন্ধের হস্তী দর্শনের চেষ্টা। ভিয়েতনাম বললেই আমাদের প্রথমেই যেটা মনে পরে, তা হলো "তোমার নাম , আমার নাম, ভিয়েতনাম , ভিয়েতনাম "। বস্তুতঃ যেকোন সাধারণ ভিয়েতনামিসের কাছে এই কথা চুড়ান্ত অপরিচিত এবং শুনেও তাদের কোন ভাবান্তর হয় না। এবং তার থেকেও দুঃখের, “আন্ডো” (মানে ইন্ডিয়া) বলতে তারা কেবল বম্বে বা মুম্বাইকে বোঝে। কলকাতা শুনলে হাঁ করে চেয়ে থাকে। অবশ্য এ অভিজ্ঞতা ২০০৭/০৮ এর। এখন পরিস্থিতি বদলে যেতেও পারে।

পশ্চিমে লাওস, কাম্বোডিয়া, উত্তরে চীন, দক্ষিনে আর পুবে সাউথ চায়না সাগরের মাঝে একফালি লম্বাটে দেশটির দুটো প্রভিন্সে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচলক্ষ বছর আগে প্যালিওলিথিক যুগের হোমো ইরেকটাসের ফসিল পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পূঃ এক হাজার বছর আগে মা/ম এবং রেড নদীর ধারে গড়ে ওঠে ডম সান (Dong Son)সভ্যতা। সেই সময়ের ব্রোঞ্জের ড্রাম পাওয়া গেছে।এই সময় এখানে Van Lang ও Au Lac রাজত্ব গড়ে ওঠে যা ক্রমশঃ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০৭ এ চীনারা ভিয়েতনাম দখল করে নেয় এবং তারপর প্রায় হাজার বছর ধরে তারা ভিয়েতনামকে দখল করে রাখে।

১৮৬২ থেকে ১৯৪৫ ফরাসীরা ভিয়েতনামে দখলদারী চালায়। তারপরে যোগ দেয় আমেরিকানরা। আর সত্তরের দশকে পুরোপুরি বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয় ভিয়েতনামিসরা।ভিয়েতনামিসদের কাছে

শোনা অনুযায়ী, ফরাসীরা এতটাই অত্যাচার চালায় যে ক্রমশ: ভিয়েতনামিসদের সব স্কুল বা পড়াশুনার ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। নিজেদের কাজ চালানোর লোক তৈরীর জন্য কিছু স্কুল বানায় অন্যসব কলোনিয়াল প্রভুদের মতন, পার্থক্য এটাই যে ভিয়েতনামিসদের নিজেদের অক্ষর সমস্ত ভুলিয়ে দিয়েছে তারা। এখন ভিয়েতনামিসরা রোমান হরফ ব্যবহার করে আর ছটা চিহ্ন। ভাষা যদিও তাদের নিজস্ব। কিন্তু নিজস্ব হরফ বা সংখ্যা নেই। আর প্রতি গ্রামে মদ তৈরীর কারখানা থাকতো। সন্ধের পরে মদ বা আফিমের নেশায় যাতে ভিয়েতমামিসরা ডুবে থাকে তা কড়া ভাবে দেখা হত। মানে কিছুতেই ভাবতে দেওয়া হত না, যাতে করে কাজ করানোর মত কিছু মগজহীন মানুষই থাকে তার ব্যবস্থা করা হত।

সে যাহোক, এসব তথ্য গুগল থেকে নানান সাইটে গিয়ে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এবং মুস্কিলটা হল, ভিয়েতনামের গল্প এত করা হয়ে গেছে, যে এখন বলতে গেলেই একই কথা ফিরে ফিরে আসে, ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেও বেশ একঘেঁয়ে, তবুও চেষ্টা করছি কিছু তথ্য লিখতে।

দুহাজার পাঁচে প্রথম ভিয়েতনাম যাই ঘুরতে এবং সেই আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমন।বিদেশ মানেই তখন মনে হত এলিয়েন জগতসম কিছু সেখানে দেখা যাবে।কাজেই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে জানলার কাঁচে নাক সেট করে বসে আছি, আমি আবার একটু হাঁ করা মানুষ। যদিও ট্যাক্সিটাই বেশ অবাক করেছিলো। তখন ও পর্যন্ত ট্যাক্সি বলতে ধারনা এই যে একটা হলুদ রঙের শক্তপোক্ত অ্যাম্বাসাডার হবে, যা কিনা একজন এমন ড্রাইভার চালাবে যে কোথাও যেতেই চায় না। সেখানে দেখি, সব ট্যাক্সি ই এসি, আর নানান দারুণ মডেলের গাড়ীর। কেবল মাথার উপর ট্যাক্সি লেখা। বেশিরভাগ ই তখন মহিলারা ট্যাক্সি ড্রাইভার হত। কিন্তু ক্রমশঃ হতাশ হয়ে যাচ্ছি, সেই তো ইঁটের বাড়ী, ঝাঁ চকচকে দোকান, সবুজ গাছ, কিচ্ছু আলাদা নয় তো। মানুষগুলো কেবল অন্যরকম দেখতে আর পোষাক আলাদা।

২

তারপর ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত অনেকটা সময় সেখানে থাকা হয়েছে। ভিয়েতনামের হো চি মিন শহরে। প্রসঙ্গতঃ এই শহরটি ভিয়েতনামের দক্ষিনে অবস্থিত বেশ গুরুত্বপূর্ণ শহর, অনেকটা আমাদের বোম্বের মতন। তবে রাজধানী শহর হ্যানয় উত্তর ভিয়েতনামে অবস্থিত। এই দুটো শহরকেই অনায়াসে টু হুইলার শহর বলা যেতে পারে। রাস্তা বাইকে ভরে থাকে, এমনকি খুব ব্যস্ততার সময় দেখেছি ফুটপাথ দিয়েও তারা দিব্যি বাইক নিয়ে চলেছে। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শহর (এমনকি প্রভিন্সেও) গুলোতে রাস্তা সবসময় পরিস্কার রাখা হয় এবং সে রাস্তাও বেশ ভালো। এবং রাস্তার দুধারে বেশ বড় বড় গাছ থাকে। এরা সবুজ খুব ভালোবাসে। সিটি সেন্টারে অনেক সবুজ পার্ক রয়েছে। এবং খুব কম জায়গা, এবং একটি নির্দিষ্ট মাপের জায়গায় বাড়ী করতে হয় বলে বাগানের জায়গা থাকে না। তারই মাঝে উঠোন, বারান্দা, ছাদে টবে ভরে রাখে এরা।

দেশটি আয়তনে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক ছোট এবং স্বাধীনতা পেয়েছে অনেক পরে, তবুও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মান অনুযায়ী অনেকটাই এগিয়ে গেছে।অবশ্য ছোট দেশ এবং সমস্ত দেশে একটিই ভাষা, এগুলো বিরাট সুবিধার। দেশটিতে প্রথমেই যেটা চোখে পরে , তা হলো পরিচ্ছন্নতা এবং সাধারণ মানুষের নিয়ম মেনে চলার স্বাভাবিক প্রবনতা। একজন অতি দীন মানুষ ও যথাযথ পোষাক পরে এবং তা পরিচ্ছন্ন থাকে। রাস্তাঘাট, পার্ক, বাড়ীঘর যথাসম্ভব পরিস্কার রাখে এরা। এদের পৌরকর্মীরা দিনে দুবার রাস্তা পরিস্কার করে দিয়ে যেত তখন। তাদের হাতে গ্লাভস, মাথায় টুপি, নাকে গার্ড এবং গাম্বুট থাকত পায়ে, এতটাই সচেতন তারা।সন্ধ্যেতে বড় গাড়ী করে রাস্তার ধারের

গাছ গুলিতে জল দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। প্রত্যেক বাড়ীর বর্জ্য কালো প্ল্যাষ্টিক ব্যাগে বন্ধ অবস্থায় বাড়ীর সদরের বাইরে রাখা থাকত যা এরা নিয়ে যেত। এবং বন্ধ ব্যাগ বলে নোংরা চারিদিকে ছড়ানোর উপায় থাকত না। প্রত্যেক বাড়ীতেও বিন গুলোতে ব্যাগ রাখা থাকত, সেটা ভরে গেলে বাইরের গোটানো অংশ ধরে তুলে বেঁধে বাইরে রেখে আসা হত, কাজেই সেক্ষেত্রেও হাতে নোংরা লাগার সম্ভবনা থাকত না। এতটাই সিস্টেমেটিক ছিলো তখন ই তারা। ড্রেন সমস্তই ঢাকা এবং প্রত্যেকবাড়ীর ড্রেনেজ সিস্টেমের যে অংশটি রাস্তার ড্রেনে এসে পড়ছে সেখানে জালি লাগানো, ফলে ড্রেনে কেবল জল ই গিয়ে পড়ছে এবং ড্রেন জ্যাম হওয়ার সম্ভবনা নেই। রাস্তায় টয়লেট প্রায় সব পার্কেই ছিলো, এবং এমনি রাস্তাতেও মুভেবেল টয়লেট রাখা থাকত, তা বেশ পরিচ্ছন্নও।

আর রাস্তায় খুব বিক্রি হত ইউজ অ্যান্ড থ্রো রেনকোট। কারন এখানে হঠাৎ হঠাৎ ই বৃষ্টি চলে আসে। আর দক্ষিন ভিয়েতনামে দুটোই সিজন, সানি আর রেইনি। এখানে বেশ পুড়িয়ে দেওয়া গরম। কিন্তু লোকজনকে সেভাবে ছাতা ব্যবহার করতে দেখা যায় না। মেয়েরা খুব সৌন্দর্য সচেতন। তারা রৌদ্রে বেরোলে মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস এবং মুখ স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতে লম্বা গ্লাভস, পায়ে জুতো, মোজা , অর্থাৎ কিনা সর্ব অঙ্গ ঢেকে রাখে। ছেলেরাও টুপি ব্যবহার করে।

এখানে হ্যানয় এবং হো চি মিন এই দুটো শহরেই দেখেছি সিটি সেন্টার গুলি সবুজ পার্ক এ সাজানো এবং হ্যানয়ে অনেক লেক রয়েছে। রাস্তাও সেখানে বেশ চওড়া। এখানে প্রত্যেককে বাড়ী করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাপের জমি দেওয়া হয়। তা বেশ ছোট মাপের। কাজেই তারা প্রত্যেকেই (কর্নার প্লট ছাড়া) প্রতিবেশিদের দুটি দেওয়াল শেয়ার করে। কাজেই কেবল দুদিকেই জানালা বা দরজা বানানোর জায়গা থাকে। এবং পাশে বাড়াতে পারে না বলে এরা ক্ষমতা অনুযায়ী ফ্লোরের সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়। এবং ঘরের মাপ বেশ বড় রাখে। এজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রতি ফ্লোরে দুটি করে ঘর রাখে। বেশিরভাগ ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে , বিশেষ করে সাধারণ ফ্ল্যাট বাড়ী গুলোতে অনেকসময় কেবল একটা দিক ই খোলা থাকে। বাড়ী গুলি এভাবে তৈরী হয় বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক মোর থেকে আরেক মোর পর্যন্ত বাড়ীগুলিকে একটাই বাড়ী বলে ভ্রম হয়। এখানে রাস্তাগুলি প্যারালাল। ফলে রাস্তায় খুব সুবিধা হয় চলতে, ভুল হবার সম্ভবনা বেশ কম। ভিয়েতনামিসরা বেশ সৌখিন স্বভাবের এবং অত্যন্ত খুঁতখুঁতে যেকোন কাজের ক্ষেত্রে , বা বলা যায় পারফেকশনিষ্ট। যার জন্য এদের হাতের কাজ অত্যন্ত ভালো হয়।

৩

মানুষরাও ভারী হাসিখুশী। এমন অনেকবার হয়েছে আমি তাদের কথা বুঝছিনা, তারাও আমার, তবু যে যার নিজের ভাষায় কথা বলে গেলাম অনেকক্ষন ধরে , অনেকটাই ইশারার উপর নির্ভর করে। খুব অল্প কয়েকটা শব্দ মনে আছে, যা শিখেছিলাম।'থম' মানে না,' ড্যুং' মানে হ্যাঁ, 'সিন চ্যাও' মানে হ্যালো বা সময় বিশেষে গুড মর্নিং। 'ড্যাব' মানে সুন্দর'।স্যুয়্যা বা সোয়্যা' মানে দুধ, 'ড্যা' মানে বরফ। বয়সে ছোট মেয়ে সম্বোধন করা হত অ্যাম অয় বলে, বয়সে বড় মেয়েদের চি অয়, ছেলেদের অ্যান অয় , এভাবে। ডাঁয়ে বাঁয়ে কে চায়ে ছায়ে, খুব সম্ভবতঃ। এদের যেহেতু লেটার এবং সংখ্যা গুলি ইংরাজির, কাজেই লোকাল বাজারে গেলে জিনিস নেওয়া হলে ক্যালকুলেটরে সংখ্যা দেখিয়ে দিত। ভিয়েতনামিস কারেন্সিকে ডং বলা হয়, এবং তখন এক টাকার সমান ছিলো তিনশ ডং। কাজেই যেকেউ লাখ লাখ ডং নিয়েও দিব্যি ঘুরে বেড়াত। জিনিসপত্রের দাম ছিলো বেশ বেশি এবং বিদেশি বুঝলে

এরা জবরদস্ত দাম হাঁকাতো, সেক্ষেত্রে কোন কমপ্লেন করলে কাজে আসত না। ওদের নীতিই ছিলো দেশের লোককে আগে সাপোর্ট দেবে।

তখন ও পর্যন্ত ভিয়েতনামিসরা খাবার এবং নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলো। সকাল বিকেল পার্কে বা রাস্তায় অসংখ্য স্বাস্থ্যপ্রেমী মানুষ দেখা যেত জগিং বা ওয়াকিং এ ব্যস্ত। ফলে মোটা মানুষ সেভাবে চোখে পরত না। পরে শেষবার ২০১০ এ যখন যাই, তখন দেখি অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং শহরটি খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আগে এই শহরে ভিখারি দেখা যেত না। সেইরকম গরীব মানুষকে লটারির টিকেট বা ফুল বিক্রি করতে দেখেছি। শেষবার গিয়ে বেশ অনেক ভিক্ষুক ই দেখলাম। যখন উপায় না থাকে, তখন ঠিক ই মানুষ পরিবর্ত উপায় খুঁজে নেয়। ভিয়েতনামিসদের প্রধান খাদ্য ভাত এবং মাছ, ঠিক আমাদের বাঙালীদের মতন।
কেবল ভাতটা স্টিকি রাইস এবং রান্নার বেস আমাদের মতন তেল মশলা নয়, জল। সব কিছুরই স্যুপ বানিয়ে ফেলে। মাছ বা মাংস তো থাকেই, সাথে থাকে প্রচুর শাক, সব্জি এবং খাওয়ার শেষে ফল। ফলে এদের ত্বক এবং চুল বেশ ভালো হয়। এদের একটা ভীষন প্রিয় খাবার হল 'ফ' , যা আদতে ন্যুডল স্যুপ। বিরাট বড় সাইজের গরুর মাংসকে সকালে ডেচকির জলে ফেলে স্লো কুক করে সিদ্ধ করতে থাকে। তাতে দেয় নানারকম সব্জি এবং রাইস ন্যুডলস। সাথে দেবে প্রচুর পাতা, বেসিল, মিন্ট, ধনেপাতা, এছাড়া বিন স্প্রাউট আর লেবু। রাস্তাঘাটে ছোট থেকে বড় নানারকম ফ এর দোকান আছে। দারুন হেলদি আর সুদিং খাবার। আমি সেটাকে নিজের মতন করে বানিয়ে নিই। পাঁঠার মাংস, পেঁপে, বিনস, গাজর দিয়ে অল্প আদা বাটা আর গোলমরিচ দিয়ে স্যুপটা বানিয়ে নিই। বাকি যা পাতা পাওয়া যায়, আর আলাদা সিদ্ধ করে রাইস ন্যুডলস তাতে দিয়ে দেই। লেবু তো মাস্ট।

স্টিকি রাইস

এখানে ঘুরতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও বেশ ভালো। এদের সার্ভিস পার্টের তুলনা হয় না। অতি সাধারণ হোটেলেও পরিস্কার ঘর, বিছানা আর টাওয়েল পাওয়া যাবে। যেকোন প্যাকেজ ট্যুরে গেলে গাইড সমস্ত রাস্তাটা ভারী মজার গল্প বলতে বলতে তার দেশেকে চিনিয়ে দেবে। প্রতিটি ট্যুরিস্ট স্পটেই প্রচুর স্যুভিনিয়রের দোকান থাকে, তাদের হাতের কাজের জিনিস ই বেশি পাওয়া যায়, তাতে ছোট কাঠের সুন্দর গয়নার বাক্স, মাদার অফ পার্লসের কাজ করা থেকে, বড় দারুন্ শো পিস , আসবাব ও পাওয়া যায়, আর সেলাইয়ের কাজ। সব থেকে দারুন এদের সিল্কের উপর সেলাইয়ের কাজ, দেখে মনে হয় হাতে আঁকা।

গাইডরা প্রায় প্রত্যেক জায়গার ই কিছু মিথ নিয়ে গল্প শোনায়, সেরকম দুটো গল্প বলে শেষ করব। প্রথমটা শুনেছিলাম হ্যানয়ের কাছে হ্যালঙ বে তে গিয়ে আর দ্বিতীয়টা দালাতে ঘুরতে গিয়ে।

হ্যালঙ এর মানে ডিসেন্ডিং মাদার ড্রাগন। গল্পটা এইরকম; তখন সবে নতুন দেশ তৈরী হয়েছে, এদিকে ভিয়েতনামিসদের কেবল ই উত্তরের সাগরের দিক থেকে আসা বহিঃশত্রুর ভয়ে সজাগ থাকতে হচ্ছে এবং বারংবার তাদের সাথে লড়তে হচ্ছে দেখে জেড রাজা ভারী দু:খিত হয়ে স্বর্গ থেকে মাদার ড্রাগনকে তার ছানাপোনা সমেত সেই সাগরে পাঠিয়ে দেন। মা ড্রাগন তার ছানাদের নিয়ে চুপটি করে সাগরে ডুবে বসে থাকে। তারপর যখন আবার আক্রমনের সম্ভবনা দেখা দেয় তখন ভুস করে ভেসে উঠে আর মুখ দিয়ে আগুন আর বড় বড় পান্না ছুঁড়তে থাকে। সেই পান্না গুলো জলে পরে ন্যাচারাল বেরিয়ার তৈরী করে, আর শত্রুদের জাহাজগুলো ডুবে যায় ও তারা নির্মূল হয়। সেই থেকে আর ভিয়েতনামিসদের সাগর থেকে আসা শত্রুদের নিয়ে ভয় পেতে হয় নি। আর বহু বহু বছর পরে ঐ পান্না গুলো আইল্যান্ড আর আইলেট এ পরিনত হয়, যা আজকে আমরা বিভিন্ন শেপ ও সাইজে দেখতে পাই। আর তখন থেকে মা ড্রাগন যেখানে ডুবে ছিলো সে জায়গার নাম হয় হ্যালঙ আর ছানাদের ডুবে থাকা জায়গার নাম হয় বায় তুই লং।

ল্যামবিয়াম মাউন্টেনের গল্প:

ল্যাম আর বিয়ামের মূর্তি

ল্যামবিয়ামের গল্প সেই হির-রাঞ্চা, রোমিও-জুলিয়েটের গল্পের মতই। প্রতি দেশেই বোধহয় একটা এমন বিরহাত্মক মিথ (?) থাকে। আর বিরহ মনে হয় প্রেমের গল্পের সবচেয়ে মধুর দিক। গল্পটা এইরকম,দালাতের কাছে দুই আদিবাসী দল ছিলো, যাদের মধ্যে প্রবল আকচা আকচি,ল্যাক আর চিল মাইনরিটি গ্রুপ। ল্যাকদের দামাল ছেলে কে ল্যাম আর চিলদের দস্যি মেয়ে হো বিয়াম। হো তো একেই ভিয়েতনামিস মেয়ে, ভয় তার কিছুতেই নেই, তার উপর পাহাড়ের কোলে বনের ধারে সে বড় হয়েছে, বনবালিকা বনকে চেনে নিজের হাতের

তালুর মতই। কে-ও কম দামাল নয়, সেও নিজের মনে বনবাদারে ঘুরে বেড়ায়। এমনি এক দিন হো একদল হিংস্র, ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে পড়েছে। আর বাঁচার উপায় নেই। এমন সময় কে এসে টার্জানের মতই গাছের ঝুড়ি ধরে ঝুলে পলকা হো-কে নিয়ে নেকড়েদের হাত থেকে অনেক দুরে পালিয়ে যায়। তারপরেই মনে হয় একে অপরের চোখে নিজেদের সর্বনাশ দেখতে পায় । আর যা হয় , ক্রমশ আর কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারছে না, এদিকে দুই প্রবল বিরোধী দল তাদের বিয়েও মেনে নেবে না। তখন তারা পালিয়ে যায় পাহাড়ের উপরে, বনের মধ্যে। কিন্তু দলনেতার মেয়ে , তার এত কষ্ট সইবে কেন! কঠিন অসুখে পড়ে সে, আর উপায়ন্তর না দেখে কে তাকে নিয়ে ফিরে আসে গ্রামে। কিন্তু গ্রামে আসতেই যেহেতু চিলদের তারা সহ্য করতে পারতো না তাই হো-র গ্রামের মানুষ বিষাক্ত তীর দিয়ে তাকে মারতে যায়। তখন হো সামনে এসে কে- কে আড়াল করতে গিয়ে তীরের আঘাতে মারা যায়। সবার জ্ঞান ফেরে যে তারা আসলে কি করে ফেললো। কে পাগল হয়ে যায়। তার কান্না থেকে তৈরী হয় দানকিয়া নদী, বা সোনার নদী। এবং শোকে দুঃখে কে ও মারা যায়। তাদের সেই পাহাড়ের পাদদেশে কবর দেওয়া হয় আর তারপরেই সবাই অবাক হয়ে দেখে পাহাড়ের মাথায় দুটো চুড়া আর তারা একে অপরের দিকে চেয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে তারা এমনি করেই চেয়ে রয়েছে একে অপরের পানে। তাই এই যুগ্ম শৃঙ্গের নাম ল্যামবিয়াম।

[ছবি: লেখক]

পাড়াকাহিনী

রিনি চৌধুরী

অনেকদিন পাড়া বেড়ানো বন্ধ। আড্ডায় হাজিরা দেওয়া হয় না। মাঝেসাঝে পাড়াতুতো 'অকেশনে' মেলাজোলার সূত্রে কোনো কোনো কানাকানি গল্প পাওয়া যায়, সেসব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তবে বলার মতো গল্প একটা আছে। গত বছর পুলিশ বউদি আমার সঙ্গে একতরফা আড়ি করে দিল। সেদিন আমার জন্মদিন। বাড়িতে দুজন বন্ধু এমনিই এসেছিল, তাদের মিষ্টি খাইয়েছি, আর পাশের বাড়ির পাঁচ বছর বয়সী বন্ধুকে চারটে কেক দিয়েছি, তাতেই রাগ হয়ে গেল ওর। দু'দিন পরেই ছেলের জন্মদিনে আমায় বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে ডেকে রোল খাওয়াল, তারপর বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে পরোটা-মাংস, সেখানেও আমি বাদ (অবশ্য সকালে আমার কাছেই শসা চেয়ে নিল)। নিমন্ত্রিতের দলের কেউ কেউ বাড়ি বয়ে সহানুভূতি জানিয়ে গেল। আমি কখনো আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করি না। একতরফা লড়াই স্বল্পায়ু, সে কথা বিশ্বাস করি। ক'দিন পর বিজয়াদশমীর ছলে সব্বাইকে নেমন্তন্ন করলাম। পুলিশবউদি, ছেলে-মেয়েকে সাদরে পেট ভরে খাওয়ালাম, পুলিশদাদার খাবার পাঠিয়ে দিলাম। এইসব টুকটাক ঠোকাঠুকি আর ছুটকো কানাঘুষোয় বছর গেল। আবার ঘরের দোরে পুজোর উঁকিঝুঁকি।

পুজো এসে গেলে এ পাড়া স্ব-স্বভাবেই জমজমাট। রথযাত্রায় ঠাকুরের বায়না দেওয়া হয়ে গেলেই পুজোর প্রথম অধিবেশন শুরু। গত বছর থেকেই পুরোনো দিকপালদের মধ্যে ধিকিধিকি বিদ্রোহের আঁচ। এ বছর তারা কেউ পুজো কমিটির কোনো উচ্চ পদে নাম লেখাবে না। এতদিন তারাই সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা-দায়িত্ব সামলেছে, এবার নতুনেরা দায়ভার নিক। মানে দৈনিক অধিবেশনে এমনটাই চাউর হচ্ছিল। তবে মনে মনে যে সাম্রাজ্য বজায় রাখার ইচ্ছে ষোলআনা, সেটা বোঝা গেল দ্বিতীয় অধিবেশনে। 'ফার্স্ট মিটিং'-এ পদ-পরিবর্তন নিয়ে তেমন জলঘোলা হল না। তর্ক ছিল চাঁদার পরিমাণ নিয়ে। মিসেস চ্যাটার্জী সরকারী উচ্চপদে চাকরি করেন। কাজেই সামনাসামনি তাঁর কথার ওপর কথা বলার ধক কারো নেই। এমনকি সুমনা, জাঁদরেলবউদি বা পুলিশবউদিরও নয়। এই মিটিংয়ে পাড়ার সকলকেই ডাকা হয়, কিন্তু কোনোবার কোর গ্রুপের লোকজনের উপরি গোটা ছয়েকের বেশি লোক হয় না। এবারেও সেই একই। দশ-পনেরোজন মেম্বারেই মেতে উঠল অধিবেশন। পুজোর বাজেট এবারের বিশেষ

সমস্যা। গত বছর পর্যন্ত মোটা ডোনেশন দিয়েছেন এমন তিনজন এবার বাদ। তার মধ্যে পাড়ার নবাগত আব্বাস পরিবার টাকার গরমে সর্বদা মড়মড়ে। লোকে বলে কর্তা আব্বাস চিটফাণ্ডের টাকায় পাড়ার গলিতে পেল্লায় বাড়ি হাঁকিয়েছে। পড়শিরা দেখেছে কাকভোরে ট্যাক্সিতে লাল শালু মোড়া বাক্সে নগদ টাকা চালান যায়। বাড়িতে এক পিস বউ (বাকি চার পিসের জন্য না কি বিভিন্ন জায়গায় এমনই বিশাল বিশাল বাড়ি), এক পিস শালী, ফুটফুটে মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি, লোক-লস্কর, আয়া-কুটুম্বে সরগরম। বউ আর তার বাপের বাড়ির সকলে প্রত্যন্ত মফঃস্বলের মানুষ, কিন্তু উঠতি বড়মানুষী চালচলন দেখানোর তাড়নায় সারাক্ষণ ছটফট করছে। তাতে অবশ্য পুজোকমিটির লাভ বই ক্ষতি নেই। চাইতে না চাইতেই পাঁচ-সাত হাজার ওমনি দিয়ে দেয়। প্রথম দু'বছর কোনো গোল ছিল না। জাত-পাত-ব্যবহার নিয়ে কানাঘুষো ছাড়া তেমন কিছু ব্যাঘাত ঘটেনি। সাড়ে সব্বনাশ হল গতবছর। যে গলিতে খাওয়ার প্যাণ্ডেল, তার শেষপ্রান্তে আব্বাস-বাড়ি। আব্বাসের আধা-ঘরওয়ালি, মানে শালী এক আজব প্রাণী। ঘোর শ্যামলা, খাতা-পিতা সাইজ, কান-ছাঁটা চুল, থুতনির কাছে একচিলতে কালো মাছির মতো কি যেন একটা। কেউ কেউ বলে দাড়ি, কিন্তু শালীর থুতনিতে দাড়ি! মন মানে না। সে যাক গে, শালী দেমাক আর স্পীড মিলিয়ে স্কুটি চালায়। সপ্তমীর দুপুরে সেকেন্ড ব্যাচ সবে খেতে বসেছে, এমন সময় ভ্রুম ভ্রুম সশব্দে শালীরাণী হাজির। অনুরোধ করা হল স্কুটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু তার মানে লাগল। দু'সারি খাবারের বেঞ্চের মাঝ দিয়ে হুউস্ করে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। ব্যস, 'পুজো কমিটি ইন্ডিয়া' গরম দুধের মতো ফুটতে লাগল। কেউ বলে মার্, কেউ বলে ধর্। সবে একপরত শান্তির সর পরেছে কি পড়েনি, শ্যালোর (শালী-শালার সংমিশ্রণ) স্কুটি ফড়ফড়িয়ে ফের ছুটে এল। এবার পাড়ার দাদারা তৈরি। ঝ্যাট করে উঠে স্যাট করে আটকে দিল স-স্কুটি শ্যালোকে। তারপর কেলো কাকে বলে! ভদ্র গলাবাজি, খিস্তি-খেউড়ের চরম! কিন্তু এ পাড়ায় বড় থেকে বুড়ো হওয়া দাদাদের মিলিত আক্রমণের সামনে আব্বাসের শ্যালো কুটোর পারা উড়ে গেল। মুখ নিচু করে স্কুটি ঠেলে ঠেলে ঘরে ঢুকতে হল তাকে। মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল আব্বাসের প্রতিশোধ কোন রূপ ধরে আসবে তা কে জানে! সাহসী-সিনীরা পরোয়া করল না। তবে ফলস্বরূপ এ বছর আব্বাস তরফের হাজার দশেক টাকা বাজেট থেকে বিলকুল বাদ।

দ্বিতীয় ডোনেশন-মাসিমার গল্পটা একটু অন্যরকম। পাড়ার পত্তন থেকে ওনাদের বসত। ছেলে-মেয়েদের বড় হওয়া, তাদের বিয়ে, তাদের কুচো-কাচা সব এখানেই। যে কোনো পাড়াতুতো অনুষ্ঠানে সবাই ওনার পরামর্শ নেবে, ওনাদের আলাদা করে নেমন্তন্ন করবে, এটা পাওনা হিসেবেই ধরেন। সবাই সেটা মানেও। অতএব পুজোর সময় উপদেশ-চাঁদা-ডোনেশনের প্যাকেজ পাওয়া যায়। কিন্তু গেল বড়দিনে উনি বেজায় চটলেন। আমাদের ক্লোজ্ড্-গ্রুপ, মানে পাঁচ পরিবার মিলে ডিসেম্বরের শেষ রাত উদ্‌যাপন করছিল আদি-বাড়ি ও পুলিশ বউদির বাড়ির মাঝের গলিতে। কাঠ-কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালা হল, পুলিশ বউদির গ্যারেজের সামনে পাতা চেয়ারে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল, চিপ্‌স্ আর কেকের টুকরো ভরা প্লেট রাখা। সামনের বাড়ির বারান্দায় লাগানো বক্স থেকে ভেসে আসছে চটুল হিন্দি গান, সবাই নাচছে। সুমনার মাথায় জলদস্যুদের মতো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা, হাতে সফ্‌ট্ ড্রিঙ্কসের গেলাস এমনভাবে ধরা, যেন সেটা হার্ড ড্রিঙ্কস মনে হয়, পুলিশ বউদির চিরাচরিত শালোয়ার আর উড়ন্ত দোপাট্টার ডোন্টকেয়ার নাচ (বিসর্জন, পিকনিক, বড়দিন সবেতেই ভঙ্গি এক) চলছে, দিব্যি চলছে। কিন্তু ডোনেশন-মাসিমার জানলায় দু-চক্ষুর সিসিটিভি যে চালু ছিল সেটা কেউ খেয়াল করেনি। ফল, পরের দিন শিপ্রার বাড়ি এসে রীতিমত হিংস্র টোনে শাসিয়েছেন – "পাড়াডা কি অসব্যতা করনের জায়গা? তোমাগো হায়া-শরম কি কিসুই আর নাই। পাড়ার মাইয়া-বউ সব রাস্তায় নাসো? কিস্যা কাহিনী

যা করবা ঘরের ভিতর করন যায় না? আর করসো করসো, কই, আমার বউ দুইডারে, নাতনিগুলারে ডাকো নাই তো! ওরা কি এ পাড়ার নয়, না কি? ঠিকাসে, আমিও আর কোনোকিসসুতে নাই, এইডা জাইন্যা রাইখ্য"। সে নয় জানলাম, কিন্তু সেই প্রকোপে যে পুজোর ডোনেশনে কোপ পড়বে এটা ভাবা যায়নি। তাই এবারের 'ফার্স্ট মিটিংয়ে' চাঁদা আর ডোনেশন নিয়েই আলোচনার জলঘোলা। এইসব প্রসঙ্গ তুলেই ম্যাডাম চ্যাটার্জী ভেটো দিলেন – 'এবারে চাঁদাও বিরাট কিছু বাড়ানো যাবে না। বাড়ালেও তাতে পুজো হয়ে খাওয়ানোর পয়সা অসম্ভব। লোকে দু'হাজার টাকা চাঁদা দেবে, অথচ খেতে পাবে না, এটা মানবে না। তাই আমার মনে হয় চাঁদার অ্যামাউন্টটা ষোলোশোই থাক, আর চারদিনের বদলে একদিন, মানে শুধু অষ্টমীর দিন খিচুড়ি খাওয়ানো হোক। তোমাদের কি মত সবাই বল"। ম্যাডাম সবসময়েই আগে ভেটো দিয়ে পরে ভোট চান। সবাই প্রথমটায় গুম হয়ে রইল সাড়ে চার সেকেন্ড। তারপর সুপ্তিদি হাত তুলল – "আমি রাজি"। ব্যস, পর পর হাত উঠতে লাগল। দু' একজন মিনমিন করে কিছু বলার চেষ্টা করল। ম্যাডাম দৃকপাত করলেন না। পুলিশবউদি সামান্য সুর চড়িয়ে বলতে যাচ্ছিল – "কুপন কেটে নবমীর দিন মাংস-ভাত..." এক দাবড়ায় থামিয়ে দিলেন ম্যাডাম, সঙ্গে ধুয়ো ধরল সবাই – "ষোলোশো টাকা দেওয়ার পর কি কেউ আর কুপন কাটবে? পাড়ার লোকেদের চেনো না?" কোণের দিকে বসা তিতলি বউদির ওপর পুজোর কাজের ভার। সেই ভোর থেকে কাজে লেগে পড়া। রান্না করবেন কখন? কিন্তু ওরকম এক দুটো ক্ষীণ স্বর ম্যাডামের কানে পৌঁছনোর আগেই মিলিয়ে গেল। ঘড়ির ঘন্টায় রুটি করার ঘন্টা বেজে যেতেই অধিবেশনের গণেশ উলটে সবাই বাইরে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় পা দিতেই আর রুটি করার তত তাড়া দেখা গেল না। সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যাডাম চ্যাটার্জীর মুণ্ডু চর্বণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেখলাম সমস্ত ম্যাডাম-পন্থী মহিলারা ম্যাডাম-বিরোধী জোট হয়ে গেল নিমেষেই। ও বাবা, এই যে একটু আগেই সবাই একযোগে সাপোর্টাচ্ছিল, এখন তো দেখি সব ক'টা অ্যান্টি হয়ে গেল, এবং সবাই দাবি করতে লাগল তারা না কি আগাগোড়া ম্যাডামের সঙ্গে সহমত ছিল না, প্রতিবাদ করছিল। চাঁদা দু' হাজার হতেই হবে, চারদিন খাওয়াও করতেই হবে। চ্যাটার্জীর কথা চ্যাটার্জী বলেছে সে ঠিক আছে, কিন্তু শুনতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে! আর সব সিদ্ধান্ত ওকে জানানোরই বা কি আছে? ঘাবড়ে গিয়ে মিনমিন করে বললাম – "তাহলে তোমরা এই কথাগুলো ওনার সামনে কেন বললে না?" পুলিশবউদি, প্রীতিদি আর সুমনা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল – "বলব না কেন? বলেছি তো! আর এই তো এখন বলছি, বলছি না?" আমি খাবি খেয়ে চুপ করলাম। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল পরের দিনই পরের সভা বসবে সুমনার বাড়িতে। সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ সভায় আবার আমার গমন। ততদিনে চাঁদার অঙ্ক ঠিক হয়ে গেছে, ক'দিন খাওয়া হবে সে লিস্টও কমপ্লিট। ভাবলাম যাক বাবা, তাহলে আর বেশি ঝামেলা নেই। আজ শুধু পদাধিকার নির্বাচন। সেটাতে মনে হয় খুব একটা গোলমাল হবে না। সেই প্রত্যেক বছরের মতো নাটক, আর তারপর নিজেদের নাম নিজেই লেখা। কিন্তু এবার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। পুরোনোদের সাধ্যসাধনা না করে নতুন তিন-চারজন সেক্রেটারি, ট্রেজারার হতে রাজি হয়ে গেল। এইবারেই কেলো! পুরোনোরা এতদিন "পারবো না, পারবো না" করে চেঁচালেও আসলে পারতেই চাইছিল। গত কমিটির সেক্রেটারি প্রীতিদির বক্তব্য – "ওরা একবারও করে নি, সামলাতে পারবে?" ওর ওপর খার আছে এমন তিন-চারজন প্রতিবাদ জানালো – "কেন পারবে না? তোমরাও তো একসময় প্রথম থেকেই শুরু করেছিলে!" ট্রেজারার

নির্বাচনের সময় এক নয়, একেবারে দু'জন স্বেচ্ছায় হাত তুলল। এবার গত-ট্রেজারারের পালা। একটু আগে সে-ও প্রীতিদির বক্তব্যের বিরুদ্ধে গলা মিলিয়েছিল। এখন আর হালে পানি না পেয়ে আত্মসমর্পণ করল। তবে উপদেশ দিতে ছাড়ল না – "তোমাদের যখনই অসুবিধে হবে আমায় বোলো। আমি এত বছর সামলাচ্ছি তো, সব খুব ভালো করে জানি"। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নিঃশব্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন এক মাসিমা ঢুকলেন, পুরোনোজন 'ভাইস'-এর তকমা নিয়েই হাল ছাড়লেন।
এবার শুরু কাজ। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল নতুন ট্রেজারাররা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। পুরোনো ট্রেজারারকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এমনিতে যাদের নিরীহ গোবেচারা মনে করা হত, তারাই কথায় কথায় বলিষ্ঠ জবাবে পিছপা নয়। পোড় খাওয়া দিদিদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া মুশকিল। দৈনিক আড্ডাখানায় শুধু ওদের মুণ্ডুপাত নয়, জব্দ করার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার কাজও চলে, যাতে সামান্য ভুল নজরে এলেই ক্যাঁক করে ধরা যায়। কিন্তু জমে উঠল পুরোনোদেরই নাটক। গত বছর শোনা গিয়েছিল 'মমতাদিদি' মহিলা-পরিচালিত পুজোকমিটিদের দশ হাজার টাকা অনুদান দেবেন। প্রীতিদি খুশিতে ডগোমগো হয়ে জনে জনে ডেকে বলতে লাগল – "দিদি আমাদের দশ হাজার টাকা দিচ্ছেন। আমাদের পুজোর স্ট্যাটাস বেড়ে গেল। এত বছর ধরে খাটছি, ফল তো পাওয়াই যাবে, বল?" কেউ কেউ হাসির আড়ালে মুখ বেঁকালো, কেউ বাহবা দিল। সপ্তমীর দিন সকালে কর্পোরেশন থেকে দু'জন কর্মী এসে 'দিদি'র সই করা শুভেচ্ছার কার্ড দিয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ তার জেরক্স কপি বিলি হতে লাগল, মাইকে ঘড়ি ঘড়ি ঘোষণা করতে লাগল প্রীতিদি। সেই অব্দি শুনি এই চেক নিয়ে লোক এল বলে। দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় প্রীতিদি বলল – "এই, সবাই প্যাণ্ডেল খালি রেখে একসঙ্গে চলে যেও না। কে জানে কখন চেক নিয়ে চলে আসে! ফিরে গেলে কেলেঙ্কারি হবে"। সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল, নবমী নিশি পোহালো, বিসর্জনের ক্ষণ চলে এল, চেক নিয়ে আর কেউ এল না। এ নিয়ে প্রীতিদিকে দু' একজন প্রশ্ন করতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জবাব দিলেন – "আমি কি দিদির সেক্রেটারি না কি? কেন এল না বলতে পারব না"।

যাই হোক, এ বছর আবার সেই না পাওয়া টাকার সন্ধানে যাত্রা শুরু। দল বেঁধে একবার থানায়, একবার কাউন্সিলারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি চলতে লাগল। থানা বলে আপনাদের নাম পাঠানো হয়েছে, কাউন্সিলার বলেন – "হ্যাঁ হ্যাঁ, আদর্শপল্লী তো? নাম আমরা পাঠিয়েছি, আপনারা থানায় খোঁজ নিন। এভাবে শাট্‌ল্ ককের মতো থানা-কাউন্সিলার, কাউন্সিলার-থানা চার পাঁচবার ছোটাছুটি, কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর জানা গেল যেতে হবে মেয়রের বাড়ি। এই সমস্ত কাজে নবীন সেক্রেটারি, ট্রেজারারদের একবারও একা ছাড়া হয় নি। সুমনা, জাঁদরেলবউদি, আর বিশেষ অভিজ্ঞ প্রীতিদি সবসময় সঙ্গে আছে, পাছে ওরা কিছু ভুল করে ফেলে! মেয়রের বাড়ি যাওয়ার জন্য বড় দল তৈরি করা হল। 'মেয়রের বাড়ি' বলে কথা! শুভ সকালে 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা' বলে জনা কুড়ির সুসজ্জিত দল যাত্রা করল। অটো, ট্যাক্সি, রিক্সা করে অকুস্থলে পৌঁছতেই চক্ষু চড়কগাছ। মেয়রের উঠোনে রথের মেলা। চারদিকে লোক থই থই। মহিলাদের সংখ্যাধিক্যে চারচাঁদ লেগেছে মচ্ছবে। মাঝখানে টেবিল পেতে কয়েকজন খাতা-ফাইল মেলে বসে। তাদের ঘিরে চুলে লাল-সবুজ রঙ করা মেয়ে-মহিলারা প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোমতে একপাশে একটু জায়গা জোগাড় করে প্রীতিদি পাখিপড়া করে সবাইকে বোঝাচ্ছে মেয়র এলে কি করতে হবে, কেমন করে কথা বলতে হবে। সুমনা মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে, অপেক্ষাকৃত নভিসের দল মন দিয়ে শুনছে। হঠাৎ সমস্ত গোলমাল থেমে গেল। তারপরেই গুঞ্জন – "দাদা এসেছেন, দাদা এসেছেন"। সাঙ্গপাঙ্গ পরিবৃত হয়ে মাননীয় মেয়রমশাই বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছির মতো মহিলাকূল ঘিরে ফেলল তাঁকে। স্মিত হেসে দৃষ্টি-প্রসাদে অভিষিক্ত করে জিজ্ঞেস

করলেন – "কি ব্যাপার?" সমস্বরে জবাব এল – "স্যার, পুজো, মহিলাপরি..." শেষ করতে না দিয়েই আঙুল তুললেন টেবিলে বসা কর্মীদের দিকে। আর একটিও বাক্যব্যয় না করে লাল আলো লাগানো গাড়িতে বসে নাকের ডগা দিয়ে হুস্‌স করে বেরিয়ে গেলেন। বিস্ময়ে ধড়ফড়িয়ে ভাবলাম – "পাগলা খাবি কি! ঝাঁঝে মরে যাবি"। একটু মিইয়ে গেলেও প্রীতিদি হতোদ্যম হল না। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। একসময় আদর্শপল্লীর নাম ডাকা হতেই হুড়মুড়িয়ে দৌড়োলো সবাই। প্রীতিদি ফাইল খুলে টেবিলে কাগজপত্র নামাতে লাগল। সুমনা সাহায্যের হাত বাড়াতেই – "তুমি দাঁড়াও, আমিই পারব" বলে তফাতে পাঠালেন। সুমনা আহত গাম্ভীর্য সামলে দূরে সরে রইল। মেয়রের জনা-দুই দলতুতো ভাই সব কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল। রাষ্ট্রপতিসুলভ ভারিক্কি স্বরে প্রশ্ন করল – "আপনারা গত বছর সত্যিই চেক পাননি?" প্রীতিদির উত্তর – "না স্যার, পেলে কি আর এখানে আসি?"
"কেন, এখানে তো এ বছরের নামও নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের কাগজপত্র সব ঠিক আছে?"
প্রীতিদি – "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব একেবারে আপ-টু-ডেট। দেখে নিন না"।
কিছুক্ষণ ফর ফর করে কাগজ উল্টিয়ে ভাই প্রশ্ন ছুঁড়ল – "গত বছরের 'এন.ও.সি. কোথায়?"
প্রীতিদি আগ বাড়িয়ে ফাইল টেনে নিয়ে খুঁজতে শুরু করল। হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজেও সেই বিশেষ কাগজ খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রমশ সবাই গলা বাড়িয়ে সহযোগিতা করতে এল, কিন্তু বৃথা। সে নিখোঁজ। নেই তো নেই-ই। সবাই হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে। প্রীতিদির মুখ পাংশুতর। কেবল সুমনার মুখে এক চিলতে উল্লাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ভাইয়েরা আর বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে ডাক পাঠাল – "নেক্সট কে আছেন? রবীন্দ্রপল্লী চলে আসুন"।
কালো মুখ করে বেরিয়ে আসতেই সব্বাই ছেঁকে ধরল প্রীতিদিকে। এবার নেতৃত্বে সুমনা – "আপনার কাছেই তো সব কাগজপত্র ছিল। তাহলে কোথায় গেল এন.ও.সি.? বাড়িতে ফেলে এসেছেন? এখানে সব কাগজ লাগবে সেটা জানতেন না?"

প্রীতিদি ভেবে কূল পায় না। শেষে মনে পড়ল। কর্পোরেশনে কাগজ জমা দেওয়ার সময় ভুল করে ওরিজিনাল জমা দিয়ে ফেলেছে। তাহলে জেরক্স? নাঃ, জেরক্সও নেই। করানো হয়নি। ব্যস, ছাতারে পাখির মতো ছিছিক্কার করতে করতে সব ফিরল। শুধু প্রীতিদি থম মেরে রইল। সেদিন সন্ধ্যের কেচ্ছা অধিবেশনে শুধু প্রীতিদির কাপড় খুলে নেওয়া বাকি রইল।

কিন্তু 'কহানী মেঁ ট্যুইস্ট' এখনো বাকি। সলা-পরামর্শ করে ঠিক হল একবার শেষ চেষ্টা করা হবে। পুলিশদাদার চেনা সুবাদে থানায় গিয়ে আর একবার দেখা যাক। ওনারা বললে নয় কাউন্সিলারের কাছে গিয়েও ফের ধর্না দেওয়া যাবে। এ বছর পাঁচ হাজার টাকাও দামী। আর দু'বছরের দশ হাজার পেলে তো কথাই নেই, নবমীতে মাংস-ভাত আটকায় কে! এবার আর ঝুঁকি না নিয়ে সুমনা প্রথম থেকেই প্রীতিদিকে ট্যাক্‌ল্ করার চেষ্টায় নেমে পড়ল – "প্রীতিদি, ফাইলটা একটু দেবেন? আমরাও একটু দেখে নিই"। কিন্তু পির্‌তিদিদি ভাঙে তবু মচকায় না। মটমট করে জবাব দিল – "না, আমিই দেখে নিতে পারব। কাউকে লাগবে না"। এবার পুরো টীম আদর্শপল্লী একদিকে, প্রীতিদি একা। আর মা দুগ্‌গার নেকনজরও বোধহয় সুমনার দিকেই। ফলে যা হবার তা-ই হল। আবার এক সুপ্রভাতে প্রীতিদি, সুমনা আর জাঁদরেলবউদি ট্যাক্সি ডেকে রওনা হবে, সুমনা জিজ্ঞেস করল – "প্রীতিদি, আগের বারের পুজোর পারমিশানের কাগজটা নিয়েছেন তো?" প্রীতিদি "হ্যাঁ হ্যাঁ" বলে মুখ বেঁকিয়েও কি ভেবে ফাইল খুলল। দেখা গেল কাগজটা নেই। বেচারী প্রীতিদি! বোধহয় অসুরের কোপে পড়েছে এবার। কাগজ নিয়ে রওনা দিল সবাই। মাঝ রাস্তায় ফের কেলো। জাঁদরেলবউদি না কি শুরু থেকেই প্রীতিদিকে

ঝাড় দিতে শুরু করেছে – "তোমার ওস্তাদির জন্যই এতসব গণ্ডগোল। নিজে না পারলে অন্যকে দাও, তা-ও দেবে না। এমনি করে কি হয়? পুজো সবার, তোমার একার তো নয়!" প্রীতিদির রাগ, হতাশা, ধুলো মাখা মর্যাদা একসঙ্গে ফুঁসে ওঠায় সে-ও জাঁদরেলবউদিকে যা নয় তাই বলে বসল। জাঁদরেলবউদি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থামাল – "অ্যাই, এঁহী রোকো, রোকো বলছি। হাম এখানেই উতর যাতা হ্যায়। কি ভেবেছেটা কি? এত অপমান? কি বলেছি আমি? ন্যায্য কথাই তো! তুমিই বল সুমনা, ভুলটা কি বললাম? না না, আমি আর এর মধ্যে নেহী হ্যায়। তুম থামো। হাম নেহী যায়গা। থামো বলছি!" ট্যাক্সিওয়ালা থেমেই ছিল। সুমনা কোনোমতে বিবাদমানা দুই বউদিকে ম্যানেজ করে ট্যাক্সি চালু করল। খানিক যেতেই সুমনা বোমা ছুঁড়ল – "বউদি, আমাদের কমিটির রাবার স্ট্যাম্পটা নেওয়া হয়েছে তো?" বত্রিশ সেকেন্ড কোনো আওয়াজ নেই। প্রীতিদির মুখ কালো থেকে পাংশু ক্রমশ। বোঝা গেল স্ট্যাম্প নিতে ভুলে গেছে। আবার ট্যাক্সির মুখ ঘুরল। পাড়ায় নেমেই কোনোদিকে না তাকিয়ে থমথমে মুখে বাড়ির দিকে চলল প্রীতিদি। জাঁদরেলবউদি, সুমনা, আরও দু' চারজন মিলে সুখের কেচ্ছায় উছলে উঠল। স্ট্যাম্প নিয়ে কারো সঙ্গে একটাও কথা না বলে গাড়িতে উঠল প্রীতিদি। সবাই দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে বিদায় জানালাম।

এখনো পুজোর অনেক বাকি। পাড়া-কাহিনীর ঝুলিতে গল্প জমবে। সেসব শোনাবো পরে। আজ এই পর্যন্ত।

চারটি উৎসবের কবিতা

পল্লববরন পাল

দ্য কিড়?

ছোট্ট ছেলে রাস্তা থেকে মারলো ছুঁড়ে ঢিল
কাঁচজানালা ঝনঝনালো, খুললো দরজাখিল
'কে রে ব্যাটা হতচ্ছাড়া?'– বৃষ্টি নামে খিস্তির
ছেলে উধাও – মঞ্চে প্রবেশ কাঁচলাগানো মিস্ত্রির

আমরা হেসে ডিগবাজি – শয়তানের ঠোঁটে ক্রুর
বেলুনমানচিত্র নাচের অট্টহাসি সুর –

যা রে ছেলে ভাঙ্ বামিয়ান বুদ্ধ, ব্যাবিলন
সব ইতিহাস, এ সভ্যতার তামাম বিবর্তন
বোম মেরে আয় রেলস্টেশনে হোটেল স্টেডিয়ামে
সিডনি থেকে বোম্বে হয়ে কায়রো নোটর্ডামে
এই নে অস্ত্র, এই নে রে ঢিল, ব্যবসা বাড়ুক ধনে
আমি আসছি পিছন পিছন শান্তিসম্মেলনে
ভরসা দেবো শুনবে বিশ্ব স্থির সংলাপহীন
কপাল ঠুকবে দেয়ালে স্যার চার্লি চাপলিন

বি-গ্রহশান্তি

ব্যস্ত স্টেশন - ঢোকেনি এখনও বারোটা কুড়ির ট্রেন
সবাই নিজের নিজের মতোন দৌড়ে বেড়াচ্ছেন
দোতলা মাথায় লালকুলি সাথে স্যুটেড় কর্পোরেট
হুইলারে দৌড় পর্ণোপাতায় চক্ষু ও মাথা হেঁট
সিলিংখাঁচায় তর্কের দৌড় পায়রা এবং কাকে
নিচে প্ল্যাটফর্ম মাদুরে নিদ্রাদৌড়ের নাক ডাকে
স্টল কাউন্টারে চা-কাপ দৌড়ে মগ্ন দু'জন সঙ্গী
ন'এগারো থেকে জম্মু সিরিয়া খাগড়াগড়ের জঙ্গী
পাশাপাশি দৌড় - ধোনি ও কোহলি সলমন শাহরুখ
স্ব-স্ব গ্রহপথে দৌড়ে বেড়ায় শান্ত্যোজ্জ্বল মুখ
আমি বসে বসে হোয়াট্স্যাপে দৌড় 'হাই'-য়ের জবাবে 'হাইই'
দশ হাত দূরে এক রমণীকে কোপাচ্ছে আততায়ী

পৃথিবী গোল

পাশের বাড়ির মেয়েটি টিউশনফেরত লাঞ্ছিত হবে কাল সন্ধ্যায়
পরশু সকালে জানোয়ারগুলো হেঁটে বেড়াবে
রক্ত মাখা দাঁত বের করে প্রকাশ্য রাজপথে
মেয়েটির বেকার দাদা একা একা সারাদিন
থানা নেতা ক্লাব সালিশীসভা পঞ্চায়েত
ক্রমাগত লাথিঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
বিকেলের আলো নিভে গেলে
থোবড়ামুখ লাশ হবে রেললাইনে
যার উপর দিয়ে আইন আইনের মতো কুঁঝিকঝিক
তারপর খবরকাগজ ক্যামেরা টিআরপি
রিয়েলিটি বিজ্ঞ-আলোচনা স্ট্যাটিস্টিক্স
মানবাধিকার চৌত্রিশ বনাম চার হাঁউমাউ
তিনদিন পরে ফেসবুকে মোমবাতি
ব্যাস, বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে

রাত্রে কলম হাতে নিয়ে
যতোই ভাবিনা কেন,
অক্ষর না মাত্রা –
কোন বৃত্তে
কোন বৃত্তে
হিংস্র আগুনশিখা হয়ে
জ্বলে উঠবার সাহস দেখাবে শব্দেরা
পরদিন উল্টোদিকের বাড়ির মেয়েটি
একই রাস্তা ধরে যাবে টিউশনে

নেঃ খাঃ দশভূজা

কামদুনি মেয়েটিও
দশভূজা আশির্বাদ চেয়েছিলো কলেজফেরত
তুমি শুধু বাৎসরিক
নির্বাচনী অশ্বডিম্ব প্রসব ও বিতরণ করো
অসুরেরা সাড়ম্বরে উৎসবে বিনিয়োগকারী –
প্রমাণিত তুমি অভিভূত
অন্ধকারশিল্প বাড়ে –
জ্যামিতিক অনুপাতে কামদুনি বাড়ে সংখ্যায়

দু'মুঠো অন্ধকার নিয়ে
আমাদের সম্মিলিত অভিমান এবং আক্রোশ
অন্ধকারতর এই গুগুলিয় মানচিত্রে
ঝাড়বাতি জ্বেলে দিতে পারে
যার প্রতিবিম্বপরিধিতে
ছোটো ছোটো অন্ধকারেরা
আলোখিদে ভিক্ষুকের আচমন সেরে
যে যার সাধ্যমতো
ছায়াবৃত্ত সীমান্তের কাঁটাতার জীবনেও সানন্দপ্রস্তুত

ওরা থাক উৎসবে।

বাকি অন্ধকারটুকু প্রদীপশিখার মতো
আগলে আমরা নিয়ে যাবো
শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অসুরের কাছে
মুখের সামনে ছুঁড়ে বলবো –
নেঃ
খাঃ

সমস্ত রাত ধরে তারপর
কামদুনি পাঁচিলের ভাঙা কোণে বসে
উল্লিখিত বহুমূল্য বিসর্গ সমেত
নাগরিক অন্ধকার উইকিপিডিয়া
দশহাত পঞ্চাশ নখে খুঁটে খুঁটে
ভিখিরিটা বাতাসার মতো
চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে – খেতে বাধ্য হবে

যতক্ষণ না কোটি কাকডাকে
অন্ধকার কোটি বুকে
ঘুম ভাঙে ঝাড়বাতি রোদ্দুরের

ততদিন এইসব উৎসবটুৎসব ভণ্ডামিতে নেই

আমার দুর্গা

অনিকেত পথিক

সে খুব একা ছিল যতটা একা হলে নিজের ভার নিজে বইতে হয়
যেখানে মরুভূমি যেখানে আমাজন যেখানে ঝোপেঝাড়ে ভূতের ভয়

কিম্বা আসলে সে ততটা একা নয় ওই তো সাথে আছে ছোট্ট ভাই
দুজনে একা একা বৃষ্টি রোদ মাথে মাটির খেলাঘর যাচ্ছেতাই

সে ঘর রোজ ভাঙে আবার গড়ে তোলা এটাও খেলা বলে ধরতে হয়
কিন্তু রাক্ষস সেও তো হানা দেয় সেটাও বাস্তব, স্বপ্ন নয়

ছোট্ট দুটি হাত কতটা সামলায়, কতটা আটকায় অসুর-ত্রাস !
এখনও খেলাঘর, রঙিন পেন্সিল, অস্ত্র হাতে পেলে সব্বোনাশ !

তাই তো হাতে ওঠে কুড়োনো চক্‌খড়ি, মাটির বুকে নামে অঙ্গীকার
রেখার উল্লাসে ঠিক্‌রে ওঠে রাগ সকল অপমান অস্বীকার

অসুরবিনাশিনী সেই যে দশভুজা এই তো জেগে এই পৃথিবী জুড়ে
পৃথিবী মানে শুধু এইযে ফুটপাথ যেখানে ভাই-বোন বসত করে

সেখানে আপাততঃ দ্বিমাত্রিক তিনি আকাশ জুড়ে তাঁর দৃষ্টি মেলা
কিন্তু তাতে কিবা বদলে যায় বল, তিনটি নয়নেই বিজলী খেলা

আকাশে চোখ মেলে তিনি তো দেখছেন যেখানে যতগুলো দুষ্টু লোক
ভাইকে বুকে চেপে দিদিটি চায় শুধু সেসব অসুরের শাস্তি হোক ।।

কবিতা

মহান দাস

#১

এখানে বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, মেঘ নেই, মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ ও লুকিয়ে নেই .....
এখানে অনেক নেই নেই জাতীয় অনেক কিছুই নেই,
এখানে শুধু হাইড্রোজেন আর শীতল নাইট্রোজেন ঘুমিয়ে আছে,
এখানে শুধু দাঁতের ব্যথা, চোখের ব্যথা, বুক ধরফড়ানি, এখানে চুল ড্রাই হয়ে যাচ্ছে,
পরিবেশের দূষণের সাথে সাথে হাতের রেখাও দূষিত হয়ে আছে,
এখানে প্রায় ২৫০০ বছরের এক ওক গাছ আছে,
ওর খুব বৃষ্টির দরকার,
হিসি করা জলে আর কতদিন বাঁচবে ওক গাছটি ।

এখানে অনেক কিছু নেই,
ইলেক্ট্রিসিটি আছে,
পাগলামি আছে,হাসপাতালের ফিনাইল-সুগন্ধি আছে,
অন্ধকার আছে,
পাড় ভেঙে যাচ্ছে গাঙ্গিনের,
এই তো ওই স্ত্রীলোকটির পিছনে হাত দিলো ওই ভদ্রলোকটি,
কে বললো নেই,
কত কিছুই আছে.....

ওক গাছটির জন্যই বৃষ্টির জল নেই শুধু।

#২ ক্ষমা করে দেবেন সুচিত্রা সেন আমার প্রেমিকা

১. কবি ঘুমায়,
চুলকায়, আঁচড়ায়,
ড্যানড্রাফ নেই ।

২. শহর গুনগুন করে,
ঠ্যাং বের করে জিন্স,
ল্যাং খেয়ে মরে
নিউটনের কুকুর।

৩. চিনির দাম বেড়েছে,
পতঞ্জলির মধুতে গুণ
আছে,
বেগুনে বিষ।

৪. কখনো হোটেল
ক্যালিফোর্নিয়া,
ওস্তাদ জিও জিও,

আজ ঘুমিও না।

৫. অক্ষয় কুমারের ফিজিক,
কবির মাসল নেই,
দ্রৌপদীর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ নেই।

৬. অর্জুন নেই,
মহাভারতে বীর কে?
কেন শকুনির উকুন।

৭. দিন রাতে ১৯ কাপ চা,
ধোঁয়া আর কুয়াশা,
ক্যান্সার তুসি গ্রেট হো।

৮ . বিকেল হোলো,
সূর্য এখনো টা টা করলো না,
শান্তি শান্তি, শান্তির বাপ।

৯. অবন্তিকা, চলন্তিকা,
সুচিত্রা সেন আজ রাতে কথা
হবে,

রুটি তড়কা।

১০. ..কথা দাও,
ঘুমিয়ে পড়ি,
মাস্টারবেশন গোপনে ।

#৩ বেহেশতে কবি

মন খারাপ করে কেউ বেঁচে নেই,
একটা করে রাত লম্ফ ঝম্ফ করে,
আর রাতের জঠরে স্বপ্ন দেখে দাঁড়কাকেরা,
মন খারাপ করাটা একটা বদভ্যাস,
টুথ পেস্ট সাথে নিয়ে ঘুমাও কবি,
কবি তুমি বেহেস্তে যাও,
বেহেশতে মদ ,মাগী সব পাবে,
শান্তি পাবে কিনা গ্যারান্টি নেই।
তবুও টুথপেস্ট নিয়ে ঘুমাও কবি।

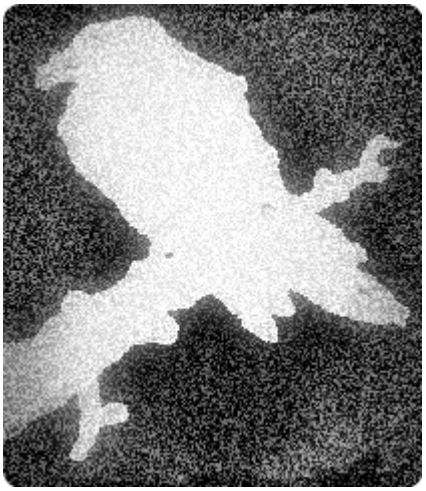

#8

তোমার যা বোঝানোর ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছো,
আমি নির্বোধ বট গাছ,
ঝুড়ি নেমে এসেছে চারদিক থেকে,
যদি আর নদী গ্রাস করেছে,
নদীর একটা পাড় আছে, শুধুই ভাঙে।
রাখো ফোন,
দূরত্ব বাড়ুক মহাকাশে।

তোমাকে গুড বাই বলার আগে
এরিক ক্লাপট্রনের ওয়ান্ডারফুল

টুনাইট গান শোনাতে খুব ইচ্ছে করছিল,
কিন্তু আমার ঘরে এত গান,
প্রতিবেশীরা তিতিবিরক্ত হয়ে যায়,
একটা কাঠবেড়ালি হর-রোজ আসে আমার হাত থেকে বিস্কুট খেতে,
ও আর আমি শুনি গান গুলো।
ও বিরক্ত হয় না,
তুমি বিরক্ত হবে বলে আর শোনালাম না।

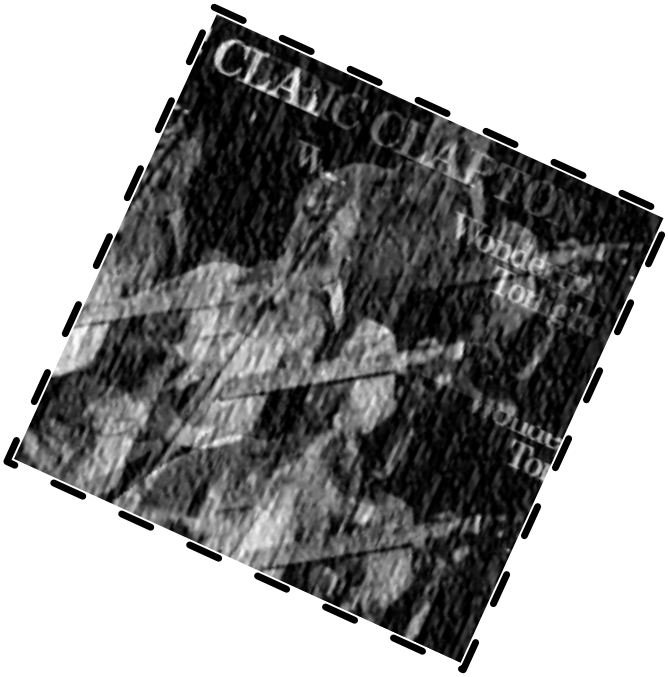

ছায়া পূর্বগামিনী

আরাত্রিক মুখোপাধ্যায়

--রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনতাম না। তাঁর বাড়ি কোথায় ছিল জানতাম। আমার দিদিমা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ফিরে এসেছিলেন। দিদিমার নাম ছিল সূর্যমুখী।

--বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীর পরে আর কারও এমন নাম শুনলাম। কিন্তু তিনি ফিরে এলেন কেন?

--তার নানা রকম মানে করা যায়। তবে আমার মনে হয়, দিদিমা চেয়েছিলেন একটু রহস্য তৈরি করতে। যা এক ধরনের প্রতিশোধও।

সল্টলেকে ভদ্রলোকের বেশ সাজানো গোছানো বাড়ি। দোতলায় বসার ঘর। চারিদিকে নানা পুরনো দিনের জিনিসপত্র। দরজা দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে উল্টো দিকের দেওয়ালে দাঁড় করানো একটি বড় ঘড়ি। যেমন বড় তার ডায়াল, তেমনই তার ঘন্টা। এমন ঘড়ির ছবিই দেখেছি, নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম। যে জবরদস্ত সোফাটায় ভদ্রলোক বসেছিলেন, সেটার কাঠ নিশ্চয়ই খুব দামি। ভদ্রলোকের পা দু'টো ছিল সামনের একটি ছোট কাঠের টুলে। একটি পায়ের পাতা অন্য পাতাটির উপরে তোলা। একটা বড় দেরাজ আর একটা বড় আলমারি ছাড়াও ঘরে ছিল বেঁটে কিন্তু চওড়া বই রাখার খোলা র‍্যাক। তার দু'টি তাকে সার দিয়ে রাখা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলির শতবার্ষিকী সংস্করণ, বঙ্কিমচন্দ্রের দু'খণ্ডের রচনাবলি এবং একটি গোল্ডেন ট্রেজারি। কয়েকটি বই ব্রাউন কাগজের মলাট দেওয়া। ওই টুল থেকে র‍্যাক পর্যন্ত কাঠের যে ক'টি আসবাব ছিল ঘরে, তার সব ক'টিই বেশ জমকালো কাজ করা। আমি বসলাম একটা কাঠেরই চেয়ারে। তার হাতল দু'টোয় বাঘের মুখ। সামনে কাচের টেবিল। তাতে চা আর পেস্ট্রি দেওয়া হয়েছিল।

এই বাড়ি আর তার মালিকের সন্ধান দিয়েছিলেন আমাদের পাড়ারই এক দাদা। তখন কলেজে পড়ি। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম টিউশনের জন্য দরবার করতে। তিনি বললেন, এই ভদ্রলোক উপন্যাস লেখানোর জন্য লোক খুঁজছেন। শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে সেই দাদা হেসে বলেছিলেন, 'একবার গিয়েই দেখ না, ভদ্রলোক ভাল টাকা অফার করবেন মনে হয়।' খানিকটা কৌতূহলে, খানিকটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছায়, খানিকটা টাকার লোভে ভদ্রলোককে এক সন্ধ্যায় ফোন করলাম। বাড়ি থেকে চেস্ট ইংরেজিতে বলা হল, সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে ফোন করতে। তাই করলাম। এ বার ভদ্রলোক আমার পড়াশোনা কত দূর, বাড়ি কোথায়, আদি বাড়ি কোথায় এবং বাড়িতে কে কে আছেন, সব এক এক করে জেনে দু'দিন পরে আসতে বললেন।

ভদ্রলোক হাফ হাতা ফিকে নীল গেঞ্জি আর ধুতি পরে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। গেঞ্জিটি নামী কোম্পানির। ধুতিটি যে দামি তা আমার মতো আনাড়িরও বেশ মালুম হল। সামনে ছেড়ে রাখা চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি। তবে স্বর শুনে যত বয়স ভেবেছিলাম, এসে দেখি তার থেকে ঢের বেশি। শরীর অবশ্য মজবুত। ফর্সা, লম্বা, পেটানো চেহারা।

বললেন, আমাদের ছিল জমিদার বাড়ি। দিদিমা ও আমার মা ছিলেন চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। আমার দাদামশায় দুলালচন্দ্র জমিদারির টাকা নানা রকম ব্যবসায় ঢেলে অঢেল পয়সা করেছিলেন। আদব কায়দায় ছিলেন পাক্কা সাহেব। দেখতেও ছিলেন নবাবপুত্তুরের মতো। তবে সত্যিকারের নায়কের মতো দেখতে ছিলেন দিদিমার দাদা বিপিনবিহারী। শ্যামার বজ্রসেনের মতো মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি, উন্নত দর্শন। তাঁর ভাই বিনোদবিহারীও সুন্দর দেখতে ছিলেন। তবে তাঁর শরীরে বুদ্ধির যে ছাপ ছিল, তা নিছক সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

--তাঁদের ক্ষেত্রে বঙ্কিম থেকে নামকরণ হয়নি?

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। তারপরে বললেন, আসলে কী জানো, যত দূর মনে হয়, দিদিমার ক্ষেত্রে বঙ্কিম থেকে নামকরণটা খোদ বঙ্কিমকেই খুশি করার একটা চাল ছিল। কর্তাদাদা খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন।

কোনও একটা মোকদ্দমার সূত্রে বঙ্কিমের সঙ্গে কর্তাদাদার আলাপ হয়েছিল বলে দিদিমার কাছে শুনেছি। সম্ভবত, সেই আলাপটা জিইয়ে রাখতেই মেয়ের নাম সূর্যমুখী রাখা।

--কর্তাদাদা আপনার দিদিমার বাবা?

--দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। প্রবাদ আছে না, কারও কারও নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়! তিনি ছিলেন সেই দরের লোক। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বিরাট এলাকা জুড়ে জমিদারি ছিল। প্রাসাদের মতো বাড়ি। তেমনই মেজাজ। কর্তাদাদা নামটা থেকে অনুমান করতে পারি, যৌবন থেকেই তাঁর প্রতাপ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল। না হলে, কর্তাবাবা নামটাই বেশি স্বাভাবিক ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েরাও তাঁকে আড়ালে কর্তাদাদা বলেই ডাকতেন।

--নিশ্চয়ই পড়াশোনাও করেছিলেন।

--প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা কত দূর জানি না। তবে ইংরেজি জানতেন। তাঁর আসল নাম ছিল রাধারমণ। সেই নাম সই করে সাহেবদের ইংরেজিতে চিঠি দিতেন। তার কিছু নকল আমি পেয়েছি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর বাস্তবজ্ঞান যেমন টনটনে ছিল, তেমনই আইন খুব ভাল বুঝতেন। তিন ছেলেমেয়েকেই পড়াশোনা শিখিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী ইংরেজির এম এ। তাঁর নাটকে খুব উৎসাহ ছিল। ছোট ছেলে বিনোদবিহারী ইতিহাসে এম এ করে আইন পড়েছিলেন। দিদিমা সূর্যমুখী বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। স্কুল শেষ করে বাড়িতে মেমসাহেবের কাছে পড়াশোনা করতেন। পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন। তখন থাকতেন কর্তাদাদার আহিরীটোলার বাড়িতে। ওই বাড়ির কাছাকাছি বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের মুখুজ্জে পরিবারের। তাঁদের পরিবারের মেয়ে ক্ষণপ্রভা বেথুনে সূর্যমুখীর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। তিনিও স্কুলের পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে যান। তাঁর জন্যও মেমসাহেব রাখা হয়েছিল। পরে সেই ক্ষণপ্রভার সঙ্গেই সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় বিপিনবিহারীর। আর এই পাঁচ জনেই তোমার উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হবে। বিপিনবিহারী, ক্ষণপ্রভা, বিনোদবিহারী, দুলালচন্দ্র এবং সূর্যমুখী। দুলালচন্দ্রকে কর্তাদাদার পরিবারের লোকেরা জামাইদাদা বলে ডাকতেন।

এরপরে ভদ্রলোক কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সময় সেই ১৩০৮ বঙ্গাব্দ। উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন তখন রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর তাতেই বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক ভাবে বেরোতে শুরু করল বিষবৃক্ষের নকল করে রবিবাবুর লেখা উপন্যাস চোখের বালি। কিন্তু সেই বৃক্ষ যে আমাদের সংসারে ডালপালা মেলে দেবে, তা কে জানত?

--সেই জন্যই সূর্যমুখীর রবীন্দ্রনাথ অভিযান?

--নিশ্চয়ই। বৈশাখ সংখ্যা থেকে উপন্যাসের প্রকাশ শুরু হল। মাসে মাসে সেই উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করলেন ওই চার জনেই। সূর্যমুখীর অবশ্য গোড়াতেই মহিনের সম্পর্কে অভক্তি জন্মে যায়। তার জন্য দায়ী রবিবাবুই। মহিন সম্বন্ধে তাঁর কাঙারু শাবকের বিশেষণটি সূর্যমুখীর ভাল লাগেনি। উপন্যাসের প্রতি টানও কমতে থাকে। তবে বাড়িতে যা সব কাণ্ড হতে থাকল, তাতে তারপরে নিয়ম করেই চোখের বালি পড়তেন। কর্তাদাদার বাড়িতেও নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন আসত। তবে তিনি মাসে মাসে চোখের বালি পড়েননি। ক্ষণপ্রভার প্রথম বারের গৃহত্যাগের পরে মেয়ের কাছ থেকে সব কথা শুনে তখনও পর্যন্ত যতটুকু বেরিয়েছিল, সব পড়লেন। তারপরে সেই রাতে ছাদে বেশ কিছু ক্ষণ পায়চারি করে শিবু সর্দারকে ডেকে পাঠান। কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাতে কাঁধে পাকা লাঠি ফেলে শিবু সেখানে হাজির হলে দু'জনে নিচু গলায় কথা বলেন।

--এ তো বঙ্কিমী ঢং।

--সেখানেই তো কর্তাদাদা হেরে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে তাঁর পরের প্রজন্ম তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। শুধু সূর্যমুখী বাবা বঙ্কিমের প্রতি অনুরক্ত থেকে গেলেন। ক্ষণপ্রভা যখন বিপিনবিহারীকে চিঠিতে 'আমি আমার বিধি নির্দেশিত আশ্রয় ছাড়িয়া এ বার আমার বোধ নির্দেশিত স্থানে যাইতেছি' লিখে প্রথম বারের মতো শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দুলালচন্দ্রের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তখন সংসারে যেন আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেল। কিন্তু ক্ষণপ্রভার ভাষা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত না বঙ্কিমচন্দ্র, সে বিচার আমি করতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, সেই ঘটনার পরে সূর্যমুখী ক্ষণপ্রভাকে ওই নিজেদের ভবানীপুরের বাড়ির ঠিকানাতেই একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, 'তোমাকে তোমার স্বামী তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার আমার স্বামীও নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। তাহাতে তোমার সম্বন্ধে ফল বিশেষ কিছু হয় না, তুমি নিরুপদ্রবে নষ্ট হইতে পার। কিন্তু আমার সম্বন্ধে হয়।' এই ভাষায় নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের বা আরও ভাল করে বললে চোখের বালির স্পর্শ পাওয়া যায়। কিন্তু 'তুমি নিরুপদ্রবে নষ্ট হইতে পার' বাক্যটি সূর্যমুখীর নিজস্ব রচনা। তার সঙ্গে আমি বঙ্কিমের মিল পাই।

--সূর্যমুখী নাম রাখাটা কিন্তু বেশ সাহসের কাজ। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখীর জীবন তো খুব সুখের ছিল না।

--কর্তাদাদার সাহস ছিল দুর্জয়। আর প্রবল আত্মবিশ্বাস ছাড়া তেমন সাহস সম্ভব হয় না। ভেবেছিলেন, মেয়ের জীবনে তেমন কোনও বিপদ এলে রুখে দেবেন। সূর্যমুখীও তাই ভাবতেন। বাবা-মেয়ে দু'জনেই রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করেছিলেন তাঁদের পরিবারের দুর্ঘটের জন্য।

--সে জন্যই তিনি জোড়াসাঁকো গিয়েছিলেন?

--বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে সূর্যমুখী জোড়াসাঁকোতে যান। ফটকে কেউ তাঁকে আটকায়নি। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে উঠোন পর্যন্ত গিয়ে দেখা পান বাড়ির কোনও পুরুষের। সেই ব্যক্তি সুপুরুষ। দেখার মতো একটি নাক। লম্বা এলানো লকস ঘিরে রেখেছে বিস্তৃত কপাল আর দুই ছড়ানো নয়ন। তবে তাঁর পরিচয় দিদিমা জানতেন না। জিজ্ঞাসাও করেননি। তবে এটুকু খেয়াল করেছিলেন, তিনি দিদিমার রূপ দেখে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে তখন দিদিমা বলেছিলেন, 'রবিবাবুকে বলুন, সূর্যমুখী এসেছেন।' সেই ব্যক্তি কোনও প্রশ্ন না করে সূর্যমুখীকে একটি বড় ঘরে বসিয়ে ভিতরে যান। সূর্যমুখীর জন্য তারপরে এসেছিল পাথরের গ্লাসে বিলিতি সিরাপ ঢালা সরবত্।

কিন্তু অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও রবিবাবু আসছিলেন না। সূর্যমুখী ওই বিরাট ঘরে একা বসেছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লাল জামদানি শাড়ি। কন্ঠ ও বাহুতে সোনার অলঙ্কার। মাথায় রুপোর চিরুনি দিয়ে বাঁধা জুঁই ফুলে সাজানো খোঁপা। অনুমান করতে পারি, রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখতে লাগছিল তাঁকে। কিছু পরে ঘরের ভিতরের দিকের দরজার ওপার থেকে ভেসে আসে পাটভাঙা জামার মৃদু খসখস শব্দ। দামি এসেন্সের গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যমুখী উঠে পড়েন। দ্রুত পায়ে বাইরে এসে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িতে উঠে চলে যান। ঘরে থেকে যায় শুধু তাঁর উপস্থিতির সৌরভটুকু।

--সূর্যমুখী কি নূপুর পরতেন?

--তোমাকে দিয়ে হবে, বুঝেছো। উপন্যাসটা লিখে ফেল। তবে সূর্যমুখী নূপুরের শব্দ দিয়ে নিজের উপস্থিতির প্রকাশ ঘটাবেন, এমনটা এ ক্ষেত্রে ঘটেনি। সূর্যমুখী নূপুর পরতেন না। গোঁড়া বামুন বাড়ি ছিল কর্তাদাদার। পদশব্দ বে-সহবত্ বলে গণ্য হত। মেয়েরা তো প্রায় নিঃশব্দে চলাফেরা করতেন। তা ছাড়া, সোনা-রুপো পায়ে ঠেকানোও নিষিদ্ধ ছিল বাড়িতে। বিয়ের পরে দুলালচন্দ্রদের বাড়িতে গিয়ে অবশ্য খোলামেলা আবহাওয়া পেয়েছিলেন

সূর্যমুখী। দুলালচন্দ্র ছিলেন মস্ত সাহেব লোক। শোবার ঘরেও ঢুকতেন জুতো মসমসিয়ে। কিন্তু সূর্যমুখীর বাল্যকালের সংস্কার তাতে কাটেনি।

--কিন্তু তার মানে সূর্যমুখী পরিকল্পনা করেই উঠে এসেছিলেন, এমনটা তো না-ও হতে পারে। অন্তত ঘটনাক্রম তাই বলছে। যদি তিনি পরিকল্পনাই করবেন, তা হলে এ কথা কী করে আগে থেকে ভেবে নিতে পারতেন যে, পাটভাঙা জামার খসখস শব্দ বা এসেন্সের গন্ধ তিনি পাবেন?

--ঠিক এইগুলোই না হলেও, রবিবাবু ঘরে আসার আগে কোনও না কোনও একটা ইঙ্গিত তিনি ঠিকই পাবেন বলে ধরে নিয়েছিলেন, এমনও তো হতে পারে। সূর্যমুখী ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। অভিমানী। অহঙ্কারীও। নিজের বুদ্ধির উপরে আস্থা ছিল ষোলো আনা। সেই আস্থার উপরে ভর করেই গোটা পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন বলে মনে হয়। যে কারণেই তাঁর বাক্যটা লক্ষ কর, নিজের নামের ঐশ্বর্য তিনি কী ভাবে ব্যবহার করেছিলেন রবিবাবুর বাড়ি গিয়ে। ওই নামের অভিঘাত, রূপের তারিফ আর আচরণের আভিজাত্যটুকু তিনি ওই ঘরে ফেলে এসেছিলেন রবিবাবুর জন্য।

২
এ নারী খেলা করিবার নহে

--সূর্যমুখীর এই আচরণ উপন্যাস সম্মত।

--সূর্যমুখীকে লেখা ক্ষণপ্রভার চিঠিও তাই। সূর্যমুখীর নাতি আমাকে উপন্যাস লেখার উপকরণ হিসেবে প্রচুর চিঠি, ডায়েরি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এইগুলি পড়া হয়ে গেলে তাঁরা যে বাড়িগুলিতে থাকতেন, সে সব জায়গায় যেতে হবে।

বুঝতে পারলাম, তিনি আসলে উপন্যাসের উপরে ভর করে তাঁর পরিবারের একটি কাহিনিই লিখিয়ে নিতে চান। উপন্যাসটি ভনিতা। নানা ছড়ানো ছিটানো উপাদান থেকে তৈরি করে ওই কাহিনি লিখিত অবস্থায় ধরে রাখতেই চান তিনি। উপন্যাসের আকারে ইতিহাসই লিখতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের সব উপকরণ নেই। বরং অনেক জায়গাই রয়েছে, যা কল্পনায় রাঙিয়ে নিতে হবে। অন্য উপকরণ থেকে পাওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে সেই কল্পনা গঠন করতে হবে। উপন্যাসের পরতটুকু থাকলে, যে অনুমানের প্রত্যক্ষ কোনও তথ্যসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না, তা-ও লেখা যাবে। যেমন একটি অস্বাক্ষরিত চিঠি। পত্রটি লিখেছেন কোনও মহিলা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি দোষ দিচ্ছেন। এখানে যে সব কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, চিঠিটি লেখা হয়েছে চোখের বালি বেশ কয়েক মাস প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে। যেখানে মহেন্দ্রর মুখে বিষবৃক্ষের প্রসঙ্গ উঠছে। তখনও মহেন্দ্র বিনোদিনীকে দেখেনি। কিন্তু বিহারী দেখেছে। সেই সময়ে সূর্যমুখীকে লেখা সেই চিঠিটিতে প্রেরক লিখেছিলেন, 'রবিবাবুর বিনোদিনীকে বেশ লাগিতেছে। বিহারীর সঙ্গে তাহার একটি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিহারীর কথাটি আমার মনে ধরিয়াছে। সে বিনোদিনী সম্পর্কে ভাবিতেছে, 'এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে।' তোমায় বলি, এই একই কথা তোমার দাদাকেও বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি আহিরীটোলার বাসায় থাকিয়া কলকেতায় কী যে করেন, বোঝা ভার। আমি কেবল একা এই জঙ্গলে বাস করিতেছি।'
তবে এই চিঠি যে ক্ষণপ্রভার লেখা, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন যে তিনি কাকে লিখছেন, সেটি পর্যন্ত উল্লেখ করেননি, তা বোঝা ভার। সূর্যমুখীর নাতি বললেন, এইটিই তোমায় লিখতে হবে। আমি যা সাহায্য করার করব। যেমন ধরো, এই যে তিনি নাম উল্লেখ করলেন না, তাতে মনে হয় কর্তাদাদার ভয়ে নিজেকে

প্রচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছিলেন। অবচেতনে সেই ভয়টা ছিল। কিন্তু পরে ঘটনাক্রম গড়াতে তিনি যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। তখন স্পষ্টাক্ষরে কেবল প্রেরকের নামই লেখেননি, লেখার ভঙ্গিতেও সারা চিঠি জুড়ে নিজের স্বাক্ষর ছড়িয়ে রেখেছেন। তবে অনেক চিঠিতেই তিনি তারিখ দেননি। সূর্যমুখী কিন্তু আগাগোড়াই বেথুন স্কুলের ভাল ছাত্রীর মতো পাতায় যথেষ্ট মার্জিন রেখে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় চিঠি লেখার সব নিয়মকানুন মেনে চলেছেন। তারিখ তো বটেই, কোথা থেকে লেখা হচ্ছে, তা পর্যন্ত কোথাও অনুল্লেখিত নেই।

সূর্যমুখীর তেমনই ভাবে লেখা প্রত্যুত্তরটি এই—'তোমার কথায় আমিও পড়িলাম। রবিবাবু কিছু একটা ফাঁদতে চলিয়াছেন। বিহারীই সেই ফাঁদে পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। তাই সে বলিতেছে, 'এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।' বুঝিতেছি যে, তুমিও প্রভাবিত হইতেছ। কিন্তু বৌদিদিমণিভাই, তুমি জঙ্গলে পড়িয়া নেই। আমার পিতার প্রাসাদে তুমিই বিরাজ করো। আর চোখের বালি সাক্ষী, সারা ক্ষণ স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থাকিলে স্বামীর বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি ক্লান্তিতে আবৃত হইয়া পড়ে যে।'

এই কথায় অপমানিত বোধ করেছিলেন ক্ষণপ্রভা। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর প্রতি আকর্ষণ কারও কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হতে পারে না। বরং তার কেবল বৃদ্ধিই ঘটতে পারে। তিনি তাই দীর্ঘ একটি চিঠি লিখলেন সূর্যমুখীকে। এ বার সে চিঠি পাঠানোর তারিখ দেখে অনুমান করা যায়, সূর্যমুখীর চিঠিটি পেয়েই তার উত্তর লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন ক্ষণপ্রভা।

এর বেশ কয়েক মাস পরে ক্ষণপ্রভার পরের চিঠিটি পড়ে বোঝা যায়, কাহিনির প্রতি টান এই পরিবারের রক্তে। কাহিনি থেকে কাহিনি নির্মাণেও তাঁরা অভ্যস্ত। আমাকে যে কাজটি করতে বলা হয়েছে।

ক্ষণপ্রভা লিখছেন, "রবিবাবু যে ভুলটা করিয়াছেন, তোমার দাদা সেই ভুল করেন নাই। বারাসতে রাজলক্ষ্মীর বাপের বাড়ির গ্রামেই বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। রবিবাবুই লিখিয়াছিলেন, সেই বাটীতে রাজলক্ষ্মী, বিহারী আর বিনোদিনী ছাড়া ছিলেন কেবল দুই একটি অতি বৃদ্ধা বিধবা। আর স্থানটি ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। চারি দিকে ঘন জঙ্গল ও বাঁশবন, পুষ্করিণীর জল সবুজবর্ণ। দিনেদুপুরে শেয়াল ডাকে। বুঝিতেই পারিতেছ, আমাদের গ্রামের সহিত মিল কী প্রচণ্ড। তথাপি, এমন জায়গায় বিনোদিনী কেন বিহারীর অলক্ষ্য রহিলেন, কে জানে। রবিবাবুর কথায় বিনোদিনী 'উদ্যানলতা'। ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাহার মনোকষ্ট আমি বুঝিতে পারি ঠাকুরঝি। বিহারীর মতো একটি মানুষকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইয়াও সে কেন তাহাকে ঘিরিয়া জাগিয়া উঠিল না, তাহা বুঝিতে পারি না। ওই পুষ্করিণীতে বিনোদিনীর স্নান করিবার কথা, ঠিক যখন তাহার পাশ দিয়াই বিহারী কোথাও যাচ্ছেন। রবিবাবুই লিখিয়াছেন, দুই দিনে বিহারী পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যাতায়াতের পথে বিনোদিনী নামক একটি স্বপ্ন জাগরূক হইয়া উঠিবে, দেখা না দেখার রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হইবে, যে ভাবে ঘরের বইগুলিতে বিনোদিনী নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া রাখিয়াছিল, তেমনই বিহারীর জীবনপটেও মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে নিজের নামটি খোদিত করিয়া রাখিতে সে কেন উদাসীন হইয়া রহিল, এ রহস্য বুঝিতে পারি না।

'ওই পুষ্করিণীর পাড়েই দু'জনের আলাপ হইতে পারিত। সদ্য স্নানরতা বিনোদিনী ভিজা কাপড়ে উঠিয়া আসিতেছেন নম্র ভিরু পায়ে, বিহারী কোথায় লুকাইবেন বুঝিতে না পারিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। বিনোদিনীর দৃষ্টি

নিজের পদপ্রান্তে নিমগ্ন। তাহা দেখিয়া বিহারী আড়াল খুঁজিয়া লইতেছেন। কাহিনিকার যদি অন্য কেউ হইত, তাহা হইলে তাহার পরের দিন আবার ওই একই সময় কেন যে বিহারী ওই পথেই কীসের আকর্ষণে আসিয়া পড়িতেন, বিনোদিনীও তাহার স্নানের সময়ের নড়চড় হইতে দিত না, তাহা যেন বেশ অনুচ্চারিত রহিত। তবে এ বার দুই জনের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হইত। তাহার পর মন। তাহাতে অবশ্য কাহিনিতে কিছু টান পড়িত। মহিনের লাগাম আর বিনোদিনীর হাতে উঠিত না যে। কিন্তু তাহা বাস্তবোচিত হইত। এমনকী, রবিবাবু সেখানে বেশ বৃষ্টিও আনিয়া ফেলিতে পারিতেন। ঘোর বৃষ্টির মধ্যে পিছল পথে বিনোদিনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া আনিত বিহারী। দু'জনের নামের গুণ এমনই যে ভারতীয় শাস্ত্র মতে তাহাতে কোনও দোষও রহিত না। দুঃখ হয়, বেশ একখানা রোমান্সের হাত হইতে রবিবাবু আমাদের বঞ্চিত করিলেন কেবল মাসিক পত্রে কাহিনি লম্বা করিবার স্বার্থে। এমনকী, ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান রবিবাবু দুই জনের কাহাকেও পুষ্করিণীর পাড়ে পর্যন্ত আনিলেন না।
'আমি জানি ঠাকুরঝি, তোমার রবিবাবুর চেয়ে বঙ্কিমবাবুর রচনা বেশি ভাল লাগে। তোমার বঙ্কিমবাবু কিন্তু এমন সুযোগ হারাইতেন না। বরং ওই পুষ্করিণীই কাহিনির প্রাণ হইয়া উঠিত।
'তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ, আমি কাহার কথা বলিতেছি?'

ক্ষণপ্রভা কেন যে আগের চিঠিতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন তা বোঝা যায় সূর্যমুখীর জবাব থেকে। কর্তাদাদার কন্যা যেন চক্রবিস্তার করে তেড়ে গেলেন। সূর্যমুখী লিখছেন, 'ঘরের কথা আর বাহিরের কথার মধ্যে একটা বিবাদ রহিয়াছে। আমি তোমার ঘরের লোক, তাই আমাকে ঘরের ভাব ও ভাষাতেই পত্র লিখিবে, এমনটাই ঠিক। কিন্তু তোমার পত্রটি পড়িয়া, মেয়েমানুষ ও তোমার প্রাণের বন্ধু হইয়াও গা-টা রি রি করিয়া উঠিল। পুষ্করিণীর প্রতি তোমার বিকর্ষণের কথাই জানিতাম। দাদা যাহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন। তাহা তো আমরা কেহই সমর্থন করি না। কিন্তু আশ্চর্য হইল, স্বয়ং তোমার কল্পনায় বিনোদিনী ও বিহারীর সম্পর্কের যে রূপ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে দাদার আচরণকে সমর্থন করা হইতেছে। দাদা বিহারীর মতো নহেন। আর একটি কথা, বিহারীও তোমার কল্পনার বিহারীর মতো নহেন।"

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, চিঠির পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে দিদিমার দাদা অর্থাত্ বিপিনবিহারীর জীবনের একটি বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে আরও বেশি কিছু তথ্য তোমার সংগ্রহ করা উচিত।

তিনি আমাকে ঠিকানা বাতলালেন। সেই মতো বিপিনবিহারীর ভাই বিনোদবিহারীর ছেলের সন্ধান পেলাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাহিনির অনেক রহস্যের মোড় খুলে দিল। ভদ্রলোককে আমার খুবই ভাল লাগল।আহিরীটোলায় গঙ্গার ধারে তাঁদের সেই সাবেক বাড়ি। নিজে এখন আর দোতলা থেকে নড়েন না। আদব কায়দারও বিশেষ ধার ধারেন না। উপন্যাস লেখার কথা বলাতে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপরে বললেন, উপন্যাসটি একটি অজুহাত। পিসিমার ছেলে আসলে নিজে সব কথা জানতে চায়। ওদের টান সাহেবিয়ানার দিকে। আর আমার খোট্টাপনা কাটেনি। তাই মিলমিশ হয় না। সেই কারণে ভেবেছে, ও নিজে এলে আমি না বলতেও পারি। তাই তোমাকে গোয়েন্দা লাগিয়েছে। তবে এ কথা ঠিক, যা যা ঘটেছিল, তা উপন্যাসের মতোই। লিখতে পারলে লেখ।
তাঁর ঘরের সব কিছুই দৈত্যাকার। যেমন বড় ঘর, তেমন সব বিরাট বিরাট আসবাব। বইয়ের আলমারিতে গল্পগুচ্ছ, চিত্রা, সোনার তরী, চোখের বালি, নৌকাডুবি থেকে গোরা পর্যন্ত নানা বইয়ের বিভিন্ন সময়ের সংস্করণ।

সেই সঙ্গে বিশেষ করে চোখে পড়ল সুবল মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, হরিচরণ থেকে চলন্তিকা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি অভিধান। বললেন, বাংলার বাইরে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে। তাই অনেক শব্দ আমার অচেনা ছিল। তবে এই সব বই ও অভিধানগুলোর বেশিরভাগই আমার মায়ের। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বলতে পার। তিনি খুব পড়ুয়া ছিলেন। আমি কেবল তাঁর স্মৃতিটুকু ধরে রেখেছি।

সেই প্রবীণের স্মৃতি এবং বুদ্ধি ঝকঝকে। তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকবার যেতে হল। প্রতিবারেই গল্পের ঝাঁপি খুলে বসলেন। কিন্তু কথা বলার সময় কাহিনিগুলির উপরে এমন আশ্চর্য এক আবরণ তৈরি করে রেখেছিলেন যে, তখন বুঝতেই পারিনি, এই কাহিনির একটি প্রধান চরিত্র তিনি নিজেই। আসলে তাঁর নামের মধ্যেই ইঙ্গিতটা ছিল। তাই নামটি বলেছিলেন একেবারে শেষে।

তিনি বললেন, আমি বাবা-মায়ের বেশি বয়সের সন্তান। তুমি যাদের কথা বলছ, তাঁদের সকলকেই আমি দেখেছি, তবে তাঁরা তখন প্রবীণ। সেই বয়সেও আমি দেখেছি রাধাদিদি কী ভাবে মুগ্ধ হয়ে জ্যাঠামশায়ের সেবা করতেন। জ্যাঠামশায়ও রাধাদিদির সান্নিধ্যে সব থেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

--রাধা কে?
--ওই যে পুষ্করিণী নিয়ে বিবাদ, তার মূলে তো রাধাদিদিই। রাধাদিদি ছিলেন আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে ঘিরেই আলোড়ন তৈরি হয়েছিল পরিবারে। সেই আলোড়নের পরে রাধাদিদি যেন আমাদের পরিবারের একজনই হয়ে যান। রাধাদিদি যেন একটি যতিচিহ্নও। তিনি আসার আগে সংসার চলছিল কর্তাদাদার হুকুম মেনে নিয়ম মতো। কিন্তু তিনি সংসারে আসার পরে সবই অন্য রকম হয়ে গেল। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় সংসারের পাল কখনও এ দিকে ফেঁপে উঠল তো কখনও অন্য দিকে ফুলে গেল।

রাধার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রসঙ্গে খোদ বিপিনবিহারীরই একটি চিঠি থেকে সব কথা পরিষ্কার ভাবে জানা যাচ্ছে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি দুলালচন্দ্রকে। দুলালচন্দ্রের নাতি সে চিঠি আমাকে দিয়েছিলেন। এ বার তা থেকে উদ্ধৃত করছি:

"রাধার সঙ্গে আমার সম্পর্ক লইয়া যে আন্দোলন সংসারে উঠিয়াছে, তাহাতে রাধা নিমিত্ত মাত্র। ব্যক্তি রাধার প্রতি আমার আসক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে সেই দ্বিপ্রহরে পুষ্করিণীর পাড়ে দেখিয়া আমার বনদেবী বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই টুকুই সত্য।

সে দিন সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল। তাহার মধ্যেই সংসারের সব কাজ নিষ্পন্ন হইল এক এক করিয়া। বৃষ্টির শব্দ সংসারের অনেক শব্দ ডুবাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে মনে হইতেছিল চতুর্পাশ যেন নিশ্চুপ। আমাদের পাকশালার উঠোনে প্রত্যহ যে রূপ কোলাহল হয়, তাহা না পাইয়া, সারা সংসারই যেন বেলা কিছু গড়ানোর পর হইতে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বেলা একটা আন্দাজ বৃষ্টি থামিয়া গেল। সূর্য প্রকাশিত হইল। রোদ বেশ খর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনটা নাগাদ আমি যখন বাটী হইতে বাহির হইলাম, বর্ষণসিক্ত চারিপাশ সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে পৌঁছাইলাম পিছনের জঙ্গলের মধ্যে। জলে ভারি হয়ে থাকা গাছের পাতাগুলি নিচু হইয়া যেন আমাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইল অন্দরে যাইবার জন্য। কর্দমাক্ত পথ দিয়া তাহার অনেকটা ভিতরে গিয়া হঠাত্ দেখি, টলটলে জল ভরা একটি পুষ্করিণী। উপর হইতে গাছপালা তাহার উপর ঝুঁকিয়ে পড়ায় পুষ্করিণীটি সবুজবর্ণ। এখানেই বড় হইয়াছি, কিন্তু এই জলাশয়টির অস্তিত্ব অবধি জানিতাম না। তখন বেশ গরম বোধ হইতেছিল। পুষ্করিণীটি দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিলাম না। জামা কাপড় পাড়ে খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। বেশ কিছু ক্ষণ সাঁতার কাটিবার পরে মন যখন খুবই প্রফুল্ল, আকাশের দিক হইতে পাড়ের দিকে চোখ নামাইতে দেখিলাম, এক অপরূপা নারী পাড়ে দাঁড়াইয়া নিষ্পলক হইয়া আমার দিকে তাকিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি আমাকে অবাক করিয়া দিল।

আমি পাড়ের দিকে সামান্য এগোতেই সেই নারী জলের মধ্যে চলিয়া আসিল। কৃষ্ণাঙ্গী সেই নারীর নয়ন দু'টি পুষ্করিণীর মতোই বিরাট ও ভরাট। তাহার যৌবন বর্ষাস্নাত ধরিত্রীর ন্যায়। আমার পাশ দিয়ে যাইবার সময় সে হাসিয়া উঠিল। সবই কেমন অচেনা কিন্তু সুন্দর ও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইল। আমার মনে হইতেছিল, এই অরণ্যের দেবী বুঝি আমারই মতো বৃষ্টি থামিবার আনন্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বড় ভাগ্যবান যে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। আমি জলের মধ্যেই হাত জোড় করিয়া তাহার প্রতি প্রণাম নিবেদন করিলাম। তাহাতে সেই নারী আরও হাসিতে ভাঙিয়া পড়িল। সাঁতার কাটিয়া আমি তখন তাহার দিকে এগিয়ে যাইবার চেষ্টা করিতেই কিন্তু সে ভয় পাইয়া গেল। যেন এত ক্ষণের সহজ সাহস তাহার নিজের নয়। যেন কোনও দেবী এত ক্ষণ তাহাকে অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে দিয়া নিজেরই প্রকাশ ঘটাইতেছিলেন। এখন তিনি সহসা সরিয়া যাওয়ায় এই নারী অলৌকিক অধিকারগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানবীর মতো জঙ্গল মধ্যে পুষ্করিণীর ভিতরে অন্য পুরুষের সঙ্গ তাহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। এত দ্রুত ভয় তাহাকে গ্রাস করিল যে জলে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া শঙ্কা হইল। আমি তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটিয়া তাহাকে গিয়া ধরিলাম। তাহার শরীর অত্যাশ্চর্য রকম কোমল। ভগবান যেন প্রাণভরে তাহাকে গড়িয়াছেন। বিনোদিনী সম্পর্কে রবিবাবু যেমন লিখিয়াছিলেন, এই নারীরও তেমন নিটোল যৌবন। শিক্ষিত ভাস্করের হাতে নির্মিত দেবীমূর্তি ছাড়া এত নিখুঁত যৌবনবতীর শরীর আগে দেখি নাই। সে আমার হাতের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

তাহাকে পাড়ে আনিলাম। চোখেমুখে জল দিয়া জ্ঞান ফিরাইলাম। প্রায় নিরবসনা সেই নারী তখন আমাকে দেখিয়া লজ্জাবনত হইয়া রহিল। আমি বুঝিলাম, তাহাকে গ্রহণ করিলেই কেবল তাহার লজ্জা কাটিবে।

সেই নারীর সেই বুঝি প্রথম অভিজ্ঞতা। তাহার সুখ, বিস্ময়, নিবেদন ও উদ্‌যাপন আমাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। আমিও যেন নতুন করিয়া প্রকৃতির পাঠ আবিষ্কার করিলাম।
সেই নারীকে আমি কী করিয়া স্বীকৃতি না দিয়া থাকিতে পারি? জামাইদাদা, তোমরা যাহাকে প্রেম বল এ তাহা নয়। ক্ষণর সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে ছেদ আসিতে পারে। বিষাদ বা অবসাদও আসিতে পারে। রাধার সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক। ছেদহীন, বিষাদহীন। এই সম্পর্ক আমার অর্জন। ইহাকে আমি ত্যজিতে পারি না।"
বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, সে কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বোধহয় কেউ কেউ দেখতেও পেয়েছিলেন। জঙ্গলটি যত গভীর বলে সেই বর্ষণস্নাত দিনে জ্যাঠামশায়ের মনে হয়েছিল, ততটা নির্জনও ছিল না। গ্রামের মাতব্বরেরা পিতামহের কাছে গিয়ে ধর্না দিলেন। রাধাদিদি আমাদের গ্রামের যে দিকের মেয়ে ছিলেন, সেখানে যেন আগুন

জ্বলে উঠল। জমিদারের ছেলে পাড়ার মেয়ের সর্বনাশ করেছে বলে রব উঠল। কর্তাদাদা কাছারির সামনে ভয়ঙ্কর মুখ করে বসেছিলেন। জ্যাঠামশায় নায়েব উকিলের বাড়িতে গিয়ে রাধাদিদিকে সেখানে রেখে এসে অন্য পথ দিয়ে বাড়িতে ঢুকছিলেন। তখনই খবর এল কর্তাদাদা তাঁকে কাছারির ঘরে ডাকছেন।

তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। মশাল জ্বলছে। কর্তাদাদার লাঠিয়ালেরা চারিদিকে গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে। সবার সামনে শিবু সর্দার। তার এক হাতে লাঠি, অন্য কাঁধে বন্দুক। মুখ পাথরের মতো। তার মধ্যেই মাতব্বরেরা বসে রয়েছেন কর্তাদাদার মুখের দিকে তাকিয়ে। বাবার মুখে শুনেছি, গোটা বাড়ি থমথম করছিল। সকলেরই ভয় ছিল কর্তাদাদাকে নিয়ে। তিনি জ্যাঠামশায়কে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু এই ঘটনার পরে কী করবেন, তা কেউই বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু জ্যাঠামশায় খুব স্বাভাবিক পায়েই সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। কর্তাদাদা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোটা পরিবেশটাই তাতে আরও টানটান হয়ে উঠল। মাতব্বরেরাও উঠে দাঁড়ালেন। বিপিনবিহারীকে সকলের সামনে বজ্র গর্জনের মতো করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যা শুনছি তা ঠিক?'
বিপিনবিহারী শান্ত স্বরে বললেন, 'ঠিক।'
স্তম্ভিত কর্তাদাদা তাঁকে বললেন, 'তুমি বাড়ি ও আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাও।'
বিপিনবিহারী সহজ স্বরেই তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আমি স্ববশ। তাই আপনার নির্দেশ আমার উপরে কার্যকরী হয় না।'

৩
তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, বঙ্কিম লিখেছেন, সূর্যমুখীর ভ্রূযুগ সমাশ্রিত। আমার দিদিমা সূর্যমুখীরও ভ্রূ ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীরও জোড়া ভুরু ছিল। পদ্মপলাশলোচনা ছিলেন ক্ষণপ্রভা। বিষবৃক্ষে আকাশপটে এমনই চোখের এক নারীকে দেখেছিলেন কুন্দ। তাঁর মা তাঁকে এই নারী সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি হীরা।

সূর্যমুখীর নাতি খুবই শান্ত স্বরে কথাগুলি বললেন। তাঁর বক্তব্য, রাধাদিদিকে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করি আমি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে যতটা একা করে দিয়েছিলেন, রাধাদিদি ততটা একা ছিলেন না। তাঁর বাবা, মা বর্তমান ছিলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। অসহ্য মনোকষ্ট বয়ে নিয়ে ফিরেছেন। শেষ জীবনটা অবশ্য একটু সুখে কেটেছে। বিপিনবিহারী ও বিনোদবিহারীর ছেলেকে নিয়ে সংসারের কর্ত্রীর মতোই থাকতেন আহিরীটোলার বাড়িতে। নায়েব উকিলকেও আমি ছোটবেলায় দেখেছি। বিপিনবিহারীর প্রতি তাঁরও অবিচল ভক্তি ছিল।

পুষ্করিণী পাড়ের সেই ঘটনার পরে রাধাদিদিকে নায়েব উকিল নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকদিন। কথাটা বলতে যত সহজ, কাজে তা ছিল না। কর্তাদাদার প্রতাপ তখন মধ্য গগনে। রাধাদিদির খোঁজ করছে সকলেই। শিবু সর্দারের দলবল গ্রামের কোনও বাড়ি বাদ রাখেনি। রাধাদিদির পাড়ার লোকেরাও তাঁর খোঁজ করছিলেন। এর মধ্যে নায়েব উকিল ছিলেন খোদ কর্তাদাদার ছোট নায়েব। কর্তাদাদার তাঁর উপরে ছিল অগাধ

বিশ্বাস। কেউ ভাবতেই পারেনি, তাঁর বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছেন রাধাদিদি। বিপিনবিহারীই রাধাদিদিকে সেখানে রেখে দিয়ে আসেন। গ্রামের আর কোনও কাকপক্ষীও টের পায়নি।

--নায়েব উকিলের সংসার ছিল না?

--না। কর্তাদাদার বাড়ির কাছেই আম জাম কাঁঠাল গাছে ঘেরা মনোরম একটি বাগানের মধ্যে ছোট একটি কোঠা বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটি ছিল সাহেবি কেতায় তৈরি। কর্তাদাদার সঙ্গে কিছু সাহেবসুবোর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা গ্রামে এলে নায়েব উকিলের বাড়িটিতেই থাকতেন। তবে তখন তাঁর নাম নায়েব উকিল ছিল না। কেউ কেউ ছোট উকিল বলে ডাকতেন। এক তলা বাড়িটির তিনটি ঘর। বড় খাবার জায়গা। তাতে মেহগনি কাঠের টেবিল চেয়ার ছিল। বড় বড় জানলা। বাগানটি বেশ ঘন। ওই বাগানে বিপিনবিহারীকেও দেখা যেত। নায়েব উকিল ওই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর রান্না যেত কর্তাদাদার বাড়ি থেকে। কর্তাদাদা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু এই ঘটনার পরে সব জানতে পেরে কর্তাদাদা তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন। ছোটবেলা থেকে তাঁকে দেখছেন, তাই নেহাত্ মায়া বশত তাঁর প্রাণটা কাড়েননি। সেই সময় নায়েবমশায় কলকাতায় গিয়ে ওকালতি করতে শুরু করেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নায়েব উকিল। সে সময়েও তিনি থাকতেন আহিরীটোলায় কর্তাদাদার বাড়ির কাছেই একটি বাসা ভাড়া নিয়ে। আসলে কলকাতায় ওকালতি পড়ার সময় কর্তাদাদার ওই আহিরীটোলার বাড়িরই এক তলায় থাকতেন নায়েব উকিল। দোতলায় থাকতেন বিপিনবিহারী। সেই থেকেই বিপিনবিহারীর সঙ্গে তাঁর আজীবনের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

বয়সে তিনি ছিলেন বিনোদবিহারীর সমবয়সী। প্রখর বুদ্ধি ছিল। সাহস যে ছিল, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সেই নায়েব উকিল আমাকে বলেছিলেন, রাধাদিদির মধ্যে তিনি এমন নিষ্পাপ এক রমণী মূর্তি দেখেছিলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। সারা জীবন বহু মামলার কারণে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু রাধাদিদি রমণী হিসেবে অনন্যাই রয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। রাধাদিদি ও বিপিনবিহারীর সম্পর্ক সম্বন্ধেও তাঁর অদ্ভুত একটা মত ছিল। বিষবৃক্ষের উদাহরণই টেনে তিনি বলেছিলেন, নগেন্দ্রর যে সদ্য পিতৃহারা কুন্দের সঙ্গে দেখা হবে, তা বিধির লিখন। কুন্দর মা যে আকাশপটে দেখা দেবেন, তা জীবনের মায়া। এই বিধির লিখন বা জীবনের মায়াকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এগুলো গভীর ভাবে জীবনেরই অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের উপরে অধিকার ছিল, ঘোর বাস্তববাদী ছিলেন, নানা মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে জীবনের নানা রূপ দেখেছিলেন। তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন, এই সবই হয়। এই সবেরই জীবনের উপরে জোরও রয়েছে। সেই জোরের জন্যই এমন আশ্চর্যকে মেনে নিতে হয়। বড় সত্য সম্পর্ক বলেই মেনে নিতে হয়।

বিপিনবিহারী অবশ্য দুলালচন্দ্রকে অন্য একটি যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, 'এই সম্পর্ক আমার অর্জন।' কথাটা ব্যাখ্যাও করেছিলেন। লিখছেন, 'আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে ভাল লাগিয়াছিল। নিছক সেই ভাললাগার শর্তেই আমরা একে অপরকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সম্পর্কের মধ্যে সমাজ নাই, সংস্কার নাই শুধু সত্য রহিয়াছে। সেই সত্য অন্য সব শর্তকে উপছাইয়া, তাহাদের দাবি অস্বীকার করিয়া নিজের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই এই প্রতিষ্ঠা একটি অর্জন। যা শুধুই আমি করিতে পারিতাম। এখানে বিশ্ব সংসারে আমার নিজস্ব পরিচয়টুকুই কেবল গ্রহণযোগ্য। যেমনটি আদি যুগে সভ্যতার পূর্বে হইত। এই সম্পর্ক তাই শাশ্বত।'

দুলালচন্দ্র প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করেছিলেন। হাসতে হাসতে সেই চিঠিটা সূর্যমুখীর নাতি আমার হাতে তুলে দিলেন। তাতে লেখা, 'তুমি অন্ধের মতো আচরণ করিতেছ। সমাজ ও সংস্কার তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, ঘিরিয়া ছিল। তুমি কেবল ক্ষণিক বাসনার তাড়নায় তাহাদের দেখিতে পাইতেছ না। ভাবিয়া দেখ, তুমি না হয় রাধাকে চিনিতে

না। কিন্তু রাধা তোমাকে অবশ্য করি চিনিত। জমিদার তনয় তুমি। তোমার সামাজিক পরিচয় তাহার বিলক্ষণ জানিবার কথা। রাধা জানিয়া শুনিয়া তোমার কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছে। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নাই। আর তোমার ক্ষেত্রে কথাটা হইল, তুমি ওই যৌবনবতীর আকর্ষণ এড়াইতে পার নাই। তাহাকে দেবী ইত্যাদি বলিয়া কেবল সমাজ, সংস্কারের চোখে ঠুলি পরাইবার জন্য কতগুলি আবেগের যুক্তি সাজাইয়াছো। তাহাতে তুমি যেমন আমাকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ, তেমনই, বিপিন, তুমি নিজেকেও ভুল বুঝাইতেছ। সব হইতে বড় কথা হইল, ভুল বুঝাইবার এই প্রয়োজন এত বেশি করিয়া কেন পড়িল? উত্তর হইল, তুমি সমাজ, সংস্কারের ভয় ও প্রভাব হইতে মুক্ত নও। তাই ইহা তোমার অর্জন বলিয়া যে গর্ব করিতেছ, তাহা মিথ্যা তর্জন মাত্র।'

বিপিনবিহারী তার জবাবে সমান তীক্ষ্ণ ছিলেন। তিনি লিখছেন, 'তুমিও যে সভ্যতার বাঁধা ফাঁদে পা দিবে, তাহা ভাবিতে পারি নাই জামাইদাদা। সভ্যতা তাহার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যই সমাজ ও সংস্কারের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করিতে চায়। সে বলে সমাজ সত্য, সংস্কার সত্য। তাহাতে যে সত্য শিব, তাহা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। ইহা আমার সহ্য হয় না। আমি যাহা লিখিয়াছি ঠিকই লিখিয়াছি। আমি সভ্যতার পূর্বের কথা বলিয়াছি, আর তুমি সভ্যতার ঠুলি চোখে পরিয়া অন্ধ হইয়া আছো।'
বিপিনবিহারীর ভগ্নী সূর্যমুখীও ক্ষণপ্রভাকে লেখা চিঠিতে সেই সভ্যতার প্রসঙ্গই তুলেছিলেন। তাঁর নাতি বললেন, এ বার সেই চিঠির বাকি অংশটুকু উদ্ধৃত করা যায়।

সূর্যমুখী লিখছেন, 'সাহিত্য সভ্যতা নয়। সভ্যতার অঙ্গ। বিনোদিনীর সঙ্গে রাধার ও কৃষ্ণের সঙ্গে বিহারীর নামের মিলটি রহিয়াছে বলিয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সাহিত্য সেতু টুকু তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে গ্রামের রাধার সম্পর্কের উপরে চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছো, তাহা সাহিত্যে বেশ লাগে। জীবনে তাহা ঘটে না। বর্ষার মধ্যে পিছল পথে রাই কানুর অভিসারে যাইতেছে, ইহা কাব্য গীতের অতি মনোরম উপাদান। শ্রীমতী উঠোন পিছোল করিয়া বর্ষা রাতে অভিসারে যাওয়ার প্রস্তুতি সারিতেছেন, তাহাও কতবার পড়িয়া অন্যমনা হইয়া গিয়াছি। কানুকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ থরথর করিয়া উঠে, সে বর্ণনা আমিও পাগলের ন্যায় পড়িয়াছি। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি সাহিত্যের পক্ষপাত চিরকালীন। কিন্তু জীবন তাহা নয়। জীবন কী জানো, ওই পিছল পথে স্নানরতা কোনও মহিলাকে দেখিলে আমার দাদা বিপিনবিহারী ও রবিবাবুর বিহারী দ্রুত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন। ইহাই সভ্য ব্যবহার। রবিবাবুও সভ্য ব্যক্তি। উপন্যাসে মহেন্দ্রর উত্সাহে আয়োজিত পিকনিকের সময়েও উল্লেখ রহিয়াছে, বিনোদিনী ও আশা স্নান করিয়াছিল সেখানকার একটি পুষ্করিণীতে। সে সময় মহেন্দ্র বা বিহারী তাহাদের ধারে কাছে ছিলেন না। আসলে পুষ্করিণী লইয়া তুমি ভাবপ্রবণ হইয়া রহিয়াছো। জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা উপন্যাসে আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছ। সাহিত্য হইতেই তাহার যুক্তিও খাড়া করিতেছ। তুমি সাহিত্যে সমর্পিত হইয়া গিয়াছো, তাই জীবন হইতে পিছলাইয়া যাইতেছ। সে কথা তুমি বুঝিতেও পারিতেছ। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রর কুন্দ সম্পর্কে মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সূর্যমুখী যখন কমলমণিকে পত্র দিল, তাহাতে সূর্যমুখী ঠিকই লিখিয়াছিল, 'তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী।' আমি কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলি—তুমি আপনার মনে আপনার নিকট অপরাধী। তাই বিনোদিনী আর বিহারীকে ঘিরিয়া মিথ্যা উপন্যাস সাজাইতেছ।'

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, জীবনে সাহিত্যের ছায়া কিন্তু পড়ে। তিনি বাবার কাছ থেকে শোনা সেই সন্ধ্যার কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, জ্যাঠামশায়ের কথায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমন কথা কেউ কর্তাদাদার মুখের উপরে বলতে পারেন, তা যেন অনেক ক্ষণ কারও বিশ্বাসই হচ্ছিল না। জ্যাঠামশায় কিন্তু শুনেছি খুবই শান্ত

ছিলেন। দ্বিপ্রহরের সেই পুষ্করিণীর কথাই মনে পড়ে। তিনিও যেন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত গভীর জলাশয়টির মতো স্থির ছিলেন। সামান্য কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপরে তিনি ধীর পায়ে চলে গেলেন। বাবা আমাকে বলেছিলেন, বিপিনবিহারীর এই ভাবে কথা বলা, চলে যাওয়াটা এতটাই মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল যে, তাতেই যেন সভার অন্তিমকাল ঘোষিত হয়ে গেল।

এই প্রথম কর্তাদাদার কথা ছাড়াই কর্তাদাদার ডাকা সভার শেষ হল। কর্তাদাদা দ্রুত পায়ে গিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে শিবু সর্দার। কাঁধে বন্দুক নিয়েই সে দ্রুত ছুটে গেল সঙ্গে। সে ঘোড়ার মতোই দ্রুত দৌড়তে পারত। কাছারি ঘরের সামনে থেকে মাতব্বরেরা এক এক করে নিশ্চুপে বাইরে চলে গেলেন। অন্দরে বাইরে আলো দেওয়ার কথাও যেন মনে পড়ল না কারও। কিছু ক্ষণ পরে দূরে নদীর পাড় থেকে বন্দুক ছোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। দুম দুম দুম। সারা জনপদই যেন সেই সন্ধ্যাকালে সেই শব্দ শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বারিপাতের পরে সর্বত্র যেন পরিপূর্ণ শান্তির একটা ভাব তৈরি হয়েছিল। তার বদলে এখন একটা ভারী ভয়ের হাওয়া ঘিরে রইল সব ঘরবাড়ি মানুষজনকে। কী হয়, কী হয়, সেই ভাবটা অস্থির করে তুলল ভিতরে ভিতরে।

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, বাবা নিজের ঘরে ছিলেন। বন্দুকের শব্দ শুনে ছাদে চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, জ্যাঠামশায় বিরাট ছাদের এক প্রান্তে বুকের উপরে দুই হাত রেখে চুপটি করে গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর লম্বা চুল পুবের হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছিল। কিন্তু তাঁকে দেখে খুবই প্রশান্ত বলে মনে হচ্ছিল। বিনোদবিহারী তাঁকে আর ডাকতে সাহস পাননি। নীচে নেমে দেখেন, ঠাকুমা ঠাকুরঘরে প্রদীপের আলোর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছেন। সে রাতে বাড়ির কারও খাওয়াদাওয়া হয়নি। যেন বাড়ির কোথাও কোনও কুটোটিও নড়েনি। কেবল গভীর রাতে শিবু সর্দার ফিরে এসে পা টিপে টিপে জ্যাঠামশায়ের ঘরে গিয়েছিল।

শিবু সর্দার পরে বিনোদবিহারীকে বলেছিল, কর্তাদাদার মনের অশান্তি কেমন ভাবে আছড়ে পড়েছিল বাইরে। বিনোদবিহারের ছেলে সে কথা শুনেছিলেন। তিনি বললেন, কর্তাদাদার ঘোড়া তিরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। শিবু সর্দার তার পিছনে পিছনে হরিণের মতো ছুটল। কিন্তু ঘোড়া গেল সামনের সব বাধা ভেঙেচুরে। ঘোড়া গেল বাতাসের ঝাপটার মতো। ঘোড়া গেল জলপ্রপাতের মতো। শিবু সর্দার শরীরে খেই রাখতে না পারলেও বুদ্ধিতে ধরে ফেলল, কোথায় যেতে হবে। সে যখন বনজঙ্গলে পথ করে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল, তত ক্ষণে কর্তাদাদা দাঁড়িয়ে পড়েছেন একটি বাঁকের মুখে লম্বা এক ফালি পাড়ের মাটিতে। ঘোড়াটি তার গতির কারণে ওই টুকু রাস্তা আসতেই খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে থেকেও সে ক্রমাগত নড়াচড়া করছিল। ঘাড় একবার তুলছিল, একবার নামাচ্ছিল। কিন্তু তার উপরে কর্তাদাদা ছিলেন পাথরের মূর্তির মতো শক্ত। শিবু সর্দার প্রথমে সোজা তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার কাঁধে বন্দুকটি। কর্তাদাদা তখন এক দৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে। দূরে নদীর বুকে দু'একটা নৌকা। সকলেই শিবুর শাগরেদ। সুবোধ মাঝির নৌকার দিকে আঙুল দেখিয়ে কর্তাদাদা শিবুকে বললেন, ওকে ডাক। শিবু দুই হাত মুখের কাছে এনে আশ্চর্য সুরেলা কিন্তু প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বার করল। অন্য কেউ শুনলে ভাববে রাতচরা কোনও প্রাণীর ডাক বুঝি। কিন্তু শিবুর শাগরেদরা ওই ডাক চেনে। সুবোধ ইঙ্গিত বুঝল ঠিক। সে নৌকা নিয়ে মসৃণ ভাবে এসে ভিড়ল পাড়ের কাছে। কাছাকাছি আসতে শিবুর মুখ দিয়ে এ বার এমন একটা শব্দ বেরোল, যাকে ইংরেজিতে স্ক্রিচ বলে। সুবোধ এ বার ঠিক জায়গায় নৌকা ভিড়িয়ে পাড়ে উঠে কর্তাদাদার ঘোড়ার পায়ের কাছে দুই হাত জড়ো করে এসে দাঁড়াল।

কর্তাদাদা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কোনও টাকার নৌকো যায়নি?
সুবোধ ঘাড় নেড়ে না বলল।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, টাকার নৌকো কী?
দুলালচন্দ্রের নাতি বললেন, টাকার নৌকো হল এমন নৌকো যার যাত্রীদের হাতে নগদ টাকা রয়েছে। অনেক সময় হুগলির এই সব গাঁ গঞ্জ থেকে নানা ফসল নিয়ে নৌকো যেত কলকাতা। সে সব বেচেবুচে ফেরার পথে তাদের কাছে থাকত নগদ টাকা। সেই টাকার একটা ভাগ নদীর নানা জায়গায় দিতে হত। কর্তাদাদা তাঁর অংশের ভাগ দাবি করতেন। কেউ যদি না দিতে চাইত, তার নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হত বিনা দ্বিধায়। এমনও হয়েছে, নৌকো ডুবিয়ে দেওয়ার পরে তার মালিক এসে কর্তাদাদার হাতে পায়ে ধরেছে। তখন কর্তাদাদার নির্দেশে শিবু সর্দারের দলবল ডুবুরির মতো মাঝ গঙ্গায় জলের মধ্যে থেকে নৌকা ফের তুলে নিয়ে এসেছে।

সেই সন্ধ্যায় সুবোধের কন্ঠ ভয়ে থরথর করছিল। আর ঠিক তখনই কর্তাদাদা বন্দুকটি নিয়ে নিলেন শিবুর কাছ থেকে। সুবোধের বুকের দিকে তাগ করে বললেন, অন্য দিকে যেতে পারিসনি?
সুবোধ তখন ভয়ে নুয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই অসহায়ের মতো শিবুর দিকে তাকাল। শিবু বলল, ওই পাড়ে একটা বিয়ে বাড়ির আলো দেখেছি। ওখানে চলে যা। মাঝ গঙ্গায় গিয়ে অপেক্ষা কর। আরও সাত-আট জনকে পাঠাচ্ছি।

দুলালচন্দ্রের নাতি বললেন, শিবুর এই এক মস্ত সর্দারোচিত গুণ ছিল। সে তার নিজের লোকেদের বেশ রক্ষা করতে পারত। ওই যে সুবোধ মাঝি তার দিকে অন্তিম সময়ে তাকিয়েছিল, তাতেই শিবু তাকে জীবন উপহার দিয়ে দিল।

শিবু কিন্তু জানিয়েছিল, কর্তাদাদার মন তারপরেও খুশি হয়নি। তিনি গোঙানির মতো একটা আওয়াজ করছিলেন মুখ দিয়ে। এক ঝটকায় ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে খানিকটা দৌড়ে যান। আবার ফিরে আসেন। শিবুর দিকে তাকিয়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করেন। শিবু লোক জোগাড় করতে চলে যায়। কিন্তু তার যাওয়ার ধরনটা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। কর্তাদাদাকে ফেলে যে সে যেতে চাইছে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কর্তাদাদা এবার মুখ দিয়ে যে শব্দটা করলেন তা অনেকটা ইংরেজি গ্রাউলের মতো। শিবু তা শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেল। সুবোধ ছুটে গেল তার নৌকার দিকে। কর্তাদাদা আবার নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বন্দুক থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করলেন।

--আর ক্ষণপ্রভা?
বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, শুনেছি তিনি তখন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলিতে। তখন চারিপাশ নিবিড় আঁধার। জানলাগুলি খোলা। বাদলার হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে ঘর। তারই মধ্যে দেরাজের পাশে মাটিতে যেন পুজো করার ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন তিনি। সামনে প্রদীপখানি, তার সামনে রাখা পদাবলি। দু'টি পাতার উপরে আলো এসে পড়েছে। আর তার উপরে ক্ষণপ্রভার মুখখানি। তার দু'পাশ দিয়ে নেমেছে তাঁর চুলের রাশি। যেন তারা বহু যত্নে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখে দিতে চায় সেই নারীর আনন সমগ্র। কেবল প্রদীপের আলোয় চকচক করছিল তাঁর সিঁথির সিঁদুর। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল। আচমকা চোখ তুলে দেখেন দরজার সামনে বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তখন তাঁকে বলেন, বিনোদ, কী অপূর্ব কথা! রাই কানুকে বলছে, সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে, কুন্তলভার উঘারি। শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর, রাখ বক্ষ-'পর মোর। কেন

বলছে জানো বিনোদ? বলছে কেন না কানাই যে এসেছে বর্ষার পথ পেরিয়ে, কিন্তু শুধু সে কথাই শেষ কথা নয়। তার উপরে সে যে ব্রজরমণীদের সঙ্গদানও করে এসেছে। তাই তাঁর তনু শ্রান্ত। রাইসুন্দরী তাই সযত্নে তাঁর সেবা করতে চাইছেন। বলছেন, তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে, বাহু মৃণালক ডোর। ভানু কহে, বৃকভানুনন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কালা, তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কিছু সহবে জ্বালা।

এই ভাব তাঁর অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। যে কারণে অন্তত সে সময়ের জন্য বিপিনবিহারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পুনঃস্থাপন হয়ে গিয়েছিল। এত বড় ঘটনাটা তিনি যেন দাম্পত্যের মধ্যে আনতেই চাইতেন না। সারা বাড়িও প্রাণপণে তা ভুলতে চাইত। রাধাদিদি তাই অনেকটা মুছে গেলেন।
কিন্তু সেটা যে আসলে উপরে উপরে, ভিতরে যে রাধাদিদির কাঁটা থেকেই গেল, তা যে পাকাপাকি ভাবে একটি ক্ষতস্থানও তৈরি করে ফেলল, তা অনস্বীকার্য। ক্ষণপ্রভাও রাধার প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। রাই ভাব থেকেও তিনি মুক্ত হয়ে যান।

রাধার ঘটনার পরে সেই রাতে বিপিনবিহারী ঘরে ফিরেছিলেন। তাঁকে তখন এমনই সমাদর করেছিলেন ক্ষণপ্রভা, যেন সংসারে কোথাও কোনও নিয়ম ভ্রষ্টের কারণ ঘটেনি। কিন্তু পরে সূর্যমুখীর পত্রের উত্তরে ক্ষণপ্রভা দুলালচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী তাঁহার স্বামীকে ঠিকই চিনিয়াছিলেন। তোমার স্ত্রী সূর্যমুখী তাহার সহোদরকে চিনিতে পারে নাই। তাহাকে বলা বৃথা। সে সাহিত্যের কথা ঘুরাইয়া বুঝে। কথা পাল্টাইয়া দেয়। তাই জামাইদাদা, তোমাকেই বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীর কথা ঋণ করিয়া বলিতেছি, রাধার প্রসঙ্গ উঠিলে আমার স্বামী অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন? পর ক্ষণেই আমাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক আদর, অধিক যত্ন করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কী আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।'

৪
স্ত্রী জাতি বড় আপনার বুঝে

এই ঘটনার পরেই দুলালচন্দ্রের সঙ্গে ক্ষণপ্রভার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। তবে দেখা হওয়ার জো ছিল না। চিঠিই ছিল মাধ্যম। দুলালচন্দ্র সরাসরি চিঠিও লিখতে পারতেন না। তাঁর চিঠির প্রাপক ছিলেন বিনোদবিহারী। খামটি খুললে তার ভিতরে আর একটি ছোট খাম বেরোত। সেই খামটি ক্ষণপ্রভার। কর্তাদাদা একবার ছোট ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জামাই তাকে কেন এত চিঠি দেয়? বিনোদবিহারী উত্তর দিয়েছিলেন, চিঠির মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরা। কথাটা ভুল ছিল না। দুলালচন্দ্রের চিঠিগুলিতে উপচে পড়ত উচ্ছ্বাস ও ইংরেজ কবিদের উদ্ধৃতি। বায়রন, কোলরিজ, শেলি, কিটস থেকে ব্রাউনিং। সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল, তার একটা প্রমাণ মেলে কোলরিজের ক্রিস্টাবেল থেকে সেই 'লাইক ওয়ান দ্যাট সাডার্ড, শি আনবাউন্ড' উদ্ধৃত করা থেকেই। উদ্ধৃতিটি দেওয়ার ঠিক আগেই দুলালচন্দ্র লিখছেন, 'আমি তোমাকে সারা ক্ষণ কল্পনায় দেখছি ক্ষণ। আর কোলরিজের কলমে লিখে ফেলছি।' যা পড়ে শিউরে উঠছেন ক্ষণপ্রভা। কিন্তু অসামান্য আভিজাত্যের সঙ্গে তারপরে দুলালচন্দ্রকে উত্তর দিচ্ছেন, 'আই লাভ দি ফ্রিলি, অ্যাজ মেন স্ট্রাইভ ফর রাইট। / আই লাভ দি পিওরলি, অ্যাজ দে টার্ন ফ্রম প্রেজ।'

যদিও সেই উত্তর তিনি নিজে দিয়েছিলেন, না তাঁর বয়ানে বিনোদবিহারী, তা নিয়ে সংশয় কাটেনি।

বিপিনবিহারী এ সব কিছুই জানতেন না। ক্ষণপ্রভার শিক্ষক ছিলেন বিনোদবিহারী। দুলালচন্দ্রের অনেক কথা ক্ষণপ্রভা বুঝতে পারতেন না। সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার দায় ছিল বিনোদবিহারীর। উপযুক্ত উত্তরও কখনও কখনও যে জুগিয়ে দেননি, তা নয়। ক্ষণপ্রভা কি বিনোদবিহারীর ভাষায় দুলালচন্দ্রকে উত্তর দিতেন? সূর্যমুখীর নাতি বলছেন, হয়তো তাই। কেননা, দুলালচন্দ্রের চিঠিতে যে প্রচণ্ড প্রেম থাকত, তার প্রকাশ ঘটত কখনও কখনও খুই অন্তরঙ্গ ভাষায়। যেমন ওই কোলরিজের ক্রিস্টাবেল থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিটিই দেখা যাক। সম্পর্ক খুব ব্যক্তিগত এবং কথোপকথনও খুবই একান্ত না হলে ইংরেজ সংস্কৃতি মতেও এমন লাইন চট করে কোনও মহিলার মুখের উপরে বলা যায় না, তার উপরে তিনি পরস্ত্রী—'হার সিল্কেন রোব, অ্যান্ড ইনার ভেস্ট, ড্রপড টু হার ফিট, অ্যান্ড ফুল ইন ভিউ। বিহোল্ড! হার বোজোম অ্যান্ড হাফ হার সাইড, আ সাইট টু ড্রিম অফ, নট টু টেল।'

কিন্তু ক্ষণপ্রভার উত্তরগুলিতে প্রেমের এমন তীব্র মাদকতা থাকত না। তিনি অনেক বেশি করে দার্শনিক। তিনি অনেক বেশি প্রেমের শাশ্বত তত্ত্বের উপর নির্ভর করেন। সেখানে স্বাধীনতার কথা যেমন থাকে তেমন থাকে না কোনও প্রেমিকের প্রতি কোনও স্বত্ব।
--এই শেষ বাক্যটার মানে বুঝতে পারলাম না।
সূর্যমুখীর নাতি বললেন, এ প্রশ্ন করো গিয়ে বিনোদবিহারীর ছেলেকে।
তাই করলাম। তিনি বললেন, প্রেম নিয়ে দার্শনিকতা এক বস্তু। আর প্রেমের উদ্‌যাপন আর একটি। বিপিনবিহারী ক্ষণপ্রভার সঙ্গে প্রেমের দার্শনিক সম্পর্কটি পাতিয়েছিলেন, যেখানে প্রেমের উদ্‌যাপনের অংশটি বরাদ্দ ছিল সম্ভবত রাধাদিদির জন্য। ক্ষণপ্রভার ক্ষেত্রে ওই দার্শনিক অংশটুকু জামাইদাদার ভাগ্যে পড়েছিল। তাই জামাইদাদা যত তীব্র হতেন, ক্ষণপ্রভা ততই দর্শনের আভিজাত্যের একটা নিরেট দেওয়াল তুলে দিতেন চারপাশে। অন্তত তাঁদের চিঠিগুলি থেকে তাই বোঝা যায়।

কিন্তু ঘটনাক্রম অন্য রকম বলে। নিষ্কাম প্রেমের দর্শনের উপরে এতটা জোর আরোপ করা হলে ক্ষণপ্রভার গৃহত্যাগের যুক্তি মেলে না। তিনি দু'বার গৃহত্যাগ করেছিলেন। তা ছাড়া, সূর্যমুখীকে লেখা একটি চিঠিতে ক্ষণপ্রভা কটাক্ষ সংক্রান্ত যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতেও তাঁকে অন্য রকম ভাবে চেনার পরিসর করে দিয়েছেন।

সে সব কিছু সত্ত্বেও, সে কালে কোনও বধূকে পাঠানো চিঠিতে অন্তর্বাসের প্রসঙ্গ তোলা, যতই তা কোলরিজের হোক, তাতে নারী শরীরের অব্যর্থ প্রসঙ্গ উত্থাপন, এ কি খুব সহজ কথা ছিল?

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, স্বয়ং ক্ষণপ্রভাও কিন্তু এমনই একটি কথা তুলেছিলেন। চিঠিতেই। একবার নরকের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি খুব সরাসরি রতিক্রিয়ার কথা দুলালচন্দ্রকে লিখেছেন।
এ প্রসঙ্গে সূর্যমুখীর নাতি যা বললেন, তা ওই চিঠির প্রসঙ্গে যাওয়ার পরে বলা যাবে। আপাতত এটুকু জানা থাক, সব চিঠি তেমন ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুলালচন্দ্রের অকপট সাহেবিয়ানার জবাবে ক্ষণপ্রভা পেশ করতেন স্বদেশী আভিজাত্য। সেই সব ক্ষেত্রে তার অর্থ কি এই যে, চিঠিতে দুলালচন্দ্র অকপট থাকলেও ক্ষণপ্রভা যে আভিজাত্যের আড়াল তৈরি করতেন, আসলে সযত্নে সেই আড়ালটি নির্মাণ করতেন বিনোদবিহারীই? কিন্তু

সেই আড়ালটিই আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিনোদবিহারী নির্মিত ক্ষণপ্রভার সেই প্রতিমার প্রতি দুলালচন্দ্রের আকর্ষণ ক্রমশ তীব্র হতে থাকে।

বিনোদবিহারীর ছেলে জানালেন, বাড়ির ছাদে বিকেলে মাদুর পেতে বসতেন দু'জনে। বিকেল গড়াত সন্ধ্যায়। যে কবির উদ্ধৃতি দুলালচন্দ্র চিঠিতে দিয়েছেন, বিনোদবিহারী সেই কবির আস্ত কবিতাটি পড়ে শোনাতেন ক্ষণপ্রভাকে। মানে বুঝিয়ে দিতেন যত্ন করে। কখনও একাধিক কবিতা। কখনও কবির জীবন। দূর দেশের সেই প্রেম-কাহিনি বিনোদবিহারী বলতেন, মুগ্ধ হয়ে শুনতেন ক্ষণপ্রভা। রাঙা হয়ে উঠতেন কখনও কখনও। তারপরে উত্তর লেখার সময় বিনোদবিহারী মুখে মুখে বলে যেতেন, ক্ষণপ্রভা মাথাটি নিচু করে পাতার উপরে তাঁর ছোট ছোট পরিষ্কার হাতের লেখায় সেগুলি লিখে যেতেন। এই ভাবে প্রায় দিনই সন্ধ্যা নামত সেই বাড়িতে।

এই আড়ালের কথা আড়ালেই ছিল। কিন্তু সূর্যমুখী বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা ঘটছে। তিনি বোধহয় একদিন দুলালচন্দ্রের জামার পকেট থেকে ক্ষণপ্রভার কোনও চিঠি পেয়েছিলেন। তিনি পরে ক্ষণপ্রভাকে কিছুটা নাটকীয় ভাবেই বলেছিলেন, 'সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে কোনও নারী পরপুরুষকে এমন করে লিখতে পারে, এ আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

পরে যে প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে, সেই অপেরা-ধর্মের প্রতি তাঁর বরাবরই ঝোঁক থাকলেও সাধারণত সূর্যমুখী এমন ভাবে কথা বলতেন না। ক্ষণপ্রভাকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি 'ঘোর রঙের প্রলেপ'-যে কথা বলেছিলেন, তাঁর নিজেরই কথা, লেখা ও আচরণে তার প্রভাব থাকত। এ বারে তিনি সে কথা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা ঘুরিয়ে পেশ করলেন ক্ষণপ্রভার কাছে। তিনি প্রথমে একবার বাপের বাড়ি গেলেন। এ বার তাঁর চোখ ঝলসানো রূপটির সঙ্গে অলঙ্কার বলতে ছিল কেবল দৃষ্টির গভীরতা। এমন নিরলঙ্কার সাধারণত তাঁকে দেখা যেত না। তিনি সাধারণ শাড়ি ঘরে পর্যন্ত পরতেন না। কিন্তু এ বার তাঁকে দেখাল, যেন গ্রামের বধূটি। তিনি সাহেবি কেতা ছেড়ে গাঁয়ের ধরন ধরলেন। ক্ষণপ্রভার চোখে সে পরিবর্তন ধরা পড়েনি, তা হতে পারে না। তাঁরা দু'জনে গল্পও করতেন। সূর্যমুখীর সেই বাপের বাড়ি যাত্রা বিনোদবিহারী ও ক্ষণপ্রভার সাহিত্য আসরে ছেদ ঘটিয়েছিল। কিন্তু সে বার এমন কিছু ঘটেছিল, যাতে ক্ষণপ্রভা মনে মনে প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়েন। দুলালচন্দ্র স্ত্রীকে নিতে আসেন। বিনোদবিহারীর ছেলে বলেন, বাবার কাছে শুনেছি, সে দিন দুলালচন্দ্রের সামনে বেরোননি ক্ষণপ্রভা। দুলালচন্দ্রও সাহস করে যাননি তাঁর ঘরে। বাইরের ঘরে বসেছিলেন। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন ক্ষণপ্রভার জন্য। তাঁর সেই অপেক্ষা করাটি মন দিয়ে খেয়াল করেছিলেন সূর্যমুখী।

তারপরে হাসি মুখেই তিনি বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন স্বামীর গাড়িতে। কিন্তু এরপরে সূর্যমুখী একটি চিঠি লিখেছিলেন, ''বৌদিদিভাই, এই ক'দিন বাপের বাড়ি ঘুরিয়া তোমার রূপ নতুন করিয়া দেখিলাম। বিদ্যালয়ে তোমার যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহা হইতে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন আমারও ঘটিয়াছে। কিন্তু মোটের উপরে আমি একই রহিয়াছি। তুমি মানুষটি অন্য হইয়া গিয়াছো।
'বঙ্কিমের ইন্দিরায় ইন্দিরা নিজের মুখেই একটি কথা স্বীকার করিয়াছিল—'স্ত্রী জাতি বড় আপনার বুঝে!' ইন্দিরা কথাটি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল। তবে তোমাকে দেখিয়া বুঝি, কথাটি ঠিক।

‘সেই সঙ্গে স্বীকার করি, তোমার এই নূতন অবতারের নির্মাণ কার্যে আমারও কিন্তু কিছু ভূমিকা রহিয়াছে। এই যে তুমি এখন কথা কহিবার সময়ে চোখটিকেও কথা কওয়াও, সে আমার শিক্ষা। এখন যে তুমি কথা কইবার আগে বারবার ভাব ও সেই ভাবার কথা প্রকাশ হইতে দাও না, সে আমার শিক্ষা। এমনকী, তুমি যা ভাবো আর যা বলো, তার মধ্যে যে অনেক পথ উজিয়ে যাও, তাহাও আমারই দান। কোনও কথা কহিবার আগে তাহার জন্য শুধু বাক্য আর শব্দ আর উচ্চারণই যে যথেষ্ট নহে, তাহার জন্য যে একটু অঙ্গরাগও লাগে, কখনও বিশেষ কথাটি কওয়ার জন্য ঠোঁটটি লাল করিতে হয়, কোনও কথায় যে চোখ, হাত, অলকগুচ্ছের অকারণ নাড়াচাড়াও প্রয়োজন, তাহা যে সময় বিশেষে উচ্চারিত কথার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে, তাহা তুমি জানো এবং অভ্যাসও করিয়া থাকো।

‘এখন তুমি এতটাই শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছো যে, এ কথা বলিয়া দিবার প্রয়োজন পড়ে না, যে কথা উপরে লিখিলাম তাহা গালি বলিয়া ধরিলে, সেই গালি আমি আপনাকেও দিয়াছি। তাই রাগ করিও না।
‘কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে জানাই, তোমার এই পরিবর্তন আমার ভাল লাগে নাই। এখানে কথা হইল দু’টি। এক, এই শিক্ষা আমিই তোমাকে দিয়াছি, তাহা স্বয়ং স্বীকারও করিতেছি, এবং দুই তুমি বরাবর বিদ্যালয়ের ওই বালিকাটিই কেন হইয়া থাকিবে, তোমার যে বড় হওয়া প্রয়োজন, তাহা তো মানিয়াই লইয়াছি। তবু কেন ভাল লাগিতেছে না? আমি মনে ভাবিয়াছি, ভাল লাগিতেছে না, কেননা তোমাকে আমার অপরিচিত মনে হইতেছে।
‘তোমার দয়ায় আমার সাধের বাপের বাড়িটিও অপরিচিত বোধ হইতেছে। তুমি তাহাতে একটা ঘোর রঙের প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছো। ওই রঙের নীচে চাপা পড়িয়া যাইতেছে বাপের বাড়ির আসল রূপটি। তুমি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছো। তাহাতে আমার স্বাভাবিক নিশ্চয়তা বোধ বিঘ্নিত হইতেছে। তোমার একটি চিঠি আমি পড়িয়াছি। সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে কোনও নারী পরপুরুষকে এমন করে লিখতে পারে, এ আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। যেমন বিশ্বাস করিতাম না, আমাকে নিতে এসে আমারই বাপের বাড়িতে সারা ক্ষণ উচাটন মন নিয়ে বাইরের ঘরে বসে রইলেন আমারই স্বামী। দরজার আড়াল হইতে হাতের কাঁকন দু’টি ঠুকিয়া শব্দ করিলাম। তিনি উৎসুক হইয়া তাকাইলেন। কিন্তু দরজা ঠেলিয়া যখন আমি প্রকাশ পাইলাম, বুঝিলাম তিনি অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমারই বাপের বাড়িতে গিয়া।
‘কেন জানি মনে হইতেছে, আমার বাপের ঘর থেকে তুমি আমাকে বিদায় করিয়া দিলে।’

ক্ষণপ্রভাও একটি লম্বা চিঠি লেখেন সূর্যমুখীকে।
ক্ষণপ্রভা লিখছেন, ‘আমি অনেক দিন হইতেই তোমার কাছ হইতে অনেক কিছু দাবি করিয়া আসিতেছি। কিছু ঋণও হইয়াছে তোমার কাছে। তাহার কিছু তুমি জানো, কিছু জানো না। যে ঋণের কথা তুমি জানো না, তাহাও শোধ করিবার দায় আমার উপরেই থাকে। কিন্তু সমস্যার কথা হইল, তুমি জানো না এমন ঋণের কথা একবার মনে করাইয়া দিলে, তোমার দাবিও বাড়িয়া যাইতে পারে। তবুও অধমর্ণ হইয়া কিছুই লুকাইব না পণ করিয়াছি। সব কথা খুলিয়া বলিতেছি। ইহাতে তোমার মনে ক্ষোভ বাড়িতে পারে, তাহাতে আমার ঋণের বোঝাও বাড়িবে। কিন্তু তোমারও কিছু দায় রহিয়াছে। তাহার সুদ না মিটুক, আসলটুকুর খোঁজ পাইবে।

‘আশ্চর্যের কথা কী জানো ঠাকুরঝি, তুমি যে পরিবর্তনের কথা বলিয়াছো, তাহাতে বলি, সমস্ত কিছুই সর্বদা বদলাইতে থাকে। আমার এখন মাঝে মধ্যে ছোট বেলার কথা মনে পড়ে। শ্রীরামপুরের বাড়ি হইতে যখন কলিকাতায় পড়িতে যাই, বড় বড় রাস্তা, গ্যাসের বাতি আর গাড়ি দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইয়াছিলাম। সেই ভয় ক্রমশ

সঞ্চারিত হইতে থাকে সাহসে। তুমি বঙ্কিমের ইন্দিরার কথা বলিয়াছো। আমিও বলি, নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে আমিও তাহার মতোই বিস্মিত ও ভীত হইয়াছিলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ির গায়ে বাড়ি, বাড়ির পিঠে বাড়ি, তার পিঠে বাড়ি, অট্টালিকার সমুদ্র।

'আমি বুঝিয়াছিলাম, সুন্দরী বলিয়া অনেকেই আমাকে দেখিতে চায়। কিন্তু আমি বিশেষ হইতে চাহিয়াছিলাম। তখন আমি তোমাকে দেখিতাম। তুমিও গ্রাম হইতেই আসিয়াছিলে। কিন্তু তোমার নামের ন্যায় তোমার চরিত্রও বিশেষ। তুমি সুন্দরী কিন্তু সব থেকে বড় গুণ প্রকাশ পায় তোমার আচরণে। তুমি নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতে পারিতে। তাই তোমার দিকেই সকলের বিশেষ করিয়া নজর পড়িত। কিন্তু তোমার মধ্যে একটি বাহিরের প্রতি টানও আমি লক্ষ করিয়াছিলাম।

'তোমাকে দেখিয়া কী মনে হইত, তাহা বঙ্কিমের কথা ধার করিয়া বলি—'রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ, / বকুল ফুলের মালা। / রাঙ্গা শাড়ি, হাতে হাঁড়ি, / রাঁধছে গোয়ালার বালা। / এমন সময়, বাজল বাঁশি, কদম্বের তলে। /কাঁদিয়ে ছেলে রান্না ফেলে / রাঁধুনি ছোটে জলে।' তুমি সেই রকম। তুমি সংসারে মগ্ন থাক। কিন্তু বাঁশির ডাকে সংসার ভাসিয়েও দিতে পার। তোমার এই দু'টি অপ্রতিরোধ্য মুখ। এই বৈপরীত্যটিই অপ্রতিরোধ্য।

'আমিও তোমার কাছ হইতে কিছু দূরে থাকিয়া তোমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিতে থাকিলাম। সেই দেখা অনেক সময়ে তুমিও দেখিতে পাইতে। আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম। মেয়েদের একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা রহিয়াছে, অন্যের মনের কথা জানিবার। আমি এবং তুমি সে ভাবেই একে অপরের মনের খবর জানিতে পারিতাম। সে ভাবেই জানিয়াছিলাম, তুমি আমাকে সুন্দরী বলিয়া মনে করিলেও বুদ্ধিমান বলিয়া ধরো না। তাই তোমার দাদার সহিত সম্বন্ধ করিবার সময়, তুমি আমাকে বাছিয়াছিলে নিরীহ স্বভাব এক সৌন্দর্যের পুঁটুলি ভাবিয়া। আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা বুঝিতে পারিয়া, আমার বুকে খুব বাজিয়াছিল।

'তথ্য প্রমাণের সম্বাদ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন, তবু এই প্রসঙ্গে একটি গুরুতর ঘটনার বিবরণ আমি তোমাকে দিতে পারি। অবধান করো।

'তোমার বিবাহ হইয়াছিল আগে। জামাইদাদা ইংরাজি শিক্ষিত, আদবকায়দায় নিপুণ। বিশেষত শ্রীরামপুরের মতো গ্রামে তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গি থেকে বসিবার ভঙ্গি পর্যন্ত সবই একেবারে অভিনব ঠেকিবে, এ তুমি ঠিকই ভাবিয়াছিলে। তাই তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলে কনে দেখাইতে। জামাইদাদার নির্দেশে ঝড়ের মতো তোমাদের গাড়ি ঢুকিয়াছিল আমাদের ফটকের একেবারে সামনে পর্যন্ত। ঘোড়াগুলির এমন আচমকা রাশ টানা হয় যে, তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পা তুলিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছিল। ধুলো উড়িয়াছিল খুব। পরে বুঝিয়াছিলাম, এমন অবস্থাটি তৈয়ার করা হইয়াছিল অনেক যত্ন করিয়া। তাহার পরে নিজে আগে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া যে ভাবে তোমাকে হাত ধরিয়া নামিতে সাহায্য করিয়াছিলেন জামাইদাদা, তাহা অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে মুখে মুখে ফিরিত। তাঁহার থ্রি পিস স্যুট, ইংলিশ হ্যাট এবং তোমার মহার্ঘ্য শাড়ি হইতেও আলোচনার বিষয় ছিল জামাইদাদার ভারি সফিস্টিকেটেড হাসির ধরনটি। তিনি একটি পায়ের উপরে আরেকটি পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের বসিবার ঘরে কেহ জুতো পরিয়া ঢোকেন না। তিনি ঢুকিয়াছিলেন। তাঁহার চকচকে জুতোটির গা বেড়িয়া যে রুপোলি রেখাটি পা দোলার তালে তালে দুলিতেছিল, তাহা আমাদের বাড়ির কাজের লোকেদের কাছে অনেক দিন পর্যন্ত একটা দারুণ গল্প করিবার মতো বিষয় ছিল। ইহার পরে তুমিই তাঁহাকে আমার সর্বংসহা পিতার মুখের সামনেই সিগার ধরাইতে উত্সাহ দিয়াছিলে। তিনি তোমার মতো স্ত্রীরত্ন পাইয়া তখন বিভোর। তাই সিগার ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে থাকিলেন। সেই সময়ই আমার প্রবেশ ঘটে। তাঁহাকে আমি প্রথম দেখি সেই ধূমের জালের ভিতর দিয়া। তাঁহার চোখ হাসিতেছিল। তুমিও সহপাঠিনীর কাছে নিজের ফ্যাশনের স্বামীর গর্বে ফাটিয়া পড়িতেছিলে। এ বার সেই গুরুতর সম্বাদটি দিই—আমি সেই সময় নিভৃতে তোমারও

চোখ বাঁচাইয়া জামাইদাদার প্রতি একটি অমোঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তুমি তো ইন্দিরা পড়িয়াছো। তাই নিশ্চয় জান, আমার অবগুণ্ঠন ছিল তবে 'ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না।'
'এত দিন পরে এ কথা কেন বলিতেছি, তাহা পরে বলিব। আগে বলি, মহিলা মাত্রেরই কটাক্ষে কিছু না কিছু বিষ থাকে। ইন্দিরার মতোই বলি, 'সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই'। গেঁয়ো মেয়েরা শিক্ষার অভাবহেতু ওই কটাক্ষের উপরেই খুব বেশি করিয়া নির্ভরশীল। তাই তাঁহারা তাহাতে স্থানভেদে আরও কিছু রণকৌশল যোগ করিয়া থাকেন, যাহা আমিও যথারীতি শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে জামাইদাদা বধ হয় না। কলিকাতায় কিছু দিন তোমার মতো নারীরত্নদের সহিত কাটাইয়া আসিবার পরে ও নিজ শিক্ষায় আমি অবশ্য কটাক্ষটি শান বাঁধাইয়া একেবারে ঝকঝকে করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমারও সুভাষিণী থাকিলে তাহা দেখিয়া বলিত—'দূর হ পাপিষ্ঠে। তুই আস্ত কেউটে।'

'অতএব অব্যর্থ সেই কটাক্ষশরে জামাইদাদা তত্ক্ষণাত্ নিহত হইলেন। আবার ইন্দিরা হইতেই ধার করিতেছি, 'অবগুণ্ঠন মধ্যে রমনীর কটাক্ষ তীব্র দেখায়। বোধহয়, ইনিও সেই রূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম।''

৫
খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম

ক্ষণপ্রভার চিঠিটি আগাগোড়া বেশ শ্লেষে ভরা। তিনি তারপরে লিখছেন, 'আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তোমার মতো বুদ্ধিমতীও কিন্তু তখন বুঝিতেই পারনি, কেন সেই গোধূলি লগ্নে কনে দেখাইবার মতো একটি কঠিন কাজে নামিয়াও আমার মুখে রহস্যময় হাসিটি লাগিয়া রহিয়াছে। তুমি ভাবিয়াছিলে, জামাইদাদার ন্যায় ব্যাঘ্রের মুখে আমার ন্যায় অজ শাবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া, তুমি দর্শকাসনে বসিয়া কেবল তালি দিবে। পদে পদে ভীত, সন্ত্রস্ত আমার বিভ্রম দেখিয়া তুমি রানির মতো তাহাতে প্রশ্রয়ের প্রলেপ লাগাইবে। সন্ধ্যাটি কাটিবে বড় আমোদে।

'সেখানে আমি কেন হাসিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছিলে না। কিন্তু জামাইদাদা যে ঘোরতর বুদ্ধিমান, এমনকী তুমি হইতেও, তাহা বুঝিয়া গেলাম আমার শরাঘাতের পরে দ্রুত তিনি নিজেকে ভদ্রতার নানা আদবকায়দার মধ্যে দিয়া সম্পূর্ণ মুড়িয়া ফেলিলেন দেখিয়া।

'এইখানে একটু রবিবাবুর প্রশংসা করিয়া লই। ইন্দিরার র-বাবু নিজেকে সামলাইতে পারেন নাই। কিন্তু রবিবাবুর চরিত্রেরা এ সব ক্ষেত্রে বেশ নাগরিক। চোখের বালির মহেন্দ্রর কথাই ভাব। রবিবাবু লিখিতেছেন, বিনোদিনী বাড়িতে উপস্থিত হইবার পরে 'মহেন্দ্রর মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।' এই যে উল্টা মুখে হাঁটা, ইহাই রবিবাবুর চরিত্রগুলির বিশেষ গুণ। সেই সঙ্গে স্বীকার করিতেছি, তখন বুঝি নাই কিন্তু পরে নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়াছিলাম, জামাইদাদারও আদর্শের সহিত এমনই এক ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন চোখের বালি পড়ি নাই। তখন অশিক্ষিত ছিলাম।

‘কেন এ কথা বলিতেছি, তাহাও বলি। পরে চোখের বালিতে পড়িলাম, মহেন্দ্র তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকায় বিনোদিনীর কথায় রবিবাবু লিখিতেছেন, ‘এত ঔদাসীন্য কীসের? আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই।’

‘বিনোদিনীর এই কথাগুলি সেই সন্ধ্যায় আমারও ছিল। মহেন্দ্রকে যে ভাবে বিনোদিনী দেখিয়াছিল, আমিও তেমন ভাবেই জামাইদাদাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, আমি জড়পদার্থ নই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হইল, তখন চোখের বালি প্রকাশিতই হয় নাই। রবিবাবু কী আশ্চর্য ভাবেই না মনের কথা পড়িয়া নেন। পরে বঙ্গদর্শনের পাতায় এই অংশটুকু পড়িয়া আমি শিহরিত হইয়া গিয়াছিলাম। এই কথা তো আমারই। এই কারণেই কটাক্ষের কথা ভাবিয়াছিলাম আমিও। সে কথা মনে পড়িলে আমার এখনও আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া থাকে। অভিমানে ভাসিয়া যাই। তোমার প্রতি অভিমান, জামাইদাদার প্রতি অভিমান, ওই অবস্থাটির প্রতি অভিমান। অভিমানে এখনও চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাই বিনোদিনী যে রূপ ভাবিয়াছিল, আমিও সেই রূপ ভাবিয়াছিলাম, ‘একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।’ তবে স্বীকার করি, তুমি চোখের বালির আশা নও। তুমি বঙ্কিমী আদলেই বড় উৎকৃষ্ট রূপে তৈয়ার হইয়াছ।

‘কিন্তু তোমার স্বামীটি রবিবাবুর চরিত্রদের গোত্রেই পড়েন। কিন্তু সে কথা তখন বুঝিতে পারি নাই। আপামর বাঙালিনীর ন্যায় তখনও বঙ্কিমী ঘরানায় ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলাম যে। তখনও পর্যন্ত রবিবাবুতে গোত্রান্তর হয় নাই। শ্রীরামপুরে সেই সন্ধ্যায় জামাইদাদার ভদ্রতার বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাই ভাবিয়াছিলাম, শরটি একেবারে মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি এখনই এমন কিছু করিতে চান না, যাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীটি সেই ঘটনার সামান্যতম আঁচ পর্যন্ত পায়। কারণ পাইলে, বিবাহ তত্ক্ষণাত্ ভাঙিয়া যাইত। আমি জামাইদাদার হাত ছাড়া হইয়া যাইতাম। ভাবিয়াছিলাম, জামাইদাদা চাহিলেন, আমাকে সযত্নে রক্ষা করিতে, যাহাতে সময় মতো খাইতে পারেন।

‘এই যে তিনি আমাকে খাদ্যবস্তু বলিয়া স্থির করিলেন, তাহাতে কিন্তু আমার মনে একটু চিন্তা হইয়াছিল। বঙ্কিমের ইন্দিরার কথাটি তাই উদ্ধার করি, ‘আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম’। কেননা, ঠাকুরঝি, তত দিনে আমি তোমার দাদাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনিও ইংরাজি পড়িয়াছেন কিন্তু ইংরাজ হইয়া যাননি। তিনি কথা বলিতেন ফেলিয়া ছড়াইয়া। একটা কথা বলিতে বলিতে আর একটি কথায় ঢুকিয়া যাইতেন। সেই কথার খেই ধরিয়া আবার নূতন কথায়। আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়, হঠাত্ অন্যমনস্কও হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার তাহাতে খুব রাগ হইয়া যায়। আমার মতো সুন্দরী সামনে বসিয়া রহিয়াছে, তবু কেন এই পুরুষটি অন্যমনস্ক? দেখিলাম আমার সব কটাক্ষই অপাত্রে পড়িল।

‘কিন্তু তাহার পরে বুঝিতে পারিলাম, এই সমস্তই তিনি বেশ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ করিতেছেন না। তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে আমাকে দেখিয়া লইয়াছেন। এই দেখা অন্যদের মতো নহে। যেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনিতেছেন, এমনই ছিল তাঁহার ভাবটি। তাঁহার এই নিজস্ব দেখার ধরনটি আমার ভাল লাগিয়াছিল।

‘এই আনন্দময় পুরুষটির সঙ্গে জামাইদাদার কোনও তুলনাই হয় না। এই কথা সেই দিন আমি ভাবিতে বসিয়াছিলাম। অবশেষে আমার মুখে কখনও হাসি, কখনও উদাসীন ভাব দেখিয়া তুমিও বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে এই কথা ভাবিয়া যে, এত বড় বাড়িতে বিবাহের পূর্বে আমার মতো সাধারণী এক কন্যার তো এমনই হওয়া উচিত।

‘আমার অবশ্য ভুল ভাঙিল বিবাহের প্রায় সাত মাস পরে শ্বশুরমশায়ের জন্মদিনে। তোমার দাদাকে আমি তত দিনে বেশ পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি আমাকে নারী হিসেবে দেখিতেন না। বন্ধু হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দু’টি কারণে আমি তাঁহার সহিত তাল মিলাইতে পারিলাম না। প্রথমত, তাঁহার মনের দৌড় এতটাই উচ্চমার্গের যে সেখানে আমি পৌঁছাইতে পারিতেছিলাম না। দ্বিতীয়ত, বন্ধুত্ব নহে। সদ্য বিবাহের পরে আমি তখন চাহিয়াছিলাম, গাঢ় প্রণয়। কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন আগে নিজেকে আমার কাছে প্রতিষ্ঠা করিতে। সেই করিতে গিয়ে তিনি প্রণয় বলিতে আমাকে সাহিত্যের নানা রূপ বুঝাইতেন। তাহাতে আমার তৃষ্ণা মিটিত না। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার ভাল লাগা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে তুমি বা জামাইদাদা কেহই আমাদের বাড়িতে খুব বেশি আসনি। তোমার দাদা অবশ্য বার দু’য়েক কলকেতায় গিয়াছিলেন।

‘শ্বশুরমহাশয়ের জন্মদিনে তুমি তেমনই সাজগোজ করিয়া আসিলে। সঙ্গে ফ্যাশনদুরস্ত জামাইদাদা। অনুষ্ঠান মিটিবার পরে রাতে আমরা চার জন ঘরে বসিয়া কথা কহিবার সময় জামাইদাদা জোর করিলেন আমাকেও একটু পোর্ট খাইবার জন্য। আমি তাহার আগে স্বামীর সঙ্গে ঘরে বসিয়া হুইস্কি, শেরি এবং ওয়াইন খাইয়াছি। তাহা সামলাইয়াও ছিলাম বেশ। কিন্তু তোমাদের সামনে লজ্জা করিতেছিল। তুমি নিজের দাদার সামনে বসিয়া হুইস্কি খাইতেছ দেখিয়াও আমার অস্বস্তি হইতেছিল। কিন্তু জামাইদাদা আমার গ্লাসে পোর্ট ঢালিয়া দিবার পরে দেখিলাম তোমার দাদা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কথা বলিতে ভালবাসিতেন। স্ত্রীর গ্লাসে মদ ঢালা হইতেছে দেখিয়াও নিজের মনে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। আমি কিছুটা অভিমানেই বেশি হুইস্কি খাইলাম। সামান্য বেসামালও হইলাম। তাহার পরে তুমি আমাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া গেলে। ভারি লজ্জার মধ্যে পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম, তুমি এবং তোমার দাদা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্বশুরমহাশয় ও শাশুড়ি শুনিয়াছিলেন, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা সেই মতো একটু উদ্বেগ দেখাইলেন।

‘কিন্তু জামাইদাদাকে সত্যিই উদ্বিগ্ন দেখাইল। তিনি খুবই কোমল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন রহিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে কথা হইল কিছু ক্ষণ। খুব নিম্ন স্বরে খানিকটা যেন লজ্জিত ভাবেই তিনি তখন আমাকে কহিয়াছিলেন,

‘যাহা যত ক্ষণ অবধি স্বাভাবিক বলিয়া মন মানিয়া লইতে পারিতেছে না, তাহা তত ক্ষণ পরিহার করাই উচিত। দরকারে প্রতিবাদও করিতে হইবে।’

‘খুব ভাল করিয়া দুইটি কথা বুঝিতে পারিলাম সেই দিন। এক, ভদ্রতা জামাইদাদার ফ্যাশন নহে। ভদ্রতা ও চরিত্রের কোমলভাব তাঁর শিক্ষা ও স্বাভাবিক চরিত্রবোধ থেকে উদ্ভূত। তাঁহার প্রতি আমার মনোভাব বদলাইয়া গেল। দ্বিতীয়ত, দিনের আলোর মতো বুঝিতে পারিলাম, তোমার দাদার আমার প্রতি কোনও স্বত্ব নাই। কোনওদিনও তাহা আরোপ করিবেনও না।

‘ইহা হইতে আরও দুইটি কথা বোঝা গেল। এক, তোমার দাদা আমাকে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমার দায়িত্ব আমি একাই লইতে পারিব, না পারিলে তাহার দায়িত্ব আমারই, এই কথা তিনি বিশ্বাস করেন। আর দুই, আমি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন তোমার স্বামী। তিনি মনে করেন, যাহা অসম্পূর্ণ তাহা আতুর, তিনি চান তাহার নিরাময় করিতে।

‘আমার গেঁয়ো বুদ্ধিতে দ্বিতীয়টাই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

‘অতএব ইন্দিরা হইতেই বলি, ‘আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া, পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবির খেলার মতো, পরকে রাঙা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম।’’

বিনোদবিহারীর পুত্র বললেন, দেখবার মতো বিষয়টা হল, দুই সহপাঠীর এই পত্রালাপে ক্ষণপ্রভা যতটা শানিত এবং যতটা ভদ্র, সূর্যমুখী ততটাই ম্লান এবং ততটাই ভদ্রতা বিমুখ। সূর্যমুখী সরাসরি কথা বলেছেন। যার উত্তরে ক্ষণপ্রভা কৌশলে ননদকে একেবারে হত্যা করে বসলেন। জামাইদাদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা পরিষ্কার করে বলে দিলেন। এমনকী, সেই বলার মধ্যে কোনও জড়তাও নেই। অর্থাৎ, এই ভাবে তিনি জামাইদাদার উপরে নিজের অধিকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। প্রেমের এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সূর্যমুখী কিন্তু হার মেনে নিলেন না। বরং তিনি যে আহত হয়েছেন, সে কথা বুঝিয়ে ছাড়লেন।

তাঁর প্রত্যুত্তরটি এ বার উদ্ধৃত করছি—‘তুমি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠিকা। তাহাতে আমার খুব কিছু ভক্তি উৎপাদিত হয় না। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথায় আমার বরাবরের ভক্তি রহিয়াছে। তাই তুমি ইন্দিরার কথাগুলি নিজের মতো করিয়া ব্যবহার করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছো। ঠিক করো নাই। ইন্দিরার মূল সুরটিই তুমি কেন জানি বুঝিতে পারো নাই। বিদ্যালয়ে তুমি ঠিক শিক্ষাই পাইয়াছো, এই যে না বুঝিবার ছল, তাহা তোমার স্বকৃত আয়োজন। ইন্দিরা তাহার স্বামীকেই পাইবার জন্য সচেষ্ট ছিল, তুমি আমার স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট। ইন্দিরা যা করিয়াছে, সব নিজের স্বামীর জন্য করিয়াছে, তুমি যা করিয়াছো সব আমার স্বামীর জন্য করিয়াছ। তাই বঙ্কিম সত্যিই তোমার উপযুক্ত লেখক নহেন।

‘রবিবাবুই যে তোমার উপযুক্ত তাহারও প্রমাণ ওই চোখের বালিতেই রহিয়াছে। তুমি যে অংশটির কথা বলিয়াছো, পড়িয়া দেখিতেছি, তাহার পরেই রবিবাবু লিখিতেছেন, ‘পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সঙ্গলাভের জন্য স্বাভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরও যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঔদাস্য তাহাকে আরও উত্তেজিত করিতে থাকিল।’ বৌদিদিভাই, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, ইহা কি আদর্শের সহিত লড়াই? ইহা কি ধর্মসঙ্কট?

‘না। ইহা পরিষ্কার লোভ। তোমার রবিবাবু মহেন্দ্রকে হাত ধরিয়া অধঃপাতের দিকে লইয়া যাইতেছেন, তুমি তাহার সহিত একই দিকে পা বাড়াইয়াছো।

‘বিষবৃক্ষেও এমন প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম যত যত্নে তাহা সামলাইয়াছেন, রবিবাবু তত যত্ন করিতে পারেন নাই। ‘ব্যগ্রতা’, ‘উত্তেজনা’ বৃদ্ধির কথা বলিয়া যেন একরকম করিয়া কাজ সারিয়াছেন। বঙ্কিম সেখানে মনের অন্দরে প্রবেশ করেন। তোমার ও তোমার রবিবাবুর মধ্যে আসলে দ্রুত নিজের কথা বুঝাইয়া দিবার এই ব্যগ্রতা ও উত্তেজনার বাড়াবাড়ি ভাবপ্রকাশের রন্ধন প্রক্রিয়াটিকে আহত করে। তাই শেষ পর্যন্ত পাতে যাহা পড়ে, তাহা না দেখিয়া সুখ, না খাইয়া সুখ। বঙ্কিমের কাছ হইতে ধার করিয়া আনাজপাতি রবিবাবু অনেক জোগাড় করিয়াছেন, রান্নার কৌশলটি কেবল লক্ষ করেননি। তাই বঙ্কিমের ভাবনাও তোমাকে তেমন ছোঁয়নি। তুমি রবিবাবুর পাঠিকা হইয়া উঠিতেছিলে নিশ্চিত ভাবেই। তাই তুমি বঙ্কিমকে ভুল বুঝিতেছিলে। বঙ্কিমকে ভুল না বুঝিলে রবিবাবুর অনুগত হওয়া যায় না, এই কথাটি বঙ্কিমের পক্ষে যতটা আদরণীয়, রবিবাবুর পক্ষে ততটাই অনাদরের। সমাজ সম্পর্কে তোমার-আমার সম্পর্কও আদরণীয়। তুমি তাহা অনাদরের প্রান্তে পৌঁছিয়া দিয়াছো।

‘কিন্তু বঙ্কিমের সৃষ্ট একটি চরিত্রের সহিত তোমার দারুণ মিল খুঁজিয়া পাইয়াছি। (এই যে ‘দারুণ’ কথাটি বলিলাম, তাহা বৈষ্ণব গীতি কবিতার ‘দারুণ’)

‘চরিত্রটির সহিত আশা করি তোমার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি শৈবলিনী।

‘চন্দ্রশেখরের মতো স্বামী পাইয়াছো তুমিও। দাদা তেমনই পণ্ডিত এবং তোমাকে তেমনই ভালবাসেন। তাঁহার ভালবাসা চন্দ্রশেখরের ভালবাসার মতোই ততটা অনুভব করা যায় না। কিন্তু ভাল যে বাসেন, তাহাতে কোনও সন্দেহও করা যায় না। শৈবলিনীও জানিত তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসেন। শৈবলিনী জানিত, তাহার স্বামী তাহাকে এতটাই ভালবাসেন যে, তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরেও আবার ফিরিয়া আসা যায়। তবু সে ফেরে না। প্রতাপের কথা আওড়ায়। তুমিও শৈবলিনী। সেই শৈবলিনী, যে প্রতাপের সহিত প্রতাপের কথায় সাঁতরে মাঝ গঙ্গায় যাইতে পারে, কিন্তু জলে ডুবিয়া যাইতে ভয় পায়। সেই শৈবলিনী, যে চন্দ্রশেখর গৃহে সসম্মানে স্থান দিবেন জেনেও ফস্টরের নৌকা হইতে নামিতে চায় না। সেই শৈবলিনী যে প্রেমের কথা বলিয়া, প্রেমের দোহাই পাড়িয়া, প্রেমের প্রসঙ্গ বারবার জোরের সহিত উত্থাপন করাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাই করিয়া থাকে—যাহাতে তাঁহার নামটি যে শৈবলিনী, সে কথা লোকে যেন কখনও ভুলিয়া না যায়।

‘মনঃসংযোগ টানিয়া রাখিবার এই আত্যন্তিক প্রয়াসটি কিন্তু ব্যয়বহূল। ইহাতে তোমার কী কী ব্যয় হইবে, তাহার একটি তালিকা তুমি শৈবলিনীর জীবন হইতেই করিয়া লইতে পার। তবে রবিবাবুর কাহিনিতে এমন ব্যয় খুব একটা কাহাকেও করিতে হয় না, বিনোদিনীও রবিবাবুর রক্ষাকবচ পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে বলেই আমার ধারণা, কেননা, ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান রবিবাবুর বোধকরি নরক সম্পর্কে জ্ঞান কিছু কম রহিয়াছে। কিন্তু বামুন বঙ্কিম নরক কী তাহা জানেন।

‘বৌদিদিভাই, শৈবলিনী প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর কাহাকেও ভালবাসে নাই।’

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, বুঝতেই পারছ, এ বারও খুব কড়া ভাষাতেই চিঠিটি লিখেছিলেন সূর্যমুখী। কিন্তু কথা কেবল সেইটাই নয়। কথা হল, এই চিঠি থেকে পরিষ্কার, ক্ষণপ্রভা যে তাঁর স্বামীকেও ভালবাসেন, সে কথা সূর্যমুখী বুঝতে পেরেছিলেন, সে কথা প্রকাশও করে ফেললেন। তাঁর মর্যাদা যে তাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তা-ও তিনি জানালেন। এই স্বীকারোক্তি কিন্তু খুব সহজ ছিল না। বোঝাই যায়, কতটা মরমে মরে তিনি এই চিঠি লিখেছেন।

ক্ষণপ্রভার তাতে ঠিক কতটা আনন্দ হয়েছিল, তার কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। কিন্তু তিনি যে মনে মনে নিরতিশয় খুশি হয়েছিলেন, সে কথা হলফ করে বলাই যায়। সূর্যমুখীর নাতি বললেন, মুশকিলটা হল কী, দিদিমার এই চিঠিতে নরকের কথা তুলে অভিসম্পাত দেবার যে চেষ্টা হয়েছে, তাতে তিনি আরও পতিত হলেন। সে কালে মেয়েদের কথায় নরকের প্রসঙ্গ উঠত, এমনকী শিক্ষিত মেয়েরাও নরকের কথা ভাবতেন, এমনটা বলা যায়। তবু সূর্যমুখীর কাছ থেকে নরকের কথা কিছুটা আকস্মিক ভাবেই ধাক্কা দেয়। ক্ষণপ্রভার মনে যে সে কথা দাগ কেটে গিয়েছিল তা তাঁর দুলালচন্দ্রকে দেওয়া একটি চিঠিতে জানা যায়। সে চিঠিতে বিনোদবিহারীর ভূমিকা কতটা, তা অবশ্য একটা ভাববার মতো কথা।

৬
কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান

চিঠিটি লেখার আগে ক্ষণপ্রভা কিছুটা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সকালে স্নান করে গিয়েছিলেন রাধামাধবের মন্দিরে। সেখানে কিছু ক্ষণ বসে থাকার পরে ফিরে মোক্ষদার হাতে খেলেন। তারপরে দুপুরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। ঘোর দুপুরে ঘরের দোর বন্ধ করে জানলাগুলো খুলে দিয়ে লিখতে বসলেন তিনি। ডায়রিতে লিখছেন, ‘কাগজ ও কলম গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম টেবিলের উপরে। তাহার সামনেই জানালাটি খোলা ছিল। বিছানার ধারের বাগানের উপরের জানলাটিও খোলা ছিল। বন্ধ করি নাই। দুপুর আমার ঘরে ঢুকিয়া পড়ুক, এমনটাই আশা করিতেছিলাম। ওই দুপুর ছড়াইয়া যাক আমার ঘরে। আমার মনে। আমি ঠিক সময়টির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি জানিতাম দুপুরটুকুই দরকার। দোরটি বন্ধ করিয়া দিয়েছিলাম। কারণ মোক্ষদার বুদ্ধির অন্ত নাই। সে ঠিক আঁচ করিয়া নিবে যে, আমার কোনও একটা প্রস্তুতি রহিয়াছে। এ বার, কীসের জন্য সেই প্রস্তুতি, তা না জানিয়া সে ছাড়িবে না। তাহার মুখ দেখিতে এখন ইচ্ছা করিতেছে না। বেশি কিছু খাইওনি, কারণ তাহাতে অস্বস্তি হয়। আমি চাইনি আমার মন ও শরীর কোনওরকম অস্বস্তিতে পড়ুক। কিন্তু সকালের পরে দুপুরে আর

স্নান করি নাই। তা হলে শরীরে শীতলতার একটি প্রলেপ ছাইয়া যাইত। আমি তাহা চাহি নাই। আমি চিঠিটি লিখিতে ব্যগ্র ছিলাম।'

চিঠিতে দুলালচন্দ্রকে ক্ষণপ্রভা সম্বোধন করেছেন, শুভদর্শনে। তারপরে লিখছেন, 'নরক কী তাহা কি তুমি জানো জামাইদাদা?
'কয়েকদিন হইতেই নরকের কথা বারবার আমার মনে হইতেছিল। আমার স্বামী তো থেকেও নাই। তিনি কলকেতায় কী যে করেন, তিনিই জানেন। তাঁকে একটি পত্র লিখিলাম। ছোট্ট একটি উত্তর দিলেন। তাহাতে বলিলেন, 'নরকের কথা ভাবিতে বসিলেই নরককে আসন পাতিয়া বসিতে দেওয়া হয়। নরকের কথা ভাবিও না। দেখিবে নরকও তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।' ইহাতে কিছু শিক্ষা পাইলাম, কিন্তু চিন্তা দূর হইল না। চৈত্রের রোদকে যদি বলি আমি তোমাকে ভাবিব না, শীতলপাটির মধ্যে থাকিব, তাহা হইলে সে আড়াল হয় বটে, কিন্তু তাহাকে স্বীকারও করা হয়। আমার জানালা হইতে সেই চৈত্রের রোদকে দেখিতে পাই প্রাণ ভরে। বৃষ্টির মতো সেই রোদ মাঠ ঘাট বাড়ি ঘরদোর পুকুর গরু বাছুর মন্দির মন্দিরতলা থেকে শুরু করিয়া একেবারে গোটা দুপুরটাই গ্রাস করিয়া লয়। কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখিয়া যায় না। যে বাছুরটি কোনওমতে একটি খড়ের গাদার পাশে সামান্য ছায়ার সন্ধান করে, তাহারও মনে থাকে সেই রোদ। রোদ রহিয়াছে বলিয়াই সে ছায়ায় রহিয়াছে, এ কথা সেও ভুলিতে পারে না, রোদও ভুলিতে দেয় না।

'রোদের নেশা লাগিয়া গেল। দূরে দূরে মাঠের মধ্যে দিয়ে কোনও দুপুরে লোক যায়। কখনও যায় মন্থর গোরুর গাড়ি। তাহাদের ধোঁয়ার মতো ঠেকে। কখনও সখনও গাঁয়ের কোনও মেয়ে মন্দিরে যায়। চট করে প্রণামটি ঠুকে দিয়ে পলায়। কেউ বা অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকে। রোদের মধ্যে তাহাদের ত্বরা পায়ে চলাচল বেশ লাগে। আমিও একদিন ভরা চৈত্রের দ্বিপ্রহরে মাথায় ভিজে গামছা দিয়া চলিয়া গেলাম মন্দিরের সামনে। মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোথা হইতে কে খবর দিল কে জানে, ঠাকুরমশায় দেখি ভাত ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার জন্য নিঃশব্দে দোরটি খুলিয়া দিলেন। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম। বারবার ভাবছিলুম, এই দ্বিপ্রহরেই সেই ব্রজরাখাল গোরুগুলি লইয়া মাঠে যাইতেন। তাঁহার বাঁশি বাজিত। তার সুর ভরিয়ে দিত জনশূন্য মাঠ, সুপ্ত জনপদ। হঠাৎ সামনে রাধামাধবের মূর্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি তাকাইয়া রহিয়াছেন সামনের দিকে। দৃষ্টি সামনে ছড়াইয়া রয়েছে। ঠোঁটে সামান্য হাসি। আমি তড়িঘড়ি গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম সারিয়া ঠাকুরমশায়কে বলিলাম, আপনি এত কষ্ট করে দুপুর রোদে আসিতে গেলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন, 'এই দুপুর রোদে আপনি যদি ঠাকুরের টানে আসতে পারেন, তা হলে ঠাকুরের দোর খুলে না দিলে আমাকে যে নরকে যেতে হবে মা।'

'নরক কথাটি দেখিতেছি আমাকে ছাড়িতেই চাহে না। আমি দেবতার দিকে তাকাইলাম। তিনি সেই একই রকম ভাবে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলাম তাঁহাকে। দীর্ঘ দিনের এই পাথরের মূর্তিটির রং বোধকরি কোথাও কোথাও জ্বলিয়া গিয়াছে। গাত্রবর্ণের পাথুরে কালো রংটিও কিছু অনুজ্জ্বল ঠেকিল। তাহার উপরে চন্দনের প্রলেপ ছেড়ে ছেড়ে গিয়াছে। রাধামাধবের হাত পা গোল গোল। তাঁহার সামান্য ভুঁড়ি পর্যন্ত রহিয়াছে। গালগুলি টোপা টোপা। চোখ দু'টি ডাগর। আঙুলগুলিও মোটা মোটা। রুপোর বাঁশিটিও ছোট ও স্থূল। তাঁহার সর্বাঙ্গে পৃথুলতার ছাপ। হাসিয়া ফেলিলাম। এই রাধামাধবের পাশের শ্বেতপাথরের রাধা তাঁহার এই নাদুসনুদুস প্রেমিকটিকে নিয়ে বেশ আহ্লাদেই রহিয়াছে। তাঁহার সারা অঙ্গে সেই আহ্লাদের ছাপ।

‘ঠাকুরমশায়কে বলিলাম, রাধামাধব আর রাধারানির পোশাক বড় জীর্ণ হইয়াছে, এমনকী, রাধামাধবের ধুতিতে তো পোকায় কাটা ফুটো দেখিতেছি। কর্তাদাদাকে বলেন নাই কেন?

‘ঠাকুরমশায় প্রথমে ভয় পাইয়া গেলেন। তাহার পরে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পোশাকগুলি দেখিতে লাগিলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন, নজর যায়নিকো মা। আমি যে শুধু তাহার চরণযুগলই দেখি।

‘চোখ দেখেন না?

‘খুব দীন ভাবে হাসিলেন ঠাকুরমশায়। শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, ওই দৃষ্টি পড়িবে আমার উপরে, ওই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিব আমি?

‘কেন? আপনি তাঁহার পুজো করেন। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন না?

‘পুজো করিবার অধিকার সকলের আছে মা। যে মন্দিরে উঠিতে পারে না, সে অব্দি পুজো করিতে পারে। কিন্তু তাহার দিকে তাকানোর যে সাহস হয় না।

‘আপনি যদি ভক্তি করেন, তা হলে ভয় করেন কেন?

‘এ কি সোজা ভয় মা? এ যে ত্যাজ্য হইবার ভয়। ব্রাহ্মণ হইয়া জমিদারের চাবুকও সহ্য করিতে পারি, সে শক্তি দেয় এই হরির চরণের আশ্রয়ের জোর। কিন্তু যদি এই আশ্রয়টুকু যায়, আর কিছুই যে সহ্য হইবার নয়।

‘অবাক হইয়া ভাবিলাম, চাবুকের কথা উঠিল কেন? চৈত্রের রোদের মতোই কর্তাদাদার প্রতি ভয়টাও সর্বত্র গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে চাবুকও অক্ষয় স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই দুপুরে ঠাকুরের সামনে বসিয়া নিজের অসম্মান ও শরীরের কষ্টটাই ঠাকুরমশায়ের সব থেকে বড় বলিয়া মনে হইল?

‘জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার পরিবার, সন্তানাদি?

‘ঠাকুরমশায় মুখ নিচু করিয়া বলিলেন, ঠাকুরের সামনে বসে ঠাকুরের কথাই ভাবুন মা। এই বুড়ো ছেলের কথা যদি শুনিতে চান, আমি আপনার কাছে পরে যাইবখন।

‘মনে ভাবিলাম, ঠাকুরমশায় হয় খুব কৌশলী অথবা কিছু গোপন করিতে চাহিতেছেন। ঠিক সেই সময়ে বিনোদ আসিয়া বসিল লাল রোয়াকের এক কোণে। এই দুই ভাইয়ের ধুতি পরিবার ঢংটি কেবল ইহাদেরই একচেটিয়া। যেমন স্মার্ট, তেমনই দেখনদার। ধুতিটি গুটাইয়া দুই পায়ের ফাঁকে রাখিয়া কোঁচাটি ছড়াইয়া দিল পায়ের পাতার উপরে। তারপরে হাত দু’টি দিয়া হাঁটু বেড়িয়া যে ভাবে থামে হেলান দিয়া বসিল, তাহাতে তাহাকেও রাধামাধব বলিলে মন্দ লাগিবে না। সে বলিল, ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী গত হইয়াছেন। একমাত্র সন্তান আমাদের সেরেস্তায় কাজ করে। কিন্তু বাপে-ছেলেতে ভাব নেই। ছেলে কলকাতামুখী, কিন্তু বাপ চেয়েছিল সে নিক রাধামাধব সেবার ভার।

‘ঠাকুরমশায়ের পুরো মুখটা লজ্জায় ভরিয়া উঠিল। তড়বড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, মন্দিরে বসিয়া ঘরের কথা আলোচনা করিতে নাই। ঠাকুরের কথা ভাবুন।

‘পাথরের ঠাকুরের চেয়ে এই যে জ্যান্ত ঠাকুরমশায়, তাহার জীবন যে আমাকে বেশি টানিতেছে, তাহা আমি আর বিনোদ হাসিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। ঠাকুরমশায় মরিয়া হইয়া বলিলেন, পাপ হইবে।

‘কীসের পাপ? সেই পাপের প্রতিকারই বা কী?

‘এ বার ঠাকুরমশায় বলিলেন, এই দেখুন মা, কথায় কথায় কেমন রোদ ঢলে পড়েছে, চৈতের হাওয়া উঠিয়াছে। এই হইল রাধামাধবের লীলা। আপনি রোদ পার করে এলেন তাঁকে দেখিতে, তিনি রোদ সরাইয়া নিলেন। আপনি

রোদে দগ্ধ হইলেন, তিনি বাতাস আনিয়া দিলেন। এই তাঁহার দয়ার প্রকাশ। সেই প্রকাশটিরই পুজো করিতে হয় মা। তিনি তো থাকেন দূরে। এই আলো হাওয়ার মধ্যে নিজের রেশ রাখিয়া যান।

'আমার মনটি লহমায় নরক হইতে স্বর্গের দিকে চালিত করিয়া দিলেন তিনি। কোথা হইতে এক ঝলক বাতাস আসিয়া আমার শরীর জুড়াইয়া দিল। আমি প্রাণভরে প্রণাম করিলাম রাধামাধবকে। এ বার দেখিলাম তাঁহাকে, যে রূপ আমি দ্বিপ্রহরে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভক্তি হয় নাই, তাঁহার দীন রূপ, দীন বাস বড় চোখে লাগিয়াছিল, সেই কথা মনে পড়িয়া আমার মনটা এ বার ধিক্কারে ভরিয়া গেল। এইবার বিকালের আলোয় তাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি কী মনোহর! এই বিকেলের আলোয় কিছু অন্ধকারও সন্ধ্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে, সেই হততেজ আলোয় তাঁহার পোশাকের মালিন্য আর দেখা যাইতেছে না। এই আলোয় কিছু অতিরিক্ত রংও যুক্ত হইয়াছে। তাঁহার চোখেমুখে অস্তরাগের সেই রং গলিয়া পড়িতেছে। এই বার তিনি অপ্রতিরোধ্য ভাবে সুন্দর। মনে হইল, যেন আমার মনের কথাটুকু টের পাইয়া আলো বুনিয়া বুনিয়া নিজেকে সহসা অলক্ষ্যে সাজাইয়া নিয়াছেন। গোটা বৈকালটাকেই নিজের সাজের অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই যেন দেবতার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। ইহা তো প্রেমিকেরও স্বাক্ষর। আর তখনই রাধারানির দিকে তাকাইয়া দেখি তিনি যেন কটাক্ষে বিদ্ধ করিলেন আমাকে, বলিলেন, দেখো দিকি, আমার এই প্রেমিকটি তোমাকে কেমন ভুলাইয়া দিয়াছে, এই বার তাঁহার কোলে আশ্রয় লইতে এসো।

'দেখিলাম আকাশ ও বাতাস তাহাতে সঙ্গত করিতেছে। রোগা, ঢ্যাঙা আমাদের ঠাকুরমশায় নিচু স্বরে বলিয়া চলিলেন, রাধামাধব সব সময় বড় কৃতজ্ঞ মা। তাঁহার কাছে কেউ এলেই তিনি খুশি। আর তাহার প্রকাশও তিনি না ঘটাইয়া থাকিতে পারেন না। খুশি হবেন না-ই বা কেন? তিনি তো একটি পাথরের উপরে চোখ-মুখ আঁকা পুতুল। তাঁহার কাছে জীয়ন্ত মানুষ কেন আসিবেন মা? তবু যে আসে, তাহাতেই তিনি জাগিয়া উঠেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকিলে তিনি আর দেবতা থাকেন না। পাথর হইয়া যান। আপনি আসায় দ্বিপ্রহরে তিনি দেবতা হইয়াছেন। তাই বাতাস উঠিয়াছে। তাপ কমিয়াছে। তিনি নিজের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

'ঠাকুরমশায়ের কথা শুনিতে ছিলাম নিবিষ্ট হইয়া। বুঝিতে পারিলাম, এই বৃদ্ধ ঠাকুরমশায় এই দেবতার সহিত নিয়ত নানা কথা বলিয়া থাকেন। এই দেবতা তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার অনিবার্য শর্ত।

'আর তৎক্ষণাৎ অকস্মাৎ বোধ হইল, এই করিয়া এই ঠাকুরমশায় এই পাথরের দেবতাকে প্রাণদান করিয়াছেন। তাকাইয়া দেখিলাম রাধামাধবের দিকে। রাধামাধবের হাসিটি আমার মনে দৃঢ় হইয়া বিঁধিয়া গেল। সকলের অগোচরে এই মন্দিরটিতে কখন যে এই দেবতা প্রাণ পাইয়াছেন, তাহা ঠাকুরমশায় ছাড়া কেহই জানিতে পারেন নাই। এই মন্দিরটির কর্তা আমাদের কর্তাদাদা জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারেন নাই এই জনপদের কেহ। আমার স্বামী অনেকদিন এই মন্দিরের সামনের ছোট মাঠটিতে শুইয়া থাকিতেন, তিনিই সম্ভবত এই ঠাকুরমশায়ের মনে এই সব তত্ত্ব কথার প্রতিষ্ঠাকর্তা। তিনিই হয়তো ঠাকুরমশায়কে বুঝাইয়াছেন, এই রাধামাধবকে ঘিরে থাকা কাহিনিগুলিই রাধামাধবের প্রাণ। সে কথা নিয়ত যপ করেন এই ঠাকুরমশায়। আর তাহা করিতে করিতে তিনি ছাপাইয়া গিয়াছেন আমার স্বামীর কাছ হইতে আহৃত ইংরেজি বিদ্যার শিক্ষাটুকু। তিনি এই দেবতাকে সত্যিই প্রাণ দিয়াছেন। কাহিনির ঝর্নারও আজ আর ঠাকুরমশায়ের দরকার নেই। কিন্তু সেই কথাটি আর কেহ জানিতে পারেন নাই। আজ, আচমকা এক রৌদ্রতপ্ত দিনে আমার কাছে তাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

'আমার প্রতি তাঁহার এই দয়ার কারণ আমি জানি না। কিন্তু এ টুকু বুঝিতে পারিলাম, বহু দিন আগে আমার স্বামী যে বলিয়াছিলেন 'আমি স্ববশ', তাহা এই ঠাকুরমশায়ের ক্ষেত্রেও খাটে। তিনিও স্ববশ। তিনিও এই দেবতাকে অর্জন করিয়াছেন। এই দেবতাই তাহাকে সেই পরিসর দিয়াছে। এই দেবতা তাঁহার নিজস্ব দেবতা। আর তিনি

সেই মন্দিরের দ্বারটুকু খুলিয়া দেন বলিয়াই, সেই দেবতা আজ আমার কাছেও জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই দীনহীন অল্প শিক্ষিত ঠাকুরমশায়কে এই যে অপরিসীম দয়া, তাহাতে এই দেবতার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত রহিল না। আমি তাহাকে বলিতে পারিলাম না, আমাকেও স্ববশ করো ঠাকুর, আমাকেও স্ববশ করো। আমার ইচ্ছা করিল তাঁহার বশ হইয়া থাকিতে। মাথা কুটিতে ইচ্ছা করিল। ক্রমশ দেখিলাম আমার নিজেকে হীন নিজেকে দীন বলিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তীব্র হইতেছে। এই কি দেবতার দান? সব অহঙ্কার কাড়িয়া লইবার মধ্যে কি দয়া লুকাইয়া থাকে? তাই কি তিনি আমার কাছ হইতে নিজের কথা বলিবার অবকাশটুকুও কাড়িয়া লইতেছেন? কাড়িয়া লওয়ার এই যে দান, তাহাতে তিনি আমাকে তাঁহার অধিকারের অন্তর্ভুক্তও করিতেছেন। ইহাতে আমার মন ব্যাকুল হইল, আনন্দে ভরিয়া উঠিলাম। কোনওমতে মাথাটি নামাইয়া আস্তে আস্তে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চরণযুগল ছাড়া আর কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না।

'কালবৈশাখীর ঝড় আসিয়া পড়িল। চারিদিক ছিন্নভিন্ন করিয়া বজ্রপাত হইতে লাগিল। মন্দিরের সামনের মাঠে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মাঠের ধারের গাছগুলি নড়িয়া, দুলিয়া যেন নটরাজের নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিতে লাগিল। ঝড়ের শব্দের সহিত আসিয়া মিলিল জলের শব্দও। মন্দিরের গা বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আকাশ মেঘে ঢাকা। আলো কমিয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যেই দেখিলাম, বিনোদ চুপটি করিয়া ঠিক যেমন ভাবে বসিয়া ছিল, তেমন ভাবেই বসিয়া রহিয়াছে। এই ভীষণ ঝড়ের দিনেও তাহার মুখটি মন্দিরের দিকে। সেও কি দেবতার প্রাণের খবর পাইয়াছে? সেও কি এমনই করিয়া প্রণিপাত করিতেছে? ঠাকুরমশায়কে দেখিলাম রাধামাধবের সামনে প্রদীপটি জ্বালাইয়া তাহার সামনে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই বার ওই প্রদীপখানির আলোয় দেখিলাম রাধামাধবের মুখটি টলটল করিতেছে। তিনি যেন আরও একটি নতুন রূপের প্রকাশ ঘটাইতেছেন। শুধু তাঁহার চোখ দু'টি যেন জাগিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, তাঁহার অস্তিত্ব যেন শুধু ওই দৃষ্টিটুকুতেই ভর করিয়া রহিয়াছে। দীপ নির্বাপণের পরে অন্ধকার হইবে। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন। তাহার দৃষ্টিটি জাগিয়া থাকিবে। বাহির মাতিয়া থাকিবে বৃষ্টিতে, ঝোড়ো হাওয়ায়। কী আনন্দ। এ বার আর দোর বন্ধ হইল কি হইল না, সে কথা উঠিবে না। বৈকাল কি সন্ধ্যা সেই কথা উঠিবে না। তিনি জাগিয়াই থাকিবেন। নিরন্তর।

'মনে পড়িয়া গেল একটি গান। ঠাকুরঝি গাইতেন—'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান? ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।' এই হল কথার মতো কথা। যদুনন্দন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ব্রজ। তিনি নেই, আর বেঁচে থাকা, মরে থাকার কী বা অর্থ হয়? তারপরেই মনে হল, তবু ব্রজ তাঁকে হারায়নি কখনও। তাঁরা তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি দৃষ্টিপাত করতেন, দূর থেকে, সেই অভিঘাতে উপস্থিতিও প্রকাশ্য হয়ে যেত না কি?

'এই রাধামাধবও তেমনই রহিবেন। প্রেমের প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ় হইল।'

সেই রাতে শিবু সর্দার গিয়ে ক্ষণপ্রভা এবং বিনোদবিহারীকে ঝড়জলের হাত থেকে রক্ষা করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরমশায়কে ডেকে এনে ভর্ৎসনা করেছিলেন কর্তাদাদা। বলেছিলেন, আকাশ দেখে বোঝোনি, ঝড় উঠবে? রাধামাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলে বুঝি! দেবতার মুখে কি আকাশের খবর লেখা থাকে?

৭
দিয়া ধরে ধরে দেখে

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, ওই ঠাকুরমশায়ের ছেলে এখনও বেঁচে রয়েছেন। ঠিকানাও দিলেন। একদিন তাঁর কাছে গেলাম। ভদ্রলোকের প্রচুর বয়স হয়েছে। ইনিও ওকালতির কাজ করতেন। পসারও করেছিলেন। দোতলা বাড়ি করেছেন। সামনে একটু বাগান। বাগানের মধ্যে ছোট বসার জায়গাও রয়েছে। সেখানেই বসতে বললেন। ইনিও লম্বা। নিচু স্বরে কথা বলেন। তখন বিকেল। মাথাটি তুলে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

তারপরে খুব আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন, সেই সন্ধ্যার কথা আমার খুব মনে রয়েছে। প্রচণ্ড ঝড় জল হয়েছিল। বাবা অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্তাদাদার সামনে। কর্তাদাদা খুব বকাবকি করছিলেন বাবাকে। বাবা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা মাত্র করেননি। কর্তাদাদা ভুলে গিয়েছিলেন, যাঁকে তিনি বকছেন, তাঁর পুত্রই একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ যেন ডবল শাস্তি। বাবা আর আমিই থাকতাম। বকাবকির পরে আমি ঘরে ফিরে গেলাম। বাবা শীতলভোগ দিতে মন্দিরে চলে গেলেন। ফেরার সময় পিছল পথে পড়ে গিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক ছিলেন। কোমরে লেগেছিল। ওই ভাবেই পড়েছিলেন বেশ কিছু ক্ষণ। অত রাতে কে আর তখন সেখানে যাবে। শিবু সর্দারের অবশ্য সর্বত্র গতিবিধি ছিল। অন্ধকারেও তার অনেক চোখ জ্বলজ্বল করত। শিবুই বাবাকে একরকম কোলে তুলে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, রাতের রান্না হয়নি বলে।

--এই অন্যমনস্কতা কি কর্তাদাদার ব্যবহারে?

--তা ছাড়া আর অন্য কিছু হতেই পারে না। তিনি সব থেকে ভয় পেতেন অসম্মানকে। সত্যি সত্যি ভয়ই পেতেন। আর কর্তাদাদা সেইটাই করতেন তাঁর সঙ্গে।

--অভাব নিয়ে কোনও অনুযোগ ছিল না?

--না। সে সবকে তিনি গুরুত্বই দিতেন না। বরং দারিদ্র একটু সম্মানের বলেই মনে করতেন। স্বপাক আহার করতেন। আমি তাঁর রান্নাই খেতাম। কিন্তু অনেক সময় জমিদার বাড়ির পাকঘরেই খেয়ে নিতাম। সেখানে রোজ নানা ভালমন্দ রান্না হত। জমিদাররা বামুন, তাঁদের রান্নার লোকও বামুন, ছোঁয়াছুঁইর বিচারও ছিল ষোলো আনার উপরে আঠরো আনা। কিন্তু বাবা সেই উপনয়নের সময় থেকে স্বপাক খেতেন, সেই অভ্যাস ছাড়েন বিয়ের পরে। মা চলে যাওয়ার পরে আবার স্বপাকের অভ্যাসেই ফেরেন। তা নিয়ে কিছু বিলাসও ছিল। ভাতের পাতে প্রথমে ঘি আর তারপরে শাক থাকতই থাকত। কলমি শাক, সুজনি শাক ভাজা করতেন চমৎকার। পলতা শাকের বড়া করতেন। বর্ষাকালে আবার সে সব খেতেন না। বলতেন জলের শাক, খেতের শাক, জলের ধারের শাক বর্ষায় খাই না। তখন আমাদের হত মাচার শাক। পোস্ত দিয়ে বা স্রেফ সরষের তেল কাঁচালঙ্কা দিয়ে তাঁর লাউ শাক সেদ্ধ অনেক সুখাদ্যের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারত। পুঁই শাকও কুমড়ো দিয়ে মাখোমাখো ভাবে রান্না করতেন। এক এক দিন ভোরের বেলা গঙ্গা স্নানের পরে মাছ নিয়ে ফিরতেন। সে দিন ছেলেমানুষের মতো করেই আমাকে বলতেন, 'আজ কিন্তু তুই আমার কাছেই খাবি। খাবার সময় একেবারে পালাবি না।' আমি জানতাম, বাবা খুব কড়া করে মাছটি ভেজে সামান্য তেল মশলা দিয়ে রান্না করবেন। নিজস্ব রেসিপি কিছু একটা ছিল। এক ধরনের শাকপাতাও দিতেন। তা খেতে খারাপ, তা বলছি না, সে স্বাদ

আজও আমার মুখে লেগে রয়েছে। কিন্তু জমিদারবাড়ির রান্নার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মাছ, মাংসের কথা উঠলে মোক্ষদা অনেক বড় রাঁধুনি। শুধু তাই নয়, ওই মাছটি খাওয়ার পরে বাবা সারা দিন ধরে জিজ্ঞাসা করে যেতেন, 'কেমন রেঁধেছি, তা তো বললি না!' বাবা বুঝতে চাইতেন না, আমি বড় হয়েছি। তিনি বুঝতে চাইতেন না, তিনি জীবন বলতে যা বোঝেন, তার বাইরেও জীবন হতে পারে।

--আপনার বাবা বৈষ্ণব ছিলেন না?

--না তো। বাবা প্রধানত পুরোহিতই ছিলেন না। তিনি নিজেকে পুরোহিত বলে মনেও করতেন না। তিনি একটি কাব্য লিখছিলেন। নিজেকে কবি মনে করতেন। তাই পুরোহিতের চেয়ে বাড়তি সম্মান আশা করতেন। এমনকী, পৌরোহিত্যের কাজে স্বাভাবিক ভাবেই যে সব ভুলচুক করতেন, তা তাঁর ওই কবিজনিত সম্মানের কারণেই মাপ করে দেওয়া হবে বলে আশা করতেন। জমিদার বাড়ির পারিবারিক ঠাকুরঘরটি ছিল প্রাসাদের মধ্যেই। তার পুজোটি করতেন কর্তাদাদা নিজেই। কখনও কখনও কর্তামা। তাতে প্রদীপ জ্বালতেন ক্ষণপ্রভাও। একবার গৃহত্যাগের সময় ক্ষণপ্রভা সেই মন্দিরেই মাথা ঠুকে প্রণাম করে গিয়েছিলেন। সেখানে বাবাকে ঢুকতে দেওয়া হত না। বাবাও জানতেন, তাঁর স্থান বাইরের মন্দিরে।

--তিনি যে কাব্য লিখতেন, সেটা কর্তাদাদা জানতেন?

--জানতেন তো বটেই, কিন্তু উৎসাহ কিছু ছিল না। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। গ্রাম্য কবি-সাহিত্যিকদের উপরে তাঁর তেমন ভক্তি ছিল না। তাঁর বড় ছেলে বিপিনবিহারীর সঙ্গে বাবার অবশ্য অনেকটা বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। তাঁর সঙ্গে তিনি কাব্যটি পড়ে শোনাতেন। তিনি কাব্যটি পড়ে হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন।

--সে কী!

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, কাব্যটি সম্পর্কে বিপিনবিহারী দুলালচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, ''এই এক আশ্চর্য কথা। খুব সরল আচরণ কেবল কিছু ভাবকে মরিয়া হইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আর তাহাতেই কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। তাহা যিনি লিখিতেছেন তিনিও জানেন, যিনি পড়িতেছেন তিনিও। যেন ভাবের সাম্রাজ্য। রাজশক্তির মতো তাহা সব কিছু দমন করিয়া অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাবই সত্য, জীবন সমুদ্রে আর কিছু নাই। কিন্তু ভাব যে কালে কালে বদলাইয়া যায়, তাহাও যেন ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া থাকে কথক ও শ্রোতা।''

দুলালচন্দ্র কী উত্তর দিয়াছিলেন, সেই চিঠি পাইনি। তবে কিছু একটা লিখেছিলেন, যার উত্তরে বিপিনবিহারী এরপরে লিখলেন, ''ঠাকুরমশায় একটি কাল্পনিক স্বর্গ রচনা করিয়াছেন। যেখানে গোড়ার দিকে দেবদেবীরা কলকাতার বড়লোকদের মতো আচরণ করে। তাহাদের বাড়িগুলোও ইংরেজদের বানানো প্রাসাদগুলোর মতো। আর তার মধ্যে পড়ে এক বালক, শুধু ভক্তির জোরে যার স্বর্গলাভ হয়েছে। প্রতিবার তর্কযুদ্ধ হয়। আর ওই বালকেরই জিৎ হয়। কথা হইল, এখানে ভক্তি এমন একটি ভাব, কাব্যে যাহার প্রতিষ্ঠা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেবতারা পরাজিত হইয়াও তাই খুশি হন। কিন্তু বর্তমানে কাব্যটি মোড় লইয়াছে। ঠাকুরমশায় পেগান হইতে হেদান হইতেছেন। এ বার একজন দেবতাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ হইয়া উঠছেন, যাঁহার সঙ্গে কর্তাদাদার খুব মিল। একটি বিদ্রোহী দেবতাও রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার মিল পাই। তবে সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেবতাটি সব থেকে বেশি নাস্তানাবুদ হচ্ছেন এক অলৌকিক শক্তিধরের কাছে।''

--তিনিই রাধামাধব?

--ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, ঠিকই ধরেছ। অতএব এটাও বুঝতেই পারছ, সরল পয়ারে লেখা এই কাব্যটির রচনাশৈলী যত দুর্বল ছিল, তার দার্শনিক মূল্য ছিল তার থেকেও কম। বিপিনবিহারীর মতো শিক্ষিত মানুষের তাতে হেসে ফেলায় দোষ হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও সত্যি যে, ওই কাব্যটি ছিল বাবার নিজস্ব জগৎ। বাবা তাঁর রাগ দুঃখ অভিমান সেই কাব্যে ঢেলে দেওয়ায় বাস্তবে তিনি ক্রমশ বিনয়ী হয়ে উঠছিলেন। যে রাগ তাঁর প্রকাশ্যে দেখানোর কথা, তা তিনি কাব্যেই প্রকাশ করতেন আর মনে করতেন, সে সব পড়ে লোকে তাঁর মনের কথা জেনে যাবে। সব থেকে বড় কথা, ওই কাব্যটি ছিল তাঁর আবেগ প্রকাশের জায়গা। এটা খুবই স্বার্থপর একটি কর্মকাণ্ড।

কী আশ্চর্য, বিপিনবিহারী ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন। দুলালচন্দ্রকে তিনি লিখছেন, ''কাব্যের একটি নিজস্ব গতি থাকে। তাহার নানা চরিত্র-পরিবেশের নিজস্ব দাবি-দাওয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে কেহ যদি কেবল একটি ভাবের কথাকে আঁকড়াইয়া রহিয়া বাকি সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করেন, অন্য চরিত্রগুলিকে প্রস্ফুটিত হইতে না দেন, তবে তিনি লেখকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন না। তিনি নিজের অনুভূতির স্বার্থপর বিস্তার ঘটাইতেছেন।''

বিনোদবিহারীর ছেলে আমার কাছ থেকে এই পর্যন্ত বৃত্তান্ত শুনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন। তিনি বললেন, ঠাকুরমশায়ের ছেলেকে আমি চিনতাম। এখন অনেক কাল আর কোনও সম্পর্ক নেই। ঠাকুরমশায়কে কখনও দেখিনি। কিন্তু একটা কথা বলি, লেখকদের সব থেকে বড় গুণ হল, অনুভূতির যত্ন নেওয়া। সেটা নিজের আবেগও হতে পারে, তার চরিত্রদের আবেগও হতে পারে। আর চরিত্রগুলির উপরে নিজের একটা প্রভাব থাকে। লেখক যে ভাবে যে চরিত্রকে দেখছেন, বুঝছেন, সে ভাবেই তো তার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন।

বিপিনবিহারীকে লেখা দুলালচন্দ্রের এ বারের চিঠিটিও পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিপিনবিহারী সেই চিঠি পেয়ে তাঁকে যে প্রত্যুত্তরটি দেন, তা থেকে বোঝা যায় দুলালচন্দ্র বিনোদবিহারীর ছেলের মতোই ভেবেছিলেন। বিপিনবিহারী লিখছেন, ''তোমার কথা কিছু দূর পর্যন্ত ঠিক। ঠাকুরমশায় তাঁর কাব্যে নিজের প্রতি যত্ন লইয়াছেন। তোমার সঙ্গে আমি এ বিষয়েও সহমত যে, ইহা কোনও খারাপ কথা নয়। সব থেকে বড় কথা, কেউ যদি তাঁর রাগ, দুঃখ, আবেগ নিজের লেখায় ঢালিয়া দেন, তা হলে তাঁর লেখা ভাল হইতে বাধ্য। কিন্তু সবটাই যদি সেই লেখকই হইয়া ওঠেন, সবটাই যদি কোনও একটি ভাবকেই শুধু আকর্ষণ করে তাহা হইলে হায়, লেখকের স্বার্থটুকুই কেবল বড় হইয়া ওঠে, সব ছাপাইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত রচনাটি তাহার নিজস্ব মনোবাসনার একটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়া থাকে। সেই কাব্য মন্দ কাব্য।''

বিনোদবিহারীর ছেলে আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে বললেন, কাশীর হরিদাস বাবাজির সঙ্গে গ্রামের ঠাকুরমশায়ের এইটিই পার্থক্য ছিল। তিনি কৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতেন। তাতে বেশ সাহিত্য তৈরি হত।

--তিনি কে?

--তাঁর অনেক কথা। তুমি যে সব চরিত্রের খোঁজ করছ, তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গে হরিদাস বাবাজির সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তার আগে এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর আচরণে যে দেবতার প্রতি ভক্তি ফুটে উঠত, তিনি পদাবলির কৃষ্ণ। পদাবলির প্রধান যে গুণ, ভক্তিবিলাস আর তার অঙ্গ হিসেবে

কাব্যের ব্যবহার, সেই ছিল তাঁর আরাধনা। তিনি ভক্তির এই দায়িত্ব পালন করতেন। তাতে আশেপাশের সব কিছুই স্বরূপে প্রকাশিত হত। তবে কাব্য রচনার চেষ্টা করেননি। কাব্যের রসগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু গ্রামের ঠাকুরমশায়ের প্রতিও আমার ভালবাসা রয়েছে। ইনি সেই গ্রামের কবি, যিনি যুগ যুগ ধরে সামান্য সম্মানের আশায় কাব্য রচনা করেছেন। তার কোনও কাব্য উতরেছে, কোনওটা উতরোয়নি।

--আপনি যে কথাগুলো বললেন, তা বিপিনবিহারীর পক্ষেও তো বলা সম্ভব ছিল। তিনি হাসলেন কেন? বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, বিপিনবিহারী বিপিনবিহারী হলেও তাঁর ধাঁচ কর্তাদাদার মতো। ক্ষণপ্রভা ঠাকুরমশায়ের ভক্ত ছিলেন। রুচির এই অমিলটাই কর্তাদাদার পরিবারের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছিল।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে কিন্তু এমন তিনটি বাক্যে ছেড়ে দিলেন না। তিনি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, বৌদিদিমণির চিঠিতে বাবার কথা পড়ে তোমার তাঁর প্রতি একটা সহানুভূতি তৈরি হয়েছে। দরিদ্র, অক্ষমদের প্রতি যেমন সহানুভূতি মানুষের হয়, তেমনই। তোমার মনে হচ্ছে, সুদূর গ্রামের একটি রোদে ভেজা মন্দিরের লাল মেঝেতে বসে একটি ঢ্যাঙা কালো লোক আপন মনে কাব্য রচনা করে তা তাঁর দেবতাকে নৈবেদ্য স্বরূপ অর্পণ করছে। গানও গাইতেন। যেমন তিনি একটি মহাজনী পদ গাইতেন, 'হাত দিয়া দিয়া মুখানি মুছায়া, দিয়া ধরে ধরে দেখে'। বাবাকে আমি দেখেছি সত্যি সত্যিই খুব যত্নে রাধামাধবের মুখটি মুছিয়ে দিতে। রাধারানির নয় কিন্তু, রাধামাধবের। সন্ধ্যারতির সময় দীপটি জ্বেলে তিনি রাধামাধবের দিকে অপলকে তাকিয়েও থাকতেন। রাধার প্রতি মাধবের যে প্রেম, তা তিনি এই ভাবে সঞ্চারিত করে দিতেন মাধবের প্রতি তাঁর প্রেমে। রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই প্রেম গ্রামের মানুষের কাছে খুব প্রিয় ছিল। আমিও সেই ছোটবেলাতে গানটির কথায় মগ্ন হয়ে যেতুম। কল্পনা করতুম, রাধারানির মুখটি কত যত্নে মুছিয়ে দিচ্ছেন কানাই। এই কল্পনাটির মধ্যে সাহিত্যবীজ রয়েছে, তাই আবেগকে আকর্ষণ করার শক্তিও রয়েছে। বাবার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। তোমার কল্পনায় বাবাও সাহিত্য সংসর্গ তৈরি করে ফেলেন। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলার গ্রামের প্রতি তোমার ওই সাহিত্য থেকে পাওয়া এক ধরনের স্মৃতিমেদুরতা। কিন্তু আমার রাগও সেখানেই। বিনোদবিহারীর ছেলে ঠিকই বলেছে, বাবাও যে সেই সম্মানটুকুই কেবল আশা করত, যার আধখানা মানুষের কল্পনা থেকে পাওয়া যায় আর বাকিটা নস্টালজিয়া থেকে উঠে আসে। তাহলে হিসেব করে দেখ, কেবল উপস্থিতিটুকু ছাড়া বাবার আর কোনও অবদানই নেই। তিনি মিছিমিছি এই সম্মানটা পাচ্ছেন। আর সেটাকে তিনিও সত্যি বলে ধরে নিচ্ছেন।

কিন্তু এই গান তো সকলে জানেন না। তার উপরে এই গান গাওয়া, অনুভূতির প্রতি এই এতখানি দরদ, এ তো সত্যিই খুব বড় কথা।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, আমি অনেক সময় দুপুরবেলা এ পাড়া, সে পাড়া ঘুরে বেড়াতাম। বাবা আমার কোনও খোঁজই রাখতেন না। আমি কখনও একা একা গঙ্গা স্নান করতে যেতাম। শিবু সর্দারের কোনও শাগরেদ বাবাকে খবর দিলে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গঙ্গার পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর ওই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমি নদী থেকেই দেখতে পেতাম। চারপাশে ভরা গঙ্গা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার উপরে বিরাট আকাশ। তার মধ্যে ওই একটি লোক ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে, সে আমার মুখখানি দেখতে চায়, সে চায় আমি বেঁচে উঠে আসি, এটা যে আমাকে কত বড় শান্তি দিত, তা বলতে পারব না। এই বুড়ো বয়সেও আমার সেই বাবার জন্য মনটা আনচান করে। আমি নিজে

বাঁচব বলে বাবাকে ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি, বাবা গ্রামে চলে যাওয়ায় আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কলকাতায় ফিরে বহু কষ্ট করে ফের পড়াশোনা শিখি, পরে ওকালতি শিখি। তার পরে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়েছি জীবনে। এই গোটা জীবনে যতবার ঠোক্কর খেয়েছি, তত বার মনে হয়েছে, ওই মাঝ নদীতে ভেসে চলেছি জোয়ারের প্রচণ্ড টানে, আর ওই লোকটি, আমার বাবা, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঝুঁকে পড়ে।

--আপনার কথা থেকে মনে হয়, বাবাকে আপনি খুবই ভালবাসেন। তবুও আপনার রাগ যায়নি কেন?

--রাগ এইখানে যে, ওই নদীতে মৃত্যু শিয়রে নিয়ে ভেসে যেতে যেতে আমি জানতাম, যদি আজ সত্যিই আর টানতে না পারি, যদি ডুবে যাই, তা হলে আমাকে বাঁচাতে পারে কেবল শিবু সর্দার আর তার দলের লোকেরা। বাবা নন।

--সে তো সকলের বাবাই কোনও না কোনও ভাবে সন্তানদের রক্ষা করতে অক্ষম।

--কিন্তু আমার বাবা কেবল নিজের আবেগেরই যত্ন নিতে পারতেন। আর কোনও যত্নই যে তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না—এটা সারা জীবনে ভুলতে পারিনি। আমি যখন একা একা দুপুরে ঘুরে বেড়াতাম, কখনও বাবার সঙ্গে দেখা হত। তিনি যেন ভূতে পাওয়া অবস্থায় এ রাস্তা দিয়ে ও রাস্তায় যাচ্ছেন। আমাকে সামনে দেখলে বলতেন, ঘরে যেতে, রোদ লেগে যাবে। কিন্তু আমি সত্যিই ঘরে যাচ্ছি কি না, তাঁর খোঁজ করতেন না। রাতে ঘরে ফিরে বাবা আমাকে নানা গল্পকথা বলতেন, তাঁর কী দেখে কী মনে হল, সে সব বিস্তারিত ভাবে বলতেন, সেই বিবরণের মধ্যে কতটা সাহিত্যগুণ থাকছে, তা-ও তাঁর মতো করে খেয়াল রাখতেন। সেই সাহিত্যগুণ আমি বুঝতে পারছি কি না, সে দিকেও তাঁর নজর থাকত। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ত, আমি ঠিক মতো খেয়েছি কি না।

--অর্থাৎ, আপনি অনুভূতির যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি আপনার শরীরের যত্ন নেওয়ার দাবিও করতেন।

--করাটা ভুল ছিল না। আমি ছাড়া তাঁর আপনার আর কে ছিল? আমারই বা কে ছিল? বাবা সে দিকে নজর দেননি। বাবা শুধু একটা প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার আসনকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। যা তিনি নিজে অর্জন করেননি।

--আপনি নিশ্চয়ই এ কথা বলছেন না যে, আপনার বাবা জীবনটা নাটক করে কাটিয়েছেন।

--আমি ঠিক উল্টো কথাটাই বলছি। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বিলাস এবং তাঁর অর্জন এ সবই ওই গ্রামের সমাজের মর্যাদার নিজস্ব মাপে মেপে দেওয়া একটা বাসস্থান। অর্থাৎ, যে লোকটার নাটক করার কথা, সে লোকটা নাটকটাই করছে না।

৮
রাখিবে প্রমোদে ভরি

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, এই যে ঠাকুরমশায় নাটকটা করতে পারতেন না, তিনি মাপ মতো আচরণ করতেন আর সেটুকু করতেই তাঁর দম বেরিয়ে যেত, তাতেই তাঁর প্রতি ভালবাসার অন্ত ছিল না ক্ষণপ্রভা এবং বিনোদবিহারীর। ক্ষণপ্রভা একদিন দুপুরে ঠাকুরমশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন নরকের কথা।

কিন্তু তারপরে নিজেই দুলালচন্দ্রকে লিখছেন, ‘একদিন মন্দিরে বসিয়া ছিলাম, ঠাকুরমশায় আরতির আয়োজন করিতেছিলেন। সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে বিনোদও আসিয়া বসিল। মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া দেখিতে পাইলাম, ভিতরটি আলো-অন্ধকারে কেমন রহস্যময় হইয়া উঠিল। রাধামাধব কি আবার কোনও অলৌকিক তৈয়ার করিতে চলিয়াছেন? এ বার মনোরম একটি সন্ধ্যা বুনিবেন? তবে ইহা আর যাহাই হউক নরক নয়। তিনি একবার উপস্থিত হইবামাত্র নরক সম্বন্ধে চিন্তা পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই ঠাকুরমশায়ের কাছ হইতে নরক লইয়া কিছু জানা যাইবে না। কিন্তু আমার যে নরক চাই। না হইলে রাধামাধবের শক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইবে কী করিয়া?

‘বাড়ি আসিবার পথে বিনোদকে আমার ভাবনার কথা বলিলাম। তাহাতে আমার জন্য তাহারও খুব ভাবনা হইল। সে কহিল, নরকের সম্বাদ তাহার বিশেষ জানা নাই। কিন্তু একজন বিলাত ফেরত পণ্ডিত রহিয়াছেন, যিনি বেশ জানেন। বিনোদ আমাকে বুঝাইল, নরকের সঙ্গে শাস্ত্রের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু শাস্ত্রের সহিত সমাজেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে কারণে মিলটনের লুসিফার যে নরকে গিয়া পড়ে, দান্তের নরক তাহা হইতে একেবারেই পৃথক। বাঙালির ও ভারতবাসীর নরকেও কিছু পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া সে আমাকে জানাইল। তাহার পরে কহিল, ওই পণ্ডিত আমাকে নরক সম্পর্কে সম্যক বুঝাইতে সক্ষম। তাঁহার কাছে আমাকে লইয়া যাইতেও রাজি হইল। কর্তাদাদা তাহাতে সম্মতি দিলেন। অতএব, বিনোদের সহিত কলকেতা রওনা হলুম। শিবু সর্দারের নৌকা কলকেতার ঘাটে ভিড়িবার পর আহিরীটোলার বাড়ি যাইব বলিয়া এগোতেই শুনিলাম, আমার স্বামী মহোদয় সেখানে নাই। তিনি কোনও একটি থিয়েটারের রেহের্সালে ব্যস্ত। আমি সে কথা শুনিয়া বিনোদকে বলিলাম, এই বৈকালের কলকেতার রূপই দেখিব। এখন ফাঁকা বাসায় যাইব না। তিনি ফিরলে আমরা ফিরব।

‘বিনোদ তখনই আমাকে লইয়া চলিল ওই পণ্ডিতের বাড়ি। বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাট ঝকঝক করিতেছিল। লোক কম ছিল। একটু ঠান্ডা ভাবও ছিল। আমার মনটি শান্ত হইয়া গেল। শিবু সর্দার একখানি সরেস দেখিয়া ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করিয়াছিল। সেটির বসিবার বন্দোবস্ত বেশ ভাল, কিন্তু মূল কথা হইল, জানলাগুলি বড় বড়। আমি জানলা খুলিয়াও দিলাম। বিনোদ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু বাধাও দিলে না। পথে লোক সমাগম কম ছিল। কিন্তু যাহারা আমার শ্রীমুখখানি জানলার বাহির হইতে দেখিতে পাইলেন, তাহারা খুবই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাহারা আমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই তাহাদের নিশ্চয়ই মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটি নির্ঘাত নরকে যাইবে।

‘আমি অবশ্য অন্তত তখনকার মতো বিনোদের সেই পণ্ডিতের বাড়িই গেলাম। ওই পণ্ডিতও সন্ধ্যাবেলা আমাকে দেখিয়া আমার একই গতি নির্দেশ করিবেন কি না, তা নিয়ে চিন্তিত হইলাম। বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, এমন আশঙ্কা তাহারও মনে হয় নাই, তাহা নয়। তবে পণ্ডিতটি বিলেতে বেশ কিছু দিন ছিলেন। সে নিশ্চয়ই বিষয়টি অ্যাপ্রিশিয়েট করিবে, এমন আশাও তাহার রহিয়াছে।

‘কলকেতার বাড়িগুলি পরিসরের অভাবে গ্রামের আমাদের বাড়ি হইতে ছোট ছোট। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। বরং আহ্লাদের বিষয় হইল, বাড়ি যতই ছোট হউক, তাহাতে অলঙ্করণের আয়োজন কিছু না কিছু থাকিবেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, রবিবাবুর লেখায় কলিকাতার একটি মনোরম দৃশ্য ছিল। চোখের বালির আশা যে বাড়িতে প্রতিপালিত হইয়াছিল, শ্যামবাজারের সেই অনুকূলবাবুর বাড়িটির দক্ষিণের দোতলার বারান্ডা রহিয়াছে। সেই

বারান্ডার নীচে একটি বাগানও রহিয়াছে। তাহাতে মালি জল দেয়। আর উপরে বসিয়া অতিথিরা মিষ্টান্ন ও শীতল জল পান করেন। তা বেশ। এমন বাড়ি আমার ভাল লাগে। আর তাহাতেই প্রশ্ন উঠে, অনুকূলবাবু শ্যামবাজারে এমন একটি বাড়ি করিয়াও কেন তাঁহার চুনির জন্য পড়াশোনার যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না? তাহাতে বিনোদিনীর সহিত আশার লড়াই এতটা একপেশে হয় না। আশাও বেশ করিয়া যুঝিতে পারিত।

'তবে সকলেরই কিছু অত বড় বাড়ি হয় না। ছোট ছোট পরপর বাড়িগুলি দেখিয়া মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি একটু তীব্র হইলেই পাশের বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত অনায়াসে চোখ চলিয়া যাইবে। দুইটি বাড়ির ফাঁক দিয়া কোনও একটি বাড়ির অন্দর কোথায়, তা দেখিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলাম। তাহাতে রাস্তায় যে কয়েকজন ভাগ্যবান আমাকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা এমন অবাক হইয়া গেলেন যে, আমি পর্যন্ত লজ্জায় পড়িয়া গেলাম।
'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লজ্জায় পড়িলেন বিনোদের সেই পণ্ডিত মহাশয়। লোকটি ছোটখাট। গায়ের রং পরিষ্কার। কথা আরও পরিষ্কার।

'আমি গাড়িতে অপেক্ষা না করিয়া বিনোদের সহিত নামিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম। বেহারা দরজা খুলিয়া যতটা অবাক হইল, তাহার চেয়েও অবাক মুখ করিয়া নামিয়া আসিল বাড়ির মালিক। প্রথম পরিচয়েই যদিও বুঝিলাম, তিনি কখনও নরকে যাইবেন না। রীতিমতো সাবধানী মানুষ। আমাকে দেখিয়াই হাঁকডাক করিয়া তাঁহার গিন্নিকে ডাকিয়া আনিলেন। গিন্নিটি আমারই বয়সী। আসিয়া হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া অন্দরমহলে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। আমি বলিলাম, ভাই তোমার স্বামীর সঙ্গেই আমার যে বিশেষ করিয়া দরকার। তাঁহার কাছ হইতে নরকের গল্প শুনিব।
'গিন্নিটি বেশ হাসিয়া বলিল, তাহার আগে আমার বন্দোবস্ত তো একটা হইতে হইবে!
'আমি বলিলাম, সে কি, এমন কথা বলিতেছ কেন?
'গিন্নি বলিল, শুনিয়াছিলাম আপনি ডানা কাটা পরীর মতো সুন্দরী। এ বার চোখেও তাহাই দেখিতেছি। আপনাকে একা আমি কী করিয়া ছাড়িয়া দিব?
'আমি বলিলাম, আমার সুখ্যাত করেছে আমার দেবর। তাহার কাছ হইতে শুনিয়াছে তোমার স্বামী। তাই সুখ্যাতির সহিত যুক্ত হইয়াছে বিনোদের কাব্যগুণ। আমার যে গুণকীর্তন সে করিয়াছে, তাহার মধ্যে আমার গুণের কিছু নাই, বিনোদের কীর্তনের রসটিই ভারী হইয়া রহিয়াছে। ওখানে আমি না থাকিয়া অন্য কেউ হইলেও চলিত। বিনোদ তাহাকে লইয়াও আপনার গুণে চমৎকার কীর্তন গাহিয়া শুনাইয়া দিত।
'গিন্নিটি এ বার হাসিয়া কুটোপাটি হইল। তাহার পরে বলিল, আপনি এবং আপনার দেবর যে পরস্পরের গুণকীর্তন করিতে অভ্যস্ত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

'এই বলিয়া সে আমাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল। কলকেতার কোনও বড় হোটেলের ফিসফ্রাই, কাটলেট আর পুডিং খাওয়াইল। সবই বেশ খেতে। ফ্রাইটির রন্ধনপ্রক্রিয়াও দেখিলাম সে জানে। তাহাকে শিখাইয়াছে কোনও এক মেম। আমি তাহা শিখিয়া লইলাম। ছটফটে কটকটে মেয়েটিকে আমার বেশ লাগিল।

'ইহার পরে তাহাদের বসার ঘরে গিয়া বসিলাম। আমাদের দেখিয়াই বিনোদ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদো কাঁদো মুখে তাহাকে বলিল, বৌদিদি, আমাকে একা পাইয়া তোমার স্বামী এত পড়াইয়া দিয়াছে যে এই ফ্রাই, কাটলেট পর্যন্ত খাইতে পারিতেছি না। এ যদি নরক না হয়, তবে নরক কী?

‘সেই পণ্ডিত বলিলেন, কথাটি মন্দ বলোনি। লোভনীয় খাইবার বস্তু সামনে রাখিয়া খাইতে না দেওয়া নরকেই সাজে।
‘বিনোদ বলিল, তবে কি তুমি হাতে-কলমে নরকের ক্লাস নিচ্ছিলে?
‘সেই পণ্ডিতের স্ত্রী তাহাতে বলিল, ক্লাসের এ বার কিছু ক্ষণ ছুটি। এ বার আপনাকে খাবার শেষ করিতেই হইবে। আপনার বৌদিদিকে আমি জোর করিয়া খাওয়াইয়াছি। এ বার আপনার পালা।
‘বিনোদ কহিল, মহিলাদের জন্য খাবার সুষ্ঠু আয়োজন আর আমার মতো লোককে পড়াশোনা করানো, এ কেমন বন্দোবস্ত?
‘ওই পণ্ডিত দেখিলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নরক এক এক জনের জন্য এক এক রকম। পুরুষ-স্ত্রী ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদও রহিয়াছে। ইতর প্রাণীদের জন্যও নরক রহিয়াছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমও রহিয়াছে যথেষ্ট। তবে, বড় কথাটি হইল, আমাদের শাস্ত্র-সাহিত্যে সুন্দরীদের জন্য সত্যিই কিছু আলাদা বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অন্যে যাহা যাহা করিলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা ঘটে। বরং তাঁহাদের বিশেষ ভাবে দেখা হয়। যেমন, তারা বা অহল্যা।

‘বিনোদের কিন্তু মত হইল, সাহিত্যের সুন্দরী আর সত্যিকারের সুন্দরীদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। জন সমর্থনের ভারকে স্বয়ং দেবতারাও ভয় পান। সাহিত্যের সুন্দরীরা অনেক দিন ধরিয়া অনেক কবি ও কাব্যের পাঠকের স্তুতি সংগ্রহ করিতে করিতে সেই জন সমর্থন সংগ্রহ করেন। তাহাতেই তাহারা পার পাইয়া যান। কিন্তু সংসারের সুন্দরীদের তো আর কবিদের হাতে ততটা মাজাঘষা হইবার জো নাই। তাই তাঁহাদের সৌন্দর্য ততটা স্তুতিও আকর্ষণ করে না। তাই স্রেফ জন সমর্থনের অভাবে তাঁহারা চার দেওয়ালে বন্দি থাকিয়া নরকের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন।
‘সেই পণ্ডিতের স্ত্রী বিনোদকে কহিলেন, আপনার বৌঠানের কিন্তু স্তুতির লোকের অভাব নেই। তিনি কবি কল্পনার রক্ষাকবচটি পাইয়া যাবেন।
‘বিনোদ সে কথা শুনিয়া প্রথমে কেমন হতবম্ভ হইয়া গেল। তাহার পরে কী একটা বলিতে গিয়া কথা হাতড়াইতেছিল। শেষ পর্যন্ত কহিল, কবিও তো যে সে হইলে চলিবে না। নরকের দ্বার আগলায় এমন কবি এ কালে কেবল রবিবাবুই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বৌঠানের সম্পর্ক নেই। বরং বৌঠানই তাঁর ভক্ত।
‘পণ্ডিতের স্ত্রী কহিলেন, তাহা হইলে রবিবাবুর সঙ্গে একবার আপনার বৌঠানের আলাপ করাইয়া দিন, তা হলেই সমস্যা চুকিয়া যাইবে। আপনার বৌঠানকে দেখিয়া রবিবাবু নাচিবে ঘিরি ঘিরি, গাহিবে গান।
‘ইহা হইতে দু’টি কথা বুঝা যাইতেছে। এক, এই পণ্ডিতের স্ত্রীটির যথেষ্ট পড়াশোনা রহিয়াছে। রবিবাবুর গান তিনি বেশ জানেন, সময় মতো তাহা প্রয়োগ করিতেও পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হইল, ইনি আমাকে একটু অপমান করিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বস্তুত যে ভাবে তিনি কথাগুলি কহিলেন, তাহাতে অপমানের কোনও ছায়া পর্যন্ত মনের উপরে পড়িল না। কথা বলার এই ধরনটি থেকেও বুঝা যায়, তাঁহার শিক্ষা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার বেশ লাগিল।
‘কিন্তু এ বার আমাকে কথা কহিতেই হইল। আমি বলিলাম, আমাকে যে নরকেই যাইতেই হইবে, এমনটা আপনারা সকলে মিলে স্থির করিলেন কী করিয়া?
‘পণ্ডিতের স্ত্রী এ বার কহিলেন, ও মা। পরের কথাগুলি বুঝি আপনার চোখ এড়াইয়া গেল! আপনার মনপ্রাণ তো রবিবাবু এ ক্ষণেই ভরাইয়া রাখিবেন, এমন কথাই তো হইল। রাখিবে প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ।

আর তাহাতেই নরকের কথা আপনি বেমালুম ভুলিয়া যাইবেন। তবে সে ক্ষেত্রে বিনোদবাবু ও আপনার স্বামীর মনপ্রাণ জুড়াইবে না জ্বলিবে, সে কথা কহিতে পারি না।

'আমি কহিলাম, আমাকে নিয়ে রবিবাবু কাব্য লিখিলে, বিনোদ ও আমার স্বামীর তো মনপ্রাণ জুড়াইবারই কথা।

'তাঁহার স্বামী কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ লইয়া কহিলেন, চণ্ডীদাস পদ লিখিবার পরে রামি ধোপানির স্বামী কী করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখা নেই। কিন্তু স্বয়ং রাধার স্বামী যে কৃষ্ণকে সইতে পারিতেন না, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরিয়া কবিরা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

'আমি একটি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করিয়া বলিলাম, সে সব হইল অশিক্ষিতদের কথা। আমার স্বামী ও দেবর শিক্ষিত জন। বিদ্যাপতি মিথিলার রানি লক্ষ্মীদেবীকে রাধা ভাবিতেন। তাহাতে শিবসিংহের কোনও বিকার উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই শুনিয়াছি। শিবসিংহ শিক্ষিত লোক ছিলেন।

'পণ্ডিতের স্ত্রী বলিলেন, বিদ্যাপতির একটি স্ত্রীও ছিল। সে অবশ্য অশিক্ষিত, তাই বিদ্যাপতির কাব্যে যেমন তাহার স্থান নাই, তেমন তাহার রাগেরও কোনও সম্মান নাই। বিদ্যাপতি, লক্ষ্মী আর শিবসিংহ নিশ্চয় স্বর্গে গিয়াছিলেন। সে ব্যাচারা নির্ঘাৎ নরকে।

'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হঠাৎ তাহাকে নরকের দ্বারে আগায়াইয়া দিলে কেন? সে কী করিয়াছে?

'পণ্ডিতের স্ত্রী অবাক হইবার ভান করিয়া বলিলেন, কী করে নাই? স্বামীকে নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল। তাহাকে দু'কথা শুনাইয়াও হয়তো দিয়াছিল। স্বামী হলেও সে যে কবি। সে যে সমাজের মুকুট। তাহাকে বিরক্ত করা অন্যায় বই কি! এই অন্যায়ের বোঝা যখন তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে, তখন নরক ছাড়া তাহাকে আর পাঠাইবার স্থান কোথায় পাই?

'পণ্ডিতের স্ত্রীর কথা কহিবার ধরন দেখিয়া সকলেই হাসিয়া ফেলিলাম। সে-ও হাসিল। তাহার পর বিনোদকে কহিল, কেহ তরিবৎ করিয়া কিছু বানাইল আর অন্য জন তাহার সেই যত্নের দাম দিল না, এ ভারি ঘোরতর অন্যায়। কবির যেমন কাব্য শুনাইয়া সুখ, বাড়ির গিন্নির তেমন অতিথিদের খাওয়াইয়া সুখ। না হইলে আপনারও নরক গমন অনিবার্য।

'পণ্ডিত তখন সহাস্যে কহিলেন, নরকের কথায় একটা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে আমাদের শাস্ত্রে। আমরা যেমন যেমন থাকি, খাই, ঘুমাই—নরকেও ঠিক তেমনই বন্দোবস্ত। যেন দেহ রহিয়াছে, এমনটা ধরিয়া লইয়া শাস্তিগুলির বিধান দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষিদে পাইবে এবং তখন অখাদ্য খাইতে হইবে। ঘুম পাইবে, ঘুমাইতে দেওয়া হইবে না। কন্টকের উপরে শুইতে হইবে। অর্থাৎ শরীর একটা দরকারই। কিন্তু মৃত্যুর পরে বিদেহী হইয়া গেলে, শাস্তিগুলি ফাঁকি পড়িয়া যাইবে। তাই নরক মানিলে এটাও মানিতে হইবে যে, দেহের বিনাশ নাই।

'এই সময় বিনোদ কহিল, শাস্ত্র মতে দেহের বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ নেই। কিন্তু আত্মা কন্টক শয্যা বা চাবুককে ভয় পায় না, ঘুমাইতে চাহে না এবং অখাদ্য দেখিলে নাক সিঁটকোয় না। অর্থাৎ, নরক মানিতে হইলে মানিতে হইবে, মৃত্যুর পরে নূতন একখানা দেহ জোটে। মৃত্যুর পরেও দেহটাকে এই ভাবে ঘাড়ে করিয়া ঘোরাটাই বোধকরি সব থেকে বড় শাস্তি।

'পণ্ডিতের স্ত্রী কহিলেন, দেহের উপরে আপনার এত রাগ কেন?

'বিনোদ আবার থতমত খাইয়া গেল। তাহার পরে বলিল, দেহটাই যত নষ্টের গোড়া। দেহ না থাকিলে পাপও হয় না। ছোটবেলায় আমের আচার থেকে দাদার কলম পর্যন্ত কত কী না চুরি করিয়াছি, সে সবের নিশ্চয়ই কড়া ধরনের শাস্তি কিছু রহিয়াছে। যে কারণে বিদেহী আত্মার তত্ত্বটি মানিয়া লইয়া এতদিন বেশ স্বস্তিতে ছিলাম। এখন বৌঠানের কথায় এই পণ্ডিতের বাড়ি আসিয়া খাদ্য কিছু জুটিল, কিন্তু স্বস্তিটি গেল।

‘পণ্ডিতের স্ত্রী এ বার একটু হাসিয়া বলিলেন, দেহ না থাকিলে আনন্দও বোধ হয় না। এই যে কাটলেট, পুডিংটা আপনাকে জোরাজুরি করিয়া খাওয়াইলাম, তাহাতে আমার একটু বিদেহী আনন্দ হইল, খাইয়া আপনার বেশ দেহের আরাম ঘটিল। এই আরামটি আপনি দেহ না থাকিলে পাইতেন না। শুধু তাহাই নহে, এই যে আপনি আপনার বৌঠানের গুণকীর্তন করেন, আপনার বৌঠানটি যদি বিদেহী হইতেন, তাহা হইলে আপনার গুণটাই অন্তরালে থাকিয়া যাইত।

‘আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম, ওই গুণটা বিনোদের দেহ-নিরপেক্ষ স্বভাব। আমার জায়গায় আপনি থাকিলেও হইত।

‘পণ্ডিতের স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, হইত না। কাটলেটে মাংস, পুডিংয়ে ডিম না থাকিলে কেবল হাতের জাদুতে রান্না খোলে না। আপনার রূপের জাদু আপনার দেবরকে দিয়া কীর্তন করাইয়া লইয়াছে।

‘এই কথাটির মধ্যে এমন কোনও কথা ছিল, যে আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। পণ্ডিত বেশ গম্ভীর হইয়া শুরু করিয়া দিলেন নরকের কথা। প্রথমেই বলিলেন, নরক নানা প্রকার। নানা সময়ে রচিত। রাশি রাশি সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিতে শুরু করিলেন। কিন্তু প্রথমে একটু ভুল বুঝিয়াছিলাম। তাঁহার কথায় মনে হইতেছিল, হিন্দু শাস্ত্রের নানা নরকের মধ্যে যেগুলি একেবারে বালখিল্য ধরনের, সেগুলিই বরাদ্দ রহিয়াছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়াইবার শাস্তি হিসাবে। দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় এবং খাইতে দেওয়া হয় না। শাস্তির বহর হিসাব করিলে ব্রাহ্মণ হত্যা, পশুপাখি হত্যা ইত্যাদি বেশি গুরুত্বপর্ণ পাপ। অসিপত্রবন নামক একটি নরক রহিয়াছে, যেখানে অরণ্যের বৃক্ষগুলির পাতাগুলি অসির ন্যায়। মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেলে ওই তরবারিরূপ পাতাগুলি কুচিয়া কুচিয়া কাটিবে। একটি নরক রহিয়াছে, যেখানে নিম্ন বর্ণের মহিলার সংসর্গ হইলে ভয়ঙ্কর নোংরা একটি সাগরে পতিত হইতে হয়। প্রাণরোধ নরকে তাহারাই যায়, যাহারা জীবিতকালে শিকার করিয়াছে। তাহাদের সেখানে শিকার করা হয়। শূলপ্রোতা নরকে তাহারাই যায়, যাহারা কাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করে। অর্থাৎ, তুমি জীবিতকালে তোমার আমোদের জন্য যে কষ্ট অন্যদের দিয়াছো, তোমাকে মৃত্যুর পরে সেই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এ বড় সুন্দর বন্দোবস্ত। লালাভক্ষ্য নরকটিও তাই। ইহাতে বুঝি, আমাদের পণ্ডিত প্রবরেরা অবলা নারীজাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তাহার জন্যও জলহীন একটি নরক বরাদ্দ রহিয়াছে।

‘ইহার পরে ওই ভদ্রলোক বলিলেন, নরকের একটি বিশেষ রূপ রহিয়াছে আমাদের দেশে। বৃহদ্ধর্মপুরাণটি বাংলারই দান। বইটি তিনি আমাকে দিলেন। বলিলেন, এটি পড়িলেই নরক সম্পর্কে আমি অনেক কথা জানিতে পারিব।

‘বেশ রাত করিয়া বাড়ি ফিরেও দেখি স্বামী তখনও আসেন নাই। বিনোদ বাহিরে যাহাই খাইয়া আসুক, যতই খাইয়া আসুক, রাতে বাড়িতে ফিরিয়া অল্প একটু ডাল-ভাত না হইলে তাহার চলে না। মুখে কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু কেউ করিয়া দিলে কৃতার্থ হইয়া যায়। আমি স্নান করিয়া আসিয়া তাহার জন্য সেই সামান্য আয়োজনটুকু করিয়া দিয়া আমাদের শোওয়ার ঘরে শুইয়া শুইয়া ওই পুরাণটি পড়িতেছিলাম। কিছু ক্ষণ পরেই বুঝিলাম, ওই পণ্ডিত কেন বইটি আমাকে দিয়াছেন। ইহাতে এমন অনেক কথা রহিয়াছে, যাহা তিনি মুখে বলিতে পারেন নাই।

‘কী সেই কথা? শোনো তা হলে—অবৈধ সম্পর্কের নরক আসলে বড়ই ভয়ঙ্কর। তপ্তমূর্তি নামে একটি নরক রহিয়াছে। এই নরকে রহিয়াছে তপ্ত লৌহ নির্মিত কিছু নারী ও পুরুষ। জীবিতকালে কাহারও অবৈধ সম্পর্ক যদি রতি পর্যন্ত আকর্ষণ করে, তাহা হইলে পুরুষ হইলে তাহাকে ওই তপ্ত লৌহমানবীর সহিত রমণ করিতে হইবে, নারী হইলে তপ্ত লৌহমানবের সহিত রমণ করিতে হইবে। এবং যত ক্ষণ পর্যন্ত রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ না হইতেছে, তত ক্ষণ যমদূতেরা ছাড়িবে না। মাথায় ডাণ্ডস মারিতে থাকিবে।

‘কী আশ্চর্য এক শাস্তি।’

গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরে ক্ষণপ্রভা খবর পেলেন, বিপিনবিহারী মাঝ গঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর বোন বিভাকে।

৯
বিস্ফারিত ফুল্লেন্দ্রীবরতুল্য চক্ষু

সে কথায় যাওয়ার আগে শিবু সর্দার সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। শিবু সর্দারের চোখ দু'টোই প্রথমে চোখ টানে। তার টানটান চেহারা। ফর্সার দিকেই গায়ের রং। সারা শরীর পেশীবহুল। মুখটি কোমল। দাড়ি ছিল না। হাল্কা একটা গোঁফ ছিল। তাকে দেখলে বেশ ডানপিটে প্রেমিক চরিত্র বলেই প্রথমে মনে হত। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালেই ভুলটা ভাঙত। এত জ্বলজ্বলে চোখ আমি সারা জীবনে দেখিনি। তারও ভ্রুযুগ জোড়া ছিল। মনে হত যেন মনের অন্দরের সব কোণ তার চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ঠাকুরমশায়ের ছেলে পরে আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, শিবু সর্দার খুব মসৃণ ভাবে কাজ করতেন। মসৃণ কথাটির উপরে জোর দিয়েছিলেন। খুব মসৃণ ভাবেই শিবু সর্দার অনেক দিন পরে একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যান বাড়ির আরও দু'জনের সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন বিনোদবিহারীর ছেলে। বললেন, নায়েব উকিলের মতোই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শিবু সর্দারেরও ছিল আশ্চর্য একটা প্রীতির সম্পর্ক। সে কর্তাদাদার খাস লোক। কত ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে, কত খুন করেছে তা কেউ হিসেব রাখতে পারবে না। তার সব থেকে বড় গুণ ছিল অবশ্য নদীর উপরে কর্তৃত্ব। গঙ্গার যে অঞ্চলে কর্তাদাদার জমিদারি ছিল, সেই অঞ্চল লাগোয়া নদীর কর্তৃত্ব পুরোপুরি ছিল শিবু সর্দারের হাতে। নদীর প্রতিটি জলকণা পর্যন্ত যেন তার চেনা ছিল।

কিন্তু সেই শিবু সর্দার নৌকো আটকেও বিভাকে আটকাতে পারলেন না।

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, বিভা নামটি রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাস থেকে নেওয়া বলেই মনে হয়। প্রতাপাদিত্যের এই কন্যার জীবনও সুখের ছিল না। কিন্তু কর্তাদাদার পরিবার যদি বঙ্কিমের প্রভাবযুক্ত হয়, তাহলে ক্ষণপ্রভাদের পরিবার ছিল রবীন্দ্র অনুরাগী। তাই বিভার নামটি গৃহীত হয়েছিল। বৌঠাকুরানি হাটের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে নামটি আবার দেখেছিলাম রবিবাবুর বুড়ো বয়সের লেখা রবিবার গল্পে। তবে সেই বিভা আর বৌঠাকুরানির হাটের বিভার মধ্যে চরিত্রগত ফারাক খুব একটা আমার অন্তত চোখে পড়েনি। কিন্তু নামটি যে তিনি পঞ্চাশ বছর পরেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছিলেন, সেটা কিন্তু একটা ভাববার মতো কথা।

তিনি বললেন, রবিবাবু অনেক দিন পরে 'দুই বোন' বলে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানে ঊর্মিমালা সম্পর্কে তাঁর যা মন্তব্য, তা ক্ষণপ্রভার বোন বিভার ক্ষেত্রে খাটে—তিনি যতটা দেখতে ভাল, তার চেয়েও তাঁকে দেখায় ভাল। এই এক অসামান্য গুণ ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে তাঁর রূপের বর্ণনাও কিছু করা আবশ্যক। এ বার বিষবৃক্ষ থেকে ধার করে বলি, স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দ্রীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবত্ ভ্রুযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবত্ গঠন ও চম্পকদামবত্ বর্ণ তাঁকে রমণীকুলদুর্লভ করে তুলেছিল। তাঁর একটি পুরনো ছবি রয়েছে। সাদাকালো সেই ছবিতে তাঁর রূপ যেন কুলিয়ে উঠছিল না। বিপিনবিহারী যখন তাঁর

প্রেমে পড়েন, তখন তাঁকে নিয়ে একটি গানও লেখেন। সে গানের প্রথম লাইনটি ছিল, 'ধন্য হলেন ধারণ করে মোদের ধরণী'। বিভা তখন অভিনয় জগতের প্রতি আকৃষ্ট। বিপিনবিহারীও কলকাতার নাট্যসমাজে তখন প্রতিভা ও অর্থের ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। মুখে মুখে গান লিখতে পারেন, যে কোনও চরিত্রকে সামান্য কিছু অদলবদল করিয়ে আকর্ষক করে দিতে পারেন। অন্নদামঙ্গল অভিনয় করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। নিজে হতেন শিব। দক্ষালয় যাত্রার অংশে তিনি রিহার্সালে যখন বলে উঠতেন, 'অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।। সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে' তখন সারা বৌবাজারের বুকে কাঁপন লাগত।

বিভা তাই তাঁর জামাইবাবুকে অনুনয় করেছিলেন, তাঁকে কলকাতার খ্যাতিমান নট-নির্দেশকদের কাছে পৌঁছে দিতে। আগে প্রস্তাবটা বাড়িতে করেছিলেন। সে কালে কোনও বাড়িই এই প্রস্তাবে রাজি হত না। বিভার বাবা জমিদার হলেও ছিলেন নরম মনের মানুষ। বিভার প্রতি শাস্তি নির্দেশ করলেন, পড়াশোনার ছেদ ঘটিয়ে। বাড়িতে একা একা পড়াশোনা, রূপচর্চা আর কল্পনাবিলাসে বিভার দিন কাটতে লাগল। সে সময়েই তাঁর নিভৃত পত্রালাপ শুরু হয় জামাইবাবুর সঙ্গে। তবে তার জন্য ডাক বিভাগকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ হবে না। বিভাদের নিজস্ব বজরা ছিল। সেই বজরার এক মাঝি এক দিন কী করে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার জায়গায় নিজে থেকেই এসে কাজে যোগ দিল এক কিশোর। তাকে দেখেই ভাল লাগে। সে-ই মাঝে মধ্যে গঙ্গা মাটি পৌঁছে দিতে যেত বিভার কাছে। কেউ কেনই বা তাতে বারণ করতেন! সেই কিশোরই যে পত্রবাহকের কাজ করত, তা অনেক পরে বুঝেছিলেন ক্ষণপ্রভা ও কর্তাদাদা। সেই কিশোর যে শিবু সর্দারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা তখন তাঁরা পলকমাত্রেই বুঝতে পেরেছিলেন।

এমনই এক চিঠিতে বিভা প্রস্তাব দিল, সে পালিয়ে যাবে। ক্ষণপ্রভা নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন, 'বিভা আমার স্বামীকে কখনওই ভালবাসে নাই। সে শুধু মনে করিয়াছিল, আমার স্বামী তাকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। তাই সে একরকম ব্যবহার করিয়াছিল আমার স্বামীকে। ইহাতে তার নিদারুণ হৃদয়েরই কেবল পরিচয় মেলে। সে আমার প্রতিও নিষ্করুণ, আমার স্বামীর প্রতিও। আমার স্বামীর ক্ষেত্রে কথাটা হইল, নিত্য নূতনের দিকে তাঁহার ঝোঁক, কর্তাদাদা যাহা যাহা অপছন্দ করেন সে সবের প্রতিই অতিশয় আসক্তি। তা ছাড়া, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া তিনি বাঁচিতে অক্ষম। কর্তাদাদাকে অমান্য করিবার ঝোঁক তাহাকে বারবার বিপজ্জনক পথে লইয়া গিয়া ফেলে। কিন্তু তিনি পাড়ে উঠিয়াও আসেন বারবার। চোখের বালির মহেন্দ্রর মতো 'এখন তোমার আমার একই মৃত্যু' বলিয়া চিত্কার করিয়া উঠিতে হয় না তাঁহাকে। যে কারণে, রাধা পর্যন্ত আমাদের সংসারের অঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি কী করিব? কেবল সহ্য করিব?'

বিপিনবিহারীর আশ্বাস পাওয়ার পরে বিভা বাড়িতে বলল, দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাবে সে। সেই মতো নিজের কাপড়চোপড়, কিছু বই আর অলঙ্কারের একটি বাক্স সঙ্গে নিয়ে সে চেপে বসল বজরায়। ঢিমেতালে বজরা চলতে থাকল। কিছু ক্ষণ পরেই সেই কিশোর যখন গানে কৌতুকে চারিদিক ভরিয়ে তুলল তখন ছুটির খুশির ছোঁয়া যেন লাগল বজরার বাকি মাঝিদের মনেও। সন্ধ্যা গভীর হলে নিজের হাতে এক ধরনের মণ্ডা বানিয়ে সকলকে খেতেও দিল সে। তার স্বাদ চমত্কার। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিভা ও সেই কিশোর ছাড়া বজরার বাকি সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেল। তখনই একটি ছিপ এসে লাগল বজরার গায়ে। বিভা ও সেই কিশোর সেই ছিপে উঠে বসল। ছিপের একটি পাটাতনে পাতা ছিল কুশের আসন, তাতে বসল বিভা। পা দু'টি

রাখল সামনের পাটাতনে। পিছনে বসল সেই কিশোর। তার সঙ্গে ছিল বিভার একান্ত নিজস্ব সামান্য কিছু জিনিসপত্র। বজরাকে পিছনে ফেলে হু হু করে সেই ছিপ উড়ে গেল কলকাতার দিকে।

কিন্তু ঘটনার নিষ্পত্তি সেখানেই নয়। সেই সন্ধ্যার আঁধারে সেই ছিপটির পথ রুখেছিল আরও একটি ছিপ। পাড়ের দিক থেকে সরসর করতে করতে ছিপটি এসে ঠেকল বিভাদের ছিপটির গায়ে। তাতে ছিপছিপে দুই ব্যক্তি। তাদের প্রতাপ এতটাই, কণ্ঠে কর্তৃত্বের স্বর এমনই স্পষ্ট, বিভাদের মাঝি নৌকা থামিয়ে দিল লহমায়। তারা সেই ছিপ থেকেই প্রশ্ন করল, কে যায়?
উত্তর এল, শ্রীরামপুরের জমিদারের মেয়ে।
প্রশ্ন হল, কোথায় যাচ্ছেন?
উত্তর এল, কলকেতা।
প্রশ্ন হল, জমিদারের মেয়ে, ছিপে কেন?
উত্তর এল, বজরা মাঝগঙ্গায় ডুবে গিয়েছে।
প্রশ্ন হল, শ্রীরামপুরে খবর গিয়েছে?
উত্তর এল, সেখানে লোক গিয়েছে।

এ বার বিস্ফারিত ফুল্লেন্দ্রীবরতুল্য চক্ষু তুলে তাকালেন বিভা। তাতেই সংলাপ থেমে গেল। তাঁর নিঃসংশয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই অন্য ছিপটি আবার পাড়ের দিকে সরে গেল। বিভাদের ছিপটি চলে গেল কলকাতার দিকে। রাত গভীর হওয়ার আগেই আহিরীটোলার বাড়িতে সব ঘরে আলো জ্বলে উঠল। একটি ঘর বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছিল। সেই ঘরে গিয়ে উঠলেন বিভা। সেখানে অন্য দামি আসবাবপত্রের সঙ্গে ছিল একটি বিরাট বেলজিয়াম কাচের আয়না। তাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখা যেত। বিভা এসে প্রথমেই সেই আয়নার সামনে দাঁড়াল। তাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়ল পিছনে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে থাকা বিপিনবিহারীর। বিনোদবিহারীর ছেলে নায়েব উকিলের কাছ থেকে শুনেছিলেন, বিপিনবিহারী তখন একটি গানও গেয়েছিলেন নিজের মতো সুর করে। গানটি এই
'শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখব বলে হে, তাই এসেছিলাম এই গোকুলে, আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।'
বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, বাবা ও নায়েব উকিলের কাছ থেকে শুনেছিলাম জ্যাঠামশায়ের কণ্ঠে সহজাত সুর ছিল। আমিও ছেলেবেলায় তাঁর গলায় গান শুনেছি। তাঁর চেহারা ছিল নায়কোচিত। আচরণও তেমন। তাই তিনি যখন উপস্থিত থাকতেন, তখন বাতাসে পরিবেশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যেত সহজ ও আমোদিত। তার উপরে গান ধরলেন যদি, তা হলে পরিবেশে আর কোনও মেঘ থাকতেই পারত না। তিনি যেন ছিলেন

একটি উদ্যানের মতোই। যেখানে কেবল কষ্ট লাঘব করাই যায়, কষ্ট প্রাপ্তি ঘটে না। তিনি যেন ছিলেন পুষ্করিণীর মতোই। যেখানে তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, শান্তি বৃদ্ধি পায়।

সূর্যমুখীর নাতি সে কথা শুনে বললেন, এই যে বিপিনবিহারী সম্পর্কে আবেগের উচ্ছ্বাস, এই যে কেবল একটি উপমায় কেউ সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, এই যে উদ্যানের পরে পুষ্করিণীর উদাহরণও আপনিই ভেসে চলে আসছে, এটাই বিপিনবিহারীর প্রতি তাঁর পরিজনদের অনুরাগের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁরা কেউই অল্পে তাঁর প্রশংসা করে চুপ করে যেতে পারতেন না। এবং এটাই বিপিনবিহারীরও চরিত্র।

কিন্তু পুষ্করিণীর কথাটা যে বারবার তাঁর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে, এটাও তো তাঁর চরিত্রের একটা কিছুতেই না ভুলতে পারা দিকের প্রতিই ইঙ্গিত করে।
বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, হয়তো করে। রাধাদিদি কিন্তু পরের দিকে সংসারে সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরা যেমন থাকতেন, রাধাদিদিও তেমন থাকতেন। তাঁর একটা অধিকারবোধও সংসার সম্পর্কে ছিল। কাশী থেকে ফিরে আসার পরে কর্তাদাদার হেঁশেলেও তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি হয়। একটা সময়ের পরে কর্তাদাদার কাছে তিনি এতটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন যে, কর্তাদাদা তাঁকে নানা রকম আদেশ করতেন। আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি সন্তানহীনা। আমাকে দেখে সেই শোক বোধ করি ভুলতে চাইতেন। আর আহিরীটোলার বাড়ির তিনি তো একরকম কর্ত্রীই ছিলেন।

কথার মধ্যে বাধা দিইনি। পরে প্রশ্ন করলাম, রাধা কাশী গিয়েছিলেন কেন?
বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, সে ছিল রাধাদিদির অজ্ঞাতবাসপর্ব। কর্তাদাদার ভয়ে রাধাদিদি উধাও হয়ে গেলেন। কেউ খোঁজ পেল না তিনি কোথায়। অনেক পরে জানা গেল, দুলালচন্দ্রের কাশীর বাড়িতে হরিদাসবাবাজি থাকতেন, বিপিনবিহারী তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন রাধাদিদিকে। রাধাদিদি ট্রেনে চেপে একলা সেখানে গিয়েছিলেন। প্রায় বছরখানেক সেখানে ছিলেন। এখানে নায়েব উকিলের একটা ভূমিকা রয়েছে।
--এঁর কথা আগেও বলেছেন। দুলালচন্দ্র বা কর্তাদাদার সংসারে এই বাবাজির প্রভাব ছিল?
--ছিল। সকলের উপরেই হরিদাসবাবাজির কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন গ্রামের ঠাকুরমশায়ের ধাঁচে গড়া। তবে মিল কেবল ওইটুকুই। তিনি ঠাকুরমশায়ের মতো সর্বদা কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতেন না। ঠাকুরমশায়ের মনে সব সময়তেই একটা সংশয় ছিল। নিজেকে ন্যূন মনে করতেন। তাঁর অপারগতার কথা ভুলতে পারতেন না। কর্তাদাদা হয়তো তাঁকে ভুলতে দিতেনও না। কিন্তু তেমন কোনও সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না হরিদাসবাবাজির মধ্যে। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা পুরো মাত্রায় করতেন। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করতেন সর্বক্ষণ। তিনি জানতেন, তিনি যা পারেন, সেইটুকুই পারেন। অন্যে কী পারে আর না পারে, তা নিয়ে তাঁর কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না। সর্বদা সহাস্য হরিদাসবাবাজি খুব নিরহঙ্কারী সংকীর্তন প্রিয় ভালমানুষ গোছের লোক ছিলেন। নিজে যা ভাল বুঝতেন, তাই বলতেন। এতটাই সরল ভালমানুষ ছিলেন যে, তাঁকে দাপট দেখিয়ে কোনও লাভ হত না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয় মানুষদের রক্ষা করতেও তাঁর বুক কাঁপত না। মানুষকে সহজ পরামর্শ দিতেন। কথা বলে মনের শোক দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাবিজ-মাদুলি দেওয়ার দিকেও যেতেন না। মানুষও তাঁকে ভালবাসতেন। নায়েব উকিল একবার আশ্চর্য বুদ্ধি বার করে দুলালচন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন হরিদাস বাবাজিকে ব্যবহার করে।
--কী রকম?

--দুলালচন্দ্রদের দু'টো বাড়ি ছিল কাশীতে। দু'টোই তাঁর বাবার কেনা। একটি বাড়িতে থাকতেন তাঁর বাবারই এক বন্ধু। অকৃতদার সেই বৃদ্ধ ছিলেন খিটখিটে মেজাজের। কিছুতেই বাড়ির দখলও ছাড়ছিলেন না। অথচ তখন দুলালচন্দ্রের খুব টাকার দরকার। হরিদাস বাবাজি থাকতেন অন্য বাড়িটাতে। তাঁকে উত্খাত করতে মন চাইছিল না। তখন দুলালচন্দ্র নায়েব উকিলকে ডেকে পাঠান। নায়েব উকিল কাশী ঘুরে এসে তাঁকে বুদ্ধি দেন, যে বাড়িতে ওই বৃদ্ধ থাকেন, সেই বাড়িটাই হরিদাস বাবাজিকে দিয়ে দিতে। আর হরিদাস বাবাজি যে বাড়িতে থাকেন, সেইটা বিক্রি করে দিতে। দুলালচন্দ্র তাই করলেন। হরিদাস বাবাজিও সরল মনে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলেন এক দিন। কিন্তু তাঁর দিনরাত সংকীর্তন, পুজো-পাঠে অতিষ্ঠ হয়ে ওই বৃদ্ধ মহা চিত্কার চেঁচামেচি জুড়ে দিতে কাশীর লোকজনই তাঁকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তা সহ্য করা কঠিন হয়েছিল। শেষে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে, ওই বৃদ্ধ পালাতে পারলে বাঁচেন। দুলালচন্দ্র তাঁকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে রেহাই পেলেন।

--নায়েব উকিল তাই রাধাকে হরিদাসবাবাজির কাছেই পাঠিয়ে দিলেন?

--নায়েব উকিল ছিলেন বিপিনবিহারীর আজ্ঞাবহ। তিনি অন্য লোককে পরামর্শ দিতেন, কিন্তু বিপিনবিহারীর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করতেন। বিপিনবিহারীর এতটাই বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন এবং বিপিনবিহারীর প্রতি তাঁর ভক্তিও এতটাই ছিল যে, কর্তাদাদার কোপে পড়ার ভয় ত্যাগ করে তিনি রাধাদিদিকে সাহায্য করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

--বিপিনবিহারী তখন কোথায়?

--তিনি তখন কলকাতায়। প্রকৃত লেখক সত্তা যদি কারও থেকে থাকে তো তিনি হলেন বিপিনবিহারীই। জ্যাঠামশায় বারবার একটা কথা বলতেন, কলকাতার সমাজ তাঁর ভাল লাগে কারণ এখানে বৈচিত্র রয়েছে। নাটকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতার কারণও ওই একই। নানা ধরনের লোক নানা ধরনে কথা বলে। বিপিনবিহারী সে সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করতেন। নানা জনের আচরণ, কথা বলার ধরন, শব্দ নির্বাচন এ সবই তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। তাই লোকচরিত্র সম্পর্কেও তাঁর একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা সাধারণ ভাবে আমাদের সঙ্গে মেলে না। তিনি কোনও লোকের মধ্যে কথা বলার কোনও বিশেষ ধরন দেখে পরের দিকে বুঝে যেতেন, তাকে দিয়ে কী করানো যায়।

--নায়েব উকিলকেও সে ভাবেই বুঝেছিলেন।

--কেবল নায়েব উকিল নন, সবাইকেই। এই যে ধরো, নিজেদের বাড়ির উঠোন ভরা লোকজনের মধ্যে সরাসরি কর্তাদাদার মুখের উপরে বলে দেওয়া ওই কথাটা যে—'আমি স্ববশ'—সেটা একটা বিশেষ ধরনের কথা বলা। বিশেষ কিছু শব্দ উচ্চারণ করা। যে শব্দ ও তার উচ্চারণের অভিঘাতে সভা সেখানেই ভেস্তে গেল। কর্তাদাদার মতো দুনিয়াদার লোকও যেখানে পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। এটা অন্য কেউ করতেই পারতেন না। তাঁরা কেবল এমন কোনও কথা বলতেন, যাতে সভা চলত কর্তাদাদার মেজাজ মতোই। অর্থাৎ এখানে কর্তাদাদাকে ধরা হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কে খুব বোঝেন এমন একজন লোক বলেই। দেখা যাচ্ছে, সেই লোককেও ঠিক কী করলে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়, তা বিপিনবিহারী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এই হল একজন লেখকের গুণ। যে ক্রিয়াশীল। যে নতুন কিছু তৈরি করতে পারে। যে অভিঘাত তৈরি করতে পারে। এইটাই তাঁর প্রিয় শখও ছিল। কলকাতায় তিনি নাটকের রিহের্সালে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন। তার কারণ হল, ওই যে কথাগুলো কে কী ভাবে বলছে, তা দেখা। তা থেকে তাঁর লেখক মনের উদরপূর্তি ঘটত। তারপরে তিনি নতুন করে নাটকের ভাব বিস্তার করতেন।

--সে ভাবেই তিনি বুদ্ধি দিলেন নায়েব উকিলকে?

--হ্যাঁ। তিনি যে ক্ষণপ্রভার ঠাকুরমশায়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি, তার কারণ, তিনি দেখেছিলেন, এর মধ্যে ভাবনার বিস্তার তেমন কিছু তিনি পাচ্ছেন না। অনুভূতির যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রেও ঠাকুরমশায় তাঁর থেকে পিছিয়ে পড়ছিলেন। তিনি কিন্তু ঠিকই খেয়াল করেছিলেন, ঠাকুরমশায় গ্রামের মহিলাদের আবেগের যত্ন নেন। গ্রীষ্মকালে ওই প্রাচীন মন্দিরটি যেমন একটি শীতল আশ্রয় তৈরি করে, তাতে ভগবানের উপস্থিতি যেমন মনে একটা বাড়তি শান্তির প্রলেপ দেয়, তেমনই ঠাকুরমশায়ও গ্রামের মানুষের তপ্ত মনে দু'ফোঁটা জল ঢালেন তাঁর চরিত্র ও কাব্যপ্রিয়তা দিয়ে। তাই তাঁকে ঘিরেও একটা বলয় তৈরি হয়েছিল। হরিদাসবাবাজির সঙ্গে তাঁর যে মিলের কথা বলছিলাম, এই সেই মিল। সেই বলয়ে ছিলেন গ্রামের মেয়েদের একটা বৃহৎ অংশ। সে দিন ঠিক কী তিথি ছিল, তা মনে নেই, তবে গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে রাধামাধব মন্দিরে হাজির হয়েছিলেন। এসেছিলেন আশেপাশের নানা গ্রামের মেয়েরাও। মন্দির থেকে ফেরার সময়ে রাধাদিদিকে সেই দলেই ঠেলে দিয়েছিলেন নায়েব উকিল। রাধাদিদি একগলা ঘোমটা টেনে তেমনই দু'টো তিনটে দলের মাঝখানে মাঝখানে হেঁটে পার হয়ে এলেন গ্রামের সীমানা।

--শিবু সর্দার বিভাকে ধরতে পারেনি। রাধাকেও ধরতে পারল না?

--না। তবে তারও তখন হাত-পা কিছুটা বাঁধা ছিল। যতটা তৎপর হতে পারত, ততটা হয়নি। কেননা, গ্রামের মেয়েরা তখন কোনও রকম ভাবে সামান্য বিব্রতও হয়, এমনটা চাইছিলেন না কর্তাদাদা। তার জন্যও দায়ী রাধাদিদিই। তাঁরই ছেলে যে গ্রামেরই মেয়ে রাধাদিদির সঙ্গে একটি অশালীন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে, তার প্রভাব যে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, তা কর্তাদাদার অজানা ছিল না। রাধাদিদি তাই মেয়েদের নানা দলের সামনে পিছনে হেঁটে চলে গেলেন বেশ কয়েকটি গ্রাম পার করে। এখানে কর্তাদাদার বাড়ির পাচিকা মোক্ষদার কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, জানি না। তবে মোক্ষদা রাধাকে খুবই ভালবাসতেন। মোক্ষদাই কোনও মেয়েদের দল দিয়ে রাধাদিদিকে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করলে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। রাধাদিদি গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে মেঠো পথ ধরে উঠে এলেন পাকা সড়কে। বিপিনবিহারীর পাঠানো গাড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন নায়েব উকিল। তিনি সোজা গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন। গাড়ি গেল হাওড়া। সেখান থেকে ট্রেনে বারাণসী। মোট কুড়ি মাইলের মতো পথ সে দিন হেঁটেছিলেন রাধাদিদি। সেই তিথিতে সব গ্রামেই পুজো ছিল। সব গ্রামেই দুপুরে কোনও না কোনও মন্দিরে ভিড় ছিল। তাই মেয়েদের ভিড় তিনি সবখানেই পেয়েছিলেন। গ্রামের পথে ছায়াও পেয়েছিলেন। শেষ কিছুটা অংশ কিন্তু খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এসেছেন। তাও ত্রস্ত মনে ও পায়ে। সে খুব কম কথা নয়। রাধাদিদি নাকি গাড়িতে উঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন। তাঁর পায়ে বড় বড় ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

--এটা যে হবে, তা বিপিনবিহারী বা নায়েব উকিল কেউই অনুমান করতে পারেননি?

--পেরেছিলেন। রাধাদিদি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সে জন্য বরফ জল ছিল গাড়িতে। কিন্তু গ্রামের মেয়ে রাধাদিদি যে হাঁটতে গিয়ে অমন হতশ্বাস হয়ে পড়বেন, তা তাঁরা ঠিক অনুমান করতে পারেননি। তাই ওই বরফ জল তাঁর পায়ে ঢালতে হয়। মুখে ছিটোতে হয়। জলে টান পড়ে। হাওড়ায় গিয়ে রাধাদিদিকে ভাল করে খাইয়ে খানিকটা সুস্থ করে তোলেন নায়েব উকিল। তারপরে তাঁকে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে দেন। কেন উঁচু ক্লাসের টিকিট কাটলেন না জানো?

--কেন?

--তা হলে চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থেকে যায়। কর্তাদাদার বুদ্ধি তো, ট্রেনেও লোক পাঠিয়ে দিতে পারত শিবু সর্দার। বিপিনবিহারী যে ঘটনায় যুক্ত, সেখানে সবই ফার্স্ট ক্লাসের মাপেরই হবে, এটা কর্তাদাদা এবং

শিবু সর্দার জানতেন। রাধাদিদির জন্য তেমন কোনও বন্দোবস্তই তিনি করে দেবেন, এমনটা তাই ভাবা সহজ ছিল। কিন্তু বিপিনবিহারীও সে কথা জানতেন। তাই তিনি আয়োজন করলেন একটু অন্য ভাবে। তিনি রাধাদিদির মাপের বদলটা ঘটালেন না। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে বদলটি ঘটা এক রকম অনিবার্য ছিল বলে মনে করতেন সকলে। তার উপরে থার্ড ক্লাসের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া সোজা। তাই লোক পাঠালেও ট্রেনে উঠে সেখানে রাধাদিদিকে খুঁজে বার করা শক্ত ছিল। তার উপরে, রাধাদিদি ওই থার্ড ক্লাসেই যে স্বাভাবিক থাকবেন, সেটাও জানতেন বিপিনবিহারী। তিনি চেয়েছিলেন রাধাদিদি এই যাত্রাকালটুকু স্বচ্ছন্দ থাকুন। তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে গেলে ধরা পড়ার সুযোগও বেড়ে যায়। তবে আশ্চর্যের কথা হল, এই যে রাধাদিদি ওই রাস্তাটুকু হেঁটে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাতে তাঁর প্রতি জ্যাঠামশায়ের প্রেম বেড়ে গেল।

--কিন্তু একটু আগেই আপনি আমাকে বলছিলেন, বিপিনবিহারীর লোকচরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট প্রজ্ঞা ছিল। রাধার মাপ বদল না করার মধ্যেও সেই প্রজ্ঞা বেশ বোঝ যায়।

--সে কথাই তো বলছি। এই যে রাধাদিদি কাতর হয়ে পড়লেন, এই যে রাধাদিদি অনায়াসে মাইলের পর মাইল উজিয়ে যেতে পারলেন না, এ কথায় রাধাদিদির শরীর মনের যে একটা নরম ভাবের কথা প্রকাশ পায়, সেটাই জ্যাঠামশায়কে আকর্ষণ করেছিল। নায়েব উকিল আমাকে বলেছিলেন, বিপিনবিহারী রাধাদিদি সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর মুখে বেদনার ছায়াও পড়েছিল তখন। আমার মনে হয়, এরপর থেকেই বিপিনবিহারী রাধাদিদির প্রেমে পড়ে গেলেন। তার আগে তিনি তাঁকে ঠিক ভালবাসতেন না।

--কিন্তু দুলালচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বিপিনবিহারী যে রাধার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সত্য বলে দাবি করেছিলেন? বলেছিলেন এই সম্পর্ক শিব।

--সেটা তাঁর নিজের তরফ থেকে বলা। রাধাদিদিকে তিনি কী ভাবে দেখছেন, সেটার প্রকাশ। সেখানে রাধাদিদির বক্তব্য বিশেষ কিছু ছিল না। রাধাদিদি যেন সেই বক্তব্যটিই রাখলেন ওই মাঠ উজিয়ে ভরা রোদে হেঁটে গিয়ে। এ যেন তাঁর কথা বলা। তাঁর কাতরতাই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলল। এ বার দু'পক্ষের মধ্যেই কথা হল যেন।

১০
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা

ঠাকুরমশায়ের ছেলে এই প্রসঙ্গে বললেন, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের একটা পরম্পরা সব সময়তেই গ্রাম বাংলায় ছিল। সেখানেও বিনোদিনী রাধা এমনই কাতর। তিনি দুধ-দধির ভার বহন করতে পারেন না। নৌকা দুলে উঠলে ভয় পান। অভিসারে যাওয়ার পথে তিনি উদ্বেগে অস্থির হয়ে ওঠেন। এই তাঁর চরিত্র। বিপিনবিহারীর মতো ইংরেজি শিক্ষিত মানুষও, রাধার ওই অভিসারে যাওয়ার কষ্টটুকুকে গুরুত্ব দিতে তাই বাধ্য ছিলেন। খেয়াল করলে বুঝবে, এই ঘটনার মধ্যেও একটা সাহিত্যের বীজ রয়েছে। ভরা দুপুরে প্রথমে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশেই অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা একটি একলা মেয়ে, যে অভিসারে যাচ্ছে, আসলে সে পালাচ্ছে, কিন্তু পালাচ্ছে প্রেমের জন্যই। পালাচ্ছে বিপিনবিহারীর জন্যই, তাঁরই নির্দেশ মেনে। তারপরে সে গিয়ে পড়ল একা একটি খোলা মাঠে। অতদূর সম্ভবত সে আগে কখনও একা যায়নি। তারপরে সেই মাঠ সে পার হয়ে এল। তার পায়ে আঘাতের পর আঘাত এল। সে ভেঙে পড়তে চাইল। সে ছাড়িয়ে আসছিল তার গ্রাম, তার বাড়ি, তার মন্দির, তার সকাল থেকে রাত, প্রিয় গাছগাছালি, তাদের বাড়ির বাছুর, তার সেই

পুষ্করিণী। তার শৈশব থেকে যৌবনের উদয়ভাগ। সেই আঘাত তার শরীরে ও মনে সমান অভিঘাত তৈরি করছিল। আর তার মধ্যেই সে পালাতে চাইছিল। একই সঙ্গে সে কোথাও যেতে চাইছিল। এই অবস্থাটি, রাধা ও কৃষ্ণের সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, তা প্রেম উৎপাদনের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিপিনবিহারী এই সারা অবস্থারই প্রেমে পড়েছিলেন। বৌদিমণির বোনকে মাঝ গঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়েও এমনই একটি অবস্থা তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে, কর্তাদাদার নিপুণ ব্যবস্থাপনা আর শিবু সর্দারের মসৃণ খবরদারিতে বিপিনবিহারীর সঙ্গে বৌদিমণির বিয়ের সময়ে এই অবস্থাটি তৈরি হয়নি। এই যে অবস্থাটি তৈরি হয়নি, কেবল সেটুকুই কিন্তু বলার। অবস্থাটি তৈরি হয়নি বলেই বিপিনবিহারী বৌদিমণির প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন না, এমনটা তুমি ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতায় লিখতে পার, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বসিয়ো না। আমি শুধু তোমায় একটা ইঙ্গিত সরবরাহ করলাম।

--শুনে শুনে আপনার বাবার সম্বন্ধে যে ধারণাটি তৈরি হয়েছে, তাতে মনে হয়, আপনার তাঁর সঙ্গে খুব মিল রয়েছে।

--থাকারই কথা। বড় হয়ে বুঝেছি, বাবা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খুবই সম্মান করতেন। বড় হয়ে জীবনস্মৃতিতে পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'অনাদর এক মস্ত স্বাধীনতা।' কথাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁথে যায়। তিনি লিখেছেন, 'খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' এ তাঁর শৈশবের কথা। এ আমারও শৈশবের কথা। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হলেও, আমারও একই অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাও আমার মনে হয়েছিল, এই অনুভূতিটি আমার নিজের। কিন্তু আমার মধ্যে এই অনুভূতিটির প্রকাশ ঘটুক, এমনটা বাবার প্রত্যাশিত ছিল না। তিনি অনাদর করছেন তাঁর পুত্রকে এ কথা যে ভাবতেই পারতেন না। তাঁর বুক ভেঙে যেত তা হলে দুঃখে। কিন্তু তিনি সেটাই করেছিলেন নিজের অজান্তে। এইটিই আমার বাবার চরিত্র। যে অনুভূতিগুলি থেকে তীব্র আবেগের সঞ্চার ঘটে, সেগুলি তিনি কোনও অবস্থাতেই পরিহার করতে পারতেন না। সযত্নে রক্ষা করতেন মনের মাঝে। কিন্তু সে গুলির জন্য যতটা ত্যাগ স্বীকার করা দরকার হত, তা কিন্তু তিনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে করতে পারতেন না। আমি সযত্নেই এই বাক্যটি তৈরি করলাম।

সূর্যমুখীর নাতিও প্রায় একই রকম কথা বললেন। তিনি বললেন, নায়েব উকিল সারা জীবন ধরে রাধাদিদির প্রতি যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাতে এই অবস্থার কথাটি অস্বীকার করা যায় না। প্রথম দিন রাধাদিদি অসহায় অবস্থায় তাঁর বাড়িতে বিপিনবিহারীর সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। সেই সন্ধ্যা, যখন নায়েব উকিল বুঝতেই পারছিলেন, এই মেয়েটি জীবনের প্রথম রতিক্রিয়ার পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই দুপুর। মাঠের ধারে পাকা সড়কের উপরে গাড়িতে বসে নায়েব উকিল নিশ্চয়ই দেখেছিলেন, দূর থেকে রাধাদিদি আসছেন। তিনি আঘাতে ভেঙে পড়ছেন। তিনি নুয়ে পড়ছেন। তবু তিনি আসছেন। তাঁর দিকেই আসছেন। এই পরম আশ্বাসে আসছেন যে, একবার তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলে যন্ত্রণার উপশম হবে। জীবন নিরাময় হবে। ত্রস্ত ও আহত এক মেয়ে যে বাকি জীবনের জন্য ওই একটি মুহূর্তের উপরে অপেক্ষা করছে, যে মুহূর্তে সে তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠবে, এই দৃশ্যটি সারা জীবন পরম যত্নে লালন করেছেন নায়েব উকিল।

কর্তাদাদার প্রভাবেই হয়তো নায়েব উকিলেরও বঙ্কিম প্রীতি ছিল। বঙ্কিমের 'কবিতা পুস্তক' তাঁর ঘরে ছিল। সেই পুস্তকের 'আদর' কবিতাটির প্রতিটি ছত্রের নীচে ছিল নীল কালির দাগ। কেন জানি মনে হয়, নায়েব উকিলই সেই দাগ দিয়েছিলেন। সে কথা আরও জোর পেল ঠাকুরমশায়ের ছেলের কথায়। তিনি জানালেন,

নায়েব উকিলকে আহিরীটোলার বাড়িতে এক সান্ধ্য আসরে রাধার সামনে উচ্চস্বরে খুব আবেগের সঙ্গে ওই কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন—'মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুসুম, পূর্ণিত সুবাসে। বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র, আঁধার আকাশে।। নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী, বিশাল প্রান্তরে। রতন শোভিত যেন একই তরণী অনন্ত সাগরে।। তেমনই আমার তুমি প্রিয়ে, সংসার ভিতরে।।' সে দিন বিপিনবিহারী ছিলেন না। রাধা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন।

কিন্তু রাধা কতটা কবিতার মানে বোঝেন, সে প্রশ্ন পরেও উঠেছে, এখনও উঠল।

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে নায়েব উকিলের ওই কবিতাপাঠেই। বঙ্কিমের কবিতাটি বেশ বড়। কিন্তু নায়েব উকিল কবিতাটির একটু অংশই কেবল বলেছিলেন বলে জানিয়েছেন ঠাকুরমশায়ের ছেলে। এই যে বাকি অংশটি তিনি বাদ দিলেন, তার মধ্যেই ধরা রয়েছে রাধার সাহিত্য বোধ ও নায়েব উকিলের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানের ঠিকানা।
খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা কী রকম?
সূর্যমুখীর নাতি বললেন, যে তথ্য তুমি পেয়েছো, তাতে আমি নিশ্চিত, কবিতাটি নায়েব উকিলের খুবই প্রিয় ছিল। না হলে এমন মুখস্থ করতেন না। তক্কে তক্কে থেকে রাধার সামনে আবৃত্তিও করতেন না।
---অর্থাৎ, বিপিনবিহারীর প্রভাবেও তাঁর বঙ্কিম প্রীতি কমেনি।
সূর্যমুখীর নাতির বক্তব্য, নায়েব উকিল ছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে। ভাবপ্রকাশের জন্য রবিবাবুর কবিতার চেয়ে বঙ্কিমের উপরেই তাঁর বেশি করে নির্ভর করারও কথা। একটু ভারি শব্দ, ভারি ভাব, তাঁর পছন্দের হওয়ারই তো ছিল। তাতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। তার চেয়েও বড় কথা, ওই ভারি শব্দগুলোর জন্যই রাধা যে তা বুঝতে পারবেন না, সেটাও অনুমান করেছিলেন নায়েব উকিল। এটা খুব জরুরি ছিল। কারণ, রাধার ভালোবাসা তীব্রভাবেই একমুখী। তা বিপিনবিহারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। তাই কবিতাটি বুঝতে পারলে তিনি বিপিনবিহারীকে বলে দিতেন যে, নায়েব উকিল তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছে। সেটা নায়েব উকিল স্বাভাবিক ভাবেই চাননি। তাঁর মনের দু'টি ভাগ। একটি ভাগে বিপিনবিহারীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, অন্য ভাগটিতে রাধার জন্য প্রণয়। তিনি এই দু'টি ভাগের মধ্যে রফা করলেন এই ভাবে যে, এমন ভাবে প্রণয় নিবেদন করতে হবে, যাতে রাধা তা বুঝতেই না পারেন। নায়েব উকিল কেবল মনের ভারটুকু লাঘব করতে চেয়েছিলেন। তবে কেন রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি, তা বলি। গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, বঙ্কিমের এই পঙ্‌ক্তিগুলি রবিবাবুরও পছন্দ হয়েছিল। তিনি বঙ্কিমবাবুর বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে এই লাইনগুলির প্রশংসাই করেছিলেন। কিন্তু এরপরেই কবিতাটিতে বঙ্কিম লিখছেন, 'সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে, রম্য বৃক্ষতলে। শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র বরষার জলে।।' সেই ছত্রগুলি সম্পর্কে রবিবাবু লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন।' ঠাকুরমশায়ের ছেলের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এই লাইনগুলো নায়েব উকিলও বলেননি। কেননা, শীতের আগুন, বর্ষার ছত্র এই সব উপমা রাধার বুঝে যাওয়ার কথা। আর, একবার তা বুঝে গেলে, গোটা কবিতাটারটিই ভাবটি যে ঠিক কী, তা-ও তিনি বুঝে যেতেন। তাই শুধু কবিত্বগুণ সম্পর্কে জ্ঞানের জন্যই নয়, বিষয়বুদ্ধির খাতিরেও নায়েব উকিল লাইনগুলি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু 'তেমনই আমার তুমি প্রিয়ে, সংসার ভিতরে' এই লাইনটির অর্থ তো রাধার বুঝে যাওয়া কথা। তাতেও তো একই সমস্যা হওয়ার কথা।

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, কোনও একটি বাক্যর মানে বোঝা এক কথা। কিন্তু যখন সারি দিয়ে পরপর অনেকগুলো কঠিন বাক্য এসে হাজির হয়, তার সম্মিলিত না বোঝাটা একটা ভার তৈরি করে মনে। ওই 'পূর্ণিত সুবাস' বা 'নিদাঘ সন্তাপ' ধরনের শব্দগুলি তখন কবিতাটির মূল ভাবটি বোঝার মুখে একটা লোহার বন্ধ দরজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার পরে 'তেমনই আমার তুমি প্রিয়ে, সংসার ভিতরে'-র মতো সরল বাক্য শুনলেও তার মানে তালেগোলে হারিয়ে যাওয়ার কথা। নায়েব উকিল তাঁর টনটনে বিষয়জ্ঞানে এই সুযোগটা নিয়েছিলেন। তিনি বলার কথাটি বললেন, কিন্তু তা এমন শক্ত শক্ত কথার ঘোমটা তৈরি করে দিয়ে বললেন, যাতে তা বলা হয়েও বলা হল না। অর্থাৎ যাঁকে বললেন, তিনি বুঝেও বুঝলেন না। কাশীর হরিদাসবাবাজি এই ভুলটা করেননি। তিনি রাধাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর পাশে রয়েছেন। তাই তিনি ঝর্নার মতো স্বচ্ছ, সরল, মোলায়েম গতিসম্পন্ন একটি কবিতা বেছে নিয়েছিলেন, যাতে তা বিনা আয়াসেই রাধার মনে প্রবেশ করে যেতে পারে। হরিদাস বাবাজি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। নায়েব উকিল কিন্তু একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন।

---ওই পুস্তক সমালোচনাটিতে প্রবীণ বঙ্কিমকে তরুণ রবীন্দ্রনাথ খুবই আক্রমণ করেছিলেন।

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, রবিবাবু তো মধুসূদনের মেঘনাদ বধের মতো কাব্যেরও বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এ নিয়ে কোনও কথা বলব না। কিন্তু এ টুকু বলব যে, ওই সমালোচনাটিতে রবিবাবুরও একটি মারাত্মক প্রমাদ ধরা রয়ে গিয়েছে।

--সেটি কী?

--প্রথমে বলি, একটু তরল ভাষায় বঙ্কিমকে আক্রমণ করলেও বঙ্কিম সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে রবিবাবুর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি লিখেছিলেন, 'উপসংহার কালে আমরা একটি মাত্র কথা বলিব—বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।' এরপর তাঁর মত হল, 'আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভালো একজন উপন্যাস-লেখক ভালো কবি হইতে পারেন না।' অথচ দেখো, রবিবাবু নিজেই ভালো কবি ও ভালো ঔপন্যাসিক।

সূর্যমুখীর নাতির বক্তব্য, রবিবাবুর এই স্বভাব ক্ষণপ্রভাতেও আরোপিত হয়েছিল। ক্ষণপ্রভা চিঠিতে 'ব্রজজন টুটায়ল পরাণ' বলে যে গানটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি বঙ্কিমের লেখা। গানটি সূর্যমুখী গাইতেন। তাঁর মুখেই শুনে থাকবেন ক্ষণপ্রভা। এই অংশটুকু তাঁর ভালোও লেগেছিল। তাই তা উল্লেখও করলেন। এই খানে নায়েব উকিলের সঙ্গে ক্ষণপ্রভার একটি মিলও যেন দেখতে পাই। দু'জনেই নিজেদের মতো করে কাব্য সম্পাদনা করে নেন।

--নায়েব উকিলের সঙ্গে ক্ষণপ্রভার সম্পর্ক কেমন ছিল?

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, আমি যতদূর জানি, কোনও সম্পর্কই ছিল না। ক্ষণপ্রভা নায়েব উকিল কে সেটুকু জানতেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর নায়েব উকিল বাইরে শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও ক্ষণপ্রভাকে তেমন পছন্দ করতেন না বলেই মনে হয়। তাঁর মন ভরে ছিলেন রাধাদিদি।

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, রাধাদিদির এই আশ্রয় নিতে চাওয়াটুকুই তাঁকে দেবী করে দিয়েছে নায়েব উকিলের চোখে। কেননা, রাধাদিদি তখন জীবন্ত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর জীবনের রহস্যগুলি যেন সূর্যমুখীর বলা কথার মতো 'ঘোর রঙের প্রলেপ' তৈরি করে দিচ্ছিল নায়েব উকিলের চোখে।

রাধার মনেও সেই প্রলেপ পড়ল বারাণসী পৌঁছে। বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, নায়েব উকিল ট্রেনে রাধাদিদিকে তুলে দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন। রাধাদিদি সেই রাতে যাত্রা করেছিলেন, ভিড়ের মধ্যে, বারাণসীর দিকে। তাঁর পাশে বসে যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকে পশ্চিমেই থাকেন। তাঁদের কথা, খাওয়াদাওয়া, ট্রেনের মধ্যেই এক খণ্ড সংসার, এ সবে রাধাদিদির মন ও শরীরের ক্ষতে প্রলেপ পড়ছিল। তিনি তখন আর অপরিচিত জায়গায় যাওয়ার ভয় পাচ্ছিলেন না। বরং পরিচিত জায়গা থেকে উৎপন্ন ভয়টা আস্তে আস্তে কাটছিল। তিনি স্বাভাবিক হচ্ছিলেন।

পরের দিন বারাণসীতে পৌঁছে তিনি নিজেই পথ চিনে চলে গিয়েছিলেন হরিদাসবাবাজির বাড়িতে। তাঁকে নায়েব উকিল সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। শরীর মনের ওই অবস্থাতেও রাধাদিদি সে সব কথাই মন দিয়ে শুনে নিয়েছিলেন। এইটি রাধাদিদির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। হরিদাস বাবাজির বিশেষ গুণটি হল, তিনি জানতেন রাধাদিদি আসবেন, কিন্তু তিনি তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি জানতেন, রাধাদিদি ঠিকই তাঁর বাড়ি পৌঁছে যাবেন। যে লোককে তিনি চেনেন না পর্যন্ত, সে লোকও কোথায় কী করতে পারে, তা কেবল তাঁর বর্ণনা পেয়েই বুঝে নেওয়ার এই গুণ গ্রামের ঠাকুরমশায়ের ছিল না। এখানেই হরিদাসবাবাজি তাঁকে পেরিয়ে যান।

এই আচরণেই বোঝা যায় হরিদাসবাবাজির রাধাদিদির জন্য প্রস্তুতিও ছিল। তার আরও একটি প্রমাণ, রাধাদিদি যখন আহত ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকছেন, তখন হরিদাসবাবাজির বাড়ির প্রাঙ্গণে বাঁশি বাজছে। ওই বাঁশির সুরই যেন পথ দেখিয়েছিল রাধাদিদিকে। তিনি সেই সুর ধরে বাড়িটিতে ঢুকে পড়ে শোনেন, সুকণ্ঠ হরিদাসবাবাজি মনপ্রাণ ঢেলে গাইছেন—ও অকূলের কুল, ও অগতির গতি, / ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি। / ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু, / ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু। / ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা, / ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা। / ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল— / ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

১১
পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল

প্রতিটি শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল আকুতির মতো করে। রাধাদিদি পরে নায়েব উকিলকে বলেছিলেন, প্রত্যেকটি শব্দ যেন তাঁরই কথা বলে তিনি মনে করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল হরিদাসবাবাজির কণ্ঠ। তিনি যেন গাইতে গাইতে গানের অঙ্গই হয়ে যান। ওই আকুতির তীব্রতা তখন রাধাদিদির মনের কথা ধরতে পেরেছিল সম্পূর্ণ ভাবে।
--হরিদাসবাবাজি রবীন্দ্রনাথের গানের খবর রাখতেন?

--রাখবেন না কেন? তিনি পড়াশোনা করা লোক ছিলেন। তাঁর ভক্তেরাও অনেকে ছিলেন সুশিক্ষিত। যেমন বিপিনবিহারী, দুলালচন্দ্র বা নায়েব উকিল। আরও অনেক ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপকও ছিলেন তাঁর ভক্তদের তালিকায়। তাঁর পছন্দের কিছু তাঁদের কেউ কোথাও দেখলে, তার সন্ধান তাঁকে দিতেন বৈকি। হরিদাসবাবাজির গুণ ছিল, তিনি সে সব নিজের মতো করে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারতেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাওয়া হলে তিনি বৈষ্ণব পদ গাওয়ার পরে যেমন ভাবে হরির লুঠ দিতেন, তেমন ভাবেই হরির লুঠ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কার কথা ভেবে এই গানটি লিখেছিলেন, কিচ্ছু এসে যায়নি তাতে। কোন গান কৃষ্ণের আর কোন গানটি অন্য কারওকে নিবেদিত, তা তিনি দেখতেন না। তাঁর মনের দ্বার খোলা থাকত। তেমন মনের মতো কিছু পেলে হর্ষোন্মাদ হয়ে যেতেন। তাঁর মতো ওই ভাবে আনন্দ আত্মসাৎ করতে আমি আর কারওকে দেখিনি। এখানে যেমন তাঁর তেমনই রূপ দেখে রাধাদিদির মনে তা গেঁথে যায়। তিনি যেন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন, এই আনন্দময় পুরুষটির কাছ থেকে তিনিও আনন্দের ভাগ পাবেন। তিনি প্রফুল্ল মনে হরিদাসবাবাজির সামনেই বসে পড়েন। তবে ওই যে বলেছি, হরিদাসবাবাজির প্রস্তুতিও ছিল রাধাদিদির জন্য। হরিদাসবাবাজি যখন গান শেষ করে হরির লুঠ দিচ্ছেন, তখন বাতাসা কুড়িয়ে নেন রাধাদিদিও। সেই তাঁদের প্রথম দেখা। মাটি থেকে বাতাসা তুলতে গিয়ে রাধাদিদি আচমকা খেয়াল করেন, যেন তাঁর সামনেই পড়ছে বাতাসার এক ঝর্না। তিনি অবাক হয়ে মাটি থেকে চোখ তুলে দেখেন, কখন যেন ভিড় ঠেলে হরিদাসবাবাজি তাঁর সামনেই এসে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই প্রফুল্ল নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতের কাঁসার থালাটি রাধাদিদির দিকে ঢলে রয়েছে। হরিদাসবাবাজি হাসছেন। উপবিষ্ট রাধাদিদি ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মান হর্ষোৎফুল্ল উজ্জ্বলকান্তি হরিদাসবাবাজির দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই হাসিটি দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন, অবশেষে নিশ্চিন্দি। তারপরে সবাই যখন হরিদাসবাবাজির পায়ে পড়ছেন, রাধাদিদি তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দৃশ্যটা কল্পনায় দেখে নাও। হরিদাসবাবাজি তখন পূর্ণ দৃষ্টিতে রাধাদিদিকে দেখেন। তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

--রাধা গানের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন বলে বললেন।

--বুঝতে পারবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো তো খুবই স্বাভাবিক। এটুকু না বোঝার মতো তো কিছু নয়। তবে সব থেকে বড় কথা হল, গানটির শব্দগুলি বড় সৎ। গানের কথাগুলি হয়ে উঠেছিল ও মনোহর কথা, ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা। তা ছাড়া, মনোহর বা মরম শব্দগুলি এখন যতটা অপরিচিত মনে হচ্ছে, বা শুধু শিক্ষিতজনেরই ব্যবহার্য বলে মনে হচ্ছে, তখন তেমন ছিল না। গ্রামের লোক এমন শব্দ ব্যবহার করতেন। 'মরমের ব্যথা'ও অপরিচিত কোনও ভাব নয়। আর একটা কথা, মনের ওই অবস্থায় রাধাদিদি কথাগুলো বুঝে নিয়েছিলেন। কেননা তিনি যে এই কথাগুলিরই অপেক্ষা করছিলেন। কথাগুলি যে ছিল পিপাসার্তের মুখে ঠান্ডা জলের মতোই। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার, নায়েব উকিল দুলালচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে 'অপেরা-ধর্মে'র কথা বলেছিলেন। এই অপেরা-ধর্ম হরিদাসবাবাজির মধ্যেও ছিল। এই যে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাওয়া, বিশেষ করে ওই গানটিই গাওয়া, যে গানে এমন সব কথা রয়েছে, যা রাধাদিদির সেই সময় একান্ত ভাবে চাওয়ার কথা দিয়েই তৈরি, এমন সময় গাওয়া ঠিক যখন রাধাদিদি বাড়িতে প্রবেশ করছেন এবং তারপরে রাধাদিদির সামনেই গিয়ে হাসি মুখে ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে বাতাসার ঝর্না তৈরি করা, এই সবই ওই অপেরা-ধর্মের প্রতিফলন। তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, অপেরা ধর্মটি কী? তবে সেটা আমার বলার দরকার নেই। দুলালচন্দ্রকে নায়েব উকিল যে চিঠিটি লিখেছেন, তাতে সে কথা পরিষ্কার করে বলা রয়েছে। আমি শুধু এইটুকু বলব যে, হরিদাসবাবাজি ওই অপেরা-ধর্মের জন্যই রাধাদিদির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ-ক্ষণটি সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করেছিলেন। তাতে গান ছিল, নাচ ছিল, আবেগ ছিল, ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ভক্তজন সমাবেশে যেন একটি মঞ্চও তৈরি করা হয়েছিল। রাধাদিদি এই পরিবেশে অভিভূত হয়ে যান। আর ঠিক সেইটিই চেয়েছিলেন হরিদাসবাবাজি।

--সেই মঞ্চ কি ছিল বাড়ির উঠোনটি?

--তুমি উপন্যাস লিখবে বলে লোকেশনের খোঁজ করছ? তা ভাল। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল এক তলার একটি বড় ঘরে। বঙ্কিম যেমন রাধারানি উপন্যাসে লিখেছিলেন অনেকটা সেই মতোই, হরিদাসবাবাজি ও রাধাদিদি যখন একে অপরের দিকে চেয়ে রয়েছেন, 'এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।' কথাটা মনে পড়ল এই কারণে

যে, বঙ্কিম দেবেন্দ্রনারায়ণের চেহারা যেমন এঁকেছিলেন, হরিদাসবাবাজির সঙ্গে তার কিছু মিল ছিল। তবে দেবেন্দ্রনারায়ণ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবক এবং সে পড়েছে প্রেমে, হরিদাসবাবাজি যেখানে তখন প্রৌঢ় এবং তিনি পড়েছেন স্নেহে। কিন্তু হরিদাসবাবাজিরও বর্ণটুকু স্ফুটিত মল্লিকারাশির মতো গৌর ছিল। শরীর ছিল দীর্ঘ। চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রুযুগ সূক্ষ্ম, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ। নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল। বঙ্কিম সাক্ষী, ছেলেদেরও এমন চেহারা বাঙালি ঘরে হত। তাঁর রূপ জ্বলজ্বল করত। সেই সঙ্গে গলায় ছিল সুর। মনে ভক্তি। সেই রূপবান মানুষটি তাই যখন কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতেন গান গেয়ে, তখন মোহিত হয়ে যেতেই হত। ঘরে বড় বড় জানলা ছিল। ওই ঘরেই থাকতেন হরিদাসবাবাজি। বাড়িটি তিন তলা। কিন্তু হরিদাসবাবাজি নিজে এক তলায় থাকতেন বলে সারা বাড়ি থাকত শান্ত। যাঁরা উপরের ঘরগুলিতে থাকতেন, তাঁরা কিছুটা অপরাধবোধেও ভুগতেন। আস্তে চলাফেরা করতেন। আস্তে কথা বলতেন। রাধাদিদি উঠলেন গিয়ে দোতলার একটি অন্য দিকের কোণের ঘরে। এই প্রথম তিনি কোনও বাড়ির দোতলায় রইলেন। সে ঘরের একটি বারান্দাও ছিল। তাতে হনুমান এসে বসত।

--বাড়িটি তো ছিল দুলালচন্দ্রের। তিনি কিছু জানতেন না?

--না।

--সে কী করে সম্ভব?

--বিপিনবিহারীর কথাতেই সম্ভব হয়েছিল। হরিদাসবাবাজির সঙ্গে তাঁর অতি সুন্দর সম্পর্ক তো ছিলই। তাই তিনি সেই খাতিরে বাবাজিকে জানান, একটি অনাথা মেয়েকে তিনি তাঁর কাছে পাঠাবেন। তাঁকে আশ্রয় দিতে হবে। বাবাজি প্রশ্নমাত্র না করে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলেন। আর আশ্রয় দেবার কথাতে দুলালচন্দ্রের সম্মতির ধারও ধারেননি। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন, বিপিনবিহারীর অনুরোধটির মধ্যে কোনও বিশেষ কথা রয়েছে। তবে রাধাদিদি তারপরে তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছিলেন।

--রাধা সেখানে কী করে সময় কাটাতেন? তিনিও পুজো-কীর্তনে ঢুকে পড়েছিলেন?

--রাধাদিদি তখন সেখানে রান্না করতেন। বেশ ভাল রুটি করতে শিখেছিলেন। আর নানা রকমের ডাল মিশিয়ে একটি রান্না করতেন তিনি, তা সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। শুনেছি মোক্ষদা খুব ভাল রাঁধতেন, তাঁর কাছ থেকেই রাধাদিদি রান্না শিখেছিলেন কি না, বলতে পারব না। তবে কর্তাদাদার বাড়িতেও রুটির চল ছিল। বিশেষ করে রাতে কর্তাদাদা, পাইক, বরকন্দাজ, শিবু সর্দার ও তার শাগরেদরা সকলেই রুটি খেতেন। কিন্তু সেই রুটি ছিল পাতলা। হরিদাসবাবাজির বাড়িতে রুটি হত মোটা মোটা। বলতে ভুলে গিয়েছি, রাধাদিদি খুব ভাল টক রাঁধতে পারতেন। কাঁচামিঠে আম বা তেঁতুল কিংবা ছোট মাছেরও ভাল টক বানাতেন তিনি। ঠাকুরমশায় মাছ খেলেও হরিদাসবাবাজি কিন্তু মাছ খেতেন না। ওই বাড়িতে মাছ ঢুকতোও না। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার ছিল সেখানে। নিরামিষ রান্নায় সাধারণত স্বাদ ভাল হয়, কিন্তু হরিদাসবাবাজির বাড়িতে যাঁরা রান্না করতেন, তাঁরা তেমন তরিবৎ করে খাবার তৈরি করতে পারতেন না। রাধাদিদি সেখানে তাঁর অন্যরকম রুটি, ডাল, সর্ষে বা পোস্ত দিয়ে শাকভাজা, নানা রকম টক ইত্যাদি সম্ভার নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে বেশ একটা কোলাহল ফেলে দিয়েছিলেন। সকলের খুব প্রিয়ও হয়ে যান। তবে তাঁর ঝালের হাত ছিল। সেইটুকু মানিয়ে নিতে হয়েছিল দু'পক্ষকেই। রাধাদিদি যে পুজোর দিকে বেশি ঘেঁষতেন না, সেটাও সকলে খেয়াল করেছিলেন। আমার মনে হয়, রাধাদিদি মনের দিক থেকে পুজোয় খুব সাড়া পেতেন না। তা ছাড়া, নিম্ন বর্ণ হওয়াতে পুজো নিয়ে তাঁর নিজের মনেই সম্ভবত বাধা ছিল। হরিদাসবাবাজি সে বাধা ভাঙাতে চেষ্টাই করেননি। কারণ, মনে হয়, তিনি বুঝেছিলেন, রাধাদিদি ঘরকন্নার কাজেই বেশি স্বচ্ছন্দ, তাই তিনি তাঁকে তাই করতে দিয়েছিলেন। এটাও আমি হরিদাসবাবাজির গুণ বলেই মনে করি। রাধাদিদি অবশ্য একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন,

ঠাকুরের বাসন তিনি মাজতেন। মেজে ঝকঝকে করে দিতেন। তবু রান্না করাটাই সকাল সন্ধ্যা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। পাড়া বেড়ানোও তাঁর শখ ছিল। বাঙালির কোনও অভাব কোনওদিনই বারাণসীতে ছিল না। তাই বন্ধুর অভাবও হয়নি রাধাদিদির। অনেককে আমি দেখেছি রাধাদিদি বারাণসী ছেড়ে চলে যাওয়ার বহু বছর পরেও তাঁর খোঁজ করছেন। অনেককে বোধহয় গোপনে সাহায্যও করতেন।

--টাকা কোথা থেকে পেতেন?

--নায়েব উকিল মাসে মাসে কিছু টাকা তাঁর জন্য মানি অর্ডার করতেন। টাকাটা বিপিনবিহারীর, পাঠাতেন নায়েব উকিল। মানি অর্ডারের সঙ্গে সামান্য দু'একটা লাইন লেখা যেত। তাতে নায়েব উকিল গ্রামের খবর পাঠাতেন রাধাদিদিকে। রাধাদিদি তা পিওনকে দিয়ে পড়িয়ে নিতেন। টাকাটা ছিল রাধাদিদির নিজস্ব। তিনি কী ভাবে খরচ করতেন, তা কেউ কোনওদিন জানতে চায়নি। হরিদাসবাবাজির বাড়িতে ভক্তির একটি শৃঙ্খলা কাজ করত। তাতে জাতপাত মানা হত না। সেই শৃঙ্খলাতেই রাধাদিদি কখনও হরির লুঠের বাতাসা কিনে এনে থালার উপরে চুড়ো করে সাজাতেন।

--হরিদাসবাবাজি কোন বিগ্রহের পুজো করতেন?

--আশ্চর্যের কথা হল, হরিদাসবাবাজি লক্ষ্মী-নৃসিংহের সেবা করতেন। মূর্তিটি কালো পাথরের তৈরি। নৃসিংহ বলতে অবশ্য মাথাটা সিংহের এমন ভেবো না। আসলে সেই দেবতাই, কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্মীর সামনে, তখন তাঁর মুখ মানুষের মতোই। নারায়ণ যেন। এটি একটি বিশেষ অবস্থা। তাঁর মুখটি বেশ দার্ঢ্য ভরা। সপ্রেম হাসিটিও খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ। মাথার উপরে একটি বড় লম্বা টোপরের মতো মুকুট। যার শীর্ষটি ক্রমে ছোট হতে হতে গিয়েছে। বাঁ হাতে লক্ষ্মীর কটিদেশ জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। লক্ষ্মীও একই ভাবে অতিশয় সপ্রেমে তাকিয়ে রয়েছেন নারায়ণের দিকে। তাঁর মুকুটটি ছোট কিন্তু অলঙ্কৃত। দু'জনেরই চোখ বেশ বড় বড়। নারায়ণের মুখের হাসিটি বড়। তাতে প্রেমই প্রতীয়মান। লক্ষ্মীর হাসিটি মৃদু তবে তাতে রয়েছে প্রেমিকের ডাকে সাড়া দেওয়ার খুশি। দু'জনেরই গায়ে একাধিক অলঙ্কার। অলঙ্কারগুলি গায়ে সেঁটে বসে রয়েছে। নৃসিংহের চেহারা বড় এবং বলশালী। লক্ষ্মী ছোট কিন্তু খুবই সুন্দরী।

--কিন্তু এতে আশ্চর্যের কথাটি কী?

--আশ্চর্যের কথাটি বুঝতে পারছো না? সব আরাধ্য বিগ্রহই সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে। যুগল মূর্তিও তাই। যেমন কর্তাদাদার গ্রামের রাধামাধব। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু হরিদাসবাবাজির লক্ষ্মী-নারায়ণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। তাঁরা নিজেদের প্রেমে নিজেরাই মগ্ন। ভক্তের কাছে বরং ধরা পড়ছে তাঁদের একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। এই যে অন্তরঙ্গ প্রেমের একটি মুহূর্ত তাঁরা লুকিয়ে রাখছেন না, শুধু নিজেদের করেই রাখছেন না, সেটিই ভক্তদের প্রতি তাঁদের বিশেষ উপহার। ভক্তদের এক লহমায় তাঁরা নিজেদের প্রেমের অংশভুক্তও করে ফেলেন। এই কথাও যে কারণে বলা যায় যে, এখানে লক্ষ্মী-নৃসিংহ বিগ্রহ নন, বিগ্রহ আসলে লক্ষ্মী-নৃসিংহের আচরণ থেকে উৎসারিত প্রেম। অর্থাৎ একটি অনুভূতি। এবং সেই অনুভূতিটির সঙ্গে মনে মনে সিংহের উপস্থিতি যুক্ত হয়ে তাতে একটি প্রতাপ দিয়েছে।

--হরিদাসবাবাজি সেই প্রতাপযুক্ত প্রেমের অনুভূতিটিরই আরাধনা করতেন, এমনটি বলছেন?

--এটাই তো তাঁর গুণ। তুমি ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা বন্দনা পড়েছো? বাবাজি প্রায়ই গাইতেন—'কিবা সুললিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী। শোভে নিরুপম বাস দশদিক পরকাশ ত্রিভুবনমোহনকারিণী।। কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর উচ্চ কুচ সুধার কলস। কন্ঠ কম্বুরাজ রাজে নানা অলঙ্কার সাজে প্রকাশে ভুবন চতুর্দশ।।' হরিদাসবাবাজির এই গুণটি ছিল অনির্বচনীয়। তিনি প্রেমের প্রকাশের প্রতি উন্মুখ থাকতেন। সেই প্রকাশের রূপে শরীর যে একটি অলঙ্কার স্বরূপ, তা মানতেন। না হলে অমন একটি বিগ্রহের পুজো করতে

পারতেন না। তাঁর পুজোও ছিল প্রেমের প্রতাপের উদ্‌যাপন। রাধাদিদিকেও সানন্দে এই গানটি গাইতে শুনেছি। তা শুনে জ্যাঠামশায় মৃদু মৃদু হাসতেন। তিনি নিশ্চয় করে জানতেন, গানটির অর্ধেক কথার অর্থই রাধাদিদি জানতেন না। কিন্তু এই আর একটি সাহিত্য-ক্ষেত্র, যেখানে মানে বোঝা না গেলেও সুখ অনুভবে অসুবিধা হয় না।এই সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বসবাস করতেন হরিদাস বাবাজিও। সেখানেই থাকতেন ঠাকুরমশায়ও।

১২
সব দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভাল আমি নই

কিন্তু রাধার প্রসঙ্গে রাধারই বক্তব্য তো জানা যাচ্ছে না। তা জানার উপায় কী?
সূর্যমুখীর নাতি বললেন, রাধার প্রসঙ্গ বারবার নানা চিঠিতে উঠে এসেছে। নানা জনের ডায়েরিতেও রাধার কথা যথেষ্ট রয়েছে। সেখান থেকেই জানা যাবে। আর জানা যাবে আহিরীটোলার বাড়ি থেকে। সেখানে এক তলার পশ্চিম দিকের ঘরটিতে তিনি থাকতেন।
রাধার সঙ্গে ক্ষণপ্রভার প্রথম সাক্ষাত্‌টি ছিল বড় মনোহর। বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, রাধাদিদি তখন বাড়িতে সদ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। যে কারণে বাড়িতে সশরীরে তাঁর উপস্থিতিও আর অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। কাশী থেকে ফিরে তিনি সোজা আমাদের বাড়িতেই উঠেছিলেন। তাঁর নিখুঁত মুখ, নিটোল যৌবন দেখে ক্ষণপ্রভা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি গোপনে লজ্জার মাথা খেয়ে রাধা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর করেছিলেন। বেশিরভাগ তথ্যই তাঁকে জুগিয়েছিলেন দেওর বিনোদবিহারী এবং পাচিকা মোক্ষদা। তাতে রাধার গুণকীর্তনই বারবার শুনেছেন। কিন্তু রাধার রূপ যে এতদূর পর্যন্ত হতে পারে, তা তিনি ভাবেননি।

তখন সন্ধ্যাকাল। রাধা দাঁড়িয়ে ছিলেন মোক্ষদার পাশে এক তলার বিরাট থামগুলির পাশ ঘেঁষে। বিনোদবিহারী দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দার আর এক দিকে। রাধার দৃষ্টি ছিল নিচু। কাশীবাসকালের প্রভাবে হিন্দুস্তানিদের মতো তিনি একটি ঘাগড়া ও জামা পরেছিলেন। সেটা অবশ্য ছদ্মবেশও হতে পারে। যাতে গ্রামে ঢোকার সময়ে তাঁকে কেউ চিনতে না পারে। তিনি ঘাগড়ার উপরে একটি ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে কর্তাদাদার বাড়িতে ঢুকেছিলেন। লোকে ভেবেছিল, এ বুঝি কর্তাদাদার নতুন নোকরানি। সেই সন্ধ্যায় রাধার অলঙ্কার বলতে সামান্য একটা নাকছাবি। দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে তিনটে কালো বিন্দুর মতো টিপ। কানে দু'টো সস্তার ঝোলা দুল। হাতে কাচের মোটা মোটা গোটা কয়েক করে চুড়ি। হঠাত্‌ই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ক্ষণপ্রভার চোখে পড়ে রাধাকে। সঙ্গে সঙ্গে চিনেও ফেলেন। রাধাও ক্ষণপ্রভার দিকে অবাক হয়ে তাকান। দু'জনের দৃষ্টিতেই ক্রমে পরিবর্তন আসে। ক্ষণপ্রভার দৃষ্টি ভরে যায় ঘৃণায়। রাধার দৃষ্টিতে ভর করে ভয়। রাধা এক পা সামান্য তুলে পিছনে ফিরতে গিয়ে বোঝেন দাওয়া শেষ, তিনি আর একটু নড়লেই উঠোনে পড়ে যাবেন। তখন পদ যুগের সেই অবস্থাতেই ক্ষণকালের জন্য স্থবির হয়ে যান। তাতে তাঁর রূপ যেন আরও প্রসারিত হয়। তাঁকে সেই বৃন্দাবনের রাইকিশোরীর মতোই দেখতে লাগে। সেই সময়ে তাঁকে যেন কেবল আদরই করা যায়, শুধু বুকে জড়িয়েই রাখা যায়। ক্ষণপ্রভা প্রতিহত হলেন রাধার সেই রূপ ও ভঙ্গিতে। তিনি ত্বরা পায়ে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে। বিনোদবিহারী বৌদিদিমণির সঙ্গে সঙ্গেই উপরে উঠে যান। দেখেন ক্ষণপ্রভা নিজের ঘরে দেরাজটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তাঁর। দেওরকে দেখে প্রশ্ন করলেন, ও কি এখানেই থাকবে বিনোদ?

বিনোদবিহারী কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণপ্রভা কিন্তু তখন বলেন, থাকুক। তার পরে কিছু ক্ষণ সময় নিয়ে তিনি বলেছিলেন, জানো বিনোদ, একমাত্র এর সঙ্গেই আমি চোখের বালি পাতাতে পারি।

ডায়েরিতে রাধার প্রসঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রথমেই মনে পড়ে ক্ষণপ্রভার কথা। রাধার প্রতি তাঁর রাগই ছিল সব থেকে বেশি। ক্ষণপ্রভা যে দিন গৃহত্যাগ করলেন, সে দিনও খুব বৃষ্টি হয়েছিল। তিনি সে দিনই দুলালচন্দ্রকে চিঠিতে লিখছেন, 'নিজেকে যদি বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীর সহিত তুলনা করিতে পারি, তাহা হইলে বলি, সূর্যমুখীর কমলমণির সহিত যে সম্পর্ক ছিল, আমার সহিত পূর্বে ননদিনী সূর্যমুখীর সম্পর্ক ছিল ঠিক তেমনই। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হইবার পরে সূর্যমুখী কমলমণির নিকট যে সহায়তা পাইয়াছিল, আমি কিন্তু রাধার প্রসঙ্গে সূর্যমুখীর কাছ হইতে তাহা পাই নাই। আমার আপন ভগিনীর সহিত আমার স্বামীর সম্পর্ক গঠিত হইবার পরেও আমি সূর্যমুখীর নিকট হইতে কেবল নীতিকথাই শুনিয়াছি। তাহার চেয়েও বড় কথা, বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী নগেন্দ্রর প্রতি যেমন অবিচল ছিলেন, আমি তেমন থাকিতে পারি না।

'আর একটি কথা মনে হয়। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে সূর্যমুখীর সম্পর্ক স্থাপিত হইলে কী করিতেন কমলমণি?
'চোখের বালিতে বিনোদিনী বিহারীকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এ ক্ষণে তাহাই একটু ঘুরাইয়া বলি, রাধা যদি আমার স্বামীকে ভাল না বাসিত, তবে আমার দ্বারা তাঁহার এমন সর্বনাশ হইত না।

'সর্বনাশের কথা তুলিতেছি, কারণ আমি জানি, তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি, এ তিনি কিছুতেই সইতে পারিবেন না। তিনি পৌরুষ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নহেন। নিজের বৌ পলাইয়াছে বলিয়া খেদ করিবেন, এমন লোকও নহেন। বরং নূতন নাটক লিখিতে পারেন। কিন্তু খেদ করিবেন আমাকে ভালবাসেন বলিয়া। সেই খেদ ভয়ঙ্কর হইতে পারে। জামাইদাদা, সেই ভয়ঙ্করের আঁচ পড়িবে আপনার উপরে। আপনাকে সহ্য করিতে হইবে কর্তাদাদা এবং সূর্যমুখীর আন্দোলনও। আমি আপনার উপরে ভরসা রাখি। শুধু আমার জন্য আপনি সংসারের ঘাট হইতে সরিয়া যাইবেন, এই অতি বড় নৈবেদ্যটুকু আমার রমণী-জন্ম সার্থক করিবে।"

এরপর সূর্যমুখীকে লেখা তাঁর চিঠিটা উদ্ধৃত করি। সেখানে তিনি লিখছেন, 'এ কথাও তো সত্য যে, আমার স্বামী যদি একই সঙ্গে রাধা ও আমাকে ভাল বাসিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কেন একই সঙ্গে তাঁহাকে ও জামাইদাদাকে ভাল না বাসিতে পারিব?

'ইহাতে তোমার খেদের কারণ অবশ্য ঘটিবে। তোমাকে বিনোদিনীর কথা উদ্ধৃত করিয়াই বলিব, এই পরিস্থিতি আমি ঠেকাইতে পারিতাম, কিন্তু ঠেকাইব কাহার জন্য? তোমার দাদার সংসার রক্ষা করিতে? তোমার সংসার রক্ষা করিতে? আমার নিজের সুখ-দুঃখ কিছুই নাই? সংসারের ভাল হউক এই বলিয়া ইহকালে আমার সব দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভাল আমি নই।'

তবে দুলালচন্দ্রের কাছে যাওয়ার জন্য গৃহত্যাগের দিন দুলালচন্দ্র ও সূর্যমুখীকে তাঁর চিঠি লেখার আগে ডায়েরিতে ক্ষণপ্রভা লিখছেন, 'রাধা বারবার আমার ঘরে আসিতেছে। কেন? ও কিছু আঁচ করিতে পারিয়াছে? আমার শরীরের উপরে নজর রাখিয়া আমার মনের উপরে নজরদারি করিতে চায়? ও কি সুখ বোধ করিতেছে?

একেবারেই অশিক্ষিত এই মেয়েটি কেন যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল, কিছুতেই বুঝিতে পারি না। কী আছে তাহার? বিনোদিনীর মতো করেই বলিতে ইচ্ছা করে, বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই? তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোলো। নির্বোধ! অন্ধ।

'তাই আমি আজ নির্লজ্জের মতোই জামাইদাদার কাছে যাইতেছি। বিহারী বিনোদিনীকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে পুরুষকুলের খুব গর্ব হইয়াছে নিশ্চয়। কিন্তু জামাইদাদা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই যথার্থ পুরুষ। আমি যাইতেছি আমার বোধ নির্দেশিত আশ্রয়ে।'

বিনোদবিহারীর ভাই বললেন, নায়েব উকিল আমার বাবাকে বলেছিলেন, বিপিনবিহারীই কিন্তু জয়ী হলেন।
--কী করে?
--বিপিনবিহারী সেই পুরুষ, যিনি দায় স্বীকার করেন। রাধাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করতে তাঁর বেঁধেছিল। দুলালচন্দ্রও দায় স্বীকার করেছেন। এই দায় স্বীকার করাটা খুব বড় একটা কথা বলেই মনে করতেন ক্ষণপ্রভা। সূর্যমুখীর মত অবশ্য ছিল উল্টো। ক্ষণপ্রভা তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে থাকার সময় তিনি দুলালচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন,

"বঙ্কিমের উপন্যাসের সহিত আমার জীবন তাহা হইলে সত্যিই জড়াইয়া গেল।
নামকরণের পর হইতেই আমাকে নিয়ে এই ভয়টি পাইতেন আমার মা। বাবা বারবার বলিতেন, তাঁহার মেয়ের রূপ-গুণ এমনই যে, তাহাকে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। যত বড় হইতেছিলাম, বাবার মনে সেই বিশ্বাস ততই গাঢ় হইতেছিল। আমারও তাই। বিবাহের পরে নিশ্চিন্তই হইয়াছিলাম বলিতে পারো। তবু মনে মনে সতর্ক থাকিতাম। ভাবিতাম, সূর্যমুখীও এমন ভাবেই নিশ্চিন্ত ছিল। তাই কোনও ভাবে কুন্দনন্দিনী যাহাতে সংসারে ঢুকিয়া পড়িতে না পারে, সে জন্য মনের সব আলস্য ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে দাদার সহিত গ্রামের রাধার সম্পর্ক সৃষ্টির খবর পাইয়া নানা অন্যরকম চিন্তার উদয় হইল। বৌদিদিভাইয়ের কথা হইতে তখন মনে হইত, সেই যেন সূর্যমুখী। রাধা যেন কুন্দনন্দিনী। আমি পাইয়াছিলাম কমলমণির ভূমিকা। কিন্তু ঘটনাক্রম তেমন থাকিল না। আমি সূর্যমুখী সূর্যমুখীই রহিয়া গেলাম। সে হইয়া গেল কুন্দনন্দিনী।

এ বার তোমার কথা বলি। নগেন্দ্রকে চোর বলিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তোমাকে কী বলিব?
'আমি বরাবর শিক্ষা পাইয়াছি যে, স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়। বঙ্কিমের সূর্যমুখীও তাহাই করিয়াছে। কিন্তু আমি এক্ষণে তাহা করিতে অপারগ হইয়াছি। আমি ক্ষণপ্রভার মতো কুলত্যাগ করিতেও অসমর্থ। স্থির করিলাম, অপেক্ষা করিব। ক্ষণপ্রভার কাছে আমার হার হইতে পারে না। তুমি সম্পূর্ণ রূপে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে। আবার যদি তোমায় ভক্তি করিতে পারি, তাহা হইলে সে ক্ষণে তোমার শাস্তি বিধান করিব।"

ক্ষণপ্রভাকে লেখা একটি ছোট চিঠিও সেই সঙ্গে ছিল। তাতে সূর্যমুখী লিখছেন, 'কোনও রহস্য শেষ পর্যন্ত রাখিতে পারিলে না। তোমার রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মতোই মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে নিজের নামটি খোদিত করিয়া রাখিতে চাহিলে আমার স্বামীর অন্তরে। তাহাতে আমারও বুক জ্বলিয়া গেল। কিন্তু বহু যত্নে রচিত যে ঘোর রঙের প্রলেপ একদিন তোমাকে রহস্যাবৃত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে অবলুপ্ত। প্রেমের জন্য তোমার এই বড় একটি আত্মত্যাগ ঘটিল। তুমি উদ্ঘাটিত হইয়া গেলে বৌদিদিভাই।'

দুলালচন্দ্রের নাতির কথায়, প্রচণ্ড আঘাতের পরেও দিদিমার এই চিঠি দু'টি কিন্তু তাঁর শিক্ষার কথাই বলে। দুলালচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর কথায় যে এই প্রশান্তি প্রকাশ পায়, তিনি যে ঝড়ের সময়ে শুধুই ঝড়টুকুকে না দেখে ঝড় কেটে গেলে আবার শান্ত প্রকৃতির রূপটিকে দেখতে পাবেন বলে এমন প্রত্যয় রাখেন, তা থেকে তাঁর চরিত্রটি চমত্কার বোঝা যায়। বোঝা যায়, তিনি কতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কর্তাদাদা কিন্তু তেমন ছিলেন না। ঝড় উঠলে তিনিও ঝড়ের মুখে ঝড় হয়ে উঠতে চাইতেন।

ঠাকুরমশায়ের ছেলেকে গিয়ে সূর্যমুখীর চিঠি দু'টির কথা বললাম। তিনি কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। বললাম, ক্ষণপ্রভা ও সূর্যমুখীকে আপনি তো খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আপনার কী মনে হয়, তাঁরা যে যার মতো ঠিক কাজ করেছেন?

ঠাকুরমশায়ের ছেলের জবাব হল, তোমার দু'টো কথার উত্তর দু'রকম হবে। আমি কাছ থেকে দু'জনকেই দেখেছি এটা ঠিক। কিন্তু তাঁদের কাজ ঠিক না ভুল, সে তো কাছ থেকে দেখে বিচার করার মতো নয়। সে বিচার তো সমাজের মতে হয়।

--কিন্তু সে কাজ করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল কি না, তা আপনি জানেন।
--সব যে জানতাম তা-ও নয়। আমি তখন কিশোর। তাঁরা দু'জনেই আমার চেয়ে বড়। বড় ঘরের মেয়ে-বৌ। আমি দূরে দূরেই থাকতাম। বাবার সম্মান ছিল না বলে কর্তাদাদার বাড়িতে আমারও সম্মান ছিল না।
--তবু সে সময় আপনি ক্ষণপ্রভা ও সূর্যমুখীকে তো দেখেছেন। কেমন দেখেছিলেন তাঁদের?
--দেখেছি। কিন্তু গ্রামে আমার পড়াশোনা তেমন কিছু এগোয়নি। তাই আমি এঁদের তেমন বুঝতে পারতাম না। গ্রাম্য বিচারবুদ্ধিতেই তাঁদের বিচার করতাম। কিন্তু শিক্ষিতজনের কথায় ও আচরণে নানা কিছুর প্রভাব পড়ে। তা ধরতে গেলেও শিক্ষিত হতে হয়।

তারপরে তিনি বললেন, তুমি কিছু খুঁটিনাটি জানতে চাইছো উপন্যাসে রং দেবে বলে। তেমন কোনও সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। তবে এটুকু বলি, সূর্যমুখীকে আমার ক্ষণপ্রভার চেয়ে বেশি ভাল লাগত। তিনি অনেক শান্ত ছিলেন। নিজের উপরে বিশ্বাস ছিল অনেক গভীর। প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। এক দিন দুপুরে আমি খেতে বসেছি, মোক্ষদা মাসি ভাত বেড়ে দিয়েছে, হঠাৎ দেখি সূর্যমুখী এসে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি তো ভয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে নানা কথায় ভয়টা ভাঙিয়ে দিলেন। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দেখলাম তাঁর চোখ দু'টি ছলছল করছে। পরেও অনেক সময় তিনি নানা ছোটখাট কথা বলতেন। তাতে সম্পর্কটা সহজ হয়ে যেত। কিন্তু ক্ষণপ্রভা সব সময়েই দূরত্ব বজায় রাখতেন। একেবারে শেষ বেলার আগে আমার সঙ্গে কোনওদিন ভাল করে কোনও কথা বলেননি। ভাল করে তাকিয়েও দেখতেন না। অথচ আমার কথা জানতে চেয়েছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু যখন সত্যিই আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনি আমাকে দেখেও দেখলেন না।
--অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যে ধারণাটা ছিল যে, সূর্যমুখী অহঙ্কারী আর ক্ষণপ্রভা মাটির মানুষ, আপনি তার উল্টোটাই অনুভব করেছেন।

--অহঙ্কার থাকলেও মানুষ মাটির মানুষ হতে পারে। সূর্যমুখীর অহঙ্কার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সেটা তাঁর ভূষণ। সাজের অঙ্গ। আলাদা করে চোখে পড়ত, কিন্তু তাতে তাঁকে আরও ভালো লাগত। কর্তাদাদার জন্মদিনের রাতে তাঁদের মদ্যপানের যে বিবরণ তুমি পেয়েছো, আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। সেখানে দেখেছিলাম, ক্ষণপ্রভা বসেছিলেন দোতলার বসার ঘরের বিরাট আয়নাটির মুখোমুখি। সূর্যমুখী বসেছিলেন আয়নার দিকে পিছন ফিরে। ক্ষণপ্রভা নিজের রূপ বারবার আয়নায় দেখছিলেন। আমি বারান্দায় যাতায়াত করছিলাম। দরজা খোলা ছিল। একবার আমার সঙ্গে আয়নায় চোখাচোখি হয়ে যায়। তাঁর মুখ সঙ্গে সঙ্গে রাগে ভারি হয়ে যায়। আমি দোতলা থেকে নেমে আসি। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ক্ষণপ্রভা তেমন অহঙ্কারী ছিলেন না। আমার মনে হয়, তিনি নিজেকে নিয়ে সংশয়ে থাকতেন।

--এ রকম কেন মনে হত?

--বৌদিমণির আচার আচরণের মধ্যে তাঁর আবেগের দোলাচলের একটা প্রভাব পড়ত। সূর্যমুখী ঠিকই বলেছেন, ক্ষণপ্রভা সব সময়ে নিজের উপস্থিতির জানান দিতে চাইতেন। ওই যে এক প্রচণ্ড গরমের দুপুরে তিনি মন্দিরে গিয়েছেন শুনে বাবা পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, তার মধ্যে সেই ভাবনাটা ছিল। ক্ষণপ্রভা নিজের মনে চুপ করে বসে থাকতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্ভাবনাটি ছিল, মন্দিরের দ্বার খোলা না পেয়ে রেগে যাওয়ার। সেই রাগটিকে বাবা ভয় পেতেন। কর্তাদাদা আর তাঁর আসেপাশের সকলকে ভয় পাওয়াটা তিনি গুণ বলে বিবেচনা করতেন। আর কর্তাদাদা সেটা আনুগত্য বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু কথা হল, কর্তাদাদার তিন ছেলেমেয়ে এই আনুগত্যর খুব একটা ধার ধারতেন না। যেমন সূর্যমুখীও বাপের বাড়িতে থাকলে মন্দিরে যেতেন। কিন্তু যাওয়ার আগে বাবাকে খবর দিতেন কিংবা বলেই যেতেন, তিনি একটু একা থাকতে চান। তিনি যখন গ্রামের মেয়ে বৌদের সঙ্গে মন্দিরের চাতালে বসে গল্প করতেন, তখন তাঁকে গ্রামের মেয়ে বৌ বলেই মনে হত। ক্ষণপ্রভাকেও আমি গ্রামের কোনও মেয়ে বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি। কিন্তু সেই কথা কওয়ার মধ্যে দূরত্ব ছিল।

এরপরে ঠাকুরমশায়ের ছেলে অশ্রুতপূর্ব একটি ঘটনার কথা বললেন। তিনি বললেন, একবারের একটা ঘটনা বলি। তুমি সব কথারই নানা প্রমাণ সংগ্রহ করছ চিঠিপত্র, ডায়েরি থেকে। কিন্তু এই ঘটনার কোনও প্রমাণ সম্ভবত নেই। তবে আমি ঘটনাটির সাক্ষী। রাধা বলে মেয়েটির মা-র সঙ্গে একবার আমাদের মন্দিরেই সূর্যমুখী ও ক্ষণপ্রভার দেখা হয়েছিল।

উত্তেজনায় আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কোনও মতে বললাম, আপনি আদ্যোপান্ত সব বলুন, প্রমাণ দরকার নেই।

১৩
কি পুছসি অনুভব মোয়

ঠাকুরমশায়ের ছেলে এ বার আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন। যেন অনেক পুরনো দিনের সেই ঘটনাটি তাঁর মনের মধ্যে একটির পর একটি পরত খুলতে খুলতে যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, আমি আমার পর্যবেক্ষণ সুদ্ধু বলছি। তুমি তোমার মতো করে সম্পাদনা করে নিও। প্রথম কথা হল, রাধা আমার চেয়ে অনেকটা বড় ছিল। তাকে আমি চিনতাম তো বটেই, কিন্তু কোনওদিনও তার সঙ্গে তেমন সখ্য হয়নি। আমার ধারণা ছিল, বাবাও তাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। কিন্তু সে দিন অন্য রকম বুঝলাম। সে দিনও ছিল খুব গরমের দুপুর। সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাস। অনেকে মন্দিরে আম দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা সেই আমগুলি গুছিয়ে রাখছিলেন। আসলে এই সব নৈবেদ্য প্রধানত আমাদের বাড়িতেই যেত। তবে বাবা রোজ নিয়ম করে কর্তাদাদাকে জানাতেন। তাঁকে না পেলে নায়েববাবুকে বলে আসতেন, সে দিন মন্দিরে কত টাকা আর কী কী জিনিস পড়েছে। তবে কোনওদিনই কাছারি থেকে তার হিসেব খুব কষে দেখা হত না। জিনিসপত্রও কেউ চাইত না। বাবার কথাই বিশ্বাস করা হত। বাবা কিন্তু নগদ টাকা পেলে, সে যত কমই হোক, কাছারির খাতায় লিখে সেখানে দিয়ে আসতেন। শুধু ফল-চাল এ সব আমাদের বাড়িতেই আসত। বাবা এইসব সময় আমাকে ডেকে নিতেন। অনেক সময় অনেকে মন্দিরে উঠতে চাইতেন না। তাঁদের হাত থেকে নৈবেদ্য নিয়ে আমিই রেখে আসতাম বিগ্রহের সামনে। বাবা সেগুলি যত্ন করে মন্দিরের ঘরে এক পাশে চুপড়িতে রাখতেন। ভিজে লাল গামছা ঢাকা দিয়ে সেই চুপড়ি নিয়ে আসতেন বাড়িতে। গরম কালে অনেক দিন রাতে আম আর দুধ দিয়ে মেখে ভাত খেতাম আমরা। কেন জানি না, সেই খাবার সময় বাবা যতটা আনন্দে, হাসিখুশি মুখে গ্রাস তুলতেন একটার পর একটা করে, আমি ততটাই যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তাম। খুব কান্না পেত। মনে হত এই যে আমরা খাচ্ছি, এটা আমাদের খাবার নয়। এই যে বাবা খুব খুশি, সেই খুশি হওয়াটা উচিত নয়। আমরা যেন কোনও অন্যায় করছি। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একই সঙ্গে আমার মনে হত, আমাদের প্রাপ্য আরও বেশি। এইটুকুতে খুশি হওয়াটাও সমান অন্যায়, সমান অসন্তোষের কারণ। সূর্যমুখী কেন কী ভাবে জানি না, আমার মনের কথাটা বুঝে গিয়েছিলেন। সে কথা আমি বুঝতে পেরেছি সে দিন বাবার কাছে তাঁর আম চাওয়া থেকে। তিনি যে কখন মন্দিরে এসেছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারিনি। ক্ষণপ্রভা সব সময় থামের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসতেন। যেন পিঠের দিকটি নিরাপদ রাখতে চাইতেন। সূর্যমুখী বসতেন বিগ্রহের মুখোমুখি। সে ভাবেই বসে সেদিন তিনি বাবার কাজ দেখছিলেন। নিজের মনে বিদ্যাপতির পদ গাইছিলেন—'সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়!' রাধামাধবের দিকে তাকিয়ে বাবা গলা মেলালেন, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।'

তারপরে সূর্যমুখী জল চাইলেন। আমি দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাবা বললেন, পরে দিচ্ছি। সূর্যমুখী কিছুটা অবাক হলেও আর কোনও কথা বললেন না। কিছু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আম চেনেন ঠাকুরমশায়?
বাবা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে দেখে হেসে বললেন, চিনি। এই আমগুলি চিনির মতো মিষ্টি। এই আমগুলি একটু টক হবে।

সূর্যমুখী বললেন, একটা আম আমাকে দিন না?
বাবা এ বার বললেন, মন্দিরে বসে খেতে নেই মা।
--কেন?
--উচ্ছিষ্ট পড়ে যে।
--তা হলে দিন আমি আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই, ঘরে গিয়ে খাব।
--এই আম কি আপনার মুখে ওঠার মতো মা? ভাল আম কেউ নৈবেদ্যে দেয় না।
--এ কী কথা?
--ঠিকই কথা মা। অনেকে গাছের প্রথম আম দেয়, কেউ মানত রাখে বলে দেয়, কেউ বা এমনিই খালি হাতে আসতে চায় না বলে দেয়। এই আম দেওয়ার মধ্যে ভক্তিটুকু রয়েছে। সেটা শ্রদ্ধা করার মতো। কিন্তু আমটি তারা বেছে আনে না। ভাল আম দিতে চাইলে গাছের প্রথম আমটা নয়। ভাল আমটা দিত।
--কেন এমন হয়?
--কারণ তারা যে একটা কৃত্য করছে। ভক্তি ভরেই করছে। কিন্তু কৃত্যই করছে। এখানে ওই করা টুকুই গুরুত্বপূর্ণ। তাই গাছের প্রথম আম দেয়। সে আম ভাল হতে পারে, না-ও পারে। কিন্তু কৃত্যটুকুই প্রধান বলে তারা কাচা কাপড় পরে, হাত ধুয়ে আমটি সাবধানে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু আমটির গুণাগুণ বিচার করে না। আর তা ছাড়া, তারা যে জানে মা, পাথরের ঠাকুর আম খায় না। আম খাই আমি। তবে এ গ্রামের বেশিরভাগ আমই মিষ্টি।

অমলিন হাসির সঙ্গে বাবা এই কথাটুকু বলার পরপরই একটি আম মুখের সামনে তুলে তার বোঁটাটা সামান্য ভেঙে গন্ধ শুঁকে সূর্যমুখীকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই মন্দিরে ঢোকেন ক্ষণপ্রভা। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠেন, এ কি ঠাকুরমশায়, আপনি খুঁতো আম দিচ্ছেন ঠাকুরকে?

বাবা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। সূর্যমুখী কিছু একটা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই মন্দিরের নীচে থেকে কেউ একজন বলে ওঠেন, খুঁত আপনারাই তৈরি করেন, তারপর তাকে খুঁতো বলে আর ঘরে তোলেন না।

কথাটা এমন আচমকা এল, আমরা সকলেই তার ঝাঁজে ঝলসে গেলাম। সব থেকে আহত হলেন ক্ষণপ্রভা। তিনি ছিলেন মন্দিরের দালানের সিঁড়ির ঠিক মুখটিতে। আমি ছিলাম বিগ্রহের ঘরের মধ্যে। দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, যে মহিলা কথাগুলি বলেছিলেন তিনি একেবারে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে। কালো। কিন্তু শরীরের বাঁধন চমৎকার। এক সময়ে যে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন, তা-ও বোঝা যায়। তবে এখন মুখে রাগের ভাবটি বেশি প্রকট। রাগটি তিনি লুকোনোরও চেষ্টা করছেন না। তবে তিনি যে কোনও না কোনও ভাবে শিক্ষিত, তা বোঝা যায় তাঁর স্বরক্ষেপ থেকে। তাঁর কথাগুলিও শিক্ষিতজনের মতো। বাক্যের বাঁধুনি রয়েছে। এমনকী, এই বাক্যটি যে কোনও বড় কথা শুরু করার ভূমিকা, সেটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন শব্দ নির্বাচন ও যতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। কথাগুলি পরিষ্কার উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে এমন একটা তীক্ষ্ণতার রেশ, যে শব্দগুলি প্রাণে এসে বাজে। বাবাকে দেখলাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছেন। বুঝতে পারলাম, তিনি কোনও কিছু একটা ভয় করছেন।

সূর্যমুখীও ঘুরে ওই মহিলাকে দেখছিলেন। তিনি একবার বাবাকে দেখে নিলেন। বুঝে গেলেন এই মহিলার এমন কোনও একটা পরিচয় রয়েছে, যাতে তাঁকে জমিদারের মেয়ে-পুত্রবধূর সামনেও এমন স্বরে কথা বলার সাহস জোগায়। ক্ষণপ্রভা তখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সূর্যমুখী ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন,— আপনি?

এই যে প্রশ্ন করার ধরন, তাতে বোঝা যায় সূর্যমুখীও এই মহিলাকে শিক্ষিতজনের উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন। প্রথমত গ্রামের সাধারণ মেয়ে বৌ হলে তিনি কথাই বলতেন না। যদি বলতেন, তা হলে তাঁদের মতো করেই বলতেন। এমন নাগরিক ভাবে প্রশ্নটি করতেন না। কথা হল, ওই মহিলাও তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলেন, তাঁর উচ্চারিত বাক্যটিতে কাজের কাজ হয়েছে। তাঁকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। এ বার তিনি কথা শুরু করতে পারেন। কিন্তু তার আগে গ্রাম্য স্বভাববশত একটি ভুল করে ফেললেন। একা কথা চালিয়ে না গিয়ে, বাবাকে সাক্ষী মেনে বসলেন।

মহিলা বললেন, আপনারা আমাকে চেনেন না। ঠাকুরমশায় কিন্তু খুব জানেন। আমি রাধার মা।

যেন বজ্রপাত হল মন্দির চত্বরে। ক্ষণপ্রভা একবার নিষ্পলক হয়ে তাকালেন রাধামাধবের দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম বিগ্রহের দিকে। রাধামাধব সামান্য হাসিটি ধরে রেখে তাঁর সেই অনির্দিষ্ট দৃষ্টিতেই সামনের দিকে তাকিয়ে। ক্ষণপ্রভা কি মনে মনে কোনও শক্তি চাইছিলেন রাধামাধবের কাছ থেকে? কেন এই দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তাঁকে এমন একটি ব্যক্তিগত অপমানের মুখে পড়তে হল, তার কৈফিয়ৎ চাইছিলেন বিগ্রহের কাছ থেকে? সূর্যমুখী একবার ক্ষণপ্রভাকে দেখে এ বার সোজাসুজি ওই মহিলার দিকেই তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করলেন। বললেন, তা বেশ তো! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, উঠে আসুন না।

প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণ করলেন রাধার মা। সেই শানিত স্বরেই তিনি বললেন, আমার তো ওঠা বারণ। এখন হঠাৎ করে উঠতে বললে আর যে ওঠা যায় না। আপনারা বরং নীচে নেমে আসুন।

সূর্যমুখীর মুখ এ বার শক্ত হয়ে গেল। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, আমরা নীচে নামি আমাদের ইচ্ছে হলে। আপনি বরং ওখান থেকে প্রণাম সেরে চলে যান।

রাধার মা সূর্যমুখীর রূপ, রাগ, আভিজাত্য, সামাজিক অবস্থান ও কথার তীক্ষ্ণতায় হার মানলেন। বললেন, জানি। আমাদের চলেই যেতে হয়। তাই তো আমার ঘরের মেয়েকে কোলে তুলেও ফেলে দিলেন আপনার ভাই আর ওঁনার স্বামী। আমরা হলাম গাছের তলায় পড়ে থাকা ফল। ঠুকরে খেয়ে যে কেউ চলে যেতে পারে। তারপরে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। এ বার শেয়াল কুকুরে খাবে। কারণ একবার ঠোকরানো ফল তো আর কেউ ঘরে তুলবে না। যে ঠুকরেছে, সে-ও নয়। কিন্তু তাতে আমাদের যে তাতে প্রাণ যেতে বসে।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, সূর্যমুখী কেন এই মহিলাকে এতগুলো কথা বলতে দিলেন? তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, কথার ঝোঁকে রাধার মা তাঁর সম্মান হারালেন। যে শানিত স্বরে শুরু করেছিলেন এখন তাতে গ্রাম্যতার আমেজ চলে এসেছে। সূর্যমুখী দেখলাম মুখটি হাসিতে ভরিয়ে ফেললেন। তিনিও যে তত ক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন, কথা বলতে দিয়ে এই গ্রাম্য মহিলার কাছ থেকে তাঁর শিক্ষিতজনোচিত সম্মানটি হরণ

করে নিয়েছেন। তিনি জানতেন, এ বার এই মহিলাকে কথার জালে হারিয়ে দেওয়া তাঁর কাছে খুবই সহজ হবে। এ বার স্বচ্ছন্দে মহিলাকে সরাসরি তুমি বলে সম্বোধন করে সেই পিছনে ঠেলার কাজটি শুরুও করে দিলেন। রাধার নামটিও এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন, যাতে এই নামের মধ্যে লুকিয়ে ছিল যে বজ্রাঘাতের অভিঘাত, তা একেবারেই শিথিল হয়ে পড়ল।

সূর্যমুখী বললেন, মানুষ তো ফল নয় রাধার মা। কেউ ঠোকরাতে এলে বাধা দিতে পারে। আর পড়েও থাকে না। উঠে দাঁড়াতে পারে।

রাধার মা গ্রাম্য কলহের ধরনে প্রতি আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। বললেন, এ মানুষ তো যে সে মানুয নয়, যে ঠোকরাতে এলে বাধা দেবে। আর উঠে দাঁড়াবে কী করে। সে যে কোথায় তাই তো জানি না। আর তাতেই বুঝি, যে মানুষটা এসেছিল সে আর তার পরিবার আমাদের পক্ষে বড্ড বেশি রকমের ভারি।

সূর্যমুখী এ বার একটু সময় নিয়ে আক্রমণ করলেন। বললেন, একটু ভাল করে ভেবে দেখো তো রাধার মা, তোমার মেয়ে আমার দাদাকে ধরে উপরে উঠতে চেয়েছিল, এমনটা নয় তো? এ মানুষ যে, যে সে মানুষ নন তা যেমন তোমরা জানতে, তেমন এটাও জানতে, তিনি যদি ঠোকরান, তা হলে ফেলে দিয়ে চলে যাবেন না। তাই ভারি জিনিসকেও আঁকড়ে ধরতে ভয় পাওনি।

রাধার মা হৃত সম্মান কিছুটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। বললেন, রড় ঘরের মেয়ে হলেও তুমিও তো মেয়ে। মেয়ে হয়ে তুমি এ কথা বলতে পারলে?

সূর্যমুখীর সপাট প্রত্যুত্তর ছিল, মেয়ে বলেই তো জানি, দুপুর রোদে একলা পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়ে বড় ঘরের ছেলেকে স্নান করতে দেখলে চলে আসতে হয়। অন্তত, নিজেকে প্রকাশ করতে হয় না। তার বদলে নিজেই জলে নেমে গেলে তো একরকম নেমন্তন্ন করে বড় ঘরের সেই ছেলেকে নিজের দিকে টেনে আনা হয়। তুমিও তো মেয়ে রাধার মা। তুমি কী করতে?

ক্ষণপ্রভা তত ক্ষণে মন্দিরের সিঁড়ির আর এক দিকে একটি থামে হেলান দিয়ে বসে পড়েছিলেন। লজ্জায় তাঁর মুখটি রাঙা হয়ে ছিল। তিনি মুখটি লুকোনোর চেষ্টা করছিলেন। ফিকে হলদে রঙের মেরিনোর শাড়ি পরেছিলেন। আঁচলটি মুখের সামনে ধরে রেখেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সূর্যমুখী এ বার বললেন, তোমার রবিবাবুরই জয় হল বৌদিদিভাই। শৈবলিনী জল ছেড়ে ওঠেনি। লরেন্স ফস্টারকে আগুতে দিয়েছিল। কিন্তু বিনোদিনী বারাসতে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিহারীর সামনে যায়নি।

ক্ষণপ্রভা হয়তো কোনও উত্তর দিতেন না। দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেনও না। তবে তার আগেই রাধার মা-র আচমকা হইহই কান্নায় সব পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে গেল। সেই মহিলা সিঁড়ির নীচে বসে কেন কে জানে, আত্মসমর্পণ করে বসলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, পাপ করেছিল আমার মেয়ে। তুমি বল ঠাকুরমশায়, তুমি বল।

হঠাৎ এই কথায় বাবা অবাক হয়ে গেলেন। তারপরে একটু ভয় পেলেন। কিন্তু সূর্যমুখী ও ক্ষণপ্রভা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে শেষ পর্যন্ত বাবা আস্তে আস্তে বললেন, রাধার মা আমাকে বলেছিল, কর্তাদাদার ছেলেকে সামনে দেখে নিজেকে প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারেনি রাধা। আগে অনেকবার সে তাঁকে দেখেছে। কিন্তু তিনি তাকে দেখেননি। এ বার পুষ্করিণীতে সামনে দেখে, নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি। মনে মনে সে বিপিনবিহারীকে পছন্দ করে ফেলেছিল।

বাবার কথা শেষ হতেই রাধার মা কান্না চাপা গলায় বললেন, ও কিন্তু লোভ করেনি। ও জানতও না, কী থেকে কী হয়। ও শুধু যাকে ভাল লেগেছিল, তার সামনে চলে গিয়েছিল। আমার মেয়েটি ছোট। ভাল মন্দ বোঝেনি। ওকে তোমরা রক্ষা কোরো।

সবাই কিছু ক্ষণ চুপ করে রইলেন। আসেপাশেও কোনও শব্দ হচ্ছিল না। আমি স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সূর্যমুখী তাকিয়ে ছিলেন দূরের দিকে। রাধার মা কান্না থামিয়ে চোখেমুখে ভয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। বাবাও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা সবাই জানতাম, এ বার সূর্যমুখীই চরম কোনও নিদান দেবেন। তাঁর নিঃসংশয় জয় হয়েছে, এ বার রাধার মা-র জন্য তিনি কী বলবেন, তা জানতে বাতাসও যেন চুপ করে অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ ক্ষণপ্রভা বললেন, তোমার কোনও ভয় নেই রাধার মা। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে কোনও পাপ নেই। যার প্রতি প্রেম, তার সামনে নিজেকে প্রকাশ করা তো বরং পুণ্যকর্ম। সে নিশ্চয়ই উপযুক্ত স্থান পাবে। রাধামাধব তাঁকে তাঁর নিজের স্থান তৈরি করে দেবেন।

এই বলে ক্ষণপ্রভা এগিয়ে গিয়ে রাধামাধবকে প্রণাম করলেন গলায় আঁচল দিয়ে। বাবা সবাইকে অবাক করে দিয়ে ক্ষণপ্রভার মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তোমার পুণ্যের জোর আছে মা। না হলে এমন কথা বলতে পারতে না। রাধামাধবের মতো নিষ্কলঙ্ক তুমি মা।

ক্ষণপ্রভা উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের ছোট আলোটি পড়ে তাঁর চোখমুখ যেন দেবীজনিতই মনে হচ্ছিল। নিচু হয়ে প্রণাম করার সময় সিঁদুর গড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাকের উপরে। বড় বড় চোখ ভরা ছিল জল আর আগুনে। সূর্যমুখী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। নিজে একবার রাধামাধব ও রাধারানিকে প্রণাম করে ক্ষণপ্রভার হাত ধরে নামলেন নীচে। রাধার মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সূর্যমুখী আমাকে বললেন, একটা আলো আর লাঠি নিয়ে একবার এসো তো দেখি। আমাদের সামনে সামনে যাও।

তারপরে রাধার মা-র দিকে ফিরে পাথরের মতো গলায় বললেন, রাধা আমাদের বাড়িতেই রয়েছে। গ্রামের কেউ জানে না। তুমি জানলে। কথাটা ফাঁস কোরো না। তা হলে কর্তাদাদা কী করতে পারে, তা নিশ্চয়ই জানো। কাল দুপুরে একবার এসো। মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। কিন্তু রোজ রোজ আসবে না।

তাঁদের নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, রাধার মা-র প্রায় আর্ত চিৎকার—ঠাকুরমশায় তুমি তো জানতে রাধা এখানেই আছে। তবু একবারও বলোনি এত দিনে? তুমি কি পাথর ঠাকুরমশায়? পাথরের দেবতা পুজো করতে করতে তুমিও কি পাথর হয়ে গিয়েছো, পাথর?

বাবা সে রাতে আমার হাত দিয়ে সূর্যমুখীর ঘরে একটি পাথরের গেলাস ভরা জল আর একটি আম পাঠিয়েছিলেন। ঘরে ঢোকার সময় দেখি দোরের পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধা।

১৪
আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালবাস

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, আমার তো ক্ষণপ্রভাকেই পাথর বলে মনে হয়েছিল। তুমি হয়তো বলবে প্রেমের অনুভূতিরই তো তিনি বন্দনা করেছেন। যেমনটি করতেন কাশীর হরিদাসবাবাজি। তাই তিনি বেশ মহৎ। কিন্তু উল্টো দিক দিয়ে ভেবে দেখো, ক্ষণপ্রভা তাঁর নিজের প্রেমের প্রতি কি সুবিচার করলেন?

বিনোদবিহারীর ছেলের মুখে শুনেছি, সে সময়ে ঠিক কী হয়েছিল কর্তাদাদার সংসারে। তিনি জেনেছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বিনোদবিহারী পিতার কর্তব্য পালন করতেই ছেলের জন্য সংসারের এই সব কাহিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে সব কথা বলে গিয়েছিলেন।

বিনোদবিহারীর ছেলে জানালেন, তখন ঘোর বর্ষা। সংসারে কিন্তু তখন অশান্তির আগুন বইছে। তার কিছু দিন আগেই ক্ষণপ্রভার বোন বিভাকে মাঝ গঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আহিরীটোলার বাড়িতে রেখেছেন বিপিনবিহারী। আহিরীটোলার বাড়িতে কর্তাদাদার লোক গিয়ে যদিও দেখে, সেখানে কেউ নেই। বিপিনবিহারী তখন বিভাকে নিয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছেন। সকলেই তাঁদের তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ক্ষণপ্রভার পিতার একটি সকরুণ পত্র কর্তাদাদার কাছে এসে পড়েছিল। তারপর থেকে কর্তাদাদার মুখের দিকে কেউ তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

এর মধ্যেই ক্ষণপ্রভা সে দিন সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তিনটি চিঠি লিখলেন। প্রথমটিই তিনি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীকে। একটিই বাক্য। তবে সেটি রেখে দিয়েছিলেন, যেখানে বিপিনবিহারীর নিজস্ব কাগজপত্র, চিঠি এবং ডায়েরি থাকে, সেখানে। বোধ ও বিধির সেই দু'টি আশ্রয়ের কথা বেশ টানাটানা হরফে যত্ন নিয়ে লেখা। তারপরে চিঠিটি লিখলেন দুলালচন্দ্রকে। সেটি ভাঁজ করে একটি খামে পুরে নিলেন। যদিও তা ডাকে দিলেন না। সম্ভবত সেটি তিনি স্বহস্তে দুলালচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। সূর্যমুখীর চিঠিটি লিখে ভাল করে আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করে তা ডাকে দেওয়ার জন্য লোক ডাকলেন।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে জানিয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন সেই লোক। বৃষ্টির মধ্যেই ক্ষণপ্রভার ঘরের দরজা জানলা খোলা ছিল। ঘরে একটা ভিজে ভাব তৈরি হয়েছিল। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্ষণপ্রভা পছন্দ করতেন না, তাঁর ঘরে অন্য কেউ ঢুকুক। ক্ষণপ্রভা তাঁর হাতে চিঠিটি দিয়ে দেন। কিন্তু কর্তাদাদার চোখ

না ঘুরে তাঁর সংসারের কিছুটি হওয়ার জো ছিল না। ঠাকুরমশায়ের ছেলে তাই সেই চিঠি নিয়ে সোজা কর্তাদাদার কাছেই যান। তিনি তখন ছিলেন কাছারিতে। কাছারিবাড়িটি ছিল আলাদা একটি ভবন। ঠাকুরমশায়ের ছেলে বৃষ্টির হাত থেকে সেই চিঠির খামটা বাঁচাতে নিজের জামা খুলে তা দিয়ে খামটি মুড়ে নিয়েছিলেন। এক ছুটে উঠোন পার করে খিড়কির দোর দিয়ে কাছারি বাড়িতে ঢুকে তিনি আবার জামা পরে নেন। কিন্তু উঠোনে তখন মোক্ষদা মাছ কোটার তদারকি করছিল। ঠাকুরমশায়ের ছেলেকে ওই অবস্থায় দেখে সে মন্তব্য করেছিল, ও মলো! মেয়েদের সামনে কেউ আদুর গা হয় নাকি!
কিন্তু ঠাকুরমশায়ের ছেলে তাতে কান দেননি। তাঁর তখন মন জুড়ে ছিল কর্তাদাদা ও ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে ভয়। কর্তাদাদা যদি ব্যস্ত থাকেন, অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর মেজাজও চড়ে থাকতে পারে, তাতে ভয় বরং বেশি। কিন্তু এই সবে দেরি হয়ে গেলে ডাক নিয়ে চলে যাবে কাছারির লোক। তাতে ক্ষণপ্রভা রেগে যাবেন। তবে কাছারি ঘরে গিয়ে দেখেন, ডাক তখনও যায়নি। কর্তাদাদা কাছারির বড় ঘরের সামনে একতলার টানা বারান্দার ধারে একটি আরামকেদারায় শুয়ে আছেন। বৃষ্টি তাঁর গা অব্দি আসছিল না, কাছাকাছি এসে পড়ছিল জলের গুঁড়ো। খুশি মনে ছিলেন কর্তাদাদা। খামের উপরে নিজের মেয়ের নাম দেখে তিনি অল্প হেসে চিঠি ডাকে দিতে পাঠালেন। তারপরেই ক্ষণপ্রভার খোঁজ নিতেও ভুললেন না। জানলেন, তিনি স্নান করে ফিরে অনেক ক্ষণ ঠাকুর ঘরে বসে ছিলেন। কর্তাদাদা তখনও নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু দ্বিপ্রহরে খাওয়ার সময়ে যখন খবর পেলেন, ক্ষণপ্রভা নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সেখানেই বসে একমনে ডায়েরি লিখছেন, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

ডায়েরি লেখা শেষ করে বেশ বেলা করে খেতে নামেন ক্ষণপ্রভা। তিনি স্বভাবত নিরামিষ আহার করতেন। তাঁর প্রিয় খাবার ছিল নানা রকমের মিষ্টি মিষ্টি তরকারি আর নানা ধরনের চাটনি, অম্বল, টক। ছোট মাছের চচ্চড়ি খেতে ভালবাসতেন। কিন্তু বিপিনবিহারী, কর্তাদাদার পছন্দ ছিল ঘোরতর আমিষ রান্না। নিরামিষ রান্নাও তাঁদের জন্য গরগরে করে রেঁধে দিতে হত। মোক্ষদা তাঁকে তাঁর পছন্দের খাবারই বেড়ে দিতে গেলে ক্ষণপ্রভা কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরেই প্রতিবাদ করেন। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাকের তরকারি হয়েছিল। মোক্ষদা ভয়ে ভয়ে সে কথা বলতেই তা দিতে বলেন তিনি। তারপরে সর্ষে বাটা দিয়ে রান্না ইলিশও অনেকটা খেয়ে নেন। আঁচিয়ে উঠে দ্রুত ফিরে যান নিজের ঘরে। সেখানে দরজা বন্ধ করে তিনি সাজতে শুরু করেন। কিন্তু দামি পাউডার, এসেন্সের গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। রাধাদিদি তখন মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই দুপুরবেলা এ সব কী হচ্ছে? মোক্ষদা কোনও গুরুত্ব না দিয়ে রাধাকে বলেছিলেন, স্বামী ফিরলে সোহাগ হবে, এ সব তারই রচনা।

--কিন্তু স্বামী তো নিজের বোনের সঙ্গেই অজ্ঞাতবাসে।
--বড় বাড়ির বড় মানুষের কথা। একবার তোকে মনে ধরল, আর একবার শালিকে। কখন আবার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন, কে জানে!

মোক্ষদা ও রাধাদিদির এই কথাবার্তা বিনোদবিহারী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি একবার বৌদিদিমণির ঘরে যাবেন ভেবে নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এই কথাবার্তা শুনে ফিরে যান। বিকেলে বৃষ্টি ধরলে তিনি ছাদে গিয়েছিলেন। বর্ষার সন্ধ্যা নামে তাড়াতাড়ি। নীচে নেমে দেখেন তখনও ক্ষণপ্রভার ঘরের দরজা বন্ধ। কর্তাদাদা এক মনে কাছারি ঘরে বসে কোনও একটি মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখছিলেন। ঠাকুরঘরে পুজোর ঘন্টাধ্বনি বিনোদবিহারী শুনতে পেলেন তাঁর ঘর থেকেই। মা কী করছেন জানতে ইচ্ছা করল। পুজোর ঘরে গিয়ে দেখলেন,

প্রস্তরের মূর্তির মতো মা বসে রয়েছেন। তাঁর মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা শক্ত। বিনোদবিহারী বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন একটা বড় গাড়ি এসে থামল দেউরিতে। তার চারটি ঘোড়া। ক্ষণপ্রভার বাপের বাড়ির গাড়ি। এ বাড়িতে সকলেরই চেনা। তখন সন্ধ্যা গভীর হয়েছে। বাইরের আলো নিভে এসেছে, ঘরের আলো জ্বলেনি। সেই গাড়ির চালক উঠে এসে কাছারি ঘরে গিয়ে কর্তাদাদার কাছে গিয়ে বললেন, ক্ষণপ্রভার পিতা খুবই অসুস্থ। তিনি বড় মেয়েকে একবার দেখতে চেয়েছেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কর্তাদাদা অনুমতি দিলে তাঁর মেয়েকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারেন তিনি।

কর্তাদাদা কথা শুনে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সারা দিনের পরে বৃষ্টি তখন ধরেছে। চারিপাশ থমথম করছে। কাছারি ঘরটা অতিকায় একটা গুহার মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর চোখ ওই অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছিল।

অনুমতি অবশ্য তিনি দিলেন। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় কাছারি ঘর তখন ফাঁকা। বাড়ির মেয়েরা অনেকেই খবর পেয়ে চলে এসেছিলেন সেখানে। চলে এসেছিলেন ঠাকুরমশায়ও। ক্ষণপ্রভার কাছে খবর পৌঁছতেই তিনি ওই প্রকাণ্ড সাজে ছুটে নেমে এসে প্রথমে শ্বশুরকে, তারপরে শাশুড়িকে প্রণাম করেই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ ঠিকই খুঁজে পেল উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুরমশায়কে। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুরমশায় শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদের হাতটুকু মাথায় ঠেকতেই ক্ষণপ্রভা যেন বিদ্যুতের মতোই দ্রুত চলে গেলেন বাড়ির ভিতরের ঠাকুরঘরের দিকে। সেখানে কুলদেবতাকে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে এক রকম যেন ছুটে চলে গেলেন সদরে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে। নিজেকে যেন ছুড়ে দিলেন গাড়ির ভিতরে। গাড়ি যখন যায় যায়, কর্তাদাদা চিত্কার করে বললেন, ওর আঁচলে কোনও চাবি নেই তো?

রাধাদিদি সে কথা শুনে গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। ক্ষণপ্রভা চালককে জানিয়ে দিলেন, চাবি রেখে এসেছেন তাঁর নিজের ঘরের কুলুঙ্গিতে। রাধাদিদি সে কথা শুনে তা জানানোর জন্য ফের দেউরির সামনে থেকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গেলে কর্তাদাদা তাঁর কথা না শুনেই বজ্রগম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন, বৌমার সঙ্গে তুইও যা।

রাধাদিদি কয়েক মুহূর্ত থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্তাদাদার চোখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেই কিন্তু ভয়ে তাঁর প্রাণ যেন উড়ে গেল। তিনি সটান গাড়িতে উঠে ক্ষণপ্রভার অন্য দিকে গিয়ে বসলেন। চালক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। সেই রাতে দ্রুত গাড়ির আলো মিলিয়ে গেল। কর্তাদাদা তাঁর স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, আজ রাতে যেন ঠাকুরঘরের আলো না নেভে।

রাধা তারপরে নায়েব উকিলকে জানিয়েছিলেন, সে রাতে কী ঘটল। গাড়ি কিছু দূর যাওয়ার পরেই রাধা বুঝতে পেরেছিলেন একরাশ ঘৃণা নিয়ে ক্ষণপ্রভা তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু কর্তাদাদার হুকুম তামিল না করলে প্রাণটাও ধরে রাখা যাবে না। তাই রাধা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিলেন। রাস্তায় জমা জলের মধ্যে দিয়ে গাড়িটি যত জোরে সম্ভব চলছিল। চারিপাশ সজল। তার উপরে গাড়ির আলো পড়ে ঝকঝক করছিল নয়নগোচর নিসর্গ। মনে হচ্ছিল সবই বুঝি নতুন। একটু পরেই তিনি খেয়াল করেন, গাড়ি শ্রীরামপুর যাওয়ার বদলে কলকাতার দিকে মোড় নিয়েছে। তিনি অবাক হয়ে ক্ষণপ্রভার দিকে তাকিয়ে দেখেন, তিনি পা তুলে গুটিসুটি দিয়ে বিশাল

গাড়িটির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চালকের মুখও গম্ভীর। রাধা কোনও কথা বলতে ভরসা পেলেন না। কিন্তু মনে মনে একটা উত্তেজনা তৈরি হল তাঁর।

আরও বেশ খানিকটা পথ চলার পরে গাড়ি থামল। গাড়ির আলোতেই দেখা গেল রাস্তার পাশে আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। দু'টি গাড়ির মাঝে ছিল রাস্তায় একটুখানি জমা জল। জল বাঁচিয়ে এক পাশে নিজের ঝাঁ চকচকে ঘোড়ার গাড়িটি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন জামাইদাদা। তারপরে গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাঁর টুপি থেকে জুতো পর্যন্ত নিখুঁত বিলাতি সাজ। এই গাড়িটিকে দেখে চমত্কার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন। ক্ষণপ্রভা যে দিকে বসেছিলেন, সে দিকের দরজা খুলে বিলিতি কায়দায় বাও করলেন। তারপরে মিষ্টি হেসে ক্ষণপ্রভার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন। ক্ষণপ্রভাও তাঁর শাড়িটিকে যেন বিলাতি গাউনের মতো করেই সামান্য তুলে মেমসাহেবের মতো ভঙ্গি করে জামাইদাদার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মনোহর হাসলেন। কিন্তু তারপরে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। যেন বা আর নিজেকে প্রকাশ্যে রাখতেই চাইছিলেন না। ওই বিরাট হিল জুতো পরেই অতি দ্রুত পায়ে অনেকটা ব্যালে নাচের মতো করেই গিয়ে নিজেকে জামাইদাদার গাড়ির মধ্যে আছড়ে ফেললেন। জামাইদাদা প্রথমে একটু বিস্মিত হলেও পরে দেরি না করে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত পায়ে গিয়ে উল্টো দিকের আসনে বসলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে রাধা মরণ পণ করে ছুটে গিয়ে গাড়ির অন্য দিকের দরজা খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপরেই তিনি আবিষ্কার করেন, ক্ষণপ্রভা এক রকম অচৈতন্য। যা দেখে জামাইদাদাও আর রাধাকে নেমে যেতে বলেননি। গাড়ি চলে গেল হু হু করে। শ্রীরামপুরের গাড়িটি ফিরে গেল শ্রীরামপুরে। রাধা পরে বলেছিলেন, সেই সন্ধ্যায় ক্ষণপ্রভাকে একটি বিলিতি পুতুলের মতোই দেখতে লাগছিল। তেমন পুতুল জামাইদাদার বাড়িতে বেশ কয়েকটি ছিল।

এই কাণ্ড যে সময়ের, সেই মাসেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল বিহারীর বাড়িতে বিনোদিনীর অভিসারের প্রসঙ্গ। বিহারীর পদযুগল বারবার চুম্বন করেছিলেন বিনোদিনী। তারপরে বিহারীর শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল অনুভব করে তার পা ছেড়ে নিজের দুই হাঁটুর উপরে উন্নীত হয়ে চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করে বলেছিলেন, "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালবাস।"

কথাটির মধ্যে কিছুটা নাটক তো নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অপেরা-ধর্মের মতোই সেই নাটকের প্রভাবও কিছু কম ছিল না। আবেগের তুঙ্গে উঠে গিয়েছেন পাত্রপাত্রীদের এক জন। তখন অন্য জনকে সেই শীর্ষস্পর্শ করাতে অপেরা ধর্মের কিছুটা সাহায্য তো লাগেই। ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, সব থেকে বড় কথাটি এখানে লেখকই নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন। তিনি জানেন, তিনি যা লিখছেন, যে মুহূর্ত সৃষ্টি করছেন, তা জীবনে স্বাভাবিক বলে গণ্য হবে না। কিন্তু তিনি যে পাঠককে হাত ধরে ওই আবেগের শীর্ষটুকু ছুঁইয়ে দিতে চাইছেন। এটি তাই লেখকেরই একপ্রকার আকুতি।
সেই আকুতির স্পর্শ লাগে পাত্রপাত্রীর আচরণে। এরপরে বিনোদিনী বিহারীকে বলেছিলেন, মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।
সূর্যমুখীর নাতি বললেন, অপেরা-ধর্মের সব থেকে বড় প্রভাবটি হল এই যে, আমার দিদিমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল, বিনোদিনীর এই অভিসারপর্বই ক্ষণপ্রভাকে দুলালচন্দ্রের কাছে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। দুলালচন্দ্রও এই পর্বটি পড়েই ক্ষণপ্রভার মতে সায় দিয়েছিলেন। কর্তাদাদাকে লেখা সূর্যমুখীর চিঠিটি উদ্ধৃত করি, "রবিবাবুই

পরিবারে এমন সবর্নাশ বয়ে আনিলেন। তাঁহার বিনোদিনী যদি বিহারীর বাড়ি না যাইত, বৌদিদিভাইও আমার স্বামীর কাছে আসিবার জন্য এমন উগ্র আবেগে ভাসিয়া যাইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়জনিত যে মৃদু সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা আমি জানিতাম। বাধা দিই নাই, কেননা বাধা পেলে আগুন বাড়িয়া ওঠে। কিন্তু এমন হইতে পারে তাহাও কখনও ভাবি নাই। আমার স্বামী ভদ্র ও ইংরাজি শিক্ষিত। সম্ভবত শিভ্যালরির অতি আবেগ বশত তিনি বৌদিদিভাইয়ের আশ্রয় হইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন। তিনি বৌদিদিভাইয়ের কাতর ডাক উপেক্ষা করিতে পারেন নাই আপনার শিক্ষাজনিত সংস্কারে। বৌদিদিভাইও শিক্ষাজনিত সংস্কারেই আমার স্বামীকে ব্যবহার করিয়া আপনার স্বামীর উপরে প্রতিশোধ লইতেছে। জানি, দাদার ঘটনা তাঁহার মনে বড় খেদ উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও কুলত্যাগ করাটা কখনওই উচিত বিবেচনা হয় না। তাঁহার কর্মকাণ্ডে আমার সংসারে যে ভাঙন ধরিবে, তাহাও তিনি চিন্তা করিলেন না। এ সবই উপন্যাস পাঠের ফল। একবার উপন্যাসটি পড়িয়া দেখ। দেখিবে বিনোদিনীর শিক্ষা ছিল আমাদের মতোই। সে মেমসাহেবের কাছে পড়াশোনা শিখিয়াছিল। তাহার শিক্ষার অভাব ছিল না। অনটন ছিল প্রেমের। রবিবাবু তাহাকে দিয়া যাহা যাহা করাইতেছেন, বৌদিদিভাই অন্ধের মতো তাহা স্বীকার করিতেছে। আমাকে হুবহু বিনোদিনীর কথা উদ্ধৃত করিয়া পত্র দিয়াছে। সে উদ্ধৃতি বড় ভয়ঙ্কর।”

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, অভিসার পর্ব তো বটেই, বিনোদিনী যে বিহারীকে ‘এক মুহূর্তের জন্য’ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলেন, তা-ও ক্ষণপ্রভাকে প্রভাবিত করতেই পারে। তবে নিশ্চিত ভাবেই সব থেকে বিপজ্জনক ছিল ‘মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও’ কথাটি। এ কথার নানা অর্থ হয়। বিনোদিনী ঠিক কী অর্থে কথাটি বলেছিলেন, তা-ও বোঝা মুশকিল। ক্ষণপ্রভা কী ভাবে বিনোদিনীর এই বাক্যটি পড়েছিলেন তার প্রমাণ অবশ্য মেলে। ক্ষণপ্রভা পরে ডায়েরিতে লিখছেন, একটি সন্তান চান দুলালচন্দ্রের কাছ থেকে। যে সন্তান তাঁর সারা জীবনের জন্য একটি নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। বিনোদিনীর কথাটিই সেই মনোভাবের উত্স হতে পারে। সূর্যমুখী যা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

১৫
মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো

কিন্তু ‘মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও’ এই কথাটি রাধারও ছিল। রবিবাবু বা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়ার মতো পড়াশোনা তাঁর ছিল না। ক্ষণপ্রভার মতো চাইবার জোরও তাঁর ছিল না। কিন্তু নিজের মনে যেন বুঝেছিলেন, মরণ পর্যন্ত মনে রাখবার মতো একটা কিছু তাঁরও রয়েছে। বিপিনবিহারীর সঙ্গে পুষ্করিণীর পাড়ে তাঁর সেই ক্ষণিকের প্রণয়সঙ্গ, তাঁকে সারা জীবনের মতো বিপিনবিহারীর সঙ্গে বেঁধে ফেলে। তিনি আর কিছু চাননি। ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

তাই জোর করে দুলালচন্দ্রের গাড়িতে উঠে ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে সেখানকার পাচিকার সঙ্গে ভাব জমিয়ে পরের দিন সন্ধ্যার মধ্যেই এমন এক স্থানীয় যুবককে রাধা খুঁজে বার করে ফেললেন, যাঁর হাত দিয়ে আহিরীটোলায় নায়েব উকিলের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া গেল—ক্ষণপ্রভা চলে গিয়েছেন দুলালচন্দ্রের ভবানীপুরের বাড়িতে। নায়েব উকিল সময় নষ্ট না করে সে খবর পৌঁছে দিলেন বিপিনবিহারীর কানে।

ক্ষণপ্রভা দুলালচন্দ্রকে যে 'ভয়ঙ্করের আঁচে'র কথা বলেছিলেন, তা বড় মসৃণ ভঙ্গিতে উপস্থিত করলেন বিপিনবিহারী। শিবু সর্দার নায়েব উকিলের মতোই তাঁর বশংবদ ছিল। কিন্তু শিবু সর্দার তো কর্তাদাদারও খাস লোক। তা ছাড়া, এখন শিবু তো বিপিনবিহারীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে কর্তাদাদার কথায়। তাই নায়েব উকিলকেই দায়িত্ব নিতে হল। বরং বলা ভাল, বিপিনবিহারী নায়েব উকিলকেই দায়িত্ব দিলেন। শিবু সর্দারকে ডেকে পাঠিয়ে নায়েব উকিল তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বললেন, কী ভাবে ক্ষণপ্রভাকে উদ্ধার করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই কর্তাদাদার কান পর্যন্ত সে খবর পৌঁছে গেল। কর্তাদাদা সবই বুঝলেন। বিপিনবিহারী কী ভাবে তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করতে চাইছেন, তা-ও জানলেন। চোখের বালি পড়া শেষ করে তিনি ছাদে ডেকে পাঠালেন শিবুকে। শিবু সব কথা আদ্যপান্ত তাঁকে বলল। বেশ বিপজ্জনক সেই প্রক্রিয়ায় কর্তাদাদা সম্মতিও দিলেন মাথাটা সামান্য হেলিয়ে। কর্তাদাদার ওষ্ঠপ্রান্তে একটি হাসিও ছিল। পরে শিবুর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন বিনোদবিহারী। তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলেন তাঁর পুত্র।

দিন কয়েক পরের এক ভোরে দুলালচন্দ্রের ভবানীপুরের বাড়ির সামনে দেখা গেল বেশ কয়েকটি অপরিচিত মুখকে। দুলালচন্দ্রের নাতি বললেন, ব্যাপারটা কী ভাবে হয়েছিল বলি। এই কাহিনিতে ক্ষণপ্রভা ও দুলালচন্দ্র সে সময়ে নিজেদের নিয়ে মত্ত ছিলেন। অধিকাংশ সময় তাঁদের ঘরের দোর বন্ধ থাকত। তাঁরা কখনও খুব জোরে গান গাইতেন। কখনও ঘর থাকত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ। কোনও সন্ধ্যায় গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেতে যেতেন। কখনও যেতেন সাহেবদের পার্টিতেও। কিন্তু বাড়িতে ফিরলেই আবার দোতলার বৃহত্ ঘরটির মধ্যে নিজেদের যেন এক রকম বন্দি করে ফেলতেন। খাবার পর্যন্ত অনেক সময় পৌঁছে দিতে হত সেই ঘরে। আমোদের আহ্লাদে অপছন্দের রাধাও সেই বাড়িতে বহাল রয়ে গেলেন। ক্ষণপ্রভা সেই সময়ের ডায়েরিতে লিখেছেন,

"আমাদের দু'জনের জীবনে আমরা ছাড়া আর কেহই নাই। প্রণয় ছাড়া সংসারে যেন আর কোনও সম্পর্কই নাই। আমরা যখন বেড়াতে যাই তখনও দেখি বহু মেমসাহেবের ভিড়ে জামাইদাদা আমার মুখের দিকেই পরম প্রীতিভরে তাকাইয়া রহিয়াছেন। বাড়ি ফিরে তিনি আমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না। এমন সর্বগ্রাসী প্রেম, আমাকে ভাসাইয়া দিতেছে।

এর মধ্যেই রাধার উপস্থিতি কী করিয়া সম্ভব হয়? কেন এই কন্টকটি আমাকে সারা জীবন বহিয়া চলিতে হইবে?
মনে হয়, জামাইদাদার সঙ্গে আমার প্রেমের এই প্রহরে রাধা যেন আমার স্বামীর চক্ষু। সে সাক্ষী হইয়া বাস করিতেছে। তাহাকে দেখিলেই আমি বেশি করিয়া জামাইদাদাকে জড়াইয়া ধরি। জামাইদাদার কাছ হইতে আমার একটি সন্তান লাভ হইলে বেশ হয়। সে হইবে প্রকৃতই প্রণয়ের সন্তান। বাধাবন্ধহীন। সর্ব সংস্কার হইতে মুক্ত। তাহাকে মানুষ করিবার দায়িত্ব দিব রাধাকে।"

বিনোদবিহারীর ছেলে জানালেন, দুলালচন্দ্রের খুব জাঁদরেল ধরনের দু'জন পাইক ছিল। তাদের হাতে বন্দুকও ছিল। তাদের ভরসাতেই দুলালচন্দ্র ও ক্ষণপ্রভা বিশ্বাস করতেন, কর্তাদাদা তথা শিবু সর্দারকে রুখে দেওয়া যাবে। এই বিশ্বাসের আড়ালেই রাধাদিদিও এই সময়ে বেশ তত্পরতার সঙ্গে বাড়ির বাজার-হাটের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। ক্ষণপ্রভা ও দুলালচন্দ্র তাতে অবাক হলেও আপত্তি করেননি। দুলালচন্দ্র ও ক্ষণপ্রভা জানতেও পারলেন না, এক দিন সকালে ওই মাছ কিনতে গিয়েই রাধাদিদি যেন একটু বেশি ক্ষণ ধরেই মাছওলার সঙ্গে

কথা বলছেন। তবে খুঁটিয়ে দেখলে চেনা যেত, মাছওয়ালা আসলে গঙ্গাধর। শিবু সর্দারের বাহিনীর এক বিশ্বস্ত সদস্য। তার প্রধান গুণ ছিল বদ্যির বিদ্যে। নানা রকমের গাছগাছড়া, শেকড়বাকড়ের খোঁজ রাখত সে। কর্তাদাদার নানা কাজ করতে গিয়ে শিবু সর্দারের বাহিনীর লোকজন নানা রকম আঘাতের সামনে পড়ত। কারও হাত কেটে গেল, কারও পা। কেউ মাথায় আঘাত খেল, কেউ ভাঙল পা। এই প্রায় সব ক্ষেত্রে গঙ্গাধরই ছিল 'ডাক্তার'। হাতুড়ে তবে কাজের লোক। কর্তাদাদা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। বিপিনবিহারীও।

--কিন্তু এখানে তো কারও হাত পা কাটেনি!

--সেই তো কথা। গঙ্গাধরের ওস্তাদি টের পাওয়া গেল সেই সন্ধ্যায়। ভবানীপুরের বাড়ির দোতলার ঘরে তখন বসে ক্ষণপ্রভা আর দুলালচন্দ্র। তাঁদের সান্ধ্য চা পান তখন সবে শেষ হয়েছে। একটু একটু করে সন্ধ্যা নেমেছে। বাইরে ঝুঁঝকো আঁধার। গ্যাসের আলো জ্বলেছে। তপসিমাছওয়ালা তপসি মাছ বিক্রি করছে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে একদল বিহারী মেয়েমানুষ আসন্ন শীতের জন্য লেপ বালাপোস কেনানোর জন্য ধরনা দিয়েছে। তাদের বেশ তাগড়াই চেহারা। পাইক দু'জনকে রাধা বেশ করে শাসিয়ে দিল, যাতে তারা এই মেয়েমানুষদের দিকে কোনও নজর না দেয়। তারপরে লেপ বালাপোস সহ ওই বিহারীদের বসিয়ে রেখে রাধা দুলালচন্দ্রের ঘরে যান খবর দিতে।

কিন্তু সে ঘরে যখন রাধা ঢুকলেন, তাঁর হাতে একটা ধুনুচি। কর্তাদাদার বাড়িতে সন্ধ্যায় ধুনো দেওয়ার রীতি ছিল। এখানেও সেই রীতিই যেন তিনি পালন করছেন এমন ভাব করে, খোলা জানলাটির দিক থেকে আস্তে আস্তে ভিতরের দরজাটির দিকে ধুনো দিতে দিতে ফিরলেন তিনি। সারা ঘর যেন অকস্মাত্ অত্যাশ্চর্য ধোঁয়ায় ভরে গেল। রাধার মুখে আঁচল চাপা। তিনি ওই ধোঁয়ার মধ্যেই দেখতে পেলেন, ক্ষণপ্রভা বিছানার কোণটিতে বসেছিলেন, জ্বলজ্বলে চোখে রাধার দিকে একবার তাকিয়ে সেখানেই লুটিয়ে শুয়ে পড়লেন। সামনের আরামকেদারায় বসেছিলেন স্লিপিং স্যুট পরা দুলালচন্দ্র। তিনি সেখানেই এলিয়ে পড়ে গেলেন। রাধা কোনওমতে ঘর থেকে বেরিয়ে

দরজাটা টেনে দেন। তারপরে কাশির দমক চাপতে নীচে নেমে আসেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে গঙ্গাধরের কথা মতো রাধাদিদি আবার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দেখতে পান, দু'জনে একই অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। ধোঁয়া তখন অনেকটা ফিকে হয়ে গিয়েছে। জানলার কাছে গিয়ে রাধা নীচে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঢিল ছুড়ে ফেলেন।
বিহারী মেয়েমানুষেরা এত ক্ষণ রাধার সঙ্গেই দরাদরি করছিল। তারা নানা লেপ খেস বালাপোস দেখাচ্ছিলও। তারাই এখন হঠাত্ তড়াং করে লাফিয়ে এক লহমায় দোতলায় উঠে গেল। ক্ষণপ্রভাকে পেঁজা তুলোর মতো করেই সযত্নে তথাচ অতি দ্রুত বহন করে পুরে ফেলল একটি অতিকায় লেপের মধ্যেই। সেই লেপ বয়ে তারা লঘু পায়ে বেরিয়ে গেল সদর দিয়েই। এক পাইক তাতে সন্দেহ করতেই মেয়েমানুষদের মধ্যে এক জনের তীব্র কটাক্ষে তার প্রায় ভস্ম হওয়ার জোগাড়।

দুলালচন্দ্রের নাতি বললেন, শিবু সর্দারের এই একটি বিশেষ গুণ, সে চমত্কার মেয়েদের নকল করতে পারত। তার মুখটাও তো ছিল মেয়েলি।

দুলালচন্দ্রের পাইকদের এক জন তারপরেও ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে যে গাড়িটি বেরিয়ে গেল, তার দিকে গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলি ঠং করে গাড়ির গায়ে লেগেওছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গাড়ি গেল গঙ্গার ঘাটে। তারপরে নৌকায় ক্ষণপ্রভাকে তুলে বাড়ি নিয়ে যাওয়া তো শিবু সর্দারের কাছে চোখের পলক ফেলার চেয়েও বোধ করি সহজ কাজ ছিল।
--রাধার কী হল?
--আশ্চর্যের কথা হল, রাধা শিবু সর্দারদের সঙ্গে যায়নি।
ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, সে দিনের ঘটনা মনে রয়েছে। আমি তখন আহিরীটোলার বাড়িতে। তখন যিনি নায়েব ছিলেন, তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। কলকাতার আদালতে মোকদ্দমা ছিল। অনেক কাগজপত্র যত্ন করে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। তার জন্য কাছারির লোকও হাজির ছিল। কিন্তু আমি কলকাতা যাওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়তাম না। তাই কাগজপত্র বইবার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নায়েব মশায়ের সঙ্গে কলকাতা চলে যাই। তখন নানা কথা কানে আসত। এক দিন হঠাৎ দেখি রাধা আহিরীটোলার বাড়িতে এসে হাজির। তাকে দেখে খুব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে, কিছুই তখন জানতাম না। পরে পরে কিছু কিছু শুনেছি। সেই মতো বলতে পারি, গঙ্গাধর তাকে খুব বিষাক্ত একটা শিকড় দিয়েছিল ধুনুচিতে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। তাতে মানুষ বেশ কিছু ক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। রাধাকেও দিয়েছিল একটা অ্যান্টিডোট। সেটি রাধা আঁচলে বেঁধে তা চেপে ধরে রেখেছিল নাকের কাছে। তাতে শেষ রক্ষা হয়েছিল। কিন্তু রাধা একটু অসুস্থও হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, কর্তাদাদা তাকে আনার কথা বলেননি, রাধা গেলে কর্তাদাদা খুশি হবেন কি না, তা-ও বোঝা যাচ্ছিল না। তাই কাজ উদ্ধারের পরে রাধা যখন আহিরীটোলার বাড়িতে চলে যাওয়ার বায়না ধরলেন, শিবু সর্দার তাতে আপত্তি করেননি। তবে রাধা আবার কয়েক দিনের মধ্যেই কোথায় একটা চলে গেল। নায়েব মশায়ের পানের ডিবা মাজতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেটা কোথায় গেল, কেউ বলতে পারছিল না। কে যেন বলল, রাধা জানে। কিন্তু রাধাকে আর পাওয়া গেল না।
বিনোদবিহারীর ছেলে অবশ্য বললেন, শিবু সর্দার পরের দানটি চেলে রাখতেই রাধাকে সেই রাতে মুক্তি দিয়েছিল। শিবু সর্দারকে কর্তাদাদা এমনি এমনি পছন্দ করতেন না।

--পরের দানটি কী?

--সেটি জানা যাবে নায়েব উকিলের একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বিপিনবিহারীকে। তবে চিঠিটি উদ্ধৃত করার আগে নায়েব উকিলের একটি ছোট চিঠি যা তিনি দুলালচন্দ্রকে তাঁর কাশীর বাড়ি সংক্রান্ত গোলমালের সময়ে লিখেছিলেন, সেটি একবার পড়ে নেওয়া উচিত। সেখানে তিনি লিখছেন, "এই বাড়ির প্রায় সকলের মধ্যেই অপেরা-ধর্ম রহিয়াছে। অপেরায় যেমন সব কিছু সত্য না হইয়াও সত্য বলিয়া দাবি করা হয়, সত্যের অতিরিক্ত কিছু সত্যের অধিকার দাবি করে, তেমনই। তাহাতে সাধারণ দ্রব্যের উপরেও একটি রঙের প্রলেপ পড়ে। তাহাতে সাধারণ মানুষের মনে ভ্রমের উৎপাদন হয়। আর সেই সুযোগে নিপুণ হস্তে এই পরিবারের লোকজন পরিস্থিতি নিজেদের হাতে লইয়া নেন। এই পরিবারের মানুষজন সাধারণ কথাও কিছুটা গুছাইয়া বলিবার ক্ষেত্রে যত্ন রচনা করেন। তাঁরা সাধারণ কাজও কিছু অতিরিক্ত রঙিন করিয়া করিয়া থাকেন। ইহা অনেক সময় সমস্যার কারণও বটে। কেননা, সাধারণ মানুষ এই আচরণধর্মের সহিত পরিচিত নহেন। তাঁহারা এই বাড়ির সদস্যদের আচরণের উল্টা বুঝেন। কিন্তু এই অপেরা-ধর্মের একটি বড় গুণ হইল, তাহা যতি চিহ্নের মতো করিয়াই সাধারণ্যের থেকে ইহাদের দূরে সরাইয়া রাখে। সেই দূরত্বটি ব্যবহার করিতেও পারা যায়। প্রয়োজনে দূরত্বটি অস্ত্র হইয়া উঠে। বস্তুত, এই অপেরা-ধর্মটিই একটি বিরাট অস্ত্র স্বরূপ। সংকীর্তনের দল শুদ্ধ হরিদাসবাবাজিকে আপনার পিতার বন্ধু যে বাটীতে থাকিতেন, সেই স্থানে পাঠাইয়া দিবার যে পরামর্শ আপনাকে দিয়াছিলাম, তাহা ওই অপেরা-ধর্মেরই ফল। দীর্ঘদিন এই পরিবারের সঙ্গে থাকিয়া আমিও ওই ধর্মে কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছি।"

--অপেরা ধর্মের উত্সটি কিন্তু ছিলেন কর্তাদাদাই।

--ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, আসলে অপেরা-ধর্মটি হল একটি সাজানো গোছানো কথা। মূল কথাটি হল নাটুকেপনা। কিন্তু সেই কথাটিই যে অপেরা-ধর্ম বলে পেশ করা হচ্ছে, এটাই অপেরা-ধর্ম। এইটাতে আমার রাগ হত। এখনও হয়। বাবার মধ্যেও অপেরা-ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর কথা থেকে বোঝা যেত। যেমন তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'দেবতার প্রতি কর্তব্য বাবার প্রতি কর্তব্যের চেয়ে বড়।' তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন 'স্ববশ হও' বলে। আমি অনেক সময় বুঝতে পারতাম না, এগুলি অপেরা-ধর্ম না কি সত্যিই কথাটা এইটাই। আসলে কোনও কথার মাত্রা অনেক সময় বেশি ভারি হয়ে গিয়ে তার স্বাভাবিক চলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তাতে তার উপরে অপেরা ধর্মের প্রভাব যুক্ত হত। কর্তাদাদা সেই সন্ধ্যায় বাবাকে যে ভাষায় কথা বলেছিলেন, তার মধ্যেও এই অপেরা-ধর্ম ছিল। তাতে কিছু মুশকিলও ছিল। এই যে বললাম, অপেরা-ধর্মের কারণে কথার মাত্রা চড়ে যেত। তা কখনও কখনও কাজে লাগত। কখনও কখনও অতিরিক্ত হয়ে যেত। যেমন আমার ধারণা, বিপিনবিহারী কর্তাদাদার সামনে যে বলেছিলেন 'আমি স্ববশ', সে কথাটা অপেরা-ধর্ম অনুযায়ী কথায় প্রত্যাশিত জোর যুক্ত করেছিল। কিন্তু কর্তাদাদা যে বাবাকে বলেছিলেন, 'দেবতার মুখে কি আকাশের খবর লেখা থাকে'—তাতে অপমানের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত ভাবে একটা কড়া ভাব যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

--কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, কর্তাদাদা ইচ্ছে করেই অপমান করেছিলেন ঠাকুরমশায়কে।

--কর্তাদাদা ইচ্ছে করে অপমান করেছিলেন, সেটা বলেছিলাম। কিন্তু এতটাই অপমান করতে চেয়েছিলেন, সেটা বলিনি। আর একটা কথা, কর্তাদাদা আমার সামনে বাবাকে কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি জানতেন আমি সামনে রয়েছি। তাই ইচ্ছার অতিরিক্ত অপমানটুকু সেখানেই ঘটে গিয়েছিল। নতুন করে কথায় জোর আনার জন্য কথাটিকে সাজানো গোছানোর আর দরকার ছিল না। ওটা তিনি স্বভাব বশেই করেছেন। এটা তাঁর সব ছেলেমেয়েই করতেন।

--অপেরা-ধর্মের সঙ্গে অপেরার সাক্ষাৎ সম্পর্কও কিছু ছিল।

--তা যে সব সময়ে কর্তাদাদা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের দিক থেকেই বয়ে আসত, তা নয়। বাবার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। অনেক সময় সন্ধ্যাকালে পাঠের আসর বসত। উদ্যোগী ছিলেন বাবাই। তিনি রাধামাধবের পুজোর পরে কথকতা করতেন। কৃষ্ণের জীবনকথা। তার অনেকটা শাস্ত্রনির্ভর ঠিকই কিন্তু অনেকটা কল্পনাও। বাবা অনেক কথা পড়ে জেনেছেন, অনেক কথা নিজে কল্পনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি ছিল ওই সব মিশিয়ে এমন একটি পাঠ তৈরি করে তোলা, যা ওই গ্রামের মেয়ে-বৌরা শুনতে ভালবাসবেন। ক্ষণপ্রভা কখনও কখনও সেখানে গিয়ে বসতেন। প্রথম বার গৃহত্যাগের পরে ফিরে এসে ক্ষণপ্রভার চরিত্রে একটা পরিবর্তন এসেছিল। বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। গ্রামের মেয়ে বৌদের সঙ্গেও তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। বাবার কোনও কথা গ্রামের কোনও মেয়ে বৌ বুঝতে না পারলে, তিনি অনেক সময় তাঁদের তা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা ছিল অন্যরকম। কারণ, তিনিও তখন তাঁর মতো করে কাহিনি তৈরি করতেন। বাবা চুপ করে শুনতেন। একই সার কাহিনি থেকে দু'টি আলাদা কাহিনি স্রোত যে সে ভাবে তৈরি হত, সেটা বাবাও খেয়াল করতেন। তাই ক্ষণপ্রভার কথা শেষ হওয়ার পরে বাবা যখন ফের কাহিনির রাশ ধরতেন, ক্ষণপ্রভার কাহিনির রেশটি ধরে রেখেই এগোতেন। কিন্তু ক্ষণপ্রভার মতো করে এগোতেন না। তবে একটা মিল বাবা ও ক্ষণপ্রভা এই দু'জনেরই ছিল। দু'জনেই অনুভূতির জোরের উপরে জোর দিতেন। দু'জনেই কাহিনি বলার ভঙ্গির উপরে জোর দিতেন। শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপরেও জোর দিতেন দু'জনে।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে বলে চললেন, তখন অনেক সময়ে তাঁর বাবা গানও গাইতেন। মহাজনী পদ গাইতেন। কিন্তু নাটকের গানও গাইতেন। সেই গান ছিল, 'হরি, মন মজায়ে লুকায়ে কোথায়? আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়!' খুব দরদ ছিল তাঁর কণ্ঠে। তাঁর কণ্ঠে এই গান শুনে কেঁদে ভাসাতেন গ্রামের মেয়ে বৌ-রা। আমি পর্যন্ত ওই গান শুনে গলে যেতাম। আমি পড়ে নাটকটি দেখেছি। কিন্তু বাবার দরদ নাটকের গানে পাইনি। বাবা যেন সারা শরীর দিয়ে গাইতেন। এমনকী কর্তাদাদাকে পর্যন্ত দেখেছি এই গান শুনলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। তাঁর স্ত্রী খুব কম কথা বলতেন। তিনিও একবার মন্দিরে এসে বাবাকে বলেছিলেন গানটি গাইতে।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, এই যে সরল গান। তার সরল ভাব। এই সব গ্রামের মানুষকে খুবই টানত। যেন সারল্যেরই একটি টান রয়েছে। যেন সেই সারল্যের টানেই অনেক অভিমান ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। নানা বৈচিত্র্যের কারণে বিনোদিনী অনেক বেশি আকর্ষণীয় হলেও, চোখের বালির আশার সারল্যের ভক্ত কিছু কম ছিল না।

স্বয়ং নায়েব উকিলই চোখের বালির আশার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, একবার নায়েব উকিল আমাকে বলেছিলেন, আশার মতো নিপাট ভালোমানুষ তার চারপাশে যে আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়ে দিয়েছিল, তা কেবল রবিবাবুর লেখার গুণ। তিনি যে বিনোদিনীর নামটি দিয়ে কাহিনি শুরু করে তার পরে সেই সপ্তম পরিচ্ছেদে বিনোদিনীকে পুরোপুরি উপন্যাসে নিয়ে এলেন, এ থেকে তাঁর সংসার বুদ্ধিরও খুব একটা ভাল আঁচ পাওয়া যায়।

বিনোদবিহারীর ছেলে বললেন, তিনি রাধাদিদি সম্পর্কে আশার কথাই তুলতেন। এমনকী, রাধাদিদিকে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গেও তুলনা করতেন। চোখের বালি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি রাধাদিদি সম্পর্কে বলেছিলেন, রাধাও নিঃশব্দ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া বহুকাল বড়দাদাবাবু বিপিনবিহারীর পাশে পাশে থেকেছে। এ যে কত বড় ত্যাগ স্বীকার, সংযমের কত বড় অঙ্গীকার বয়ে নিয়ে চলা, তা সহজে প্রকাশ করাই যায় না। হরিদাস বাবাজির কাছ থেকেই রাধাদিদি সেই শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে নায়েব উকিলের মত ছিল। রাধাদিদি পড়তে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ঘরে আমি বিষবৃক্ষ ও চোখের বালি দেখেছি। সেই বইয়ে নায়েব উকিলের নাম স্বাক্ষর করা ছিল। এরকম ভাবাও অস্বাভাবিক নয় যে, পরের দিকে নায়েব উকিল ওই দু'টি উপন্যাস রাধাদিদিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। বইগুলি তারপরে সেখানেই রয়ে গিয়েছিল।

১৬
কাজটা না হয় ইংরেজের মেয়ের মতো হইল

এ বার বিপিনবিহারীকে লেখা নায়েব উকিলের চিঠিটি পুরো উদ্ধৃত করছি—
"আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনি আমার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু কী পরিস্থিতিতে আমাকে কী করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তাহা না জানাইলে হয়তো কোনওদিনই ক্ষমা পাইব না। তাই এমতাবস্থায় আপনাকে এই চিঠি লিখিতে বাধ্য হইতেছি। দয়া করিয়া ইহা একবার পড়িয়া যা উচিত বিবেচনা করিবেন, আমার প্রতি সেই ব্যবহার করিবেন।

বৌদিমণিকে শিবু সর্দারের দল বাড়ি লইয়া যাইবার পরে আমি খুব নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। যত দিন বৌদিমণি জামাইদাদার বাড়িতে ছিলেন, তত দিন আমার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবার মতো হইয়াছিল। আপনাদের বাড়ির সহিত আমার প্রাণের সম্পর্ক। আপনাকে আমি জীবিত সকল মানুষের মধ্যে সব হইতে ভক্তি করি। আপনার গৃহলক্ষ্মী গৃহে ফিরিতেছেন না, এ আমি সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি ফিরিয়া যাইবার পরে আমার মনের ভার অনেক হাল্কা হইয়া যায়। আমি আবার আগের মতো মামলা মোকদ্দমাতে মন দিতে শুরু করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল জীবন আবার আগের মতো বহিয়া চলিবে, গঙ্গার মতো নিরুপদ্রবে।

ভুল ভাবিয়াছিলাম। বৌদিমণি ফিরিয়া যাইবার সপ্তাহ খানেক পরেই একদিন ভোরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার জন্য বেরোতেই দেখি দোরের সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে শিবু সর্দার। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে তীব্র ক্ষোভ, অস্বস্তি ও বেদনা। আমি দাঁড়াইয়া পড়িতেই সে আমাকে কহিল, 'আপনি স্নান সেরে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।'

ইতিমধ্যে শিবু সর্দার বৌদিদিমণিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। আমার সঙ্গে তাহার তত্‌কালে অনেক কথা হইয়াছে। বস্তুত আপনার পরামর্শ মতো তাহাকে আমিই সব কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। এমনকী রাধা কাশীবাসকালীন যে হিন্দুস্তানি অভ্যাস সমূহ আয়ত্ত করিয়াছিল, তাহা কী ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও আপনার কথা মতো বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। হিন্দুস্তানি মেয়েলোক সাজিবার কায়দা পর্যন্ত তাহাকে পাখি পড়া করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। গঙ্গাধরকে ব্যবহার রীতিও আপনার বুদ্ধি মতো তাহাকে বলিয়াছিলাম। তাই ক্ষণকালের জন্য হয়তো মনে এই ভাব আসিয়াছিল যে, শিবু আমার প্রতি অন্তত আর মারাত্মক হইবে না। সে আপনাকে শ্রদ্ধা করিয়া

থাকে, সেই সুবাদেই আমাকে হয়তো রেহাই দিবে। কিন্তু দেখিলাম, কর্তাদাদার ভয় তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। সেই ভয় সে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত করাইয়া দিল। তাহার দৃষ্টিই যথেষ্ট ছিল। অপেরাধর্ম সে যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া অবাক হইলাম।

তাহার কথা মতো যখন স্নানের ঘাটের দিকে যাইতেছিলাম, দেখিলাম, শিবু সর্দারের লোকজন আমার চারপাশে। আমি স্নান করিতে করিতেও তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। স্নান সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া শিবুকে বলিলাম, আমি পূজা সারিয়া ফেলিতে পারিলে খোলা মনে কথা কইতে পারিব। তাহাতেও সে রাজি হইল। ঠাকুরকে বলিলাম, শিবু সর্দার ঘরের মধ্যে এসে গিয়েছে, এই বোধহয় তোমার কাছে আমার শেষ পুজো। আমি চলিয়া যাইব নিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যু যেন কষ্টের না হয়, তাহা দেখিয়ো। তাহার পরে দুরুদুরু বক্ষে পূজার পরে সামান্য প্রসাদ শিবুর হাতেও দিলাম। সে তখন বসিয়াছিল আমার বৈঠকখানা ঘরে মক্কেলদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কেদারায়। প্রসাদ খাইয়া মাথায় হাত ঠেকাইয়া সে একটু ঝুঁকে পড়িয়া আমার দিকে খর চোখে তাকাইয়া সোজাসুজি কহিল, বৌদিমণির বোন কোথায়?

বিশ্বাস করুন, এই প্রশ্নটিই যে সে করিতে আসিয়াছে, তাহা আমি জানিতাম। কথাটা বলা আমার পক্ষে সহজ হইবে না, সে কথা শিবুও জানিত। তাই সে আমাকে সময় দিয়াছিল, আর এই পুরো সময়টা সে আমার উপরে তাহার প্রভুত্বের প্রভাব ছড়াইয়া দিতে সযত্ন রহিয়াছিল। তাহার যত জন সঙ্গীকে আমি এইটুকু সময়ের মধ্যে দেখিয়াছি, প্রত্যেকেই তাহাদের আচরণে প্রতি মুহূর্তে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমি আক্রান্ত।

আমি পরিস্থিতি সহজ করিবার জন্য বলিলাম, সে খবর পাওয়া তোমার কাছে তো কিছুই নয় শিবু। আমার কাছে কেন এসেছো?
শিবু বলিল, আপনি আমাকে চেনেন। কিন্তু আমিও কখনও কখনও ভুল করে ফেলি। আর আপনি জানেন, কর্তাদাদার কাছে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বড় কঠিন ভাবেই দিতে হয়।
এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অস্থির হয়ে পায়চারি করিতে করিতে বলিল, সে দিন গঙ্গায় আমাদের লোককেই দেখেছিলাম। সুবোধ আর তার ছেলে। বৌদিদিমণির বোনকে তারা ছিপে তুলে কলকেতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রথম সন্দেহ হয়, সুবোধের মুখ দেখে। আমার কাছে খপর এসেছিল, বজরা থেকে একটি ছিপ বেরিয়েছে। তাতে এক মহিলা ও একটি কিশোর রয়েছে। পথে কোনও বাধা না দিয়ে, বালির কাছাকাছি আসতে আমি নিজে গিয়েই মাঝ গঙ্গায় যখন ছিপ আটকালাম, আমাকে দেখেই সুবোধের মুখ তরাসে কেঁপে উঠল। তারপরে একের পর এক মিথ্যে কথা। গঙ্গায় বজরা ডুবে গেলে, গঙ্গা না টের পাক, আমি ঠিকই পাব। তবু সুবোধ কী করে আমার মুখের উপরে মিথ্যে কথাটা বলল, তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি কেন বাধা দিইনি জানেন? বৌদিদিমণির বোনের মুখের দিকে চেয়ে। যে ছেলেটিকে আমিই বড়দাদাবাবুর কথায় বিভাদিদিমণির কাছে পাঠিয়েছিলুম, সে ছিল ওই ছিপে। তার কাছ থেকেও বেইমানি প্রত্যাশা করিনি। আর ওই যে মণ্ডা সে নিজের হাতে সকলকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল, তা বানানোর কায়দা তাকে শিখিয়েছিল গঙ্গাধর। এরপরেও কী করে অবিশ্বাস করি বলুন যে, এর মধ্যে কর্তাদাদার কোনও হাত নেই? তবে সব থেকে বড় চমকটি ছিল বিভাদিদিমণির। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একবার চোখ তুলে তাকালেন। ওই দৃষ্টিতেই বোকা হয়ে গেলুম। ভাবলুম, কর্তাদাদাকে বলেই বড়দাদাবাবু কাজে নেমেছেন। তাই সুবোধ মাঝির মতো বিশ্বস্ত

লোক লাগিয়েছেন, যে কখনও কর্তাদাদার কথার অমান্যি করেনি। নৌকা ছেড়ে দিলুম। আর সেই হল আমার জীবনের মস্ত বড় এক ভুল।

কথা শেষ করিয়া শিবু সর্দার আমার সামনে ভেঙে পড়া একটা গাছের মতো বসিয়া পড়িল। কিছু ক্ষণ মাথা নামাইয়া রাখিল। শ্রীরামপুরের মেয়েরা সুন্দরী হয়, সেই সঙ্গে তারা যে কতটা কঠিন ধাঁচেরও হয়, তা বঙ্কিমের রাধারানি সাক্ষী। মনে পড়িয়া গেল, রাধারানিও 'এ কাজটা না হয় ইংরেজের মেয়ের মতো হইল' অথবা 'তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন কাজটাই করি' ইত্যাদি বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল রহিয়াছিল। বিভাদিদিমণিও সত্যি সত্যিই ইংরেজের মেয়ের মতোই কাণ্ডখানা ঘটাইয়াছেন। মুখ নামাইয়া সে কথাই ভাবিতেছিলাম। মুখ তুলিতে দেখিলাম শিবুর চোখ দু'টি রাঙা।
সে বলিল, শিবু সর্দারকে ভয় করে না, এমন লোক এই গঙ্গায় নেই নায়েব উকিল। বিভাদিদিমণি যে আমাকে ভয় করলেন না, তাতেই আমি ভুলটি করে ফেলেছিলুম। কর্তাদাদা আমাকে ডেকে বললেন, যে করে হোক বিভাদিদিমণিকে উদ্ধার করে আনতে হবে। সেই সঙ্গে সুবোধের জন্য ছিল শাস্তির হুকুম। সে আমি তালিম করেছি। সুবোধ আর তার ছেলেকে বাঘে খেয়েছে। তাদের হাত পা কাটা দেহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বিভাদিদিমণির খোঁজ পাইনি।
সুবোধকে আমিও চিনিতাম। খুব ভাল লোক। দক্ষ মাঝি আর সর্বোপরি কর্তদাদার কথায় সে প্রাণও দিতে পারিত। সেই লোককে এমন নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে কর্তাদাদার বাধল না। শিবুও সেই হুকুম তালিম করিল। আমার যেন সারা জগতের উপরে ঘেন্না ধরিয়া গেল। পর ক্ষণেই মনে পড়িল, রাধাকে আশ্রয় দিবার পরেও কর্তাদাদা কিন্তু আমাকে প্রাণে মারেননি। আমি এ বার কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। মন শক্ত করিয়া শিবুকে আরও একটু বাজাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। তাহাকে বলিলাম, সে-ও তো তোমার কাছে সহজ কাজ।
শিবু সর্দার কথাটা শুনিয়া হাসিল। তারপরে বলিল, সহজ কাজ তো বটেই। আমি জানতুম, আর কেউ না হোক, রাধা বড়দাদাবাবুর খোঁজ রাখবে। আর রাখবেন আপনি। রাধা জামাইদাদার ভবানীপুরের বাড়ি থেকে চলে এসে আহিরীটোলায় উঠতে চাইল যখন, আমি জানতুম, ও এ বার বড়দাদাবাবুর কাছে যাবে। কিন্তু সে খোঁজ ও পাবে কোথা থেকে? বৌদিদিমণিকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার উপরে নজর রাখতে শুরু করলুম। কিন্তু তত ক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। রাধা আহিরীটোলার বাড়ি ছেড়ে বড়দাদাবাবু আর বিভাদিদিমণির কাছে গিয়া উঠেছে।
বাইরে কোথাও একটা কাঁসর ঘন্টা বাজছিল। তার প্রতিটি শব্দ আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ির মতো ঘা দিচ্ছিল। আমি যথা সম্ভব মনের শক্তি একত্র করিয়া তাহাকে বলিলাম, রাধার সঙ্গে এর মধ্যে আমার একবার মাত্র দেখা হয়েছে।
শিবুর চোখে সেই রাগ ফিরিয়া আসিল। সে হুঙ্কার দিয়া বলিল, ওই একবারেই আপনি তাকে বড়দাদাবাবুর ঠিকানা বাতলে দিয়েছেন।
আমি বলিলাম, এখন তুমি কী চাও?
শিবু বলিল, রাধার খোঁজ। তুমি রাধাকে চিঠি লিখে তোমার কাছে একবার আসতে বলো। তার পরে যা করার আমি করব।

শিবুর সামনেই বসিয়া আমাকে তখন রাধাকে পত্র দিতে হইল। বলিলাম, বিশেষ দরকার, সে যেন বৈকালেই আমার সহিত আসিয়া দেখা করে। সেই পত্র লইয়া শিবু সর্দারের লোক বৌবাজারের যে বাড়িতে আপনি তখন

অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সেখানে আমার বাতলানো ঠিকানায় গিয়া রাধার হাতে চিঠি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। শিবুর লোকও চিনিয়া গেল আপনার ঠিকানা। এই বৃহত্ দোষটি আমি করিয়া ফেলিলাম, শিবুর ভয়ে।

দ্বিপ্রহরে আমাকে বাড়ি হইতে বার হইতে দিল না শিবু। আমার বাড়ির চারপাশ তাহার লোকজন প্রচ্ছন্ন ভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।
শিবু একবার বলিল, রাধার বুদ্ধির শেষ নেই। সামান্য কোনও আঁচ পেলেও ও পালাবে। ওকে কিছুতেই কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না।

আমি দুরুদুরু বক্ষে ভিতরের ঘরের খাটে শুইয়া রহিলাম। রাধা বৌবাজার হইতে রাস্তায় নামিতে না নামিতেই শিবু সর্দারের কাছে খবর চলিয়া আসিল। পুরো রাস্তায় লোক রাখিয়া দিয়াছিল শিবু।

রাধা কিছুটা ব্যস্তসমস্ত হইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ উদ্বেগে ভরপুর। বৈঠকখানায় ঢুকিয়াই সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার কি শরীর খারাপ নায়েব উকিল? একেবারে আধখানা হয়ে গিয়েছো এই মাত্র ক'দিনে!

তারপরেই চারিদিকে তাকিয়ে অস্বস্তি অনুভব করিতে পারিল। আর শিবুও ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকিয়া দোরটি বন্ধ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে রাধার মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া গেল। শিবু তাহাকে বসিতে বলিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি যা যা বলব, কোনও প্রশ্ন না করে ঠিক তাই তাই করবে। অন্যথায় আমার সুনামের সঙ্গে তোমার যে পরিচয় রয়েছে, তা আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

আমি আর রাধা প্রায় আতঙ্কের মধ্যেই শুনিলাম শিবু সর্দারের পরিকল্পনা। সে একটি কৌচে বসিয়া খুব ধীর স্বরে বলিল, রাধা, তুমি এখন আহিরীটোলার বাড়িতে থাকবে। সারা ক্ষণ নজর থাকবে তোমার উপরে। তোমার গঙ্গাস্নানও এখন বন্ধ রাখতে হবে। কোনও ছুতোয় বেরোনোর চেষ্টা করলে মনে রেখো শিবু সর্দার তোমার ছায়া হয়ে পিছনে রয়েছে।
রাধা সেই কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে বাহির হইয়া গেল শিবুর লোকের সঙ্গে। শিবু আমাকেও চুপ করিয়া কয়েকদিন গৃহকয়েদ থাকিবার হুকুম দিয়া চলিয়া গেল। চার দিন কাটিল অসহ্য মনকষ্টে। শিবু আপনার বাড়ি চিনিয়া গিয়াছে। সে কী করিবে, কী করিতেছে, কে জানে! কিছুই সংবাদ পাইতেছি না। রাধার কী হইল, তাহাও জানি না।

অবশেষে শিবু এক সন্ধ্যায় রাধাকে সঙ্গে করিয়া আমার বাড়িতে আসিল। একগাল হাসিয়া শিবু বলিল, বৌবাজারের বাড়িটি আমি কব্জায় নিয়ে এসেছি। সে বাড়িতে রান্না করে যে পাচিকা, তার গুষ্ঠি সুদ্ধ সকলকে এখন আমি চিনি। যে ওস্তাদ বৌদিদিমণির বোনকে গান শেখাতে যান, তার বাড়ি ঘরদোর আমার নখদর্পণে। এ বারও নেশার দ্রব্যের সাহায্য নিতে হবে। বৌবাজারের পাচিকাকে রাজি করিয়ে ফেলেছি, সে খাবারের সঙ্গে গঙ্গাধরের দেওয়া ওষুধ মিশিয়ে দেবে। না হলে তার ন'বছরের নাতনিকে আমার লোকজন আমাদের কাছেই এনে রাখবে। নাতনির মুখ সে আর কোনওদিন দেখতে পাবে না। ওস্তাদজির সঙ্গেও কথা হয়ে গিয়েছে। তাকে কর্তাদাদার নাগপুরের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যথেষ্ট টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়ে। ওস্তাদজি বৌবাজারের বাড়িতে বলে রেখেছেন,

তাঁর নতুন সঙ্গী-সাথী এসেছে অযোধ্যা থেকে। আমার লোকজন তানপুরো, সারেঙ্গি, হার্মোনিয়াম, তবলা ঘাড়ে করে তাই তাঁর সঙ্গেই ঢুকে যাবে ওই বাড়িতে। কেউ সন্দেহ করবে না। গঙ্গাধর নানা জায়গা থেকে শেকড়-বাকর আনিয়ে ওষুধ রান্না করছে। তার এমনই গুণ যে, খাওয়ার পরে টানা দশ-এগারো ঘন্টা কোনও হুঁশ থাকবে না। তবে ভয় পেয়ো না, বড়দাদাবাবুর শরীর খারাপ হবে না। ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিক মানুষই হয়ে যাবেন। তবে ওই ঘুমের সময়টুকুতে বৌদিদিমণির বোনকে আমরা শ্রীরামপুরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেব।

অপ্রতিহত রাধা কহিল, আমি কেন ওই দিন বৌবাজারে থাকতে পারব না?
শিবুর চোখ দু'টি ধক করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পরে সে বলিল, তুমি থাকবে নায়েব উকিলের বাড়িতে। সন্ধ্যা নাগাদ ওষুধ মেশানো খাবার দেওয়া হবে বড়দাদাবাবু আর বৌদিদিমণির বোনকে। তারপরে রাত গড়ালে, আমার সঙ্কেত পেলে তুমি যাবে বৌবাজারের বাড়িতে। তখন বড়দাদাবাবুর শরীরের কিছু যত্ন দরকার। সে তুমি করবে। কিন্তু সকালের দিকে তুমি বাইরে বেরোলে সেই বেরোনোই তোমার জীবনের শেষ বেরোনো হবে।
তাহার পরে শিবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, নায়েব উকিল, তোমার বুদ্ধির দৌড় অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু আমার হাত তার থেকেও বেশি দূর অবদি যেতে পারে। বড়দাদাবাবুর কাছে যদি কোনও খপর, কোনও ভাবে পৌঁছয়, তা হলে বুঝতেই পারছ, সুবোধ মাঝির মতো তোমাকেও বাঘে খাবে।

রাধাকে তাহার লোকেরাই একরকম ঘিরিয়া ধরিয়া লইয়া গেল কর্তাদাদার আহিরীটোলার বাড়িতে। তাহার পরে শিবু সর্দার আমাকে কহিল, রাধা আমাদের প্রায় সকলকেই চেনে, তাই তাকে না জানিয়ে অথচ তারই সাক্ষাতে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। সে চিনে ফেলে চেঁচামেচি করে সব মাটি করে দিতে পারত। তাই রাধাকে দলে টানতে হল। কিন্তু রাধা সংযত নয়, তার চোখমুখ সর্বদা কথা বলে। সে কোনও কথা প্রকাশ করতে না পারলে আরও অস্থির হয়ে ওঠে। বড়দাদাবাবু তাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তার উপরে বড়দাদাবাবুর উপরে তার প্রেম আমার প্রতি তার ভয়ের চেয়ে বেশি। তাই ঝুঁকি নিতে পারিনি।

ইহার পরে কী ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা জানেন। সেই রাত্রে আপনাদিগকে বেহুঁশ করিয়া বিভাদিদিমণিকে নির্বিঘ্নেই বাহিরে বার করিয়া নিয়া চলিয়া গিয়াছিল শিবু সর্দার। গঙ্গাধরের ওষুধ ও শিবু সর্দারের হাতের গুণ এমনই ছিল যে, বিভাদিদিমণি নাকি শ্রীরামপুরের বাড়িতে নিজের ঘরে ঘুম ভাঙিবার পরে অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন, বৌবাজারের ঘর কী জাদুতে এমন করে বদলে গেল শ্রীরামপুরের ঘরে!

কিন্তু রাধা প্রত্যাশিত ভাবেই সব কথা পরদিন প্রভাতে আপনাকে খুলিয়া বলিয়াছিল। তাহার পরে আপনি রাগিয়া যান। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমার আর কী করিবার ছিল?
ক্ষমা নাই পাই, সব কথা বলিয়া মন লঘু হইল।"

১৭
পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল

ক্ষণপ্রভা বাড়িতে ফিরে দেখলেন ফারাক কেবল একটিই ঘটেছে। বাড়িতে রাধা নেই। দুলালচন্দ্রকে তিনি চিঠিতে লিখলেন, "বিনোদিনী যে রূপ বিহারীর বাড়ি গিয়াছিল, আমিও সেই রূপ তোমার কাছে গিয়াছিলাম। বিনোদিনী যে রূপ আকণ্ঠ কাতর হইয়া বিহারীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়াছিল, আমিও তদ্রূপ তোমায় আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য এই জীবন ও রবিবাবুর লেখনী। এখন যখন বাড়ি ফিরিয়া চোখের বালিতে পড়িলাম, বিনোদিনীর গ্রামের কথা, সেই যে মহেন্দ্র নতশিরে স্টেশনে যাইতেছে আর অন্য দিকে গ্রামবধূদের স্নানাহার হইয়া গিয়াছে। কেবল যে সকল কর্মনিষ্ঠা প্রৌঢ়া গৃহিনী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আম্রমুকুলে আমোদিত ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্করিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে—এই বিবরণ আমাকে খুবই টানিল। আমি ওই গ্রাম্য গৃহিনীদের হিংসা করিতেছিলাম। তাহাদের জীবন কত শান্ত। কত মনোরম। তাহারা তাহাদের সাধারণ দীন সংসারে নিজেদের কত জন্মের সংস্কারগুলি লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার জীবন তেমন নহে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর খোঁজে সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়া তাহার গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই এক প্রেম, যাহার জন্য আমি কাতর হইয়া রহিয়াছি। রবিবাবু যতই তাঁহার উপন্যাসে বিহারীর গুণগান করুন, যতই সে চরিত্র লোকপ্রিয় হউক, আমি বরাবর মহেন্দ্রকে চাহিয়াছি। অমন প্রেম, যাহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে পারা যায়, যাহার জন্য মায়ের যত্ন, স্ত্রীর আদর ত্যাগ করা যাইতে পারে, তেমনই। বারবার ধাক্কা খাইয়াছে মহেন্দ্র, তবু সে বিনোদিনীকে ত্যাগ করে নাই। অপমানিত মহেন্দ্র ফিরে ফিরে গিয়েছে তাহার কাছে। এই প্রেমের কাঙাল আমি জামাইদাদা।

'তবে বিনোদিনীর চাইতে আমার অবস্থা ভাল। শ্বশুরমশায়ের কৃপায় আমার একপাশ তাতিয়া উঠিলে অন্য পাশে ফিরিয়া শুইবার ঠাঁই রহিয়াছে। কিন্তু যে সোহাগ হইতে তোমার সহিত আমার অকস্মাত্ বিচ্ছেদ ঘটিল, বিনোদিনীর ন্যায়ই তাহা আর কোথাও নামাইয়া রাখিতে পারিতেছি না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় তোমার উদ্দেশ্যেই তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়া রাখিয়াছি।'

এই সময়েই ক্ষণপ্রভা নিজের ডায়েরিতে লিখছেন,
'আবার সেই গ্রাম। জমিদার বাড়ি। আমার ঘরটি। সেই অরণ্য মাঝে জীবনযাপন। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতির শব্দ শুনিয়া মন আর বশে রহিল না। মন্দিরে গেলাম। ঠাকুরমশায় গাহিতেছিলেন 'আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়!' আমি তাহার সহিত গলা মিলাইয়া গাহিয়া উঠিলাম, 'কালশশী বাজালে বাঁশি, ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী'। আমার কণ্ঠ শুনিয়া ঠাকুরমশায় থমকে গিয়ে গান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের মেয়ে বৌ-রা আমার দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া ছিল। আমি কিন্তু ওই রাধামাধবের দিকে তাকাইয়া গাহিয়া গেলাম, 'হৃদবিহারী, কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।' গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিয়া গেলাম। ঠাকুরমশায়ের গলায় ভাল সুর নাই। কিন্তু দরদখানি অনন্য। তিনি আমাকে সাহায্য করিয়া গেলেন। যেন গানের সেই নদীতে তিনি একখানি নৌকার মাঝি হইয়া আমাকে ত্রাণ করিলেন। আমি দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখখানি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। আমি রাধামাধবের দিকে তাকাইলাম। ঠাকুরমশায়ের কথা মতো শীতল একটি বাতাসের ঝাপট যেন গায়ে লাগিল। যেন মন্দিরের আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যেন রাধামাধব প্রাণ পাইয়াছেন। যেন তিনি এই বিশ্বে আমার মতো একা কোনও

লোকের পাশে এসে দাঁড়াইয়াছেন। আমি গাহিতে লাগিলাম, 'হৃদবিহারী, কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।' মাধবের পাশে দাঁড়াইয়া শ্বেতপাথরের রাধা যেন কুটিল একটি কটাক্ষ করিয়া আমাকে জানান দিতে লাগিল, তাঁহার ওই মাধবটি তিনি ক্ষণকালের জন্য আমার সহিত বাঁটোয়ারা করিতে রাজি। ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মান রাধামাধবের একটি পা সামান্য তোলা। সেই পায়ের পাতাটি দেখিতে লাগিলাম। আলতা পরা সেই চরণ দু'খানিকেই মনে হইল সারা বিশ্বসমগ্র। আমি গাহিয়া গেলাম একই গানের একই চরণ। বারংবার। বারংবার।'

ভাবের যে অপ্রতিহত গতির কথা বিপিনবিহারী বলেছিলেন, ক্ষণপ্রভা সেই কথাই বললেন।
ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, বাবার সঙ্গে বিপিনবিহারীর অমিল সেখানে, ক্ষণপ্রভার সঙ্গে মিলও সেখানে।
--কিন্তু ক্ষণপ্রভা থিয়েটার দেখতেন বুঝলাম। ঠাকুরমশায়ও থিয়েটার দেখতেন?
--দেখবেন না কেন? বাবা কলকাতায় থাকার সময় নাটক-থিয়েটার দেখতেন। তবে সে দিন ক্ষণপ্রভার এই গানটি গাওয়া নিয়ে বাবা রাতে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, যা ওই ভাবের প্রতিষ্ঠারই কথা। আমার আজও তা মনে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, যারা আতুর এবং কাতর, তাদের মুখেই এই গানটির শব্দগুলি যেন প্রাণ পায়। চৈতন্য লীলায় গানটি যিনি গেয়েছিলেন সেই বিনোদিনীকে নিয়ে তখন অনেক কথা উঠেছিল। খোদ স্টেটসম্যান লিখল, বিনোদিনী 'ভিসিয়াস অ্যান্ড ইমমরাল'। সোজাসুজি লেখেনি, কিন্তু ইঙ্গিতটা ছিল বিনোদিনীর দিকেই। বাবা বলেছিলেন, গানটি প্রাণ পেয়েছে ওই 'ভিসিয়াস অ্যান্ড ইমমরাল' বিনোদিনী গেয়েছিল বলেই। অর্থাৎ গানটি গাইবার প্রয়োজন খুব বেশি করে ছিল বিনোদিনীরই।
--অর্থাৎ, স্টেটসম্যান ঠিকই লিখেছে বলে মেনে নিচ্ছেন।
--উল্টো বুঝছো। স্টেটসম্যান সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা বলেছিলেন, গানটি গাওয়ার জন্য যে আকুতির দরকার ছিল, তা বিনোদিনীর মনের মতো ক্ষতবিক্ষত মনের পক্ষেই ধারণ ও উৎপাদন করা সম্ভব। তিনি প্রাণপাত করছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের দিকে না তাকিয়ে তাঁর জন্ম নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তো পাচ্ছেনই না, বরং তাঁকে আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছে, কোণঠাসা করে ফেলছে সংসার—এটা প্রচণ্ড একটা অপমানের কথা এবং সেই অপমানে মন যখন রক্তাক্ত হয়ে থাকে তখন এই গানটি গাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দরদও উৎপন্ন হয়। সেই দরদ ক্ষণপ্রভার মধ্যেও বাবা সেই সন্ধ্যায় দেখেছিলেন। তাতে আপ্লুতও হয়ে যান। তাই তিনি গানটি গাওয়ার সময় বৌদিমণির সঙ্গে কণ্ঠও মেলান। যেমন এক সময়ে তিনি সূর্যমুখীর গানের সঙ্গেও গলা মিলিয়েছিলেন। তবে সূর্যমুখী বাড়ির মেয়ে, তার উপরে তিনি যখন খুব নিচু কণ্ঠে বিদ্যাপতির পদ গেয়েছিলেন, তাতে একটু পুজো করার ভাবও ছিল। রাধাকৃষ্ণের খুব ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্কের কথাও ছিল, কিন্তু ব্রজবুলির আড়ালও ছিল। এ বার কাণ্ডখানি সম্পূর্ণ অন্যরকম হল। কর্তাদাদার পরিবারের বৌ গান গাইছেন প্রকাশ্যে বসে, তা-ও এমন একটি গান, যাতে ভাষা বা ভাবে কোনও আড়ালই নেই, তা যথেষ্ট অন্যায় বলে ধরা হতে পারত, সেই কাজে প্রশ্রয় দেওয়া আরও বড় অপরাধ, আর তাতে সঙ্গত করা চূড়ান্ত অপরাধ। বাবা কিন্তু এখানে অকুতোভয় ছিলেন। এমনকী, তিনি বলেছিলেন, এই গান গাইবার দরদ যদি আনতে হয়, তা হলে গানটি গাইবার প্রয়োজনে দরকারে যেচে অপমানিত হতে হবে। মনকে ক্ষতবিক্ষত হতে দিতে হবে।
--এ তো সাংঘাতিক জোরের কথা।
--নিশ্চয়ই তাই। বাবা বলেছিলেন, সে দিন বৌদিমণির মনও এমনই ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাই গানটি প্রাণ পেয়েছিল।

--অর্থাৎ, ঠাকুরমশায় বিদ্রোহের পাশে দাঁড়াতেন। সেই সাহস তাঁর ছিল।

--আগেই তো বলেছি, কর্তাদাদা ছিল তাঁর কাব্যের ভিলেন। সেই ভিলেনের বিরোধিতা যিনি করছেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানোটার মধ্যে তাঁর বিলাসী মনই প্রশ্রয় পায়। তিনি সরল ছিলেন। হাসলে অনেকটা হাসতেন, কাঁদলে অনেকটা কাঁদতেন। বিপিনবিহারী ঠিকই বুঝেছিলেন তাঁকে, আবেগকে বাড়তে দেওয়া তাঁর আয়াস ছিল। সেই কারণেই তিনি আবেগের পাশেও দাঁড়াতেন। ওই একটু ঝুঁকে মুখটি দেখতেন। অর্থাৎ, আবেগটি দেখতে চাইতেন, নিজের আবেগটি প্রকাশ্য হোক, তা-ও চাইতেন।

আবেগের এমনই তীব্র হয়ে ওঠার একটি উৎস ছিল দুলালচন্দ্র ও সূর্যমুখীর সাক্ষাৎপর্ব। সেই একই সময়ে তাঁদের দেখা হয়েছিল। কিন্তু তার বিবরণ কোথাও নেই। কেউ কিছুই লেখেননি এই ঘটনা সম্পর্কে। বেশ শুকনো মুখে বসেছিলাম। সূর্যমুখীর নাতি এই সময়ে উঠে গিয়ে ওই দেরাজের ভিতর থেকে একটি সুপ্রাচীন নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন সংখ্যা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে চোখের বালির যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ো। আর দেখো, তার মার্জিনে রাজলক্ষ্মী ও আশার কথোপকথনের জায়গাটিতে লেখা রয়েছে একটি বাক্য 'সূর্যমুখী হইতে আশা হইয়া গেলাম, ছি ছি'। এই হাতের লেখা আমার দিদিমার। অর্থাত্ ঠিক এমনটিই তাঁর সঙ্গে ঘটেছিল বলে অনুমান অসঙ্গত হবে না। সেই সঙ্গে বলি, দুলালচন্দ্রের অকালপ্রয়াত দাদার স্ত্রী অর্থাত্ আমার দিদিমার বড় জা-র সংসারে বেশ প্রভাব ছিল। তিনিই সম্ভবত এখানে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কী ছিল চোখের বালির সেই অংশটুকুতে?

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রেখে বাড়ি ফিরেছেন। স্বামী তাঁর ঘরে, আশা উচ্ছ্বসিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করে কাঁদতে লাগল। তারপর নেমে এল নীচে। অনুমান করি সূর্যমুখীও তেমন নীচে নেমে এসেছিলেন। হয়তো দুলালচন্দ্রের খাবার সময় নিয়ে তাঁর আশার মতো উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মতোই তাঁকেও তাঁর বড় জা সম্ভবত বলেছিলেন, 'তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নূতন ঢাকাই শাড়িখানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।'

আশার বদলে সূর্যমুখীর নাম বসালে এরপর বিবরণটি এমন দাঁড়ায়, 'এই সাজসজ্জার প্রস্তাবে সূর্যমুখী মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, সূর্যমুখীও সে রূপ সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল।'

আবেগের এই শীর্ষস্পর্শ করার পরে তার অভিঘাতে চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু জীবন তো সেখানে থেমে থাকে না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে?

সূর্যমুখীর নাতি বললেন, বলা মুশকিল। কেননা, কোনও ইঙ্গিতই নেই। তবে সূর্যমুখী তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ক্ষণপ্রভার ক্ষেত্রে। যে আঘাত তিনি নিজে পেয়েছিলেন, তাই দিতে চেয়েছিলেন ক্ষণপ্রভাকে। এ বড় ভয়ঙ্কর একটি কথা।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে সব শুনে বললেন, এটি যে খুবই ভয়ঙ্কর একটি কাণ্ড, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রবিবাবু উপন্যাসে এমন একটি বড় আঘাত দেওয়ার কথা লিখলেন, আর তা সঞ্চারিত হয়ে গেল তাঁর পাঠিকাদের মধ্যে। তাঁরা তার আগে সম্ভবত জানতেন না, এমন ভাবেও খুব বড় একটা আঘাত কেউ কাউকে দিতে পারে।

--সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হয়, সূর্যমুখীর বড় জা-ও চোখের বালি পড়তেন।
--না পড়ার তো কোনও কারণ নেই।

আশার মতোই সূর্যমুখী দুলালচন্দ্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন, এমনটা অনুমান করা যায় না, কেননা সূর্যমুখী আশা নন। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী-নগেন্দ্রর সাক্ষাত্ বরং অনুমান করা সঙ্গত ছিল, কেননা, সূর্যমুখী বঙ্কিমভক্ত। দেখা গেল, 'সেই পোড়ারমুখীকে দেখিয়া যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম'—এ ছিল বিষবৃক্ষে গৃহে প্রত্যাগত সূর্যমুখীর কথা। নগেন্দ্র যা শোনার পরে সূর্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করে অবিশ্রান্ত রোদন করেন। সেই রোদনে তাঁরা সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র কুন্দর প্রতি ব্যমোহ হয়ে সূর্যমুখীকে ফিরে পেতে চাইছিলেন। এই কাহিনিতে সূর্যমুখীর কাছে দুলালচন্দ্র ফিরেছিলেন ক্ষণপ্রভা অপহৃত হওয়ার পরে।

তাই সূর্যমুখী ও দুলালচন্দ্রের সাক্ষাৎ পর্বটি লেখা গেল না। শুধু এ টুকু তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছিল, সূর্যমুখী এরপরে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন।

মুশকিলটা হল এই, এরপরে ক্ষণপ্রভা ও সূর্যমুখীর সাক্ষাত্ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তার অনেক দিন পরে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে আশা ও বিনোদিনীর সাক্ষাত্পর্ব। তাই সেখান থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না। কিন্তু দু'জনের পরস্পরের প্রতি মনোভাবের প্রসঙ্গ উঠেছিল তাঁদের লেখা চিঠিতে। সূর্যমুখী লিখেছিলেন দাদা বিপিনবিহারীকে। ক্ষণপ্রভা চিঠি লিখেছিলেন দুলালচন্দ্রকে। বিপিনবিহারী তখন বিভা চলে যাওয়ার পরে আহিরীটোলার বাড়িতে ফিরে এসেছেন। দুলালচন্দ্র তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। দু'জনেই একা একা দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু বিপিনবিহারী ফিরলেন। এবং তত দিনে ক্ষণপ্রভা ও সূর্যমুখীর মধ্যে কথাবার্তা যাই হয়ে থাক না কেন, দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। সেটা কী করে সম্ভব হল, সে সম্পর্কে ঠাকুরমশায়ের ছেলে পরে আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তবে এটা ঠিক, সূর্যমুখী সে সময়ে ক্ষণপ্রভাকে বেশ এক হাত নিয়েছিলেন। এবং সেটা চোখের বালির সাহায্যেই।

আবার সেই চোখের বালি-র গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ৩২ তম অধ্যায়টির প্রসঙ্গ এল। সেই অধ্যায় ধরেই সূর্যমুখী ক্ষণপ্রভার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন সূর্যমুখীর সঙ্গে করেছিলেন তাঁর বড় জা। সূর্যমুখীর সঙ্গে ক্ষণপ্রভার এই সাক্ষাতের বিবরণ ক্ষণপ্রভা নিজেই তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন। ক্ষণপ্রভা লিখছেন, "তিনি সকালে উঠিয়া যথারীতি বেরিয়ে গেলেন। তারপরে ঘরে ঢুকলেন ঠাকুরঝি। তখন বাসি ঘর পরিষ্কার করা হইতেছে। তাহারই মধ্যে ঠাকুরঝি আমাকে পাশের বারান্ডায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "তার পরে ভাই, অনেকদিন পরে দেখার পর কাল দাদা তোমাকে কী বল্লেন?"

'কথাটা শুনিয়াই আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাত্ করিয়া উঠিল। কথাটা কোথায় যেন শুনিয়াছি না পড়িয়াছি, তাহা মনে করিতে পারিলাম না। ঠাকুরঝি তাহার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আমার মুখের উপরে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াই

আমার গলা জড়াইয়া পরের কথাটি কহিল, “আমার কাছে লজ্জা কীসের ভাই!” তখনও আমি আঁতিপাঁতি করিয়া মনের অন্দরে খুঁজিতেছি, কোথায় যেন এই সব কথাই হইয়াছে, আমি তাহা জানি, ছায়ার মতো তাহা এখন আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমি চিনিতে পারিতেছি না। ঠাকুরঝি কহিল, “আয় ভাই, আজ আবার তেমনি করিয়া সাজাইয়া দিই।”

‘অমনি মনে পড়িয়া গেল—চোখের বালি। বিনোদিনী তো ইহা বলিয়াছিল আশাকে। সূর্যমুখী আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও মুখশ্রীর প্রশংসা করিতে করিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু ধীরে বহু যত্নে যতই আমাকে সাজাইল, ততই অঙ্গে অঙ্গে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। আমাকে কষ্ট দিয়া রবিবাবুর জয়জয়কার ঘটিল। আমি আশার মতোই তাহার মাসীমা যে দেবতাকে ডাকেন, সেই দেবতাকে মনে মনে গড় করিয়া প্রণাম করিলাম।”

ক্ষণপ্রভা জানতেন না, সূর্যমুখীও এমনই সেজে প্রত্যাগত দুলালচন্দ্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবং সে-ও চোখের বালির অবদান।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, সূর্যমুখী যে তাঁহার সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি বড় দুঃখের ঘটনা ফের ক্ষণপ্রভার জন্য সাজিয়ে দিলেন, তাতে কিন্তু রবিবাবুকে একটু ছাপিয়ে যাওয়াও হল।

সে কী রকম?

১৮
গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অধ্যায়

দুঃখের একটি তরণীতেই দু’জনের জন্য ঠাঁই করে নিলেন সূর্যমুখী। দু’জনেই একই আঘাতের পরে, পরিস্থিতি পৃথক হলেও, এ বার পাশাপাশি বসলেন। দুঃখের সাজে তাঁরা সেজেছেন। তাঁরা তাই এ বার আপনা-আপনির কথা বুঝতে পারছেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাঁরা সত্যিই এত বড় একটা ঘটনার পরেও এক সঙ্গে মন্দিরে যেতেন।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, বাবা তাঁদের দু’জনের জন্যই একই মন্ত্র পড়তেন। রাধামাধব তাঁদের দু’জনের জন্য একই ভাবে চেয়ে থাকতেন। তাঁরা দু’জন যখন পাশাপাশি বসে থাকতেন, আমার মনে হত, সূর্যমুখীর কী অসীম ধৈর্য। তিনি যে প্রত্যাঘাতটি ক্ষণপ্রভাকে করেছিলেন, তা ক্ষণপ্রভার প্রিয় লেখক রবিবাবুর পথ ধরে গিয়েই করেছিলেন। ক্ষণপ্রভা কিন্তু জানতেন না, রবিবাবুর লেখাই সূর্যমুখীকে পথ দেখিয়েছেন।

কিন্তু বিপিনবিহারী জানতেন। দুলালচন্দ্র বিপিনবিহারীকে পত্র লিখে বলেছিলেন, “সূর্যমুখী যখন রানির মতো সাজিয়া আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল, অন্তরে সে যে রূপ দগ্ধ হইতেছিল, আমিও তদ্রূপ দগ্ধ হইতেছিলাম। আমার বড় বৌদিদি সূর্যমুখীকে এমন করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া শিউরে উঠিয়াছিলাম। নিজের প্রতি ধিক্কার হইতেছিল। বারবার মনে হইতেছিল, এ আমি কী করিয়া আসিয়াছি। তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতেছিলাম, ক্ষণপ্রভাকে নিয়া চলিয়া গিয়াছো তুমি। তাই আবার আমি আমার সূর্যমুখীর কাছে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রর মতোই তখন কুন্দকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া আমার মন সূর্যমুখীর

প্রতি একাগ্র চিত্তে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু সূর্যমুখী যখন বলিল, ক্ষণপ্রভাকে মনের ভিতর রাখিয়া আমি তাহার সহিত থাকিতে পারিব না, তখন মনটা অকস্মাত্ ঘূর্ণাবর্তে পড়িল। ফের ক্ষণ-র মুখটি ভাসিয়া উঠিল। এ আমার কী হইয়াছে বিপিন? আমি কেন দুই রমণীকেই এত বেশি করিয়া ভালবাসিতেছি? দুই রমণীই রানির মতো আমার কাছে আসিয়াছিল। দু'জনেই ফিরিয়া গেল। কাহাকেও রাখিতে পারিলাম না।"

বিপিনবিহারী তার উত্তরে বলেন, "প্রেমের ক্ষেত্রে যে সত্য শিব, তাহা হইতে তুমি ও ক্ষণ পৃথক। তোমরা নিছক ভাললাগার শর্তে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হও নাই জামাইদাদা। তোমরা কিছুটা আমার প্রতি বিরাগ বশত একে অপরকে অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলে। তাহাতেও প্রেম উত্পন্ন হইতে পারে। হয়তো হইয়াওছিল। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত নহে। ঠাকুরমশায়ের কাব্য সম্পর্কে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আবার বলি। আবেগকে শুধু বাড়িতে দিলে চলে না। তাহাকে নিয়ন্ত্রণের রাশ বুদ্ধিমান কেন তাহার নিজের হাতে রাখিবে না? অন্যথা হইলে দুর্ঘটনা ঘটিবেই। অতিরিক্ত আর একটি কথা রহিয়াছে। আমি কিছুটা সভ্যতার সংস্কার বশেও কাজ করিয়াছি। সূর্যমুখীকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। সে আমার একমাত্র বোন। তাহার সংসার রক্ষা করাও আমার কর্তব্য বই কী! ঈহা ছাড়া, আমার স্ত্রী-র প্রতি কর্তব্যও তো কিছু রহিয়াছে। যদি জানিতাম, সে সত্যই বোধ নির্দেশিত আশ্রয়ে যাইতেছে, তাহা হইলে বাধা দিতাম না। কিন্তু তোমার আশ্রয় সেই বোধ নির্দেশিত স্থান, এ কথায় আমি যে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমি তাই আমার কাজ করিয়াছি।''

বিপিনবিহারীর সেই সঙ্গে দুলালচন্দ্রকে জানালেন, তিনি জানেন ক্ষণপ্রভা তাঁকে ভালবাসেন। গৃহত্যাগের দিন ক্ষণপ্রভাও দুলালচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, তিনি জানেন বিপিনবিহারী তাঁকে ভালবাসেন। বিপিনবিহারী দুলালচন্দ্রকে সেই চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি অন্তর হইতে জানিতাম, ক্ষণপ্রভা আমাকে ভালবাসে। সে তোমার সহিত অপেরা-ধর্ম পালন করিতেছিল। তুমি তাহা বুঝিতে পারো নাই। তুমি ভাসিয়া গিয়াছিলে। এত দুর্বলতা তোমার হইতে আশা করি নাই। সত্য কথাই কহি, আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমরা কাশী বা ইলাহাবাদে তোমার যে বাটী রহিয়াছে, সেখানে চলিয়া যাইবে।"

এর অনেক দিন পরে বিপিনবিহারী দুলালচন্দ্রকে আর একটি চিঠিতে লেখেন, ''মজার কথা হইল, রবিবাবুও দেখি আমার মতো করিয়াই ভাবেন। তাঁহার চোখের বালিতেও পরে দেখি, বিহারী মনোকষ্টে পশ্চিমে যাইতেছে। তাহার পরে মহেন্দ্রকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া বিনোদিনীও পশ্চিমে চলিয়া গেল। বিহারীর সহিত বিনোদিনীর পরবর্তী সাক্ষাত্ও সেই পশ্চিমেই। নৌকাডুবিতে তো হেমনলিনী হইতে কমলা পর্যন্ত সব সুদ্ধ কাশীতেই কাহিনির যবনিকা ফেলিল। আমারও কেন জানি না মনে হইতেছিল, তোমরাও পশ্চিমেই যাইবে। তা না করিয়া খাস কলকেতা শহরেই যে রহিয়া গেলে, তাহাতে তোমার সাহস দেখিয়া খুশি হইয়াছিলাম। সূর্যমুখী কিন্তু আমাকে তখন পত্র দিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কাছাকাছি তাহারা একত্রে বাস করে কোন সাহসে।' সেই অপমান আমারও গায়ে লাগিয়াছিল।
'বোধ করি বিনোদও তাহা সহ্য করিতে পারে নাই।"

--তা হলে সূর্যমুখী জানতেন, বিভাকে নিয়ে বিপিনবিহারী কোথায় উঠেছেন?

বিনোদবিহারীর ছেলে এ বার বেশ জোরেই হেসে ফেললেন। বললেন, ওই অপেরা-ধর্মের যে কথাটা বারবার উঠেছে তার অর্থটা বোঝার চেষ্টা করো। অপেরায় খুব ব্যক্তিগত অনুভূতিও, যেমন বেদনা, ভালবাসা, কষ্ট ও সুখ—এ সবের কিছুটা বাড়াবাড়ি রকম আয়োজন করতে হয়। যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শক বুঝে নিতে পারে যে, ওই অনুভূতির তীব্রতা কতটা। তা ছাড়া, অনুভূতি ও তা সঞ্জাত আচরণগুলোও বেশ সাজানো গোছানো ধরনের হয়, যাতে তা দর্শকের মনে থেকে যায় অনেকদিন। এই ধর্মটি আমাদের পরিবারের সহজাত। সূর্যমুখী যে ক্ষণপ্রভাকে পছন্দ করতেন না, তা তো এখন আর তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। আর, বিপিনবিহারী ও সূর্যমুখী দুই ভাইবোনের সম্পর্ক যে খুবই গভীর ছিল, তা-ও বোধকরি বুঝে গিয়েছো। দু'জনে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। দু'জনের প্রকৃতিও ছিল অনেকটা একইরকম। তাই জ্যাঠামশায় বিভাকে নিয়ে কোথায় উঠেছেন, তা পিসিমা জানতেন না, এমনটা হতে পারে না।

সূর্যমুখীর নাতি এরপরে জানালেন, কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে সূর্যমুখী বিপিনবিহারীকে পত্রে লিখলেন, 'তোমার চোখে পড়িয়াছে কি না জানি না, চোখের বালি প্রকাশিত হইবার আগে পর্যন্ত আমাদের সংসার ভালই চলিতেছিল। মাথার উপরে বাবা। যে যাহার মতো করে দায়িত্ব-প্রেম নির্বাহ করিতেছিল। এর ভিতর তুমি একবার বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের লরেন্স ফস্টরের ন্যায় ঠিক একটি পুষ্করিণীর পাড়ে শৈবলিনীর মতো রাধার উপর গিয়া পড়িয়াছিলে। তাহাকে ভোজনও করিয়াছিলে। সে কথা তোমার স্ত্রী পুষ্করিণীর কথা উঠা মাত্র স্মরণ করে। আমাদেরও ভুলিতে দেয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী, বিষবৃক্ষের তাল বৃক্ষ ঘেরা ভীমা পুষ্করিণী আর চোখের বালির সবুজবর্ণের পুষ্করিণীর মধ্যে সে কোনও পার্থক্য করিতে পারে না। আমাদেরও করিতে দেয় না। বঙ্কিমবাবুর সহিত রবিবাবুর সে এইরূপ একটি সেতু গড়াইয়া লইয়াছে।

'কিন্তু রবিবাবু তাঁহার চোখের বালিতে বিনোদিনীকে যে ভাবে উপস্থিত করাইল, তাহাতে প্রথম দোলা লাগে বৌদিদিরই মনে। তোমার ওই পুষ্করিণী পাড়ে রাধা অভিসারের অভিঘাতে সে-ও ভাবিল, বনের মাঝে উদ্যানলতা হইয়া না থাকিয়া, শহরে আসিয়া উদ্যান রচনা করিতে সযত্ন হইবে। আর তাহাতেই সব গোলমাল উপস্থিত হয়। আমি বলিতেছি না যে, তাহাতে আমার স্বামীরও কোনও ভূমিকা ছিল না। তিনি নিজেকে কখনও নগেন্দ্র কখনও মহেন্দ্র ভাবিয়া গোলমাল বাড়াইয়া তুলিলেন। এই দু'জনেই ক্ষণিকের প্রেমে দাম্পত্য অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল।

'কিন্তু রবিবাবুর হাত কাঁচা। তিনি বঙ্কিম নন। তাই চন্দ্রশেখর-এ প্রতাপ যে রূপে ফস্টরের নৌকা দখল করিয়াছিল কিংবা শৈবলিনী যে রূপ প্রতাপকে লইয়া নদীতে পলাইয়াছিল, সেই অ্যাডভেঞ্চার রবিবাবুর কাহিনিতে নাই। তুমি তোমার অ্যাডভেঞ্চার দিয়া আমাদের সংসারের কাহিনিতে সে অভাব পূরণ করিয়াছো। বিভাকে একবার অপহরণ করিলে, তাহার পরে বৌদিদিভাইকে অপহরণ করিলে ভবানীপুরের বাড়ি হইতে। তবে রামচরণের মতো শিবুও শৃগালের মতো ধূর্ত অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। তাই বাবা তোমাকে টেক্কা দিয়া তোমার চক্ষের সম্মুখ হইতেই বিভাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন। তোমাকে এবং বাবাকে বঙ্কিমকে নকল করিতে হইতেছিল প্রতি পদে। সেই বঙ্কিমপ্রীতির উচ্ছ্বাসের ঢেউ আমার স্বামীর গায়েও লাগিয়াছিল বই কি! তাই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আমি বঙ্কিমের সূর্যমুখী নই। তবে সেই দুঃসময়ে বাবাও বারবার আমাকে বলিয়াছিল, স্বামী আমার নিকটই ফিরিবেন। বিষবৃক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে, চন্দ্রশেখর-এ তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের অনুমান অভ্রান্ত। কিন্তু আমি ভাবিতেছি, বঙ্কিমের যুগ শেষ। আমি আর বিষবৃক্ষ জড়াইয়া রহিব না।

‘বৌদিদিভাই বিনোদিনীতে প্রাণ উত্সর্গ করিয়াছে। কিন্তু বলিতে ইচ্ছা করে—বিনোদিনী, অভিসারের তুমি কী জানো? বিনোদিনীতে আমার সর্বদাই মনে হইয়াছে নিরামিষ শৈবলিনী। বিনোদিনীতে শৈবলিনীর সেই তেজ কোথায়? সেই সাহস কোথায়? সেই ভয়ঙ্কর অভিসারই বা কোথায়? তিনি কেবল বাপের বাড়ির সারথিকে হাত করিয়া আমার স্বামীর গাড়িতে উঠিয়াছিলেন। অথচ দেখ, শৈবলিনীর ভাগ্য তাহাতেই বর্তিয়াছে। যে দু’জন পুরুষকে সে চাহিয়াছিল, সেই দু’জনেই তাঁহাকেও ভালবাসিয়াছে। রবিবাবুর ভক্ত পাঠিকা হইয়াও বঙ্কিম হইতে এই স্নেহ তিনি পাইলেন।

‘আর আমি প্রেমের প্রসঙ্গে একা হইয়া গেলাম। আমার স্বামীও একই প্রসঙ্গে একা হইয়া গেলেন।

‘দু’টি একাকী মানুষ কী আবার একত্রিত হইতে পারে? আমি জানি, তুমি সেই চেষ্টা করিবে। তোমার এই গুণ। তুমি সত্যিই স্ববশ। তুমি যাহা প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া ভাব, তাহার জন্য পূর্ণ উদ্যমে সচেষ্ট হইতে থাক। বৌদিদিভাই ভাবিয়াছিলেন আমার স্বামী আতুরের সেবা করেন। তিনি ভুল ভাবিয়াছিলেন। আতুরের সেবা আসলে করো তুমি। তুমি নিজে যাহাকে আতুর বলিয়া ভাব, সর্বস্ব দিয়া তাহার পাশে দাঁড়াও। তুমি রাধাকেও আতুর ভাবিয়াছিলে।

‘কিন্তু আমাকে ভাবিও না। আমি আতুর নই। সে কারণেই বিশেষ করিয়া এই পত্র। তোমাকে মিনতি করি, আমার আর আমার স্বামীর ভিতরের দূরত্ব মুছাইবার চেষ্টা করিও না। আমি কলিকাতায় যাইব। শ্বশুরবাড়িতেই উঠিব। স্বামী বোধ করি ভবানীপুরের বাড়িতেই থাকিবেন। দু’জন দু’টি গৃহে আলাদা থাকিব। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমাকে নরম করিতে না পারিয়া আমার জা এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমি এই টুকু মানিয়া লইয়াছি।”

বিপিনবিহারী সত্যিই চেষ্টা করেছিলেন বোন ও ভায়রাভাইকে মিলিয়ে দিতে। সফলও হয়েছিলেন। পরের দিকে জীবনে দুলালচন্দ্র ও সূর্যমুখী আদর্শ দম্পতির মতোই জীবন কাটিয়েছেন। বঙ্কিমের সূর্যমুখীর মতোই এই সূর্যমুখীও স্বামীকে ক্ষমাই করে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ক্ষণপ্রভা কিন্তু একা হয়ে গেলেন। ঠাকুরমশায়ের ছেলে জানালেন, তাঁকে কেউ ঘর থেকে বিশেষ বেরোতেই দেখতেন না। তিনি ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। তখন চোখের বালি শেষ হয়ে গিয়েছে। বিপিনবিহারী কলকাতায়। কর্তাদাদা নিজের মনে রয়েছেন। বাড়িতে মোক্ষদা ছাড়া আর কারও গলা পাওয়া যায় না। রাধা কেবল নিজের মনে সকলের ফরমাশ খেটে যান।

১৯
সোই তো পরাণনাথ পাঁইলু

এমনই এক দিনে, খুবই শান্ত পরিবেশে আবার একটি বজ্রাঘাত ঘটে গেল।

ঠাকুরমশায়ের ছেলে বললেন, আমি তখন কলকাতায় থাকি। দুলালচন্দ্রের নানা রকম কারবার ছিল। তাতে উকিল মোক্তারদের খুব ডাক পড়ত। আমিও তাতে জুতে গিয়েছিলাম। কিন্তু খবর এল, বাবার শরীর বেশ খারাপ। ঠান্ডা লেগেছে। কোমরে পুরনো চোট থেকে ব্যথা হচ্ছে। গঙ্গাধরের টোটকায় খুব একটা কাজ হচ্ছে না। কর্তাদাদা সাহেব ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। বড় দাদাবাবু ডাক্তারের ব্যবস্থাও করে ফেললেন।

আমার কাজ ছিল বাবাকে গিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু বাবা রাজি হচ্ছিলেন না। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি গেলে রাধামাধবের সেবার ব্যাঘাত ঘটবে। আমি বললাম, আমাকে মন্দিরে পুজোর দায়িত্ব দিতে। তিনি তা হলে শিবুর কোনও শাগরেদের সঙ্গে কলকাতা যেতে পারবেন। বাবা কথাটা শুনে হাসলেন। বললেন, তুমি আমার কথা ভেবে রাধামাধবের দায়িত্ব নিতে চাইছ। এতে রাধামাধবকে ছোট করা হচ্ছে। পিতার চেয়েও দেবতার আসন উঁচুতে। দেবতার প্রতি কর্তব্য বাবার প্রতি কর্তব্যের চেয়ে বড়।

আমি মানতে চাইলাম না। বললাম, এক এক জনের কাছে দেবতা এক এক রকম। আমার কাছে আপনি দেবতা নন। কিন্তু আপনি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আপনার জন আর কেউ নেই। রাধামাধব দেবতা কি না, তা-ও আমি জানি না। কিন্তু রাধামাধবকে ছেড়ে থাকতে আমার কোনও কষ্ট নেই। আপনাকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে। আমি চাই আপনি সুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন থাকুন। তাতে আমি জানব, এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আমার আপনার জন রয়েছেন।

বাবা অনেক ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, আপনার জনের হিসেব কেবল রক্তের সম্পর্ক দিয়েই কষতে হবে, এমন কথা তোমায় কে শেখাল? রক্তের সম্পর্ক একটা সামাজিক বন্ধন। বাবা ছেলের খেয়াল রাখবে, বাবা বুড়ো হলে ছেলে বাবার খেয়াল রাখবে এই সবই সামাজিক আচার। এগুলির ব্যত্যয় হলে সামাজিক ভাবে বাবা বা ছেলের নিন্দা হয়। সমাজ এ ভাবেই গঠিত হয়েছে যুগযুগান্তর ধরে। তবে এর সঙ্গে আরও একটি কথা রয়েছে। এই যে তোমার জন্ম, শৈশব, কৈশোর, তোমার বড় হওয়া এই সবের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলাম। তুমি যেন আমাকে জড়িয়েই বড় হয়েছো। এই সবই আমাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তোমাকে ভালবাসতে সাহায্য করেছে। তোমার দিক থেকেও কথাটা সত্যি। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো। যা তুমি অর্জন করবে তাই তোমার। সম্পূর্ণ ভাবে তোমার। আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুমি অর্জন করোনি। এটা সমাজের দান। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা কেবল সমাজের স্বাভাবিক গতিতে তোমার দিকে গড়িয়ে গিয়েছে। তুমি তার কিছু নিয়েছো। কিছু নাওনি। সত্যি কথা বলতে কি, যা নাওনি তা-ই তোমার। তুমি আমার সন্তান ছাড়াও নিজের পরিচয়ে যা যা অর্জন করেছো, তার দাবি তোমার কাছে সব থেকে বেশি। তার দাবি মেটানোর দায় থেকে সরে গেলে স্বধর্ম থেকে সরে যাওয়া হয়।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাধামাধবকে অর্জন করেছেন?
পরম সন্তোষের কণ্ঠে বাবা বললেন, করেছি।
আমরা কথা বলছিলাম আমাদের ছোট ঘরটিতে। বাবা শুয়েছিলেন খাটে। তাঁর মাথার কাছে খোলা জানলা। আমি বসেছিলাম খাটে তাঁর পায়ের কাছে। আমি তখন তাঁর কথায় আপ্লুত হয়ে রয়েছি। হঠাৎ মনে হল ঘরে আরও কেউ একজন এসেছেন। তাকিয়ে দেখি, খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৌদিমণি। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করলেন। বাবা উঠে বসেছেন তত ক্ষণে। তিনি আমাদের দু'জনের মাথায় দু'টো হাত দিয়ে আশ্চর্য একটি আশীর্বাদ করলেন। বললেন, স্ববশ হও।
ক্ষণপ্রভা আমার দিকে যখন তাকালেন তাঁর চোখ দু'টি লাল টকটকে। যেন জ্বরের ঘোরে রয়েছেন। আমাকে বললেন, বড়দাদাবাবুকে জানাও যে ডাক্তারকে এখানেই আনতে হবে। ঠাকুরমশায় মন্দির থেকে দূরে যাবেন না।

কর্তাদাদার কানে গেল সে কথা। রাজিও হলেন। কিন্তু ডাক্তার আসবে ক'দিন পরে। তবে ওষুধ-পথ্য কিছু আগাম বাতলে দিয়েছিলেন। সেই মতো এই সময়ে আমিই বাবার সেবা করছিলাম। ক্ষণপ্রভা প্রায়ই আসতেন। বাবা যখন পুজো করতে যেতেন, তিনিও মন্দিরে যেতেন। বাবা যেন তাঁর একাকীত্বের ভার কিছুটা লাঘব করে দিয়েছিলেন। বাবা তখন সস্নেহে তাঁর জন্য কখনও কখনও অপেক্ষাও করতেন। এক দিন তাঁর ও বাবার আলাপও শুনতে পেয়েছিলাম আমি। বাবা তাঁকে বলছেন, তুমি কোনও অন্যায় করোনি। কেন মিথ্যা অনুতাপে ভুগছ। তুমি নিজেই তো একদিন রাধার মা-কে বলেছিলে, যাকে ভালবাস, তার সামনে নিজেকে প্রকাশ করায় অন্যায় নেই। এই তো ঠিক কথা। একবার ভেবে দেখো দেখি মা, শ্রীরাধা তো বিবাহিত। কিন্তু তিনি যখন দূর থেকে যদুনন্দনকে দেখলেন, শুধু সেই দেখাটুকুতেই তিনি গেয়ে নিলেন, 'সোই তো পরাণনাথ পাঁইলু। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেঁলু।।' এই যে মদনদহন, তা যে দেবতার দান মা। দেবতা যে তাই চেয়েছেন। তুমি নিশ্চিন্তে সেই দেবতার উপরে আপনার ভার সমর্পণ করো, যে দেবতাকে তুমি নিজেই রোজ রোজ এই মন্দিরে ছুটে এসে একটু একটু করে জীবনদান করেছো। শ্রীরাধা যে ভাবে রাধামাধবকে তৈয়ার করেছিলেন, সেই ভাবে তুমি এই রাধামাধবকে আত্মসাৎ করো।

বাবার কথা শুনে ক্ষণপ্রভা মুখের কাছে আঁচলটি টেনে বসে রইলেন। বাবা গুণগুণ করে গাইলেন, হরি মন মজায়ে লুকায়ে কোথায়।

আমি সেই গানের রেশ নিয়ে চলে এলাম।
এমনই এক দিন। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সকালে পুজো করতে গিয়ে বাবা অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ক্ষণপ্রভা এলেন না। তিনি আসবেন ভেবে বাবা পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ অসুস্থ শরীরে বসেছিলেন। আমিও তাঁর কাছেই ছিলাম। সেই সময়েই হঠাৎ মোক্ষদা দৌড়তে দৌড়তে এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, ও ঠাকুরমশায়, বৌদিদিকে কোথাও দেখেছো?
বাবা অবাক হয়ে বললেন, না।
মোক্ষদা কেঁদে চোখ ভাসিয়ে বলল, সকাল থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্তাদাদার বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। বেলা বাড়তে খবর পেলাম, ক্ষণপ্রভা আবার গৃহত্যাগ করেছেন। শ্রীরামপুর থেকে খবর এসেছে, তিনি সেখানে যাননি। কলকাতাতে আহিরীটোলাতেও যাননি, সূর্যমুখী-দুলালচন্দ্রও তাঁর কোনও খবর জানেন না। আশ্চর্যের কথা হল, এই অবস্থায় যার কথা সবার আগে মনে পড়ে সেই শিবু সর্দারও কোথাও উধাও। বিপিনবিহারীকে কলকাতায় খবর পাঠানো হয়েছে। তিনি আসছেন। সূর্যমুখী ও দুলালচন্দ্রও আসছেন। কর্তাদাদা রেগে থরথর করছেন।

কিন্তু এই পরিবেশে বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। ক্ষণপ্রভার গৃহত্যাগের আগে কেমন একটা শীতল ভাব চলে এসেছিল। যেন বৃষ্টিতে নেতিয়া পড়া একটা সংসার। সেখানে এখন লোকজন, হইচই, এর এ কথা তার সে কথায় মিলে তারপর বেশ কিছু দিন ধরে বাড়িতে বেশ শোরগোল চলল। বাবাকে নানা জনে নানা প্রশ্ন করলেন। বাবা কেমন বোবা হয়ে গেলেন। কেবল বড় দাদাবাবু মন্দিরে বসে তাঁর সঙ্গে খুব নিচু গলায় অনেক ক্ষণ ধরে যে কথা বললেন, তা কেউ শুনতে পেল না। তবে বড় দাদাবাবুকে আর বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি।

কিন্তু এই সব কাণ্ডে বাবার জন্য সাহেব ডাক্তারের আসার কথাটাও সকলে বেমালুম ভুলে গেল। আমিও মনে করিয়ে দিতে সাহস পেলাম না। মোক্ষদাদিদির কাছে একবার কথাটা তুলেছিলাম। তিনি কী ভাবলেন, কে জানে। তবে সেই সন্ধ্যাতেই দেখি, রাধা এসে বাবার কাছে বসে রয়েছে। কিন্তু রাধা বরাবর খুব চঞ্চল। তার উপরে বড় দাদাবাবু তখন সামনেই। তাই রাধার খোঁজ তারপরে আর তেমন ভাবে মিলল না। সে কেবল আড়াল থেকে বড় দাদাবাবুর তদ্বির তদারক করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তখন চোখের বালি শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই উপন্যাসও তন্নতন্ন পড়ে নানা সম্ভাবনার কথা ভাবা হল। ইঙ্গিতটা সেই উপন্যাসে স্পষ্টই ছিল। কিন্তু তখন কেউ ধরতে পারেননি। কোথাও ক্ষণপ্রভার খোঁজ মিলল না। কর্তাদাদা ও বিপিনবিহারী সারা দক্ষিণবঙ্গ এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেললেন। কোথাও কেউ নেই। দুলালচন্দ্র পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

নায়েব উকিলের ছেড়ে যাওয়া ঘর-বাগানে বিপিনবিহারী আর দুলালচন্দ্রর কথা হত। কখনও সেখানে গিয়ে যোগ দিতেন সূর্যমুখীও। নানা শলাপরামর্শ হত। একদিন নায়েববাবু আমাকে বললেন, দুলালচন্দ্রের একটি চিঠি এসেছে। সেটি নায়েব উকিলের বাড়িতে গিয়ে দুলালচন্দ্রের হাতে দিয়ে আসতে। চিঠিটি কলকাতার ভবানীপুরের বাড়ি থেকে রি-ডাইরেক্ট হয়ে এসেছে। তার উপরের হাতের লেখাটি দেখে কেমন একটা সন্দেহ হল। চিঠিটি দুলালচন্দ্রের হাতে দিতে গিয়ে দেখি সন্দেহটা ঠিক। তিনি চমকে উঠলেন। তারপরেই চিঠিটি নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কী সেই চিঠি তার খোঁজ ঠাকুরমশায়ের ছেলের কাছে ছিল না। সেই চিঠি সূর্যমুখীর নাতি আমাকে দিয়েছিলেন।

ক্ষণপ্রভা দুলালচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন,
'কারও কাছে আজ আমার আর কোনও কৈফিয়ত্ দিবার নাই। তবু কাউকে তো জানাইতে হয়, তাই তোমাকেই জানাইতেছি। আমরা তোমারই কাশীর বাড়িতে হরিদাস বাবাজির কাছে আশ্রয় লইয়াছি। কয়েকদিনের জন্য অবশ্য। দ্রুত অন্যত্র বাটী দেখিয়া উঠিয়া যাইব। এ বার বলি, কেন কী করিলাম।

আমার এক দিকে ছিল অনাদরের স্বাধীনতা। যে কারণে আমি এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারিয়াছি, এমন অনেক কাজ করিতে পারিয়াছি, যা স্বাভাবিক বাঙালির ঘরের বৌমানুষেরা পারে না। আমি তাহাতে বৌ হইতে মানুষও হইতেছিলাম। আমাদের গ্রামের ঠাকুরমশায় সামাজিক সম্পর্কগুলির চেয়ে অর্জিত সম্পর্কের উপরে জোর দেন বেশি। সে হয়তো কর্তাদাদার বড় ছেলেরই শিক্ষা। তিনিও আমাকে সামাজিক সম্পর্কে প্রাপ্ত হয়ে গুরুত্ব দেননি। আমাকে অর্জন করিতে চেয়েছিলেন। আমিও যাহাতে তাহাকে অর্জন করিতে পারি, সেই জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাহাতেই আমার বদল ঘটিয়া গেল। বাঙালি ঘরের স্বাভাবিক বৌদের তুলনায় আমি অন্যরকম হইয়া গেলাম।

কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, ওই বাঙালি ঘরের কথাটুকুও বড় সত্য। জামাইদাদা, শোক করিতে দিতে হয়। দুঃখ করিতে দিতে হয়। না হইলে কাতরতা কাটে না। আর অনাদরের স্বাধীনতা সেই অবকাশটুকু দেয় না। তাই কাতরতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই আমার সত্যিকারের গৃহত্যাগের কারণ হইল।

অনেক দিন আগের একটি কথা আজ খুব মনে পড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছ হইতে নরকের কথা শুনিয়া আমি খুব চঞ্চল হইয়া গিয়াছিলাম। শৈবলিনীর কথা খুব মনে হইত। বঙ্কিমের কলমে তাহার নরক দর্শনের চিত্রটি আমার মনে সারা ক্ষণ জ্বলজ্বল করিত। শৈবলিনী আমার মন অধিকার করিয়াছিল, সে কথাও ঠিক। বিনোদ তখন এক বিলাত ফেরত পণ্ডিতের কাছে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীকে আমার খুব মনে ধরিয়াছিল। বিদ্যাপতির স্ত্রী সম্পর্কে সে একটি কথা বলিয়াছিল। বিদ্যাপতি বড় কবি। কিন্তু বিদ্যাপতির স্ত্রী কি তাহার স্বামীকে কেবল কবি বলিয়াই দেখিবেন? তিনি কি স্বামীর কাছ হইতে যাহা চাওয়া হয়, তাহা চাইবেন না? স্বামীর কবি প্রতিভাকে অবকাশ দিতে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর আসক্তিটুকুও মানিয়া লইবেন? তাঁহার নিজের কিছু চাওয়ার থাকিবে নে? তিনি কি জড়পদার্থ? তিনি কি মানুষ নন?

এ যেন রবিবাবুর বিনোদিনীরই কথা। আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বর্ষণক্লান্ত এক দিব্য অপরাহ্নে পণ্ডিতের মুখরা স্ত্রীটি যখন কথা কহিতেছিলেন, আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বিনোদিনী সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে সর্বত্র। রবিবাবুর গুণ গাহিতেছিলাম মনে মনে। কী আশ্চর্য এক কবি তিনি। আমার মনের উপর হইতে ক্লেদ মুছিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পণ্ডিত কহিলেন, জড় পদার্থেরও নরক থাকে। মৃত্যুর পরে দেহধারণ করিতে হয় শাস্তি পাইবার জন্য। নরক একটি শরীর চায়। সেই শরীরকে খাইতে না দিয়া, কাঁটা ফুটাইয়া সে কষ্ট দেয়। স্বর্গও একটি শরীর চায়। সুখ ভোগ করিতে হইলে শরীর ছাড়া তাহার আয়োজন যে বৃথা যাইবে।

পণ্ডিতের স্ত্রী-ও শরীরের গুণ গাহিলেন। তিনিও বলিলেন, দেহ না থাকিলে কষ্টের মতো আনন্দও বোধ হয় না। আমিও বুঝিলাম, শরীর যে প্রয়োজন, তাহা দেবতাদেরই শর্ত। নাটকের বিনোদিনীর গানটি প্রাণভরে গাইলাম। গ্রামের ঠাকুরমশায় আরও আগাইয়া গিয়া একদিন আমার কানে কানে গাহিয়া দিলেন মহাজনী পদ—মদনদহনে ঝুরি গেঁলু।

এ দহন অনুভব করিব কী করিয়া, যদি শরীরটুকু না থাকে?

বিনোদিনী রাধার নাম। আমি সেই অনুভূতির প্রসার ঘটিতে দেখিলাম। আমি সেই অনুভূতি সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিলাম। যেন সাজিয়া উঠিলাম। যেন আমার সিঁথি হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত একের পর এক অপূর্ব আভরণে ভরিয়া উঠিলাম। আমি সুন্দরী ছিলাম, রানি হইলাম। আমি আমাদের গ্রামের রাধাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহাকে আমারই পূর্বজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। সে আমারই পূর্বগামিনী ছায়া, এমনও বোধ করিলাম।

কিন্তু এই বুকভরা ক্ষমা, শরীরভরা সৌন্দর্য, মনভরা আনন্দ লইয়া আমি এখন কী করিব? আমি হাসিবার জন্য, কাঁদিবার জন্য, ভার লইবার জন্য ও ভার নামাইয়া রাখিবার জন্য কোথায় কাহার কাছে যাইব? গভীর রাতে তাই সেই দিন রাধামাধবের মন্দিরে গিয়া বসিয়াছিলাম। অনাদৃত আমি রাতের রাস্তাটুকু পার হইয়াছিলাম অকুতোভয়ে। মন্দিরে উঠিয়া বসিয়া রহিলাম নিরুপদ্রব শান্তিতে। আমি যে সেই বহু দিন আগেই এক প্রচণ্ড গরমের দিন বিকেলের ঝড়ের পরে অনুভবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই মন্দিরের রাধামাধব জাগ্রত। তিনি বন্ধ দোরের ওপার হইতে অনিমিখ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার সেই দৃষ্টির কথা ভাবিতে ভাবিতেই মনে মনে ব্রজের রাধারানির কথাও ভাবিতেছিলাম। কৃষ্ণপ্রেম যে বড় আনন্দের কথা। সেই আনন্দ সে কেমন করিয়া বুকে ধরিয়া রাখিত। কৃষ্ণ অদর্শনের কাল সে কাটাইত কেমন করিয়া? বারবার চাহিতেছিলাম, সেই সামর্থ্যটুকু

সে কর্জ দিক আমায়। আর ঠাকুরমশায়ের কথা মতোই প্রকৃতি যেন তখনও সঙ্গত করিল। হঠাৎ যখন ভোরের প্রথম শীতল বাতাসটির স্পর্শ পাইলাম, পুব আকাশে যখন তক্ষুণি রং ধরিল, আমার কাঁধের উপরে কাহার যেন একটি নরম হাত আসিয়া পড়িল।

ঘুরিয়া যাহাকে দেখিলাম, এতদিন তাহাকে দেখিয়াও কেন দেখি নাই!
বিনোদ।

তাহার স্পর্শ হইতেই বুঝিয়াছিলাম, সে আসিয়াছে আমার অনাদরের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে। আমি সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। তাহার চোখে আমার প্রতি যে প্রীতি দেখিলাম, তাহা আর কাহারও নয়নে দেখি নাই। বুঝিলাম, এত দিনে ঘাট পাইয়াছি।

বিনোদ কহিল, চলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলাম। মন একেবারে ভরা পুষ্করিণীর মতো নিশ্চিন্ত রহিল। বাটীর সম্মুখেই দাঁড় করানো ছিল ঘোড়ার গাড়ি। কেহ বারণ করিল না। বিনোদের হাত ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম। সেই প্রায়ন্ধকারে ঘোড়ার গাড়ি খুটখুট করিয়া আগাইয়া গেল। গঙ্গার তীরে আসিলাম। ছই দেওয়া নৌকায় উঠিতে গিয়া দেখি, শিবু সর্দার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে স্মিত হাসি। বুঝিলাম, তাহারই আয়োজনে কর্তাদাদার প্রাসাদে আজ কোনও প্রহরা নেই, পথও আগাগোড়া বাধাহীন। বিনোদ বাহিরে বসিল। সূর্য যতই প্রখর হইতেছিল, তাহার মুখ আমার কাছে ততই স্পষ্ট হইতে লাগিল। সেই মুখে শুধু আমার জন্যই উদ্বেগ, কাতরতা, প্রেম। আর কাহারও সেখানে স্থান নাই।

হাওড়ায় আসিয়া ট্রেন ধরিলাম আমরা। কাশী পৌঁছাইয়া হরিদাস বাবাজির কাছে আশ্রয় লইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বিবাহিতা নারী কি আবার বিবাহ করিতে পারে? তিনি সামান্য হাসিয়া উত্তর দিয়াছেন, বিবাহ করিতেই হইবে কেন? রাধা-কৃষ্ণের তো বিবাহ হয় নাই।
তাঁহার কথাই শিরোধার্য করিয়াছি। বিবাহ করি নাই কিন্তু বিনোদকে স্বামী জ্ঞান করি।”

২০
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ

বিনোদবিহারীর ছেলে এরপরে যা বললেন, এতদিন এই সংসারের কাহিনির মধ্যে থেকেও তা আঁচ পর্যন্ত করতে পারিনি।
তাই একেবারে চমকে উঠলাম সে কথা শুনে।
নিজের বুকের উপরে হাত রেখে বেশ শান্ত স্বরে জানালেন, তিনিই বিনোদবিহারী ও ক্ষণপ্রভার ছেলে।
তারপরে খুব সহজ স্বরেই বলে যেতে থাকলেন, কাশীতেই আমার জন্ম। তবে বাবা-মা সেখানে যাওয়ার অনেক পরে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি কলকাতায় আসি। তখনই পৈতৃক ভদ্রাসন দেখি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়। কলেজে পড়ার সময়ে আহিরীটোলার বাড়িতেই থাকতাম। রাধাদিদি তখন আমার খুব যত্ন করতেন। তিনি সে সময়ে আমাকে হরিদাস বাবাজির কথা জিজ্ঞাসা করতেন। বাবাজির শেখানো একটি গান গাইতেন রাধাদিদি। আমি গানটি বাবাজি এবং রাধাদিদি দু’জনের মুখেই শুনেছি। গানটি হল—‘একা কাঁকে

কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি / জলের ভিতরে শ্যামরায়। / কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ / পুন কানু জলেতে লুকায়।'

ক্ষণপ্রভার ছেলে বললেন, গানে গানে ভরা ছিল সেই সংসার। সাহিত্য ক্ষেত্রের যে কথাটি বলেছিলাম, সেটি আবার তুলছি। তবে গ্রামের ঠাকুরমশায়ের মন্দিরতলাটি বরাদ্দ ছিল পল্লির নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য। সেটি তিনি রক্ষাও করতেন। হরিদাস বাবাজি রক্ষা করতেন প্রমিত সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে নিজের ভালো-মন্দের ভাবনাকেও কড়া ধরনের গুরুত্ব দেওয়া হয়। ওই 'আমি স্ববশ' কথাটি তাই এখানে আবার উঠে আসে। সেই প্রসঙ্গেই বলি, বাবাজি ভারতচন্দ্রও খুব পছন্দ করতেন। অন্নদামঙ্গলে বিষ্ণুবন্দনা রোজ পড়তেন। শুনতে শুনতে আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, 'ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমসর নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়ে।' মা-কে একবার হাসতে হাসতে বাবাজি বলেছিলেন, তোমার তো দেখছি 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। এই ধরা পড়লে তো এই নতুন ঘর-বর পেলে। মা সে কথা শুনে খুব হেসেছিলেন। সেই হাসির মধ্যে একটি মুক্তির খুশি ছিল। বাবা আর হরিদাস বাবাজি তখন মুগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মা-ও প্রেমের এই প্রকাশের প্রতিই তাঁর সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার এখনও মনে পড়ে কাশীর একটি নিরিবিলি ঘাটে যেন দুধের মতো জ্যোত্স্না থইথই করছে। মা গলাটি উঁচু করে গাইছেন, 'বড়ো আশা, বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন তোমারি লাগি। বড়ো সুখে, বড়ো দুখে, বড়ো অনুরাগে রয়েছি জাগি।' কখনও গাইতেন, 'আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরাণবঁধু / চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে। / বনে এমন ফুল ফুটেছে / মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।'

ক্ষণপ্রভার ছেলে বললেন, একটা আশ্চর্যের কথা কী জানো, মা তখন একা বসে ছিলেন ঘাটের একটি উঁচু খোলা পৈঠায়। বাবা, হরিদাস বাবাজি আর আমি ঘাটের একটি একটি ধাপে। কোথাও কোনও আড়াল ছিল না। ঠাকুরমশায়ের ছেলে যে তোমায় বারবার বলেছেন, মা কোনও কিছুতে হেলান দিয়ে বসতেন, এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। মনে হয়, কাশীতে যাওয়ার পরে মায়ের মন থেকে ভয়, অনিশ্চয়তাটুকু কেটে যায়। তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বাবার। আর তুমি পাবে ধন্যবাদ, তোমার কাছ থেকেই আমি ঠাকুরমশায়ের ছেলের মনের সংবাদগুলি পেয়েছি।

আমার উপন্যাস লেখার ইতি ঘটল এখানেই। বুঝতে পারলাম, এই জীবনযাপন আমি গুছিয়ে উপন্যাসে ধরতে চাইলে, তার রসটি মাটি হবে। আমি চেষ্টা করলাম, যা যা শুনেছি, পড়েছি সেটুকুই কেবল পরপর সাজিয়ে দিতে।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তখনও মেলেনি। তাই বিনোদবিহারী ও ক্ষণপ্রভার ছেলেকে প্রশ্ন করলাম, কর্তাদাদা আপনার বাবা-মায়ের এক সঙ্গে থাকাতে আপত্তি করেননি?
তিনি বললেন, এটি একটি মস্ত ধাঁধা। হরিদাস বাবাজিকে কর্তাদাদা অনুরোধ করেছিলেন, বাবাকে বুঝিয়ে কলকাতায় ফেরত পাঠাতে। বাবাজি রাজি হননি। কর্তাদাদাও কিন্তু আর চাপাচাপি করেননি। সম্পর্কটি মেনে নিয়েছিলেন। একটা কথা কী জানো, বাবাকে কর্তাদাদা ভালবাসতেন। কিন্তু বাবা কর্তাদাদার বাড়িতে তেমন গুরুত্ব পেতেন না। ঠাকুরমশায়ের ছেলে তোমাকে সে দিনের যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, শিবু সর্দার যে নিখোঁজ তা সকলে খেয়াল করেছিল, সঙ্গত কারণও ছিল তার, কিন্তু আমার বাবা যে নেই, সে কথা কারও খেয়াল হয়নি। বাবার সঙ্গে যে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে, তা-ও কেউ কল্পনা করেননি। তাঁরা সকলেই অপেরা-ধর্মের প্রভাবে কাহিনির নায়ককে বেশ নায়কোচিতই হতে হবে বলে ভাবতেন। আর বাবা ছিলেন তার

ঠিক উল্টো। তিনি দেখতে সুন্দর ছিলেন। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের মতো নন। মনে সাহস ছিল। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের মতো দুর্জয় ছিলেন না। তাঁর উপস্থিতির মধ্যে প্রতিষ্ঠার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। কর্তাদাদা, জ্যাঠামশায় কি জামাইদাদার উপস্থিতি যেখানে সব সময় চোখ টেনে রাখত। বাবা তেমন ছিলেন না। কিন্তু মা আমাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। একটি খুব চড়া রোদের দিন বিকেলে তিনি গ্রামের রাধামাধবের মন্দিরের সেই বিগ্রহকে জীবন্ত বলে মনে করেছিলেন। সেই দিন বিকেলে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। মা বলেছিলেন, ওই আচমকা ঝড়ের মুখে পড়লে জ্যাঠামশায় হয়তো গান গাইতে গাইতে মন্দিরের সামনের মাঠে নেমে যেতেন। জামাইদাদা হয়তো ইংরেজি কবিতা পড়তেন। দু'জনেই প্রধানত এমন কিছু করতেন, যাতে ওই হঠাৎ ঝড়টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনেরও তজ্জনিত অবস্থাটি উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু বাবা সে সব কিছুই করেননি। তিনি শুধু ঝড়টি উপভোগ করেছিলেন। এই যে তাঁর শান্ত থাকা, এই যে তাঁর নিজেকে প্রকাশের বদলে অন্যের প্রকাশের প্রতি উন্মুখ ও মুগ্ধ হয়ে থাকা, এইটিই তাঁর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। মা বলেছিলেন, আর সেইটিই যেন সেই সন্ধ্যায় সেই দেবতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই একদিন ঊষাকালে তাঁর বন্ধ দুয়ারের সামনেই বাবা যখন গিয়ে মার কাঁধে হাতটি রাখেন, তখন মনে আর কোনও দ্বিধা ছিল না তাঁর। এই সম্পর্ক দেবতার অভিপ্রায় বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা।

ক্ষণপ্রভার ছেলে বলে চললেন, কর্তাদাদার মৃত্যুর দু'বছর পরে আমার জন্ম। তখন বাবা-মা দু'জনেরই বয়স হয়েছে। আমার জন্মের পরে মায়ের শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তবে সে বার সত্যিকারের ওস্তাদের খেল দেখিয়েছিল গঙ্গাধর। শিবু সর্দার তাকে এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠায়। সে নানা জরিবুটি দিয়ে সেবা করে মা-কে সারিয়ে তোলে। তারপরে সে-ও কাশীতেই থেকে যায়। বাবার ওকালতিও তত দিনে খুব জমে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির এক তলাতে শিবু সর্দার তো থাকতই, যোগ হল গঙ্গাধরও। শিবু সর্দার আখড়া খুলেছিল। তাতে সে লাঠির নানা মারপ্যাঁচ শেখাতো কাশীর পালোয়ানদের। আর গঙ্গাধর ডাক্তার বনে গেল।

--শিবু সর্দার এমন সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

--বলা খুব মুশকিল। অনেকে তাকে এই প্রশ্ন করেছে, কাউকে কখনও উত্তর দেয়নি। যখন যেমন, তখন তেমন ভাবে এড়িয়ে গিয়েছে। তবে আমার একটা সন্দেহ হয়। সন্দেহই, কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। সেটা হল, কর্তাদাদার নির্দেশেই শিবু সর্দার বাবা-মার সঙ্গে ছিল। এটাই ছিল শিবু সর্দারকে কর্তাদাদার দেওয়া শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে কর্তাদাদা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সংসারে কী হতে চলেছে। তিনি যে তা রুখতে পারবেন না, তা-ও বুঝেছিলেন। তাই শিবু সর্দারকেই নিজের চোখ কান হাত পা করে ছোট ছেলে আর তার বৌয়ের সঙ্গে পঠিয়েছিলেন। এটি একটি বঙ্কিমী চাল বললে আপত্তি করব না।

--ক্ষণপ্রভা বা বিনোদবিহারী আর কখনও ফেরেননি?

--ফিরেছিলেন। কর্তাদাদার মৃত্যুর পরে। জ্যাঠামশায় টেলিগ্রাম করেছিলেন বাবাকে। তাতে বলেছিলেন, মা-কে নিয়ে না আসতে। ঠাকুমা তখনও বেঁচে। শিবু সর্দারকে নিয়ে বাবা গিয়েছিলেন। তবে ঠাকুমা মারা যান মাত্র তিন মাস পরেই। আমি বড় হয়ে কলকাতায় আসতে জ্যাঠামশায় আমাকে বুকে টেনে নেন। মাসিমা বিভা তখন প্রমথেশ বড়ুয়ার একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। খুব সামান্য সময় তাঁকে দেখা যেত। তবে তাতেই তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। বাবা-মা সেই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। তবে জ্যাঠামশায় সঙ্গে মায়ের আর কখনও দেখা হয়নি। পিসিমা-পিসেমশায়ের সঙ্গেও মায়ের আর দেখা হয়নি। আমি সব কথা জানি জেনে নায়েব উকিল আমাকে বলেছিলেন, মা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে পরস্পরের কথা না তুলতে।

--বিনোদবিহারী যে আপনাকে সব কথা বলেছিলেন, তা ক্ষণপ্রভা জানতেন?

--জানতেন। তবে বাবা মায়ের সামনে বলেননি। আমাকে সব কথা বলাটা তাঁর পক্ষেও খুব সহজ ছিল না। কিন্তু প্রথম বার কলকাতা আসার আগে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে বাবা আমাকে সব এক এক করে বলেন। মনে হচ্ছিল যেন অন্য কারও জীবনের কথা শুনছি। পরে এই আহিরীটোলার বাড়ির ওই বারান্দায় বসেও অনেক কথা বলেছেন। আসলে, সব সম্পত্তির আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাবা-মা-র বিয়ে হয়নি বলে আইনি সমস্যাও কিছু ছিল। সম্ভবত সেই কারণ দেখিয়েই মা-র কাছ থেকে আমাকে সব কথা বলার অনুমতি নিয়েছিলেন বাবা। পরে নায়েব উকিলও আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর বাড়িটা এক দিন দেখে যেও।

--একমাত্র নায়েব উকিলই তা হলে বিপিনবিহারীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি?

--তা কেন? জ্যাঠামশায়, রাধাদিদি এবং নায়েব উকিল বাকি জীবনটা এক সঙ্গে কাটিয়েছেন। আমার পরীক্ষা থাকলে বাবা-মা কলকাতা আসতেন। তখন জ্যাঠামশায়, রাধাদিদি গ্রামের বাড়ি চলে যেতেন, যাতে কেউ কোনও অস্বস্তি বোধ না করেন। নায়েব উকিল আমাকে পছন্দ করতেন। আমিই সকলের মধ্যে ভালবাসার বন্ধনের একটা কমন ফ্যাক্টর হয়ে গিয়েছিলাম। আমার নাম রাখা হয় বিহারী। মনে করে নিতে পারি, এ চোখের বালির অবদান। নায়েব উকিল একবার আমাকে বলেছিলেন, চোখের বালির শেষে বিনোদিনী কাশী চলে যায়, মহেন্দ্র তাকে বৌঠান বলে প্রণাম করতে যায়। আমার মা-বাবাও সেই কাশীতেই চলে গেলেন। কিন্তু এই পরিবারের কাহিনি চোখের বালির মতো তত সরল সমাধান যে মানেনি, তা রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাব। তিনি নিজে তখন যা লিখতে পারেননি, কাহিনির মধ্যে দিয়ে তা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন পাঠকের মনে। বড় লেখকের এই এক বড় গুণ। সে কথা আমি বিশ্বাস করি।

--আপনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন যা লিখতে পারেননি। এই 'তখন' কথাটির অর্থ কী?

--লেখকের মন একটি বড় গোলকধাঁধা। তাঁর কলমেও তা ফুটে বেরোয়। তক্ষুণি তক্ষুণি কী হয়েছিল, তার খতিয়ান এক রকম। আর ক'বছর পরে ধরলে, তার হিসেব অন্য রকম ভাবে কষা উচিত।

--সে কী রকম?

--খুবই ভাববার মতো একটা কথা রয়েছে রবিবাবুর শেষ বয়সে লেখা ল্যাবরেটরি গল্পটি নিয়ে। সোহিনী আর নন্দকিশোরের বিয়ে হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। লেখক ইচ্ছা করে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি অস্পষ্ট রেখে দিলেন, এটি কম কথা নয়। আমার বাবা-মা-র জীবনের সঙ্গে এর একটা প্রচ্ছন্ন মিল আমি দেখতে পাই। আমার বাবা-মা-র কাহিনি তাই রবিবাবুর মন মতো ভাবে এগিয়েছিল বলেও মনে করি। সোহিনী ও নন্দকিশোর সমাজের স্বাভাবিক দাবি-দাওয়া, শর্ত-শৃঙ্খলা অস্বীকার করেছিলেন প্রেমের জোরে। আমার বাবা-মা-ও তাই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দুলালচন্দ্র ক্রিস্টাবেল থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তা চোখের বালি লেখার সময় রবিবাবুর যে রুচি, তার সঙ্গে মানানসই নয়। কিন্তু দুলালচন্দ্রও রবিবাবু থেকে খুব দূরে যাননি। প্রবীণ রবিবাবুর গল্পের নীলা সিল্কের সেমিজ রাত কাপড় পরে এসে রেবতীর কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে। সোহিনী নীলাকে যে কথাটি গল্পের শেষ দিকে বলেছিল, সেটিও তাই খুব প্রণিধানযোগ্য। সোহিনী নন্দকিশোর সম্পর্কে তখন বলে, 'তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না। তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার, তা তিনি সম্পূর্ণই পেয়েছেন...আর কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি।' প্রেমের এর চেয়ে বড় অভিজ্ঞান খুব কমই হয়। আমার বাবা-মা সম্পর্কে এই কথাটি খাটে। বরং ওই শেষে গিয়ে রেবতীর পিসিমার এসে পড়াটা আমি মেনে নিতে পারিনি। এখন মনে হয়, ওই পিসিমাটি রবিবাবুকেই সর্বত্র তাড়া করে বেরিয়েছেন। না হলে চোখের বালির

সমাপ্তিও অন্য রকম হত। আমার বাবা-মা ওই পিসিমাটিকে অনেকদিন আগেই বর্জন করতে পেরেছিলেন। তাতে সমকালের শ্রেষ্ঠ লেখককে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের পুরস্কার প্রাপ্য হয়।

সূর্যমুখীর নাতি সে কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। ক্ষণপ্রভা সোহিনী নন। কিন্তু ক্ষণপ্রভা জীবনসঙ্গী নির্বাচনে নিজের বোধ ও অর্জনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। বিধিকে মেনে নেননি। এখানে একটা চরিত্রের জোরের কথা ওঠে। সেই জোরের কথায় তাঁর সঙ্গে সোহিনীর মিল রয়েছে।

তারপরে বললেন, শৈবলিনী, সূর্যমুখী, বিনোদিনী, আশা সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁদের জীবনের কাহিনিও বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। সত্যিকারের জীবন অনেক বড়। আমার দিদিমা সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে কর্তাদাদার কথাই ঠিক হয়েছিল, দুলালচন্দ্র তাঁর কাছে ফিরেছিলেন। দিদিমা তাঁকে মেনেও নিয়েছিলেন। রবিবাবুকেও মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের সন্তান, আমার মায়ের নাম ছিল সুচরিতা।

[প্রথম ও শেষ ছবিদুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা, বাকী ছবি কালীঘাটের পটের]

আমার মহারাণী দর্শন

শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত এপ্রিলে পুত্র কন্যার কাছে দিল্লী গিয়েছিলাম । অনেকদিন থেকেই বলছিলো যাওয়ার জন্যে , কদিন রান্নাঘর থেকে ছুটি পাবো আর তখনও অবধি দিল্লীর আবহাওয়া কলকাতার থেকে অনেকটাই ভালো। প্রায় তিন সপ্তাহের মতন থাকা। সেই শুনে আমার ভাগ্নী বলেছিলো দিল্লী থেকে কয়েকদিনের জন্যে আসে-পাশে ঘুরে এসো। কিন্তু কর্তার একটাই কথা, ছেলে-মেয়ের কাছে এসেছি যখন তখন ওদের সঙ্গেই একসাথে দিনগুলো গল্পগুজব করে কাটাবো আর যখন ওরা কাজে থাকবে ওদের মা ওদের পছন্দের নানারকম খাবার বানিয়ে রাখবে, আর কর্তা মনের সুখে বাজার করবেন এই ছিল পরিকল্পনা। । আমার অবশ্য রান্নাঘরে সময় কাটাতে মন্দ লাগে না বিশেষ করে নিজের সন্তানদের জন্যে যখন কিছু করি। এইভাবে দিনগুলো ভালই কাটছিল।

কৃষ্ণা

অবসর সময়ে ফোন, হোয়াটস্যাপ এ বন্ধুদের সাথে আড্ডা তো আছেই। ভাগ্নীর সাথে আড্ডা মারতে মারতে একটা আইডিয়া দিল তিন দিনের জন্যে রাজস্থানের রণথম্বোর ন্যাশানাল পার্ক ঘুরে আসার। রীনা জানে যে মাইমার জঙ্গল ঘোরার সখ আছে। তা আছে বটে, সেই ছোট্টো বেলা থেকে। সেই সময় আমার বাবা ও দাদাদের শিকারের সখ ছিলো। তা সেও বহুবছর হয়ে গেলো। আর তখন থেকেই ভারতের বহু জঙ্গলে ঘোরাঘুরি আর বিয়ের পরও কর্তাকে নিয়েও অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি , অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখেছি কিন্তু বাঘ/বাঘিনীর দেখা মেলেনি। জানি এটা পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। রাজস্থান আগে ঘোরা ছিলো তবে রাজস্থানের জঙ্গল দেখার সৌভাগ্য হয়নি । সৌমেনকে বার বার বলাতে নিমরাজি হ'ল।

মোম-জয় (কন্যা-পুত্র) দুজনেই উৎসাহ দিল ঘুরে আসার। তবে জয়ের ইচ্ছে ছিল আমরা কোনো পাহাড়ি যায়গাতে ঘুরে আসি। কিন্তু তার জন্যে সময় লাগবে বেশি আর কর্তা তাতে রাজি নয়। অতয়েব জঙ্গল যাওয়াই স্থির হল।

যাবো বললেই তো হয় না। দুদিনের মধ্যে ট্রেনের টিকিট পাওয়া , হোটেল বুকিং, জঙ্গল সাফারির বুকিং ইত্যাদি। ভাগ্নী রীণা তো সমানেই উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি আমরা অনলাইনে টিকিট বুক করতে না পারায় রীণাই আমাদের দিল্লী-সয়াইমাধেপুরের কনফার্ম টিকিট করে দিল। আর বাকি কাজগুলো সৌমেন সারলো।

যাত্রা শুরু ২৬শে এপ্রিল বিকেলের রাজধানী। জয় আমাদের নিয়ে ট্রেনে তুলে দিল। ৪ ঘন্টার রাস্তা দিল্লী থেকে সয়াইমাধেপুরের। স্টেশনে গাড়ী বলা ছিলো। রাত সাড়ে ৯ টার সময় আমরা জিপসি করে পৌঁছে গেলাম একেবারে জঙ্গলের ভেতর সরকারি হোটেল " ঝুমার বাউরি" তে। এটিকে হোটেল না বলে রাজপ্রাসাদ বললেই ভালো শোনায়। কারণ এটি সত্যি রাজপ্রাসাদ ছিল এক সময়। রাজারা এটি বানিয়েছিলেন শিকার করার উদ্দেশ্যে।

এই স্টেশন থেকে ঝুমার বাউরি রাতের অন্ধকারে বেশ গা ছমছম করা রাস্তা, আমাদের রাতের আহারের কথা আগে থেকেই বলা ছিলো, হোটেল ম্যানেজারের কাছে ১০ মিনিট সময় চেয়ে নিলাম একটু ফ্রেশ হওয়ার জন্যে। ডিনার টেবিলে বসে খাবারের সম্ভার, তার সাথে গরম গরম রুটি। আর সবচেয়ে যেটা ভালো লাগলো সেটা হ'ল আন্তরিক আতিথেয়তা।

আরটিডিসি ঝুমার বাউরি

ম্যানেজার জানালেন পরের দিন ভোর সারে ৫ টার মধ্যে রেডি থাকতে। জিপসি এলে উনি খবর দেবেন।আর এও জানালেন নীচে এসে চা বললেই ওরা চা দিয়ে যাবে, আমাদের বেড টি র অভ্যাস নেই, জানালাম রেডি হয়ে নীচে গিয়েই চা খাবো। এতোটাই উৎসাহিত ছিলাম যে পরের দিন ভোর ৫ টা তে এলার্ম দেওয়া সত্ত্বেও তার আগেই উঠে পরে তৈরী হয়ে নীচে এলাম, দেখিই কেউ কোথাও নেই, যাই হোক বেল বাজাতে ম্যানেজার এসে আমাদের লনে বসতে বললেন আর জানালেন ওখানেই চা দিয়ে যাবে। আর বাইরে বেরিয়ে লনে একটু পায়চারি করতে করতেই চোখে পরলো হোটেলের পাশের আউট হাউসের ছাতে ৩-৪ টি ময়ুর পেখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে , এত কাছ থেকে ময়ুর দেখার সৌভাগ্য আগে হয়নি ঠিক তাও নয় এর আগে বিকানীর যাওয়ার পথে রাস্তার ওপরই গাড়ীর সামনেই একটি পেখম তোলা ময়ুর দেখেছিলাম। আর লন থেকে যতদূর চোখ যায় চারপাশে ঘন বন। একটু পরেই জিপসি এসে আমাদের নিয়ে রওনা দিল। হোটেল থেকে রাস্তা প্রায় দেড়-দু কিলোমিটার, রাস্তার দু ধারে বন আর তার ফাঁকে ফাঁকেই দেখছি ২-৩ টি করে সাম্বার, চিতল আপন মনে

ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। জঙ্গলে ঢোকার আগেই মনটা আনন্দে ভরে উঠলো।

এরপর প্রধান সড়কে পরে গাড়ী ডান দিকে মোড় নিল, আমাদের গন্তব্য ছিল রনোথম্বর জাতীয় উদ্যানের চার নাম্বার গেট। গাইড যেতে যেতেই এখানকার জঙ্গলের বিবরণ দিতে লাগলো। আর বার বার সতর্ক করে দিলো

সম্বর হরিণ

আমরা (সাথে আর এক কাপল ছিলেন) যেন কোনো আওয়াজ বা বেশি কথা না বলি। যদিও এসবই জানা তবুও ওরা তো ওদের কর্তব্য করবেই। আর বারে বারে আশ্বাস দিচ্ছে সে তার যথাসাধ্য চেস্টা করবে শের (বাঘ মামা) দেখানোর জন্যে কারণ সকলেরই ঐ ইচ্ছেটাই থাকে যেন বাঘ/বাঘিনীর দেখা মেলে। সাড়ে তিন ঘন্টার যাত্রা।

যাই হোক চার নাম্বার জোনে আসার পর গাইড ওখানকার অফিসে গেল পারমিশন নিতে। আমাদের জিপসির সামনে ও পিছনে আরও জিপসি ও ক্যান্টর (অনেকটা হুড খোলা বাস) দাঁড়িয়ে আছে ঐ একই কারণে। দশ মিনিটের মধ্যেই পারমিট নিয়ে ফিরে এল। শুরু হ'ল আমাদের যাত্রা। সে এক উন্মাদনা, বুক ঢিপ ঢিপ কত কি যে হচ্ছে বলে/লিখে বোঝানো যাবে না। প্রথমেই হনুমানজির দর্শন। আমি এর আগেও যখন অন্যান্য জঙ্গলে প্রথমেই বাঁদর/হনুমান দেখেছি সেই যাত্রায় আর বাঘ মামার দেখা মেলেনি। কি আর করা। একটু দমে গেলাম ঠিকই তবে প্রথম দিন তো তাই আশায় বুক বাঁধি। পথের দুধারে সতর্ক চোখ আর গাইড বাবুর বদান্যতায় প্রচুর নানা জাতের হরিণ দেখার সৌভাগ্য মেলে। মাঝে মাঝে ময়ুর, প্যাঁচা, নানা রকমের পাখি ও তাদের ডাক শুনতে লাগলাম। আমাদের বোঝানো হ'ল যে বাঘ কোনো চিড়িয়া (পাখি) নয় যে যেখানে সেখানে দেখা যাবে। কখন যে তিন ঘন্টা পার হয়ে গেল খেয়ালই হয়নি। সেদিন সকালের যাত্রা শেষ। বিফল মনোরথে হোটেল ফিরে এলাম। হাত মুখ ধুয়ে সোজা ডাইনিং হলে। আর গরম গরম আলু পরাঠা, আচার, দই আর চায়ের পরিবর্তে ঠান্ডা ছাস(নোনতা ঘোলের সরবত) খেয়ে বাঘ না দেখার দুঃখটা সাময়িক ভাবে ভুলে গেলাম।

দুপুরে রাজকীয় আহারের পর আধা ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, এবার কিন্তু আমাদের নিতে ক্যান্টর এসেছিলো যেটার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। এবার আমাদের গমন পথ ছিল দু-নাম্বার জোন। একইভাবে গাইড পারমিট নিয়ে দু-নাম্বর জোনে প্রবেশ করা হ'ল। একটা কাথা বলি, আগেও অনেক

জঙ্গলে ঘুরেছি কিন্তু এই রাজস্থানের রণথম্বর যেন খুব রুক্ষ, ঘন জঙ্গল বলতে যা বোঝায় তা নয়। শুধু রুক্ষ বললে ভুল হবে পাথুরেও বটে। বড় বড় বোল্ডার রাস্তার মাঝে। গাছপালা খুব ই কম। আর এই পাথুরে রাস্তায় ঐ ক্যান্টরে করে ঘোরা, তখন বাঘ দেখার আশায় আর এই বুড়ো হাড়ের যে কি দশা হবে সেটা আর ভেবে দেখিনি। সৌমেনও অবশ্য আমার এই বাঘ দেখার অদম্য ইচ্ছে বা পাগলামিকে দমিয়ে দেয়নি।

এবেলাতেও একই দৃশ্য, তবে বাড়তি পাওনা ছিল বইকি। হরিণ, চিতল, সম্বর, ময়ূর, নানা রকমের পাখি ছাড়াও চোখে পড়লো গাউড়। পুর্ণ বয়স্ক দুটি গাউড় (বন্য মহিষ), এটাও একটা বিরাট প্রাপ্তি। এই জঙ্গলে এত ময়ূর একসাথে দেখেছি যে বলার নয়। সূর্য ডোবার মুখে আমাদের ফেরার পালা। এইভাবে কেটে গেল দ্বিতীয় ট্রিপ। কিন্তু বাঘ/ বাঘিনীর দেখা মিললো না। তাতে কি, মানুষ তো আশায় বুখ বাঁধে তাই না! আরও দুটি ট্রিপ বাকি।

পরের দিন ভোরে ছিল সাত নাম্বার জোন। সেদিন ভোরে আমাদের নিতে এল জিপসি। ক্যান্টরের থেকে জিপসিতে যাওয়াটা অনেক স্বাচ্ছন্দের। তবে এবারের গাইড ও ড্রাইভার বেশ ভালো ছিল। এবারেও সেই একই আশায় চলেছি যে বাঘ দেখব। গাইডও যথাসাধ্য চেস্টা করেছেন কিন্তু আমাদের ভাগ্যে নেই তো কি করা। তবে এবারে ড্রাইভার বেশ গল্প করতে করতে এল, যখন আমাদের রিসর্টের রাস্তা ধরল তখন তিনি বলছেন এর আগে কোনো গেস্টকে ছাড়তে এসে রাস্তার মধ্যিখানে বাঘকে দেখেছেন রাস্তা পার হতে, শুনেই মনটা যেমন পুলকিত হ'ল আবার এও মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে কি শিকে ছিঁড়বে। শেষ চেষ্টা দুপুরের ট্রিপ। মনটা বেশ দমে গেছে। এ যাত্রায় বোধহয় আর বাঘের দেখা মিললো না। তবে হোটেলের ম্যানেজার থেকে প্রত্যেক কর্মীই আমাদের উৎসাহ দিয়েছে যে বাঘ না দেখে আপনারা ফিরবেন না, বাঘ অবশ্যই দেখবেন।

আবার দুপুরের আশায় বুক বেঁধে আছি। দুপুরের আহার সেরে অপেক্ষায় আছি কখন আমাদের নিতে আসবে। যথা সময়ে আমাদের নিতে এলো ক্যান্টর। গাইডের কি দয়া হ'ল আমাদের দুজনের সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসার ব্যাবস্থা করে দিলেন। এতে ঝাঁকুনিটাও কম লাগে। এবারে আমাদের গন্তব্য দু-নাম্বার জোন যেটাতে প্রথম দিনই গিয়েছিলাম। ভাবছি এখানে তো সেদিন বাঘ দেখিনি আজ কি আর দেখা যাবে। একটা কথা বলা প্রয়োজন এই রণথম্বোরের জঙ্গলে সব জোন মিলিয়ে মোট বাঘ, বাঘিনী, বাচ্ছার সংখ্যা ৬৪। এই ক্যান্টরের গাইড ও ড্রাইভারও খুবই আশাবাদী যে বাঘের দেখা মিলবেই।

পারমিট নিয়ে দু-নাম্বার জোনে প্রবেশ করার একটু পরেই একটি ছোটো নদী/পুকুর/ডোবা যা বলা যায় কাছে যেতেই গাইড বাবু ড্রাইভার সাবকে ক্যান্টরকে পেছোতে অনুরোধ করলো। আর তখনই ইশারায় দেখালেন জলাশয়ের পাড়ে একটি কুমির, দেখেই মনটা নেচে উঠলো এই কারণে যে আজ জঙ্গলে ঢুকে প্রথম হনুমান দর্শন হয়নি। সবাই ছবি তুলতে শুরু করেছে। এবার সামনের দিকে এগোতে থাকলাম। সেই একই দৃশ্য , পথের দুধারে হরিণের দল, ময়ূরের দল পেখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি জানি তবে কি আজও হ'ল না বাঘ দেখা। আমার ভাগ্যে আর বাঘ দেখা নেই। ভগবানকে ডেকেই চলেছি। আর বারেবারে ঘড়ি দেখছি আর কতোটা সময় জঙ্গলে আছি। একটা কথা না বললেই নয়। এই জোনে প্রথম ট্রিপের গাইড সেভাবে দেখানোর ইচ্ছে দেখান নি, যেটা একই জোনে এই গাইড ও ড্রাইভার তাদের শেষ চেষ্টা দিয়ে আমাদের সহায়তা করে গেছেন। আমাদের হাতে আছে ঘন্টা খানেক সময়, তা পরেই ফেরা। এমন সময় কিছু দূরে একটি জিপসিকে আসতে দেখে তাকে সাংকেতিক

ভাষায় কিছু বলতে সেই হাত নেড়ে দেখিয়ে কিছু বললো, আর গাইড মশাই ড্রাইভারকে গাড়ী টার্ণ করে বড় জলাশয়/নদীর ধারে নিয়ে যেতে বললেন। আমাদের বললেন আগের জিপসি ওখান থেকেই ফিরছে বাঘিনী দেখে। আমাদের এখন ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রতিটি মুহুর্ত মনে হচ্ছে এক এক যুগ। এই জলাশয় কিন্তু আগেও ঘুরে এসেছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। দেখি বেশ কয়েকটি জিপসি ও ক্যান্টর সার সার দাঁড়িয়ে ওখানে। আমাদের ক্যান্টর তাদের পাশেই জায়গা করে নিল। কথা বলা বারণ। বেশীর ভাগের হাতেই ভালো ভালো ক্যামেরা জুম করে রাখা। কিন্তু যাকে দেখতে আসা তিনি কোথায়।

কৃষ্ণার সামনে

এবার গাইড আমাদের সাহায়তা করলেন। সামনেই ঝোপের ভেতর অল্প নড়াচড়া হচ্ছে, গাছপালা নড়তে দেখছি। আমরা প্রত্যেকেই প্রায় দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। এমন সময়ে রাজকীয় চালে হেলতে দুলতে কারুকে ভ্রুক্ষেপ না করে সামনে জলের ধারে এগিয়ে চলেছে বাঘিনী কৃষ্ণা। তিনি নদীর ধারে গিয়ে গদিয়ানি চালে বসে পরলেন। মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে দেখছেন আবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাচ্ছিল্যভরে, এইভাবে প্রায় আধ ঘন্টা ওখানে রইলাম, কৃষ্ণা কিন্তু একইভাবে বসে রইলো। এবার গাইড জানালেন আমাদের সময় আর বেশি নেই অগত্যা ফেরার পালা। মনের মধ্যে একরাশ আনন্দ নিয়ে রিসর্টে ফিরলাম। এত আনন্দ যে ওখান থেকেই ভাগ্নী ও কন্যাকে ফোনে চেষ্টা করছি কিন্তু খেয়াল নেই যে ওখানে ফোনের টাওয়ার নেই। আর দুজনেরই এতটাই আনন্দ হয়েছে যে সৌমেন তক্ষুনি গাইড মশাই ও ড্রাইভার সাব কে তাদের চেষ্টার পারিশ্রমিক দিলেন, ওনারাও খুব খুশি। ঘরে ফিরে ফ্রেশ হয়ে চা ও সাথে পাকৌরার অর্ডার দেওয়া হ'ল।

পরের দিন ভোর ছ- টার সময় আমাদের রওনা হওয়ার কথা। সাড়ে ছ'টাতে দিল্লী ফেরার ট্রেন। হোটেলের সকলেই আমাদের মুখে বাঘ দেখার গল্প শুনে খুব খুশি। এরপর রাত্রের আহার করে হোটেলের টাকা পয়সা মিটিয়ে ঘরে এলাম। আনন্দের রেশ রয়েই গিয়েছে। ছেলে-মেয়ের সাথে বাঘ দেখার গল্প শেয়ার করলাম। আর দেরী না করে বিছানা নিলাম।

পরের দিন অন্ধকার থাকতেই উঠে তৈরী হয়ে নীচে নামলাম চায়ের আশায় । প্রায় ঘুম থেকে তুলেই ওদের চা বানাতে বলে আমরা লনে গিয়ে বসলাম। নানা রকম পাখির কলরবে বেশ লাগছে, অন্ধকার ভেদ করে অল্প অল্প ভোরের আলো ফুটছে। সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য। আমাদের লনেই চা দিয়ে গেলো বিস্কুট সহযোগে। যিনি

চা দিলেন তিনি লনের ধারে দাঁড়িয়ে, আর আমরা ভোরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চা পান করছি। হঠাতই উনি আমাদের ইশারায় ওনার কাছে যেতে বললেন। নীচে যেখান দিয়ে রাস্তাটি গেছে সেদিকে হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না একি দেখছি। সামনেই (১৫-২০ হাত দূরে) আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক প্যান্থার/ কালো চিতা। চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। আমি ক্যামেরা বাগাতে বাগাতেই সে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। উনি বললেন রিসর্টের পাশেই জলাধার আছে সেখানে হামেশাই আসে জল খেতে অনেক ধরনের বন্য প্রাণী। মাঝে মাঝে বাঘের দেখাও মেলে।

বাঘিনী দেখার আনন্দ তো ছিলই আর তার সাথে উপরি পাওনা এই ব্ল্যাক প্যান্থার, এটি আরও বড় পাওনা।

[ছবি: লেখক]

কলকাতার নাট্য-আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু কথা

মনোজ ভট্টাচার্য

আমার নাটকের সম্বন্ধে উৎসাহ আরম্ভ হয় খুবই বাল্যকালে । এমন কি ঠিক ঠাক বোঝার বয়েস হওয়ার আগে থেকেই।সকলেই জানেন, হাতিবাগান অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি থিয়েটার, পেশাদার ও অপেশাদার, এবং সিনেমা হল ছিল। থিয়েটার হলগুলোর নাম – স্টার থিয়েটার, রঙমহল, শ্রীরঙ্গম (পরে বিশ্বরূপা) রঙ্গনা, সারকারিনা, ও মানিকতলায় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, শেয়ালদার দিকে এগোলে প্রতাপ মেমোরিয়াল হল ও নেতাজী ইন্সটিটুট আর এদিকে ইউনিভারসিটি ইন্সিটিউট ও মহাজাতি সদন। আর অবশ্যই , মিনার্ভা থিয়েটার! সব মনে করতে পারলাম কিনা সন্দেহ! সব মঞ্চেই বেস্পতিবার, শনিবার রোববার কমার্শিয়াল থিয়েটার হত। আর বাকি দিনে অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবের ফাংশান হত। এবং তাদের অফিস স্টাফের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক অভিনীত হত।

কেয়া চক্রবর্তী (ভালোমানুষ)

ওই দিনগুলোয় পাহারার কড়াকড়ি কম ছিল । আর তাই আমরাও, স্টার, শ্রীরঙ্গম, রঙমহল থিয়েটার হলে কাঠের দরজা একটু ফাঁক করে সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে বসে নাটক দেখতাম। তখন তো অফিসের আদ্ধেক লোক বাড়ি চলে গেছে । বাকি আদ্ধেক লোক তো তাদের পরিবারেরই লোক।

'আনি আনি, তোমাহ হাতে কেন অং? – অং নয় আজা – এ আমাহ অক্ত'! আমরা এই নিয়ে রসিকতা করতাম , রক্তই হোক আর রংই হোক – সেই যে আমাদের শৈশবে নাটকের নেশা ঢুকে রইল, সেই জের সারা জীবন বয়ে চলেছি!

পশ্চিমবঙ্গে তথা বাংলা ভাষায় মঞ্চনাট্য অভিনয় ও তার চেষ্টার মুলে হেরাসিম লেবেদফ নামে এক রাশিয়ান নাট্যরসিকের নাম আসে আগে। ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর, এজরা স্ট্রিট অঞ্চলে বাংলা নাটক 'ছদ্মবেশী' নাটকটি অভিনয়ের আয়োজন করেন। দুটো ইংরিজি নাটক 'ডিসগাইজ' ও 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' – বাংলা ভাষার শিক্ষক গোলকনাথ দাস কে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বাঙ্গালি শিল্পীদের দিয়ে মঞ্চস্থ করান। ২৫ নম্বর ডোমতোলা বা দুমতোলা লেন এ মঞ্চ তৈরি করে পেশাদারী করার চেষ্টা করা হয়।

তখন বেশীরভাগ হলেই পেশাদার নাটক অভিনীত হত। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক। আর অভিনয় করতেন বিরাট বিরাট মহিরুহ ! – শিশির ভাদুরী, অহীন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্র গুপ্ত, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, নরেশ মিত্র, সরজুবালা, আঙ্গুরবালা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আধুনিক কালে গণ নাটকের দলগুলোতে একেবারে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষেরা এসে নতুন চিন্তাধারায় নতুন আঙ্গিকে নাটকে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। শুধু বিদেশী নাটকের অনুবাদই নয়, দেশী নাট্যকারদের নাটকও পরীক্ষামূলকভাবে অভিনয় হচ্ছে। মানুষের মধ্যে একটা নবচেতনার জোয়ার এসে গেল। হলে গিয়ে নাটক দেখা ও নাটক বোঝার ভাবনা শুরু হল।মানুষ তাদের নিজেদের দেখতে পেল নাটকের দর্পণে।

কলকাতার নাট্য,আন্দোলন তখন রীতিমত সাবালকত্বে পৌঁছে গেছে। তা বড় তা বড় নাট্য ব্যক্তিত্বরা একএকটা গ্রুপ নিয়ে ভালো ভালো অনুবাদ নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।ভারতীয় রাজনীতির প্রভাব পুরোপুরি এসে পড়েছে নাট্যদলের ওপর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় ভুমিকায় থাকা মূল আই পি টি এ, আদর্শগত স্বার্থের কারনে বেশ কতগুলো গ্রুপে বিভক্তহয়ে গেছে। কিছু মানুষ যারা স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিল, তারা সরে গেল একটু প্রতিকী নাটকে।আর বেশির ভাগ রয়ে গেল নাট্য-আন্দোলনের মুলপথে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাধ্যমে যে বিরাট ধাক্কা এলো, দেশভাগের সেই গভীর ক্ষত ছিন্নমুল মানুষের কাছে – হতাশা ও চরম দারিদ্র্য – এক অসহনীয় পরিস্থিতি দেখা দিল।

তবু নাট্য-আন্দোলনে বামপন্থিরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভুমিকার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেনি।এমনকি পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে আধা ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের প্রতিবাদ করাটাকেও আন্দোলনের দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছে।
সেই কারনে পি এল টি, থিয়েটার কমিউন, নান্দীকার, নক্ষত্র, ইত্যাদি বেশির ভাগ দলই শেকভ, ইবশেন, ব্রেখস্ট বা পিরেনদেল্লো , কখনো ইংরিজিকখনো জার্মান কখনো ইটালিয়ান নাট্যকারের স্মরনাপন্ন হয়েছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রমুখরা একের পর এক দুর্দান্ত সব নাটক লিখেই যাচ্ছেন।

সেটা ১৯৬১ সাল হবে। বাগবাজারে নন্দ বসুর মাঠে, এখন যেখানে মালটিপারপাস গার্লস স্কুল,ঠিক সেখানে আমরা হাতে করে কয়েকটা থিয়েটারের সেট বয়ে নিয়ে এলাম। নান্দীকারের একবছর পূর্তি, সেই উপলক্ষে

বোধহয় দুটো একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হল।একটা “প্রস্তাব”, আরেকটা বোধহয় “জনৈকের মৃত্যু”। প্রস্তাবে অজিতেশদা ও কেয়া চক্রবর্তী, দারুণ মজার ছিল। তখনো রুদ্রদা মূল চরিত্রে ঢুকতে পারেনি।তখন অসিতদা, তপাদা মানে রাধারমন তপাদার, বিভাস চক্রবর্তী, অরুপ গাঙ্গুলি – সদ্য একটা,দুটো সিনেমা করেছে, দীপেন সেনগুপ্ত,অশোক মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

সে সময় অপেশাদার নাটকের দল, না ছিল অর্থ বল না ছিল নামকরা কোনো অভিনেতা।হ্যাঁ ছিল একজন অল্প নামী চিত্র- অভিনেতা।তার জোরে টিকিট বিক্রি হতোনা। সত্যি সত্যি তখন আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাটকের টিকিট বিক্রি করতে হত(পুশ সেল যাকে বলে)। নিজেদের কাঁধে করে সেট বয়ে নিয়ে যেতে হত, 'হলে' বা মাঠের স্টেজে। নাট্য কর্মীদের চাকরির অর্থ থেকে দলের ভর্তুকি বা চাঁদা দিতে হত আবার স্কুলের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল 'ভোলা মাস্টার'এর দশা। ওদিকে নায়িকা ভাড়া করা হত কোনও পেশাদার অভিনেত্রীকে, অর্থের বিনিময়। বেশ মনে আছে, কিছুদিন দলের রিহার্সাল হয়েছিল চিৎপুর ও বি কে পাল এভিনিউয়ের একটা গ্যারাজে। শোনা যায় এখানেই নাকি নান্দিকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

নান্দীকারের একটা বড় নাটক মঞ্চস্থ হবার মাত্র কদিন আগে আচমকা ১৩ জন শিল্পী যার মধ্যে বিভাস চক্রবর্তী, অজয় গাঙ্গুলি, অশোক মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় ইত্যাদিরা ছিল, দল থেকে চলে গেল। মাত্র কয়েকদিন আগেই অশোকবাবুকে এই ঘটনা নিয়ে অনুশোচনা করতে দেখা গেল।

ঠিক তখনই কেয়া চক্রবর্তীর পূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের প্রয়োজন পড়ল। এই প্রসঙ্গে বলি, কেয়াদের বাড়ি খুবই রক্ষণশীল ছিল।সেই কারনে সত্যজিত রায়ের নায়ক সিনেমার সাংবাদিক চরিত্রটা করতে পারে নি। পরে সেটা শর্মিলা ঠাকুর করেছিল। সেই থেকেই কেয়ার ঘাড়ে পড়ল দলের প্রচার ও সাংগঠনিক দায়িত্ব।

এই সময় নাগাদ আমার ও বিকাশের নান্দীকারে সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ কারনবশত তা করা হয়ে ওঠেনি। আমাকে বরং গন্ধর্ব নাট্য দলে শ্যামল ঘোষের কাছে যেতে হল। সেটা বেশ মজার ব্যাপার । শ্যামলদার সঙ্গে একটা দিন ঠিক করে বিকেলের দিকে ওদের ক্লাবে গেলাম । মির্জাপুর স্ট্রিটের একটা বাড়ি যেখানে সব নাটক দল, যাত্রাদল, ও পাবলিশিং গোডাউন আছে। তারই একটা ঘরে গন্ধর্বের অফিস, সন্ধ্যে বেলায়। দিনের বেলায় নিশ্চয় অন্য কোন পাবলিশিং অফিস!

শ্যামলদা এসে আমাকে দেখে , ডেকে নিলেন ঘরের একপাশে। আমার নাম ধাম, কি করি, কি পড়ি, পড়া শেষ হতে কতদিন লাগবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রীতিমত ইন্টারভিউ। অনেক পরে চাকরির জন্যে বেশ কিছু ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে – এই ইন্টারভিউ তার চেয়ে কম মনে হল না ! মধ্যে অবশ্য ছোট্ট গেলাশে চা।

কেয়া চক্রবর্তীর কাছ থেকে এসেছি বলে কথা ! ঝপ করে তো ‘কাজ নেই’ বলতে পারে না। তাই আমাকে বোঝাল, এখন কলেজের পড়া শেষ করতে। কারণ দলের নাটক করতে কলকাতার বাইরে যেতে হতেই পারে। তখন পড়ার এবং কেরিয়ারের ক্ষতি হবে, চাকরি পেতে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে বরং পড়া শেষ করে চাকরি পেয়ে চলে আসতে। আমাকে অবশ্যই দলে নেবে ও অভিনয় করাবে। ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ! পরে নাকি আমার খোঁজখবর করেছিলেন শ্যামলদা।

নাটক করার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – রিহার্সাল দেওয়া। বার বার রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে পুরো নাটকটাকে একেবারে কন্ঠস্থ করে রাখা। শুধু বর্তমান নাটকটাই নয় – বেশ কয়েকটা নাটক।অর্থাৎ যে কোনও সময় যে কোনও নাটক যেন মঞ্চায়িত করা যায়।

নান্দীকারের প্রথম দিকের নাটকগুলোর রিহার্সাল হত অজিতদার দোতলার ফ্ল্যাটে। বেশ মনে পড়ে ওই ছোট্ট ঘরে দশ বারো জন কুশীলব রিহার্সাল দিচ্ছে । আর অজিতদার স্ত্রী, কেন যে নামটা মনে পড়ে না, অতগুলো মানুষের মধ্যেও নিজের ঘরকন্না করা ছাড়াও আমাদের কার কি দরকার সব খোঁজ খবরও রাখছেন। মঞ্চের সেটগুলোও দরজার আশে পাশে থাকত।

একসময় আমরা দেখেছিলাম – মঞ্চায়িত নাটক – স্টেজের ভেতরেই কুশীলবেরা টিনের তলোয়ার নিয়ে অভিনয় করত। কিন্তু ক্রমশ দর্শকরা এগিয়ে এসে মঞ্চের বেড়া ভেঙ্গে দিল। তারা অভিনেতাদের তাদের সামনাসামনি নিয়ে এলো।আমাদের জন্যেই তো নাটক। তবে কেন ওই ছোটো মঞ্চে আটকে থাকবে।

তাই এইসময় আমরা দেখেছি ইডেনের পাশে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কেয়াও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছে। তাই মাঝে মাঝে কেয়ার উপস্থিতি, নাটক মনে হত না। মনে হত এই সমাজেরই এক প্রতিবাদী চরিত্র, আমাদের জীবনেরই অঙ্গ। খোলামাঠে স্পার্টাকাস, যেখানে দর্শকেরাই কুশীলব,আমিই স্পার্টাকাস। দর্শকদের সবাই সমস্বরে বলে উঠছে, আমি স্পার্টাকাস। সত্যিই তো আমিই তো স্পার্টাকাস। তিতাস একটি নদীর নাম যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন মঞ্চের বাইরের মঞ্চ কতটা বড় হতে পারে। মনে হত দর্শকরাও যেন নাটকের অংশ।

উৎপল দত্ত (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ)

এইসময়ের উন্নতমানের নাটকের প্রাবল্যে পৌরাণিক কল্পিত নাটকগুলো বেশ পানসে হয়ে গেছিল। তবু তার মধ্যেও বেশ কিছু হাস্যরসাত্মক নাটক, যেমন চলচিত্তচঞ্চরী, ব্যাপিকা বিদায় ঠিকই রয়ে গেল অভিনয়ের গুনে! রবীন্দ্রনাথের নাটকের ওপর আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতেই থাকল। এখনও তা চলছে , বিশেষ করে রক্তকরবী তো চিরন্তন হয়েই থাকবে।জরুরী অবস্থার সময়ে অনেক গ্রুপ নাটকই মঞ্চস্থ হতে পারত না। বিশেষ করে দুঃস্বপ্নের নগরী ও ব্যারিকেড কোনও পাবলিক মঞ্চে হতে পারত না।শুধুমাত্র পুলিশী তাণ্ডব নয় কখনো কখনো যুব নাৎসি বাহিনীও এসে ভাঙচুর করেছে। এমনও হয়েছে, কোনও এক 'প্রেমিকার চিঠি' নাটক দেখতে গিয়ে দেখলাম 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বা 'ব্যারিকেড'। আমাদের অফিসের রিক্রিয়েশান ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশানে 'প্রেমিকার চিঠি' নাটকের পারমিশান

হয়েছিল।ফাংশান হয়েছিল কলামন্দিরে।কর্মকর্তাদের জন্যে বেশি সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি 'প্রেমিকার চিঠি' আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল। পাছে ফ্যাসিস্ট চেলাচামুন্ডারা এসে গণ্ডগোলের সুযোগ না পায় তাই তাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।সেদিন উৎপল দত্ত আসেন নি, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর মজুমদার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সকলে হয়ত জানেন ইউনিভারসিটি ইন্সিটিউট হলে নুরজাহান নাটক হওয়ার সময়ে কিভাবে আগুন লাগানো হয়েছিল।হলের সঙ্গে সঙ্গে নুরজাহানও দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে রইল।
অতি সম্প্রতি আবার দেখছি পুরনো নাট্য,আন্দোলনের ধারাটা কেউ কেউ এখনও ধরে রেখেছে। যেমন বসন্ত দিনের গপ্পো– প্রত্যেকের অভিনয় ও সাবলীলতা প্রশংসনীয়। আবার কয়েকটা নাটকে অপেরার ধারাকে বয়ে এনেছে,সেই তিন পয়সার পালাকে মনে রেখে !

শুরু করেছিলাম কলকাতা থিয়েটার নিয়ে আর তাই নাট্য আন্দোলনের কথা অবধারিতভাবে এসে গেল। কিন্তু কিছু বিদেশের নাট্যমঞ্চের কথা বলতে হয়। মস্কোতে শুনেছি নাটকের খুবজনপ্রিয়তা। অনেকেই মস্কোর মঞ্চ থিয়েটার প্রসঙ্গে খুব প্রশস্তি গেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। আমি দেখেছি নিউ ইয়র্কের মঞ্চ থিয়েটার। সত্যিই খুব উন্নত মানের। টেকনিক্যালি অত উন্নতমানের মঞ্চ যে মূল নাটকের সঙ্গে কি সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যেতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না।ব্রডওয়ের থিয়েটার মঞ্চগুলো খুবই বড়। তার মধ্যে একটা হেলিকপটার নামিয়ে দেওয়া এক বিস্ময়ের বিষয়। আরও মজার কথা হল প্রচণ্ড পেশাদারী এই নাটকের মধ্যে অপেরা হল প্রথম এবং প্রধান কথা। অপেরার নাচ ও গান একবারে নিখুঁত ও ভীষণ জনপ্রিয়। মূল কাহিনী অত নিখুঁত না হতেও পারে । আর সেই সুযোগে অনেক নাটকের মধ্যেই কিন্তু গল্প থাকে পুঁজিবাদ-বিরোধী। হয়ত তত জনপ্রিয় নয়,কিন্তু প্রয়াস তাৎপর্যপূর্ণ !

সম্প্রতি চিনদেশে মঞ্চে থিয়েটার দেখেছি, তার মধ্যে গল্পের চেয়ে শৈল্পিক চেতনা ও অপেরার মেজাজ খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। মঞ্চে অত উজ্জ্বল রঙিন আলোর ব্যবহার ব্রডওয়েতেও কিন্তু দেখিনি ! কথা বুঝতে না পারলেও মঞ্চের একপাশে ইংরিজিতে ডাবিং দিচ্ছিল।

নাট্য আন্দোলন – নাট্য গ্রুপ – নাট্যমঞ্চ!বাকি রয়ে গেল আরও কিছু।যেমন যাদের ছাড়া নাটকে স্ত্রী চরিত্র হত না।

'তয়ফাআলি, খেমটাআলি, ঢপআলি, মেয়ে পাঁচালি
যাত্রা আলি গলি গলি তর বেতর
খেয়ালি, টপ্পাআলি, মনমাতালি ঘর ঘর।'

আগে আগে তো সীতা থেকে রাধা পর্যন্ত সব চরিত্রই পুরুষেরাই অভিনয় করত। ক্রমশ রুচির তারতম্য হতে খোঁজ পড়ল অভিনেত্রীর। তখন তো তথাকথিত ভদ্রঘর থেকে মহিলারা অভিনয় করতে বের হত না। অতএব আশেপাশে গরানহাটা সোনাগাছি থেকে 'সঙস্ট্রেস' অর্থাৎ আঁধার,কিন্নরি আনা হতে থাকল। যাদের জীবন,গাথা হারিয়ে গেছে ঘোর অমানিশায়।ইতিহাসে এনারা উপেক্ষিতই থেকে গেছেন।

সদ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি শাসনভার নিয়ে নিল ব্রিটিশ-রাজ। শহরের অবস্থা তখন সাবেকি নবাব-জমিদারদের বিনোদনের স্থান হয়ে উঠল। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান আর খোস পোশাকি যোশমি দান'এর শহর হয়ে উঠেছে কলকাতা। সে কলকাতার ছাদে ঝাড়বাতির রোশনাই,আর মাঝ চাতালে নুপুরের মূর্ছনা।

রাশিয়ান নাট্যকার জেরাসিম লেবেদফের ভারতে আসা ও নাটকের প্রতি তার আসক্তি নিয়ে দুটো কথা। তিনি বাংলা ভাষা শেখেন গোলকনাথ দাসের কাছে। প্রথম নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। সেই নাটকে মহিলা অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করান। সাধারন রঙ্গালয়ে ১৮৭৩ সালে প্রথম অভিনয় করেন চার অভিনেত্রী। জগত্তারিনী, এলোকেশী, শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপসুন্দরী বা সুকুমারি দত্ত। এইভাবেই ক্রমশ মঞ্চে আসেন বিনোদিনী দাসী, সুশীলাবালা, তিনকড়ি, প্রভা, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা প্রমুখ।এই অভিনেত্রীরা পঙ্কিল সমাজ থেকে এলেও এদের গুণগরিমা বিদ্বৎ,সমাজে বরেণ্য। ললিতকলা মন্দিরে এদের আসন অনেক উঁচুতে।

বিনোদিনী দাসী (দুর্গেশনন্দিনী)

নাটক থিয়েটারের প্রসঙ্গ এলেই গিরিশ ঘোষ ইত্যাদির নাম মনে হয়। এই রকমই আরেকজন গুনী ব্যক্তিত্বের কথাও উল্লেখ করা উচিৎ, তার নাম উপেন্দ্র চন্দ্র দাস। এর নাম খুব বেশি মানুষে জানে না, কিন্তু নাট্যকার ও শিল্পী হিসেবে সেই ব্রিটিশ শাসিত দিনে নির্ভীক মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য। সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় ব্রিটিশদের বিরোধিতায় পথিকৃতের ভুমিকায় বাংলা থিয়েটারের যথেষ্ট অবদান ছিল। এক নাট্য ব্যক্তিত্ব – নাম তাঁর উপেন্দ্রনাথ দাস – এক শিক্ষিত সাহসী প্রতিভাবান নাট্যকার। তাঁর অসুস্থ স্ত্রী বাড়ির রক্ষণশীলতার শিকার হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তখন উপেন দাস বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে যান । তিনি কয়েকজন যুবককে নিয়ে তৈরি করেন ইন্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লীগ – যার কাজ হল সমাজের সংস্কার করা। নাটকের মধ্যে ব্রিটিশ,বিদ্বেষী সংলাপ দিয়ে দর্শকদের উদ্দীপিত করার চেষ্টা করতেন।

উপেন দাস গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার অধিগ্রহণ করে সেখানে শরৎ-সরোজিনী নাটকটি করেন। শরৎ নামে চরিত্রটি এক ইংরেজকে হত্যা করে ও বলে ‘ জগত দেখুক – বাঙ্গালীদের কাপুরুষ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা’। আরও একটি নাটকে অভিনয় করতেন গোলাপসুন্দরী নামে এক বারাঙ্গনা। তার সঙ্গে গোষ্ঠবিহারি দত্ত নামে এক অভিনেতার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদায় বিয়ে দেন উপেন দাস। তখন নাম হয় সুকুমারি দত্ত। এই নিয়ে সমাজে খুব আলোড়ন হয়েছিল। এদের নিয়ে তিনি আরও একটা নাটক লিখেছিলেন। সেখানেও একজন অত্যাচারি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে এক কয়েদি হত্যা করে। ‘তোর রক্তে চান করবো তবে আমার রাগ যাবে ‘– নাটকে ছাড়া তখন আর কোথাও এত স্পষ্ট করে ব্রিটিশ,বিরোধিতা করার কথা শোনা যায়নি!

তার লেখা নাটক ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ প্রিন্স ওয়েলসের এদেশে আসার পর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চাটুকারিতা নিয়ে লেখা! কিন্তু এই নাটকটি প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার একটি নাটক ‘দ্য পুলিশ অব পিগ এন্ড শীপ’ অভিনীত হয়।

১৮৭৬ সালের ৪ঠা মার্চ – পুলিশ মঞ্চ থেকে গ্রেপ্তার করলো – উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখারজি সহ আটজনকে – অশ্লীল নাটক করার জন্যে। তার মধ্যে উপেন দাস অমৃতলালের এক মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড হল। এর বিরুদ্ধে আপিল হল। উপেনবাবুদের হয়ে সওয়াল করলেন গণেশচন্দ্র চন্দ্র। রায় বের হতে দেখা গেল সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকটি অশ্লীল নয়।

অতঃপর এদের নাটক বন্ধ করার জন্যে ড্রামা প্রোটেকশন কন্ট্রোল বিল জারি হল। বাংলা নাটকের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে শিল্পীদের এই অবদান যে কোনও কারনেই হোক ইতিহাসে বিশেষ স্থান পায় নি। অবশ্য টিনের তলোয়ার নাটকে কিছুটা দেখানো গেছিল। যাই হোক উপেন্দ্রনাথ দাস বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৭ বছর।

উপেন দাস এর আখ্যান এখানে শেষ হবার নয়। শুধু তার উত্তরপুরুষের কজনের নাম বলতেই হয়। তার পৌত্রী ও পৌত্র হলেন বিখ্যাত গায়িকা গীতা দাস,আরতি দাস,সুরকার অজয় দাস ও অভিনেতা সুখেন দাস।

বোঝার বোঝা !

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

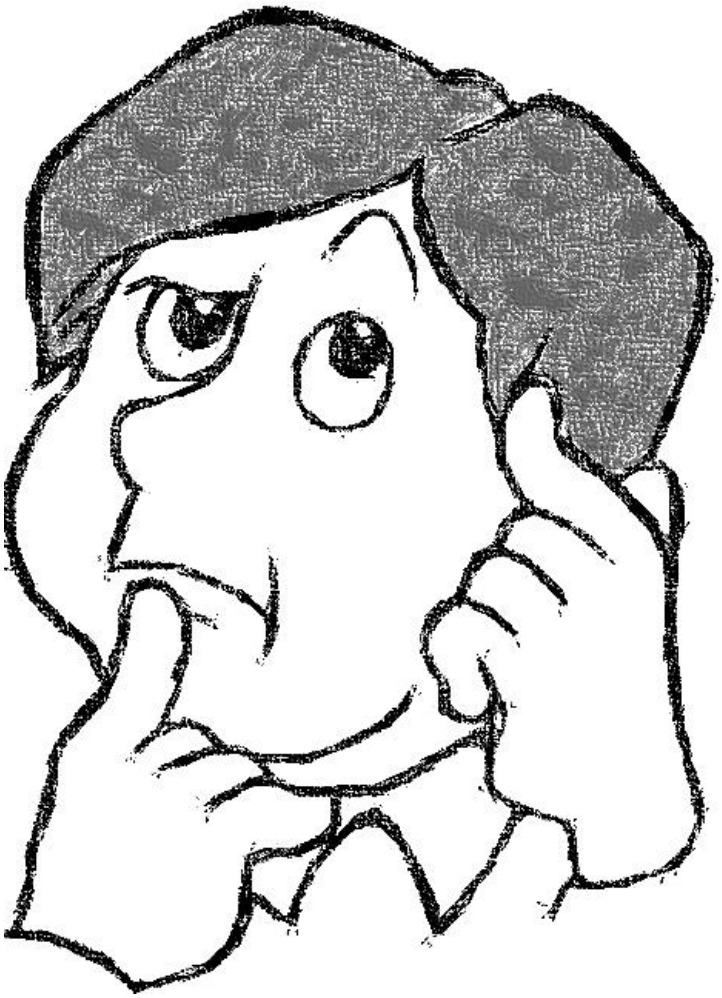

সবজান্তা হওয়ার জ্বালা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন রাজা বিক্রমাদিত্য। উত্তর জানা থাকলে মুখ খুলতেই হবে নাহলে মাথা ফেটে চৌচির, ওদিকে মুখ খুললেই বেতাল পালাবে গাছে। ভাবুন, এই অনন্ত 'লুপ' থেকে কত সহজেই বেরিয়ে পড়া যেত যদি একটা উত্তর জানা না থাকত ! কিন্তু সবজান্তাদের এটাই সমস্যা, কিছুতেই মুখটি বুজে থাকার উপায় নেই। আবার ঠিক কথাটা বললেও লোকে বলবে 'জ্ঞান দিচ্ছে' আর সে কথাটা নেহাৎ মিছেও নয়। কারণ শুধু ভুলভাল ব্যাপার দেখে চুপ করে থাকাই তো নয়, একটি সবজান্তা লোক যখন কিছু বলে বা লেখে তাকে সবসময় একটা ভাবনা তাড়া করে ফেরে যে লোকে ঠিকঠাক বুঝল কিনা, তাই সে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে আর সেই বুঝিয়ে বলার ঠ্যালায় অনেকের প্রাণ আইঢাই করে।

তবে এই বুঝিয়ে বলার রোগ যে সুধু সবজান্তাদেরই আছে এমন বললে নেহাৎই অবিচার হবে। যারা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত বা আত্মবিশ্বাস কিছু কম, এই রোগ তাদের মধ্যেও বিলক্ষণ আছে। এই যেমন সেদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতায় দেখলাম 'মাসাজ পার্লারে'র বিজ্ঞাপন। 'সুন্দরী মহিলা দ্বারা ফুল বডি ম্যাসাজ ও বোল্ড রিলেশনের মাধ্যমে দেহে মনে পূর্ণ সতেজতা লাভ করুন'। এমনিতে এখন এইসব 'ম্যাসাজ পার্লার' জাতীয় ইঙ্গিত যাদের বোঝা দরকার তারা এমনিই বোঝে, কিন্তু পাঠক যে বুঝতে পারছে সেই কথাটা যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে সে বুঝতে পারছে না, তাই অনাবশ্যক(!)ব্যাখ্যা। না হলে ম্যাসাজ করতে কেনই বা সুন্দরী মহিলা, কেনই বা বোল্ড রিলেশন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের কথা ছাড়ুন কিন্তু বাস্তবে এই বেশি বোঝা আর বেশি বোঝানো লোকেদের নিজেদের সমস্যা যত বেশি, তাদের নিয়ে অন্যদের সমস্যাও তত। যেমন এই লোকেরা কোন জোক্‌স বললে আপনি যদি না হাসেন, ধরে নেবে আপনি বোঝেন নি এবং আপনাকে জোক্‌সটা বোঝাতে বসবে; এমনকি আপনি যদি হাসেনও তাহলেও

আপনার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে যে আপনি ঠিক বুঝে হাসছেন কিনা এবং শেষমেশ হয় নিজে থেকে ব্যাখ্যা করে দেবে না হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করেই ফেলবে কি বুঝলেন বলুন তো ! মানে সমস্যাটা দ্বিমুখী; আপনি যে কোনভাবেই এড়িয়ে যাবেন তার জো নেই, আপনাকে বুঝতে হবেই। আলাদা আলাদা বিষয়ে এইরকম সবজান্তাদের সঙ্গে দিনে হাজারবার আপনার আমার দেখা হয়, বিশেষভাবে নজরে পড়ে না। কিন্তু কিছু কিছু লোক সবব্যাপারেই এইরকম, তারাই ঝামেলায় ফেলে।

তবে ব্যাপারটা ওই বেশি বোঝনদারদের দিক থেকেও ভাবার আছে। তারা কিন্তু আপনার ভালোই করতে চায় এমনকি ঠিক যে নিজের মত চাপিয়ে দিচ্ছে এমনও নয়। এরা কেবল চাইছে নিজের বোঝাটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বা বলা ভালো বোঝার অভ্যেসটা গড়ে তুলতে। জগতে যে এত কিছু বোঝার ছিল বা আছে তা হয়ত আপনি জানতেই পারতেন না এইরকম কারুর সঙ্গে আলাপ না হলে। এদের সঙ্গে কোথাও খেতে গেলে প্রতিটি মেনু আপনাকে খেতে হবে বুঝে, দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে গেলে আপনাকে থিমটাও বুঝতেই হবে। একটা দুর্দান্ত বালুচরী শাড়ি পরেছেন, খুব প্রসংশা পেলেন কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকে বুঝতে হল এই শাড়ির অঙ্গ জুড়ে কোন পৌরাণিক কাহিনী কিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এইরকম লোকের বাড়ি গিয়ে যদি আপনি যদি তাঁর গৃহসজ্জার সুখ্যাতি করেন, তাহলেও আপনাকে বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথের পাশে কেন গৌতম বুদ্ধকে রাখা হয়েছে। আর এঁরা আপনার বাড়িতে এলেও আপনাকে বোঝাতে হবে কেন দেওয়ালের রঙ নীল না হয়ে সবুজ হয়েছে। ব্যাপারটা জ্ঞানবর্ধক সন্দেহ নেই কিন্তু যারা এত বোঝাবুঝির মধ্যে থাকতে চায় না তাদের কাছে বড্ড চাপের। তবে বেশি বোঝানোর রোগ যাদের আছে তাদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হল গল্প-কবিতা জাতীয় কিছু লেখা। কারণ এই বুঝিয়ে বলার রোগ সব চরিত্রের মজ্জায় ঢুকে থাকে তাই চরিত্রেরা যা দেখে শোনে ভাবে, সবই অতীব দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। কিন্তু লেখক নিজের চরিত্রদেরও সেভাবে বিশ্বাস করে না তাই আড়াল থেকে বেশীর ভাগ কথা সে নিজেই 'বর্ণনা' করে যায়। এখন এই বর্ণনা যদি চেহারার বা সাজ পোষাকের বা প্রকৃতির দৃশ্যের মত সহজ সরল বিষয় হয় তো একরকম; কিন্তু ধরুন কিছু একটা শ্যুটিং হচ্ছে, কি কোন কারখানার ভেতরে কিছু তৈরী হচ্ছে, সেইরকম জটীল দৃশ্যের বর্ণনা হল তো হয়ে গেল ! অন্ততঃ একপাতা ধরে আপনাকে পড়ে যেতে হবে ক'টা ক্যামেরা, কোন্‌টা কোথায়, কোথা থেকে নামছে, কত ডিগ্রী কোণে কিভাবে ছবি তুলছে, কোন মেশিনটা কিরকম দেখতে, কিরকম আওয়াজ, কত ইঞ্চি কত সেন্টিমিটার ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিতে আপত্তির কিছু নেই, তবে অনেক সময়ই এই এত বোঝানোটা গল্পে আদৌ বিশেষ লাগে না বরং গল্প-উপন্যাসকে কেমন একটা 'রচনা'র মত শোনায় এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে লোকে পাতা উল্টেও যায়। আর তা ছাড়া কখনও কখনও ব্যাপারটা বেশ অন্ধের হস্তীদর্শনের মতনও হয়ে দাঁড়ায়, মানে অনেক কথা খরচ করে সবটাই ভস্মে ঘি ! কি অপচয়...!

আরও করুণ অবস্থা হয় কবিতার ক্ষেত্রে, গদ্যে যদিবা উপায় আছে কবিতায় তো বুঝিয়ে বলার কোন জায়গাই নেই, এমনকি বিশেষ দরকারই নেই কারণ কবিতা যে পড়ছে সে যেভাবে বুঝছে সেটাই কবিতার মানে। সে কথা যে সবজান্তা বোঝনদার মানুষেরা জানেন না এমন নয়। আপনি কোনো কবিতার মানে বুঝতে গেলে এঁরাই হয়ত আপনাকে বলবেন যে কবিতার মানেবই হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মুস্কিল হল নিজের প্রকৃতিই এমন যে বুঝিয়ে বলার প্রবণতাটা ছাড়তে পারেন না। তাই কবিতায় একটা রূপকের ব্যবহার করলে কি একটা ব্যাক্তিগত রেফারেন্স দিলেই মনটা ছোঁক ছোঁক করে সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য। যেমন হয়তো বাইশে জুলাই কবির নিজের জন্মদিন, কোন কবিতায় জন্মদিনের রূপক হিসেবে বাইশে জুলাই কথাটা লিখে হয়তো নিজের

বেশ পছন্দ হল কিন্তু মনে প্রবল অস্বস্তি হতে লাগল যে লোকে পড়ে কি বুঝল ! এই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে শেষ অবধি রেফারেন্স-ফুটনোট-ব্রাকেট-কন্টকিত কবিতা কিম্বা কবিতার সঙ্গে মানেবই পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া উচিৎ কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। এর একটা কারণ হতে পারে যে এই ব্যক্তিরা হয়ত কবিতা লেখার সময় এই বুঝিয়ে বলার চাপটা শেষ পর্যন্ত জয় করে ফেলেন আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে যথেষ্ট বুঝিয়ে বলতে না পেরে হতাশ হয়ে কবিতা লেখা (বা প্রকাশ করা) ছেড়ে দেন। দ্বিতীয়টা সত্যি হলে আবারও বলতে হয় কি অপচয়!

পড়ানোর সময়ে বুঝিয়ে বলা চিরদিনই ভাল কাজ বলে ধরা হয় কিন্তু সেখানেও বেশি বোঝানোর জ্বালা কম নয়। মানে ধরুন সুকুমার রায়ের ছড়া পড়ছেন 'আর তো সবাই মামাগাগা আবোল তাবোল বকে, খুড়োর মুখে গুংগা শুনে চমকে গেলে লোকে'... কিম্বা সহজ পাঠ থেকে 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি...' আর আপনার কানের কাছে কেউ ব্যাখ্যা করেই চলেছে আবোলতাবোল বকা কিরকম গুংগা মানে কেন অন্যরকম, ছায়ার ঘোমটা কি করে টানা হয়...নিশ্চই অসহ্য লাগবে। কারণ এই অপরাধে কিছুদিন আগে একটি সাতবছরের শিশু আমার কাছে বাঙলা পড়তে অস্বীকার করেছে। তার মতে আমি কবিতার বাইরের কথা এত বেশি বলি যে ওর নাকি 'বুঝতে' অসুবিধে হয়!
এই বার বোঝা গেল তো বুঝিয়ে বলা লোকের সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়!* আপনারও চেনা চেনা লাগছে নাকি !

*(কোথায় দেখা হয় বুঝেছেন ? বলুন তো কোথায়...আয়নায়!)

সেই ব্যাগটা

জল

দোকানটা প্রায় সবটাই খুঁজে ফেলেছি। কিন্তু না, নেই। যেটা আমি খুঁজছি সেটা এখানেও নেই। কে যেন বলেছিল আর কোথাও না পাওয়া গেলেও এখানে পাওয়া যাবেই যাবে। তাই তো এসেছিলাম এই দোকানটায়। কিন্তু আমি হতাশ এখানেও পেলাম না। একটু একটু মনখারাপও।

কি ম্যাডাম পেলেন না আপনার পছন্দের ব্যাগটা?

দুদিকে নেতিবাচক মাথা নেড়ে জানাই, না পেলাম না।

দোকানদার ভদ্রলোক বেশ ভালো, না হলে আমার মত একজন অদ্ভুত ক্রেতার অত্যাচার সহ্য করছেন। দোকানে তো ভিড় কম না, বিক্রিও বেশ ভালো। তবু যে এতক্ষণ ধরে আমায় ওরা সময় দিলেন, সুযোগ দিলেন আজকালকার দিনে কম কি?

কি আর করা যাবে ম্যাডাম। একখানা ফটো পেলে না হয় বানিয়েও দিতে পারতাম। দোকানদার ভদ্রলোক হেসে বলেন।

এই প্রথম আমি সরাসরি ভদ্রলোকের দিকে তাকাই। আসলে এতক্ষণ কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঈপ্সিত জিনিস পাব জানলে একটা যেমন ঘোরের সৃষ্টি হয়, তেমন একটা ঘোর। তাকিয়েছি হয়ত অনেকবার তবু মন দিয়ে দেখিনি। তাই হয়ত এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। ভদ্রলোকের চোখে যেন একপ্রকার কৌতুক। চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী বাঘকে দেখে যেমন একটা কৌতুক জাগে অনেকটা সেরম। আমায় কি মানসিক ভারসাম্যহীন ভাবছে নাকি? ভাবতেও পারে। আর ভাবলে কি বা এসে যায়।

ফটো সে কোথায় পাব? তখন তো আমি নিজেই অনেক ছোট। আর সেসময় তো ফটো তোলার ক্রেজটাই এত ছিল না।আর তখন তো মোবাইলও ছিল না যে ফটো তুলে রাখবে। আর ছিল না ফেসবুক বা ট্যুইটার যে ফটো আপলোড করে রাখলেই খুঁজে ঠিক পাওয়া যাবে।

এতগুলো কথা কি আমি রেগে বললাম? আমার কথার সুরে আমি টের পেয়েছি একটা ব্যঙ্গের আভাস ছিল। তাই হয়ত দোকানদার ভদ্রলোক নিজেকে সামলে নিলেন। আর হেঁকে বললেন পল্টু মালগুলো তুলেছিস? ছড়ানো না থাকে যেন।

এটাও আমাকেই যেন পরোক্ষে বলা। আমাকেই তো দেখাচ্ছিল পল্টু নামের ছেলেটা। ব্যাগের পর ব্যাগ নামিয়ে পুরো ছোটখাটো একটা স্তুপ বানিয়ে ফেলেছিল। মায়া হচ্ছে ছেলেটার জন্য। কটা টাকাই বা মাইনে দেয়, কিন্তু গাধার খাটুনি খাটিয়ে নেয়। আমার বোঝা উচিত ছিল ঐ ব্যাগটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আচ্ছা ম্যাডাম তবে আপনি এবার..... দোকানী কথা শেষ করে না।

বেশ অপমানিত বোধ হচ্ছে। না না দোকানীর কথাতে নয়, নিজের নির্বুদ্ধিতায়। আমারই তো বেড়িয়ে আসার কথা অনেক আগেই। জিনিস যখন পেলামই না, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

শুধু শুধু আপনাদের খাটালাম। কিছু মনে করবেন না, বলে ঝট করে বেড়িয়ে এলাম দোকানটা থেকে।

কানে এলো পিছন থেকে দোকানীর বিরক্ত গলা যত্তসব পাগল ছাগল আমার দোকানেই এসে জোটে। দিনটা পুরো ঘেঁটে দিয়ে গেল।

পাগল ছাগল ! হয়ত তাই। এমন কথা নতুন তো শুনলাম না। তবে সত্যি দিনটা ওদের ঘেঁটে দিলাম। এটার জন্য একটা আফশোষ হচ্ছে। দুটো পয়সা কারও ইনকাম আমার দ্বারা হবে ভালো লাগে। সেটা হল না। বিরক্তি তো স্বাভাবিক। গায়ে মাখি না দোকানদারের বিরক্ত হয়ে বলা কথাগুলো। হয়ত আমি ওঁনার জায়গায় থাকলেও ঠিক এইভাবেই রি-অ্যাক্ট করতাম। ।হাঁটতে থকি । এরা কেউ বুঝবে না, একটা ব্যাগ কেন আমি খুঁজছি? আসলে ঐ ব্যাগটা একটা শুধুমাত্র ব্যাগ নয়, আমার গ্লানি, আমার কষ্টের, আমার অপমানের প্রতীক। বললে হয়ত ঐ দোকানদার বিশ্বাসই করত না যে এখন আমার কত ব্যাগ আমি নিজেই তার সঠিক সংখ্যা জানি না। প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে ম্যাচ করে এক একটা ব্যাগ। আর প্রত্যেকটা ব্যাগই বেশ দামী। তবু কেন যে আমার মন ওঠে না। থেকে থেকে আমি শুধু সেই ব্যাগটার কথা ভাবি। আমার চেতনে, অবচেতনে ঐ

ব্যাগটা এমনভাবে রয়েছে যে মনে হয় ওটা না পেলে আমি যেন ঠিক শান্তি পাচ্ছি না। আমি কি মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছি?

তখন আমার কতই বা বয়স হবে, ঐ সাত কি আট, একদিন তুতুলদি আমাদের বাড়িতে এসেছিল কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিয়ে। কচিকলাপাতা রঙের ভারি সুন্দর দেখতে ব্যাগটা রেখেছিল ছোট টেবলটার ওপরে। আমি ঘুরে ফিরে দেখছিলাম ব্যাগটাকে। তুতুলদি বলল ব্যাগটা সুন্দর না?
--খুব সুন্দর। আমি তখন ব্যাগের সৌন্দর্যে মোহিত। আমি কিন্তু হাড় হাভাতে ছিলাম না। লোভীও নয়। তবু ঐ ব্যাগটা কি করে যেন আমায় মোহিত করেছিল।
--দেখ সোনা কতগুলো চেন আর কতগুলো পকেট এর। বলে তুতুলদি খুলে খুলে একটা একটা করে চেন দেখাচ্ছিল। তারপর বলল দেখ কি নরম।
--আমি হাত বাড়িয়ে দেখতে যেতেই তুতুলদি ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল ব্যাগটাকে। যেন আমি হাত লাগালে ব্যাগটা নষ্ট হয়ে যাবে।
--হাত দিচ্ছিস যে বড়, আমি কি তোকে হাত দিতে বলেছি?
--বারে তুতুলদি, এইমাত্র তো তুই বললি দেখ কি নরম, তাই তো আমি হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম।
--ওটা কথার কথা।
--একটু দেখতে দে না ?
--মামুকে বল না, তোকে একটা এইরকম ব্যাগ কিনে দিতে, তারপর যত ইচ্ছে দেখিস। শেষের শব্দগুলোতে শ্লেষ ছিল। এখন বুঝি কিন্তু তখন বুঝিনি। কিন্তু শব্দগুলো খারাপ লেগেছিল। তুতুলদি জানত খুব ভালো করেই তার মামু, মানে আর কি আমার বাবা আমাকে ব্যাগটা কিনে দেবে না। ব্যাগটা বেশ দামী ছিল তখনকার হিসাবে।

সেই প্রথম আমি বাবার কাছে পাবো বা জেনেও অহেতুক বায়না ধরেছিলাম ঐরকম একটা ব্যাগ আমায় কিনে দিতেই হবে। কিন্তু বাবা দেয় নি। বাবা বুঝিয়েছিল, পরের দেখে লোভ করতে নেই। কিন্তু আমি শুনিনি। আসলে ব্যাগটার প্রতি আমি এতটাই অবসেসড ছিলাম যে একদিন তুতুলদি যখন বাড়ি ছিল না ব্যাগটা চুরি করেছিলাম তুতুলদির বাড়ি থেকে। চুরি করা যে খুব গর্হিত অপরাধ সেটা আমি জানতাম আর জেনেই করেছিলাম। ধরা যে পড়ে যাব এই বোধটা ভেতরে ভেতরে ছিল তবু নিজেকে বিরত করতে পারিনি।

তুতুলদি এসেছিল পিসাইকে নিয়ে। আর পিসাই আর তুতুলদি মিলে এত কথা এত কথা মাকে আর বাবাকে শুনিয়েছিল যে, বাবা আমায় প্রায় মারতে মারতে আধমরা করে দিয়েছিল। লুকিয়ে রেখেছিলাম ব্যাগটাকে ঠাম্মার ঘরে। বাবা তুলে দিয়েছিল তুতুলদির হাতে ব্যাগটাকে। আর তারপর থেকে আমি আর কোনদিন তুতুলদির বাড়ি যায়নি, কথাও বলিনি তুতুলদির সাথে। কিন্তু ব্যাগটাকে ভুলতে পারিনি। একটা জেদ চেপেছিল একদিন ঠিক ঐ রকম দেখতে একটা ব্যাগ আমি কিনবই। হয়ত সেই কারণেই ঐ ব্যাগটা আমি খুঁজছি। খুঁজেই চলেছি।

আমার চেতনে, অবচেতনে সবসময় ঐ ব্যাগটা রয়ে গেছে। পুরোনো দোকানেও খুঁজেছি, যদি ঐরকম ব্যাগ পাওয়া যায়, কিন্তু না পাওয়া যায়নি। সময়ের সাথে সাথে তো রুচি পাল্টায় আর তার সাথেই সামঞ্জস্য রেখে আর চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই বাজারে প্রোডাক্ট আসে। এসব যে আমি জানি না তা নয়, তবু খুঁজছি আমি।

আচ্ছা আমি কি ব্যাগটাকে খুঁজছি নাকি সেদিনের সেই জ্বালাটাকে মেটানোর চেষ্টা করছি, হয়ত সেই কষ্টটাকে মুছে দেবার চেষ্টা করছি নাকি সেই যে চুরিটা করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করছি? ঠিক কোনটা। দিশাহীন লাগে নিজেকে নিজের কাছে। এই যেমন এখন লাগছে।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি আচ্ছা ঐরকম যদি একটা ব্যাগ আমি পাই, তাহলে ঠিক কি করব? কিনব কিম্বা হয়ত কিনবই না, হয়ত আজ আর দেখে সেদিনের মত ভালোলাগা তৈরিই হবে না, তবু খুঁজে চলেছি আমি ব্যাগটাকে। আমি জানি কোনদিন খুঁজে পাব না, হয়ত পেতেও চাই না। আসলে আমি বুঝি আমার শৈশবকে খুঁজে চলেছি। মুছে দিতে চাইছি সেদিনের সেই অপমানকে ? কিম্বা সেদিনের সেই অপ্রাপ্তিকে আজ আমি মুছে দিতে চাইছি ঐ ব্যাগটা খোঁজার মাধ্যমে। আচ্ছা আমি আসলে ঠিক কি চাইছি?

হেঁটে চলি সামনের দিকে। চোখে কোন ব্যাগের দোকান পড়লে আমার চোখ চিরুণি তল্লাশী চালায় রোজকার মত সেই ব্যাগটার খোঁজে। এ যেন আমার নিরন্তর খোঁজা ।

অস্তোদয়

উমালক্ষ্মী

১

ঠাকুরকে সন্ধ্যাবাতি দেখিয়ে প্রণামের জন্য নত হতেই ঘাড়ের পেছনদিকটা চিড়িক দিয়ে উঠল, মাটিতে মাথা ঠেকানো থেকে বিরত হলেন তিনি। বাড়িতে একজন রুগী, তিনিও যদি অসুখ বিসুখ বাঁধিয়ে বসেন তবে কে কাকে দেখবে! অগত্যা দুই হাত জড় করে ঘাড়টা অল্প নোয়ালেন, ঠাকুর সকলকে সবখানে ভালো রেখো। পৃথিবীময় মানুষকে সুবুদ্ধি দিও। চন্দন ধূপের মিষ্টি গন্ধ ঠাকুরঘর ছাপিয়ে বাকি ঘরগুলোকে পবিত্র গন্ধে পরিপূর্ণ করে তুলছে। মন ভালো হয়ে যায় দিনশেষ আর রাতের সন্ধিক্ষণের এইরকম মুহূর্তে। সারাদিন ধরে মনের আকাশে দুর্ভাবনার ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ ভেসে বেড়ায়, জোর করে তাদের গতি করে রুদ্ধ করে দিনান্তের এই একান্ত সময়টুকু বাবা মহাদেব এর চরণে মনপ্রাণ সঁপে দেন তিনি। ঠাকুরের কাছে তাঁর নিজের করে চাওয়ার

কিছু নেই। তাঁর দিন প্রায় সমাগত। কর্তব্যের নাগপাশ বন্ধন থেকে মুক্তি মেলেনি এখনো কিন্তু মহাসিন্ধুর ওপার থেকে প্রহর শেষের মৃদুমন্দ ঘন্টাধ্বনি তুমুল ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর কর্ণগোচর হয়। ছেষট্টি ছুঁইছুঁই বয়সের সুখে দু:খে ভরা জীবনের ঝুলি উপুড় করে নেড়েচেড়ে দেখেন মাঝে মাঝে। তাঁর ঝুলিতে দু:খের থেকে সুখের ওজন অনেক ভারী। তবুও সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনিদের প্রজন্মের জন্য সকাল সন্ধ্যে একমনে ঠাকুরের কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে যান। মানুষগুলি কেমন ক্ষেপে উঠেছে চতুর্দিকে। পিঁপড়ের মত অবিরত পিষে মারছে একে অপরকে, বন্দুক দিয়ে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠছে রোজ রোজ। হে মঙ্গলময় শিবশম্ভু, পৃথিবীব্যাপী এই নিষ্ঠুরতার অবসান হোক এবার।

-বৌমণি, এ'বেলা কি রুটি করব? মনার মা চৌকাঠে এসে দাঁড়ায়। বয়সের ভার এখনো তাকে জর্জরিত করতে পারেনি। সারাজীবন খেটে খেয়ে এইবয়সে প্রতিমার আশ্রয়ে বরং আরামেই আছে সে। ছেলেমেয়েরা সাবলম্বী, যে যার মত করে খায়, স্বামীকে বছর পাঁচেক আগে হারিয়ে এখন এইটেই ওর বাড়ি হয়ে উঠেছে।
-রুটি তোমার জন্য ক'টা বেলে নাও। দাদাবাবুর জন্য পাতলা করে খিচুড়ি করব। গাজর, আলু কেটে রেখো। কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে রেখ। আমিও তাইই খেয়ে নেব। নীরবে চলে যায় মনার মা। প্রতিমা জানেন নিজের জন্য কিছুতেই সে আলাদা করে রুটি করবে না। বকা দিলে বলবে, আজ আর রুটি খেতে ইচ্ছে হল নাগো বৌমণি। দুইগাল খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে থাকবক্ষণ। স্মিত হাসিতে ভরে ওঠে প্রতিমার মুখ।

প্রদীপের স্ট্রোকের খবর পেয়ে পনেরদিন আগে পুরোপুরি ফিরে এসেছেন এই বাড়িতে। সেই কত বছর আগে, গ্রীষ্মের এক স্নিগ্ধ সকালে, রিনো আমেরিকাতে পাড়ি দেওয়ার তিনদিন পরে, প্রদীপের যাবতীয় হম্বিতম্বিকে অগ্রাহ্য করে বাড়ি ছেড়েছিলেন। শারীরিক দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন বাড়ির সাথে, বাড়ির মানুষটার সাথেও। কিন্তু মানসিক কর্তব্য থেকে মুক্ত করতে পারেননি নিজেকে। হয়ত নিজেই মুক্তি চাননি। নইলে কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি সপ্তাহে সপ্তাহে এসে খোঁজ নিয়ে যেতে, মনার মাকে সংসার চালাবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে! এতগুলো বছরে নিয়মিত এসেছেন ঠিকই, তবুও প্রদীপের সাধাসাধিতে একবেলা, একরাত্তিরও কাটাননি এই বাড়ির ছাদের তলায়। যতই কষ্ট হোক, ঠিক ফিরে গেছেন নিজের একচালায়। আজ যখন প্রদীপ অসুস্থ তখনো এক লহমায় স্বইচ্ছায় ফিরে এসেছেন নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে। রিনো বলেছিল, দরকার নেই মা, আমি চব্বিশ ঘন্টার নার্স রেখে দিচ্ছি, তোমার মত তুমি থাক, মাঝে মাঝে যেমন আস তেমনই এসে দেখে যাবে। মন মানেনি, স্বামীকে যতই অপছন্দ করুন, তবুও জীবনভর সম্পর্কের দায়ভার অস্বীকার করে উঠতে পারলেন আর কই! ক্ষয়ে যাওয়া শাঁখা পলায় পরম মমতায় হাত বোলালেন প্রতিমা। তাছাড়াও যে প্রদীপকে তিনি অশ্রদ্ধা-অভক্তি করতেন, যার সংস্পর্শে বিবমিষা জাগত, সেই মানুষটি অনেকদিন আগেই অস্তমিত। যে মানুষটা তাঁর সামনে, তাকে দেখলে মায়া আসে, রাগ করা যায়না।

শোবার ঘরে ঢুকে সন্ধ্যাবাতিটা জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন প্রতিমা, প্রদীপ অন্যদিকে কাত হয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে। শ্বাসের তালে তালে বুকটা ওঠানামা করছে তো! আচমকা চাপা ভয় বুদবুদি তোলে। দ্রুত পায়ে প্রদীপের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান তিনি। হ্যাঁ এইতো, বিছানার সাথে মিশে যাওয়া শরীরটা শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বাতিটা জ্বালাতে উঠছিলেন আবার, আঁচলে টান পড়তে পেছন ফিরে চাইলেন। প্রদীপ ইশারাতে কিছু বলতে চাইছেন। মুখটা লাল, কপালের শিরা-উপশিরা পাতলা ক্ষয়িষ্ণু চামড়া ঠেলে উঠে এসেছে। শুকনো

ঠোঁটের কষ বেয়ে লোল গড়িয়ে পড়ছে। ফিরে এসে যত্ন করে খাটের ডাঁশায় ঝোলা গামছা দিয়ে স্বামীর মুখ মুছিয়ে দিলেন।
–কিগো, জল খাবে?
–না, বস। থেমে থেমে উচ্চারণ করেন প্রদীপ। চোখের ভীত ভাব দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলেন প্রতিমা। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন চুপচাপ খানিকক্ষণ।
–আমি এখানেই থাকব যতদিন না তুমি সুস্থ হও। তুমি ভেব না। একটু হেসে প্রদীপের বাহুতে হাত রাখলেন প্রতিমা। প্রদীপকে যেন একটু আশ্বস্ত দেখাল। চোখ বন্ধ করলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য আবার তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে।

–যাই, খিচুড়িটা চড়িয়ে দিয়ে আসি? এবার ধীরে ধীরে আঁচলটা ছেড়ে চোখ বুজলেন প্রদীপ। মুখের চেহারা শান্ত। মনার মাকে ডেকে টিভিটা চালিয়ে নিতে বললেন প্রতিমা। রোজ এইসময় প্রদীপের ঘরে বসে সে বাংলা সিরিয়ালের গল্পগুলো গেলে। কখনো কখনো প্রদীপ জেগে থাকলে দুপুরেও দেখে। একবার ভেবেছিলেন টিভিটা বাইরের ঘরে বের করে দেবেন। পরে ভেবে দেখলেন, যতই অবাস্তব গল্প দেখাক প্রদীপও মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেন। কখনো চোখবুজে চরিত্রদের কথোপকথন শোনেন। দুই সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত বিছানায় শোয়া, বাড়ির বাইরে যাওয়া আসা নেই, কল্পকাহিনীর চরিত্রদের কল্পকথা আর তার সাথে মনার মার ক্রমাগত মন্তব্য প্রদীপকে খানিকক্ষণ ভালই সঙ্গ দেয়।

অথচ যখন মনার মা কাজে লেগেছিল প্রদীপ ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। কিছু পাওয়া না গেলেই দৃঢ় আস্থার সাথে বলতেন, এ মনার মায়েরই কাজ। পরে যখন পাওয়া যেত জিনিসটা, তখনো লজ্জা পেতেন না প্রদীপ। মানুষকে এত সহজে অবিশ্বাস করতে দেখে, অবিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হলেও অপ্রস্তুতুতে পড়তে না দেখে মনে মনে কুঁকড়ে যেতেন প্রতিমা। তিনি দূরে সরে যেতে প্রদীপ হয়ত মনার মার মূল্য বুঝতে পেরেছেন। প্রদীপ না খেতে চাইলে, ঝামেলা করলে, মাঝে মাঝে এখন তাঁকে মুখ ঝামটাও দেয় সে। কটকটিয়ে কথা শুনিয়ে দেয়, দেখ দাদাবাবু, জ্বালাতন না করে বৌমণির কথা শুনে চল। বৌমণি ফিরে না এলে তুমি বাঁচতেনাগো। চলতে ফিরতে দুজনের সম্পর্কের বদলানো সমীকরণে আমোদ পান তিনি। আগে এমন কথা ভাবতেও পারতেন! সত্যি জীবন এত অদ্ভুত! বাঁকে বাঁকে তার এত রহস্য! আজ সামনে তাকিয়ে যা অবাস্তব লাগে, আগামীকাল তা বাস্তব হয়ে যায়। তিনি নিজেও কি ভেবেছিলেন আর কোনোদিন ফিরে আসবেন এই বাড়িতে? স্বেচ্ছায় যখন ফিরে এলেন, ভেবেছিলেন কত যে কষ্ট হবে! এ বাড়ির প্রতিটি দেওয়ালে তাঁর প্রথম জীবনের অপ্রাপ্তির ছবি। কখনো সখনো মনে পড়ে যায় কিন্তু আজ আর তা জ্বালা ধরায় না। এমনকি সময়ে সময়ে মনেও পড়েনা এই বাড়িঘর থেকে কখনো দূরে সরে ছিলেন। ঘোরতর সংসারী জীবন ছেড়ে অনেকগুলো বছর একাকী কাটিয়েছেন আবার এখন পুরোদমে সংসারী, সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে তাঁর মনকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। টগবগ করে ফুটন্ত জলের আওয়াজ উঠতে প্রতিমা গোবিন্দভোগ চাল ছেড়ে দিলেন। গুনগুনিয়ে গান করছেন, হাতও চলছে সাথে সাথে। গলায় আর আজকাল আগের মত সুর খেলেনা, কয়েক লাইন গাইতে গেলে হাঁপ ধরে। তবুও নিয়ম করে তাঁর কাছে গান আসে। তাঁকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। গানই হয়ত তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেম যার প্রতি বোধপ্রাপ্ত বয়স থেকে আজ অবধি তিনি একনিষ্ঠ।

হাতাটা নামিয়ে রেখে বাসনের তাকে মাথা ঠেকিয়ে গলা খোলেন প্রতিমা–
" জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে।।
চলার পথে দিনে রাতে দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে।।
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দু:খসুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে..."
দালান পেরোনো চির পরিচিত রান্নার সুগন্ধ নাকে টেনে প্রতিমার সুর বুকে পুরে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরলেন প্রদীপ।

২

মস্তো বড় সুটকেস খুলে, জামা কাপড়ের জঙ্গলের মাঝে গভীর চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় কার্পেটে থেবড়ে বসে আছে লরেন। তার পাশে উপুড় হয়ে বাড়ুম যে একমনে চিরুনি চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে তা নজরও করছে না। অন্য সময় হলে বাড়ুমের এতক্ষণ ধরে এই সুখলাভ কিছুতেই সম্ভব হত না। লরেন বড়ই পরিপাটি মা। আটমাসের বাড়ুমের যাবতীয় পরিচর্যা নিজের হাতে নিখুঁতভাবে করে। মাতৃত্ব একজন তুখর কেরিয়ারিস্ট মহিলাকে তার চোখের সামনে কেমন পাল্টে দিল, ভেবে মাঝে মাঝে অবাক লাগে শুদ্ধর। হাসপাতাল থেকে নবজাতককে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে লরেন জানতে চেয়েছিল,
–শুদ্ধ, আমি যদি বছরখানেক বাড়িতে থাকি নয়নকে নিয়ে তবে কি তুমি অর্থনৈতিক দিকটা সামলে নেবে?
–নেব। যতদিন ইচ্ছে বাড়িতে থাক, সোনা। আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।
–ঠিক বলছ?
–একদম ঠিক। মনে মনে হেসেছিল শুদ্ধ। সে যে পরিবেশ থেকে এসেছে সেখানে বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে তাকে পরিচর্যা করতে ইচ্ছুক মাকে অনুমতি চাইতে হয়না বাড়িতে থাকার জন্য। অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু লরেনের বেড়ে ওঠা সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে। সেই পরিবেশে বাবা এবং মায়ের দায়িত্ব ভিন্ন নয় বরং এক। দুজনে একই সাথে পয়সা উপার্জন এবং সন্তান প্রতিপালন করে। আর দুই তরফই মোটামুটি সমান অনুপাতে সেই দায়িত্বপালনে ব্রতী হয়।

সত্যি কথা বলতে কি অন্ত:সত্বা লরেন যখন ঠিক করেছিল বাড়ুম ছয়মাসের হলে কাজে ফিরে যাবে তখন মনে মনে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি সে। যদিও মুখ ফুটে লরেনকে বলেওনি কিছু। ছয়মাস থেকে তাদের সন্তান ডে কেয়ারে বড় হবে ব্যাপারটাতে সায় ছিলনা ওর। লরেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মহিলা, নিজের দ্বিধার কথা বললে হয়ত শুদ্ধকে পরের ছয়মাস ছুটি নিয়ে বাচ্চার দেখাশোনা করতে বলত। শুদ্ধ বাড়ির যাবতীয় কাজ একা হাতে করে দিতে পারে কিন্তু একা একা বাড়ুমের দেখাশোনা করবে ভাবলে অসহায় লাগে। ওইটুকু একটা ক্ষুদে মানুষ, যার ভাবপ্রকাশ কেবল কান্না আর হাসির দ্বারা, কিকরে বুঝবে সে কখন সেটা খিদের কান্না কখন পেটে ব্যথার!

প্রথমদিকে উইকএন্ডে লরেন যখন বাড়ুমকে ওর হাতে সঁপে দিয়ে বন্ধুদের সাথে কয়েক ঘন্টার জন্য বেরোত, শপিং এ যেত বা মুভি থিয়েটারে, ওই প্রতিটি মুহূর্ত গোপনে ভীষণ অশান্তি ভোগ করত সে। কি হবে যদি ভুল পদ্ধতিতে খাওয়াতে গিয়ে বাড়ুমের শ্বাসরোধ হয়ে যায়! অথবা কোলে তোলার সময়ে বেকায়দায় লেগে

গিয়ে মট করে হাতটা ভেঙে যায়! হ্যাঁ, বাড়ুম হওয়ার আগে সে লরেনের গাইনোকলজিস্টের উপদেশমত আরো কিছু হবু বাবা মায়ের সাথে একত্রিত হয়ে বাচ্চা সামলানোর কোর্স করেছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনে একটা সত্যিকারে ছোট্ট মানুষ সামলানো আর হবু বাবা মায়েদের সাথে মিলে হাসি ঠাট্টা করে পুতুল সামলানো কি এক কথা! এখন অবশ্য সে দিব্যি স্বচ্ছন্দ। লরেন তো ক্ষণে ক্ষণে মুক্ত কন্ঠে তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়।

আজকাল লরেনের অনুপস্থিতিতে গাজর-মটর স্টিম করে ফুড প্রসেসরে পেষ্ট বানিয়ে অতি যত্নে যখন সে বাড়ুমকে খাওয়ায়, আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ুম যখন তার সদ্য ওঠা একটা দাঁত দেখিয়ে স্বর্গীয় হাসি হাসে, তখন ভয় ভাবনা মনের আনাচে কানাচে কোথাউ আর টের পায়না শুদ্ধ। বুক জুড়ে শুধু একটাই অনুভূতি ঢেউ তোলে, হয়ত তারই নাম বাৎসল্য। ঠিক জানেনা সে। শুধু এইটুকু জানে, কোনো শিশুকে দেখে এমন অনুভূতি তার এই প্রথম। রোজ রাতে বাড়ুমকে বুকে করে ঘুম পাড়ায়। লরেন রাগ করে। অবিকল বাঙালি মেয়ের ধরনে ধমকে ওঠে, এ কি আদিখ্যেতা, শুদ্ধ! তুমি ওর অভ্যাস খারাপ করছ। পরে একা শুইয়ে দিলে কিছুতেই আর ঘুমোবে না। বাড়ুম সম্পর্কিত লরেনের বাকী উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, শুধু এইটে ছাড়া। ব্যালকনির আধো অন্ধকারে তার আত্মজকে বুকে চেপে বেসুরে ভুল শব্দে বাংলায় কতযে গান গায়! লরেন মাকে ফোন করে কুলকুল করে হাসে, বলে, শুনতে পাচ্ছ, মা? তোমার ছেলে বুড়ো বয়সে বাবা হয়ে কত আনন্দিত এসে দেখে যাও।

মা তো নিজের চোখেই দেখে গেছে জন্মাবার পরের একমাস বাড়ুমকে ঘিরে শুদ্ধর পাগলামি, উদ্বেগ আর বাড়াবাড়ি। স্বভাব গম্ভীর মায়ের খুশীও যেন বাঁধন ছিঁড়েছিল। বাড়ুমের নয়ন নামটাও তো মায়েরই দেওয়া। লরেন নিজে

থেকেই অনুরোধ করেছিল মাকে নাতির নাম দিতে। শুদ্ধ মনে মনে আপ্লুত হয়েছিল। আশ্চর্য লাগছিল সে নিজে কি করে এমন করে ভাবেনি, মাথাতেই আসেনি মাকে বলার কথা। এত বুঝদার তার বউটা! ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারে, সবদিকে যে কত নজর! লরেনের মাও এসেছিলেন, থেকেছিলেন ওদের সাথে লরেনের শেষের ভরা মাস দুটোতে। মেয়েকে খুব যত্ন আদরে রেখেছিলেন। নাতি হওয়ার পরে তিনিও পছন্দ করে শুনিয়েছিলেন ক'টা নাম। লরেন ওকে একান্তে বলেছিল, আমার মায়ের তো আরো তিনটি নাতি নাতনি আছে কিন্তু তোমার মায়ের তো প্রথম, আর হয়ত একমাত্র। নিজের মাকে কি বলে বুঝিয়েছিল তা আর জানা হয়নি।

- শুদ্ধ, একটু সরাও নয়নকে, দেখ কি করছে! এতক্ষণে লরেনের নজর পড়েছে বাড়ুমের দিকে। ল্যাপটপটা পাশে রেখে লিভিংরুমের সোফা ছেড়ে উঠল শুদ্ধ। হাজারোগন্ডা বিল মেটাবার ফাঁকে ফাঁকে এতক্ষণ ওখান থেকেই মা ছেলের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছিল।
-কোথায়রে আমার বাড়ুম গুড়ুম? ছোঁ মেরে বাড়ুমকে মেঝে থেকে তুলে শূন্যে দুলিয়ে পরমুহূর্তে মুখের কাছে এনে নাকে নাক ঘষে দিল শুদ্ধ। খুব মজা পেয়েছে বাড়ুম, বাবার এমন দৈহিক আদরে অভ্যস্ত সে, কুলকুল করে হাসছে।
- শুদ্ধ, জিনস কি পরা ঠিক হবে ক্যালকাটার বাড়িতে? নাকি শুধু স্কার্ট নেব?
-মা তো তোমাকে শর্টসেও দেখে গেছে, তবে শর্টস নিওনা, মা কিছু হয়ত বলবেনা তবে ওখানে তা পরা যাবেনা। বাড়ির সামনে লোক দাঁড়িয়ে যাবে। প্রাণখুলে হেসে ওঠে শুদ্ধ। বাড়ুম মন দিয়ে ওর জামার পকেটের ওপর লাগানো বোতামটা খুঁটে তোলার চেষ্টা করছে। বাবা হেসে ওঠাতে সে ও একগাল হাসে। ছেলের গলায় নাক ডুবিয়ে দুধ দুধ গন্ধটায় বুক ভরে শুদ্ধ। তারপর বলে, জিনস ঠিক আছে, তবে এত গরমে কি পরতে পারবে? স্কার্ট নাও বরং, সুতির, আরাম পাবে।
- বাবা কিছু মনে করবেন না তো? শুদ্ধ লক্ষ্য করে লরেন মা, বাবা বলে উল্লেখ করছে, তোমার মা, তোমার বাবা নয়।
হাসি থামিয়ে গোমড়া মুখে শ্রাগ করে শুদ্ধ। বাড়ুমকে নিয়ে পায়ে পায়ে লিভিংরুমে ফিরে আসে। পিছু পিছু লরেনও বেরিয়ে আসে।
-শুদ্ধ, এবার তো বাবার সম্পর্কে স্বাভাবিক হও। আর কতদিন এমন করে চলবে?
-আমি কি করলাম? গলা তুলতে গিয়েও শেষমুহূর্তে চেপে দেয়। বাড়ুম তাদের দুজনের মাঝখানে।
-বাবার কথা বললেই তোমার ভাবভঙ্গি পাল্টে যায়। আমি বিয়ের আগে থেকে দেখে আসছি। আগে যা হয়েছে তা এখন অতীত। মানুষটা অসুস্থ। বিছানায় শোয়া। এবার তো মাফ কর।
-বিয়ের পরে যখন ফোন করলাম তোমার সাথে কথা বলেছিল?
-শুদ্ধ, সেটা পাঁচবছর আগের কথা। তারপরেও অনেকবার কথা হয়েছে আমার সাথে। আর উনি আমার সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করেছেন। বরং তুমি মায়ের সাথে কথা বলেই আমাকে ফোন ধরিয়ে দাও। বাবার সাথে কখনো যেচে কথা বলনা। ভুল করে কথা হলেও ওই একটাই প্রশ্ন, কেমন আছ? ব্যাস।
-আমি কিছু বলার খুঁজে পাইনা। আমাদের মধ্যে কোন মিল নেই। একটার বেশি দুটো কথা বললেই ঝগড়া হয়ে যাবে।
-এই সমস্তই তোমার অমূলক ধারণা। লরেনের গলায় বিরক্তি ফুটে উঠলো। ঝগড়া হবে কেন শুনি? উনি কি তোমার জীবনের কোনো ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন, তোমার সংসার বা চাকরীর ক্ষেত্রে অযাচিত পরামর্শ দিতে যান?

লরেনের গলায় অসন্তোষ অনুভব করে কিছু বলার চেষ্টা না করে চুপ করে যায় শুদ্ধ। কি করে বোঝাবে লরেনকে, বাবার প্রতি এই মনোভাব এক দু'দিনে গড়ে ওঠেনি। এর শিকড় অনেক গভীরে। এইযে এত বছর পরে দেশে যাচ্ছে, বাবার হার্ট এ্যাটাকের কারণে উদ্বেগ নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেনা। বস্তুত বাবা নামে সম্পর্কের কোনোই উত্তাপ টের পায়না সে বহুদিন। কোনো রক্তের টানও নেই। কিন্তু মায়ের প্রতি সদা বহমান একটা তিরতিরে উৎকন্ঠা লেগে থাকে। বিশেষ করে যবে থেকে মা আবার ওই বাড়িতে ফিরে এসেছে। কি জানি লোকটা এতদিন পরে বাগে পেয়ে আরো কত রকমে জ্বালাচ্ছে মাকে। এত দূর থেকে জবরদস্তি কিছু পয়সা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া মায়ের প্রতি অন্য দায়িত্বপালনে সে অপারক। সর্বদা মনে একটা অপরাধবোধ বয়ে বাড়ায়। নিশ্চিন্ত হত মাকে যদি এখানে এনে রাখতে পারত। কিন্তু মা দেশ ছাড়বে না, আর তার দেশে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই বাবার হার্ট এট্যাকের খবর দিয়ে আলতো করে যখন মা জানতে চেয়েছিল, তুই কি একবার আসবি, রিনো। অসুবিধে হলে জোর করে আসিনা। সম্পর্কের দাবিতে হুকুমতো নয়ই, ওইটুকু অনুরোধ করতেও ইতস্তত করছিল মা। সে আর একমুহূর্তও ভাবেনি। সোজা হ্যাঁ করে দিয়েছিল। মা কোনোদিন জোর খাটায়নি তার ওপর কিন্তু মায়ের ইচ্ছে অনিচ্ছে তার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

তাকে অন্যমনস্ক দেখে লরেন মুখটা দুষ্টু হাসিতে ভরিয়ে ঝপ করে তার কোলে বসে গলা জড়ালো।
–আচ্ছা সত্যি করে বল, বাবার ওপর রাগের কারণ বাবা তোমার সাথে তিয়াসের বিয়ে হতে দেননি বলে, নয়? ওরে নয়ন, চলরে আমরা গ্র্যানির বাড়ি চলে যাই, আমাদের দুজনকে পেয়েও বাবা তিয়াসকে না পাওয়ার দু:খে দু:খিত এখনো। মাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে বাড়ুম প্রাণপন চেষ্টায় বাবার কোল থেকে মায়ের গা বাইবার চেষ্টা করে। তার আকুলতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শুদ্ধ। তারপর দুজনকে একসাথে সজোরে বুকে চেপে ধরে।

৩

খোলা চাতালের ধারে শিউলিতলায় তিনটে চড়াই কিচিরমিচির করে তারস্বরে গল্প করে যাচ্ছে। পাঁচিলের ওপর বসে কাঠবিড়ালীটা দুই হাত জড় করার ভঙ্গিতে গভীর মনযোগ দিয়ে কিছু কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। পাঁচিলের নীচে বসে মিনি গভীর অসন্তোষে লেজ আছড়ে বিরক্তি দেখাচ্ছে। এই সমস্ত সাধারণ ঘটনা প্রদীপ আজকাল খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করেন। তিন দিন হল ঘরের বাইরে আসতে শুরু করেছেন। প্রতিদিনের প্রতিটি সাধারণ ঘটনা তাঁর জীবনে অনন্য হয়ে উঠছে। আবিষ্ট হয়ে পৃথিবীর রূপ রস আরোহন করার জন্ম জন্মান্তরের তৃষ্ণা প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মিটিয়ে নিতে তুমুল পিপাসা জাগে। রোজ রোজ সকাল হওয়ার প্রহর গোনেন। ভোর সকালে মনার মা উঠে টং করে কোলাপসিবল গেটের তালা খোলে, প্রতিমা অনুচ্চ স্বরে দুধওয়ালাকে কিছু বলেন, জমাদার এসে বাগান ঝাঁট দেয়, আর খাটে শুয়ে মনে মনে উত্তেজনায় এপাশ ওপাশ করতে থাকেন তিনি। এক্ষুণি প্রতিমা তাঁর ঘরে এসে পুবের জানালাটা খুলে দেবেন। মশারি তুলে সাবধানে দেখতে চেষ্টা করবেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তারপর তাঁকে তাকিয়ে থাকতে দেখে গভীর বিস্ময়ে বলবেন, কিগো এত সকাল সকাল উঠে গেছ? তোমায় কি আমরা জাগিয়ে দিলাম?

রাত ঘন থাকতে থাকতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু তিনি তা টের পেতে দেননা। ভোর সকালে প্রতিমা ঘুম ভেঙে খাটের পাশে এসে তাঁকে দেখে যান তারপর নিজের খাটে বসে অনেক্ষণ ধরে মশারির আবছা অন্ধকারে চুপকরে বসে থাকেন, হয়তবা প্রার্থনা করেন, সবই দেখেন তিনি। প্রতিমার নিশ্চল অবয়বের পানে চেয়ে যত

সম্ভব চোখ তীক্ষ্ণ করে শুয়ে থাকেন। ওইটুকু ছোট্টখাট্ট চেহারার, স্বল্পবাক মানুষটার কি অদম্য মনের জোর! চিরকালই মনের নাগালে বাইরে তাঁর অবস্থান ছিল, এখন যেন দূরত্ব আরো বেড়ে গেছে। নিজের বউ ভাবতে অস্বস্তি হয়। যেন অন্য গ্রহের মানবী। তাঁর রোজকার সেবা যত্ন এত মন দিয়ে করে, প্রদীপের সাথে কথাও

হয় অনেক বেশী। অথচ বাথরুমে প্রায় নগ্ন তাঁকে প্রতিমা যখন সাবান ডলে স্নান করিয়ে দেন, গা মুছিয়ে দেন, সংকোচে তিনি কেন্নোর মত গুটিয়ে যান। মনে হয় নিজের বউ নয় প্রতিমা যেন পরস্ত্রী। আসলে মনের ভিত কেমন যেন টলে গেছে। মা চলে যাওয়াতে শোক পেয়েছিলেন। খোলাখুলি সেই শোক প্রকাশে কোনো লজ্জা, সংকোচ জাগেনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ অবিচল মুখে প্রতিমা যখন বলেছিলেন যে তিনি আলাদা থাকতে চান সেই অনুভূতি যে কি দিয়ে বোঝাবেন! দু:খ ছিল, কষ্ট ছিল, শোক ছিল, বিরহ, অপমানও ছিল। সবচেয়ে বড় ছিল লজ্জা। মৃত্যুতে মাকে হারাবার শোক লোকসমাজে অকুন্ঠে প্রকাশ করা যায় কিন্তু বউ স্বেচ্ছায় চলে গেছে, এমন কথা গোপন রাখতে সমাজ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়াতে হয় পুরুষমানুষকে।

মনে হত সবাই যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছে, তার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। কি দু:সহ লজ্জা জ্বালা! প্রতিমা সপ্তাহে সপ্তাহে দিব্যি আসতেন। তাঁর শরীর গতিকের খবর ঘটা করে জানতে চাইতেন। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরে অনেকদিন রাগে অপমানে প্রতিমার সাথে কথা বলতেন না। প্রতিমা এলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন বা মুখ ব্যাজার করে নিজের কাজে ডুবে থাকার ভান করতেন। ভেবেছিলেন অবহেলা দেখিয়ে ক'দিনেই জব্দ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনা যাবে। প্রতিমার অবশ্য কোনো হেলদোল ছিলনা। দিব্যি নিয়মমাফিক আসতেন, তাঁকে, মনার মাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতেন। দরকারী কথা সেরে ফিরে যেতেন আবার। নিজের প্রয়োজনেই প্রতিমার

সাথে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে শিখেছেন তিনি। তাঁরই দরকার প্রতিমাকে, প্রতিমার জন্যই কত বছর পরে রিনো কাল রাত্রে বাড়ি ফিরেছে। সাথে নিয়ে এসেছে নয়ন আর লরেনকে। প্রদীপের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। এই এক রোগ হয়েছে, থেকে থেকে চোখ জলে ভরে। প্রতিমা যেদিন জানিয়েছিলেন রিনো আসছে সেদিনও আবার কাল রাতে লরেন যখন নয়নকে কোলে শুইয়ে দিল, তখনো। নয়নের ছোট্ট শরীরটা ছুঁতেই বুকের ভেতরে প্লাবন টের পেলেন। নয়ন তখন ঘুমে অচেতন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গভীর তৃষ্ণা নিয়ে দেখছিলেন। মায়ের সাদা রং পেয়েছে নাতি, ঠোঁট নাকও, কিন্তু জোড়া ভুরু আর ঘন আঁখিপল্লবে সে নিয়োগী বাড়িরই সন্তান।

সতৃষ্ণ নয়নে রিনোদের ঘরের দিকে চাইলেন একবার। দরজা বন্ধ। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়েছিল ওদের। নয়ন একটু পরেই উঠে গেছিল, বড় বড় চোখ তাকিয়ে দেখছিল তাঁকে। প্রতিমার কোলে দিব্যি ছিল। তিনি নিতে গেলেই ভ্যাঁ করে ঠোঁট উল্টে কান্না জুড়ল। রিনো একটু অস্বস্তিতে পড়ল বোধহয়, বললো, ক'টা দিন যেতে দাও, ঠিক চিনে যাবে। বাড়ুম খুব ফ্রেন্ডলি, চেনা অচেনার তোয়াক্কা করে না। প্রদীপ অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, না না ঠিক আছে, এতটা পথ এসে, অচেনা লোকেদের মাঝে পড়ে ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে আনন্দে মনার মা। বউমার সাথে বাঙলায় অনর্গল জলস্রোতের তোড়ে কথা কয়ে চলেছে। লরেন বাঙলা বোঝে, ধীরে ধীরে বললে অনেকটাই বুঝতে পারে। কিন্তু মনার মার ওই স্পিডের উচ্ছ্বাস তার পক্ষে বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তবুও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসিমুখে মাঝে মাঝে বলছিলো, কুব বালো, কুব বালো। মনার মা ইতিমধ্যেই লজ্জা লজ্জা মুখে বউমাকে একজোড়া দুল দিয়েছে, একটি লাল টকটকে শাড়িও। প্রতিমার প্রতিক্রিয়া দেখে প্রদীপ বুঝেছিলেন তাঁর অগোচরেই সে এইসব ষড়যন্ত্র করেছিল। লরেন হাতে নিয়েই দুলটা পরে ফেললো। শাড়িটাও পরবে কথা দিয়েছে। ওইটুকুতেই বুঝে গেছেন প্রদীপ। মেয়েটা অহঙ্কারী নয় একটুও। শুদ্ধর বিয়ের পরে প্রতিমা ওদেশ থেকে ঘুরে এসে লরেনের খুব গুণগান গাইত। তিনি এক বর্ণও বিশ্বাস করতেন না। চিরকালই প্রতিমার সবার সব কিছু বাড়াবাড়ি রকমের ভালো দেখা অভ্যাস, শুধু স্বামীরটা বাদে। প্রদীপের সম্মতি ছিলনা বিদেশী, বয়সে বড় মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে হয়। তাই তার কাছে ছেলের বউয়ের প্রশংসা প্রতিমা যে একটু বাড়িয়ে করবেন সে তো জানা কথাই। ছেলেটাও পেয়েছে ছোট থেকে একেবারে মায়ের ধারা, বাবা যা করে সবই ভুল এবং প্রতিবাদের যোগ্য, আর বাবা যা বলে তার উল্টো পথে চলা অবশ্য কর্তব্য। আরো কম বয়সে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে ক্ষেপেছিল, তখনতো নিজের পায়েও দাঁড়ায়নি। তাঁর অসম্মতি সত্বেও এক বিকেলে সেই মেয়েটির পরিবার এসে হাজির।

তখন কি আর আজকের ভীরু দুর্বল মানুষ ছিলেন তিনি! স্পষ্ট ভাষায় মেয়েটির বাবা মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অসম্মতি। বলেছিলেন, ছেলে নিজের মর্জিমত বিয়ে করলে ছেলের সাথে হয়ত তাঁদের সম্পর্ক স্থাপন হবে কিন্তু তিনি সেই সম্পর্কের বাইরে থাকবেন। এ কেমন পরিবার? কোথায় নিজের মেয়েকে সামলে রাখবে, রিনোকে বলবে প্রেম ট্রেম ভুলে নিজের পায়ে দাঁড়াও, তা না সম্বন্ধ করতে সদলবলে নাচতে নাচতে ছেলের বাড়ির কড়া নাড়ছে! খুব অপমানিত হয়েছিলেন মেয়েটির মা। এত বছর পরেও ওনার কাটা কাটা কথাগুলো কানে ভাসে, মি: নিয়োগী, একদিক থেকে ভালোই হল আপনি অসম্মতি জানালেন। আপনাকে না জানলে আমাদের মেয়েটাকে হয়ত আমরা জলে ভাসিয়ে দিতাম। সেই পাগলামির হাত থেকে রিনোকে বাঁচিয়েও প্রতিমা আর ছেলের প্রবল রোষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। সে ও তো নতুন কিছু নয়, যখনই নিজের পরিবারের জন্য ভালো কিছু করতে চেয়েছেন তখনই তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর সদিচ্ছা, ছেলের জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তকে কোনোদিনও তাঁর পরিবার ভালো মনে নেয়নি। মেয়েটাকে বিয়ে করতে না পেরে রিনো যে সেই বাড়ি ছেড়েছিল,

তারপর থেকে তাঁর সাথে আর সম্পর্ক রাখল না! একটা মেয়েকে বিয়ে না পারার শোকের কাছে রক্তের টান ফিকে পড়ে গেল! অফিসের রায়দাকে একবার দু:খ করে বলেছিলেন ছেলের সাথে তাঁর সম্পর্কের জটিল সমীকরণের কাহিনী। রায়দাতো তার বিবেচনাটা বুঝলেনই না উল্টে জ্ঞান দিয়ে দিলেন, নিয়োগী, ছেলে মেয়ে বড় হলে তাদের সে সম্মানটা দিতে হয়। জেনে রেখ, মেনে নিতে পারলে মানুষ মানব, না মানলে দানব। যত্তসব! রায়দার একমাত্র মেয়ে ডাক্তার, বিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারের সাথে ধুমধাম করে। জীবনের অমন স্টেজে থাকলে অন্যকে জ্ঞান দেওয়া সোজা হয়ে যায়।

সেই বিয়েটা বন্ধ করতে পারলেও লরেনকে বিয়ে করার পরে তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তখন আর কিছু করার ছিলনা। রাগে অন্ধ হয়ে গেছিলেন তিনি। প্রতিমাকে যে দুটো কথা শুনিয়ে মনের জ্বালা জুড়াবেন সে উপায়ও ছিলনা। প্রতিমা তখন ঠিকানা বদলে তার নাগালের বাইরে। তারপরে যতবার রিনোর অদূরদর্শীতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেছেন, প্রতিমা কানেও তোলেননি বরং লরেনের ভূয়সী প্রশংসা করে করে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, তারা খুঁজলেও ছেলের জন্য অমন পাত্রী পেতেন না। তখন মানেননি, তবে ধীরে ধীরে ফোনের মাধ্যমে লরেনের সাথে সম্পর্কটা সহজ হয়েছে। নয়ন হওয়ার পর কথা বলার বিষয়ের অভাব হয়নি। নাতির নামকরণ তাঁকেই করতে বলেছিল বৌমা। বলেছিল, একটা সহজ নাম দিওতো, বাবা, যা এদেশে সহজে উচ্চারণ করা যাবে। তিনি নামের ভার প্রতিমার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। নাতি নিয়ে প্রতিমার উচ্ছ্বাস তখন তাঁকে অন্য রূপ দিয়েছে। ভট্টাচার্য মশাইকে ওদেশ থেকে ফোনে ধরে, নাতির জন্মের দিনক্ষণ জানাতেই তিনি বর্ণমালার 'ন' দিয়ে নাম রাখতে বলেছিলেন। প্রতিমা 'নয়ন' ঠিক করাতে তিনি খুশী হয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এইরকম নানাবিধ ঘটনায় বৌমার সাথে দূরত্ব কমল কিন্তু ছেলে এখনো সেই দূরে সরে আছে। তা থাকুক, বুঝবে একদিন! সে নিজেও তো ছেলের বাপ এখন! তিনি যেরকম করে দিনে দিনে পুড়েছেন, তাকেও জ্বলতে হবে, পুড়ে খাক হতে হবে। শান্তির কথা ছেলের সে যাতনা প্রত্যক্ষ করতে এই ধরাধামে তিনি তখন থাকবেন না। গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে সাথে মনটা উদাস হয়ে উঠল প্রদীপের। মিঠেকড়া রোদের আরামে ঝিমুনি এসে গেছিল। কখন যে নয়নকে নিয়ে লরেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পাননি। দুটো ছোট্ট হাত তাঁর চুল টেনে ধরতেই চটকা ভেঙে জেগে উঠলেন অনাবিল আনন্দে।

৪

মনার মা নয়নকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ফুল চেনাচ্ছিল। ও দাদাভাই, এই দ্যাখনা, ঠাম্মার লাগানো নয়নতারা ফুল। ঠিক তোমার মত। তুমিও তো নয়ন, আমাদের দুই নয়নের ফুল। বলতে বলতে ভারী খুশী হয়ে উঠল সে। বা: কি সোন্দর একটা কথা সে নিজে নিজে ভেবে বললো। পড়ালেখা জানা মানুষদের মত। দাদাভাই বুঝলনা কিন্তু তাতে কি, তার মাথায় কেমন এল কথাটা! বৌমণিকে বললে কত হাসবে, হয়ত ভাববে সে কারুর থেকে শুনে বলছে। তারপর যখন জানবে মনার মা নিজে থেকে ভেবেছে, তখন নিশ্চয়ই অবাক মানবে।

বৌমণির শরীরটা ক'দিন ধরে বশে নেই। দুপুরে খাওয়ার পরে বসার ঘরের চৌকিতে গিয়ে একটু শুয়েছে। শরীরেও বা দোষ কই! ছেলে-বৌমা, নাতিকে পেয়ে সকাল বিকেল সে কি রান্নার ঘটা! এবাড়িতে এত খাইয়ে কেউ নেই। দাদাবাবু অসুখের আগে অবশ্য খেত। এখন খিদে মরে গেছে। মেম বৌমা তো খালি এক চামচ ঘি ভাত আর ডাল সেদ্ধ খায়। কখনো মুরগির ঝোল খায় হলুদ ছাড়া, সাদা সাদা। হলুদে নাকি গন্ধ লাগে। এমন আজব কথা কোনোদিনও শোনেনি মনার মা। শুদ্ধ দাদা সব খায় তবুও তো সে পাখির আহার। অন্যদিকে

দাদাবাবুর জন্য কত যত্ন। যখন নার্স ছিল তখনও বৌমণি নিজের হাতে রাঁধতো, খাওয়াতো, নাওয়াতো স্বামীকে। দাদাবাবুর ভারী ঝগড়া ছিল নার্সের সাথে, তাকে ছুঁতেও দিত না। মাসে মাসে কিচ্ছুটি না করেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুণতো মিনতি। শেষে একদিন অন্য কাজ পেয়ে আসা বন্ধ করল। দাদাবাবুও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এদিকে বৌমণি একাহাতে সব করতে গিয়ে নিজের শরীর যে ক্ষইয়ে ফেলছে সে হুঁশ কারুর নাই। শুদ্ধ দাদা এসেই মায়ের এই খাটাখাটনি দেখে একদিন খুব বকা দিয়ে বলছিল রান্নাবান্না সব বন্ধ করে রান্নাঘরে তালা ঝুলিয়ে দেবে। মনার মাকে বলেছিল একটা রান্নার লোক দেখতে। তবে থেকে সুদমা এসে রান্না করে যায়। সে কিছু বললে বৌমণি কথা কানেও তোলেনা কিন্তু শুদ্ধ দাদা যখন বকছিল, তখন হেসে হেসে বৌমণি বলছিল, আচ্ছারে আচ্ছা। আর বকিসনা, এবার থেকে লোক রেখে দেব। আমি সকাল থেকে পটের বিবি সেজে বসে থাকব।

নয়ন দাদাভাই দুই পা দিয়ে উত্তেজনায় তড়বড়িয়ে উঠল একটা শালিখ দেখে। বিস্ময়ে ঠোঁটটা একটু ফাঁকা করে চোখের নীল মণি দুটো স্থির করে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য স্বরে কিছু বলে উঠছে। আরো একটা শালিখের আশায় এদিক ওদিক চোখ চালালো মনার মা। না: নেই! এক শালিখ দেখা মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু আশে পাশে কোথাই নেই। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল তার। চল দাদাভাই, আমাদের মিনিকে খুঁজতে যাই। দালানের অপর প্রান্তে পা বাড়ালো সে। দাদাভাই তখনো ঘাড় ঘুরিয়ে শালিখটাকে দেখছে।

শুদ্ধ দাদা মেম বৌমাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। দাদাভাইকে বৌমণি সাথে করে নিয়ে শুয়েছিল। মেঝেতে বসে শাড়ির পাড় সেলাই করছিল সে। অন্যসময় হলে দুপুর দুপুর একটু গড়িয়ে নেয়। দাদাভাই আসার পর ঘুম, সিরিয়াল দেখা সব মাথায় উঠে গেছে। সেলাই করতে করতে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল একরাত্তি মুখটার দিকে। ঠিক যেন একটা দেবশিশু। কান্নাকাটি, বায়নাক্কা এক্কেবারে নেই। সময়ে সময়ে পেটভরে খাইয়ে দিলেই ঘুমানোর আগে অবধি দিব্যি হাসিখুশি থাকে। খানিক পরে সেলাই থেকে চোখ তুলে দেখে দাদাভাই উপুড় হওয়ার চেষ্টা করছে। তক্ষুণি সেলাই ফেলে চুপিচুপি দাদাভাইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে। থাক বৌমণি একটু ঘুমোক। দাদাবাবু জেগে ছিল। দাদাভাইকে নিয়ে ঢুকতেই খুশী হয়ে উঠলো। দাদাবাবু এখন খাটে বসে বসেই কত খেলা করে দাদাভাইয়ের সাথে। কোথায় সেই রাগ রাগ ভাব! পরশু দাদাভাই দাদাবাবুর প্রিয় কলমটা কামড়ে দাগ ফেলে দিল, বৌমণিকে তা দেখিয়ে দাদাবাবুর কত হাসি, বললো, ব্যাটার দাঁতের জোর দেখেছ? কালে কালে দাদুর মত পাঁঠার হাড় চিবিয়ে খাবে। বৌমণিও হাসছিল। সত্যি, বাড়িটা যেন ঘুমন্ত পুরী ছিল, দাদাভাই এসে জাগিয়ে তুলেছে। এইটুকুনি পুঁচকে একটা মানুষ সবাইকে কেমন মায়ায় বেঁধে রেখেছে।

দাদাভাইকে আনচান করতে দেখে বুঝতে পারল খিদে পেয়েছে। কোলে কোলেই রান্নাঘরে নিয়ে ঢুকলো সে। দাদাবাবুর কাছে একা ছাড়া ঠিক হবেনা। হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে হামা দিতে গিয়ে খাট থেকে পড়ে যেতে পারে। দাদাবাবু সামলাতে পারবেন না। মিনিটাকে দেখা যাচ্ছেনা। হয়ত পাড়া চড়তে বেরিয়েছে। রান্নাঘরে নতুন স্টিলের বাসনের ওপর সার দিয়ে রাখা দাদাভাইয়ের দুধের বোতল। শুদ্ধ দাদা বোতলগুলো গরম জলে সেদ্ধ করে সাজিয়ে রেখে গেছে। সে শিখে গেছে দুধ বানাবার কায়দা কানুন। তাকে দুধ বানাতে দেখে দাদাভাই খুশীতে ছটফটিয়ে উঠলো। সে কি কি করছে খুব মন লাগিয়ে দেখছে। এইটুকু মানুষের বুদ্ধি দ্যাখো! গভীর মমতায় দাদাভাইয়ের গালে একটা ঠোনা দিল মনার মা।

আজ সকালে মনা এসেছিল। তিনদিনের জন্য মাঝের চরে যাচ্ছে বউয়ের বাপের বাড়ি। বলছিল, হপ্তায় দুই কেটে গেল তুমি একবারও বাড়ি এলেনা, মা। সপ্তাহ দশদিনে একবার বাড়ি ঘুরে আসে মনার মা। ছেলেকে দেখে আসে। তাকে দেখলেই বউয়ের মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। তবুও জোর করে যায়। ছেলেটা খুশী হয়। এখনো সে কারুরটা খায় না পড়ে না, নিজের গতর খাটিয়ে খায়। বরং মাসে মাসে ছেলের হাতে কিছু ধরে দিয়ে আসে। আহা অল্প বয়স, ওদেরইতো সখ আহ্লাদ। তবু ছেমড়ির এমন ব্যবহার! তার খাই খরচা তো সব বৌমণি দেয়। মাসে মাসে টাকাও ধরে দেয় কতগুলো। আবার বলে, মনার মা, সব পয়সা ছেলেকে দিয়ে দিওনা, পোষ্টঅফিসে নিজের নামে জমা রেখ। দরকারে অদরকারে যাতে কারুর কাছে হাত পাততে না হয়।

দাদাভাই আসার পর থেকে আর বাড়ির পানে যাওয়া হয়নি। ইচ্ছাই হয়নি। মনা কারখানা যাওয়ার পথে আজ এসেছিল। মুখটা কালোপানা। বৌমণি সাথে সাথে ভাত বেড়ে খেতে দিল। মনা চুপচাপ খেয়ে নিল ভাতক'টা। বৌমণি তাকে আড়ালে ডেকে বললো ছেলের সাথে একা বসে কথা বলতে। মনার হাবভাব দেখেশুনে সন্দেহ লাগছিল মনার মার। বৌটা ছেলেকে রেঁধে বেড়ে দেয় কিনা কেজানে। একপেট খেয়ে এলে মানুষ আবার ভাত খেতে পারে! মনা কিছুটি স্বীকার করল না। হয়ত মার কষ্ট হবে সেই ভেবে। বৌটা মনের মত হয়নি। চেনাজানার অভাবী পরিবার থেকেই বাপহারা মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছিল। ভেবেছিল খেতে পড়তে পাওয়া পরিবারে এসে তার ছেলেটাকে সুখী রাখবে। কোথায় কি! পেটে যেই ভাত পড়ল এখন তার নিত্য নতুন বায়না। সপ্তাহে সপ্তাহে সিনেমা দেখবে, শাড়ি কিনবে! মনা রোজগারের টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারেনা। অন্যের মেয়ের দোষ দেবেকি আসল দোষী তো তার ছেলেটা, এক্কেরে ম্যাদামারা তাই বউটা এমন মাথায় চড়ে বসেছে। মনার বাপের পাল্লায় পড়লে দুই চড়ে হুঁশ ফিরিয়ে আনতো। বুক ঠেলে তপ্ত নি:শ্বাস বেরিয়ে আসে মনার মায়ের, পোলাটার জীবন সুখের হলনা।

দাদাভাই খাওয়া শেষ করে জিভ দিয়ে বোতলটা ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে দুধ, ঠোঁটে পরিতৃপ্ত হাসি। আঁচল দিয়ে যত্ন করে মুখটা মুছিয়ে দিল মনার মা, কোলে বসিয়ে পিঠটা চাপড়ে দিতেই ঘক করে মস্ত ঢেঁকুর উঠলো। সবেমাত্র বোতলটা রান্নাঘরের সিঙ্কে রেখে পেছন ফিরেছে বসার ঘর থেকে ঠাঁস করে কিছু পড়ার আওয়াজ পেল। দাদাভাইকে বুকে চেপে তাড়াতাড়ি পা চালালো মনার মা, বেশিদূর যেতে হলনা, উঠানের এপ্রান্ত থেকে সোজাসুজি দেখতে পেল চৌকির নীচে পড়ে আছে বৌমণি, বন্ধ চোখ, ঠোঁটের পাশে ফেনা বের হয়ে অচেতন। অজান্তে নিজের বুক চিরে প্রবল আর্তনাদ বেরিয়ে এল মনার মার।

৫

শোকের অভিঘাত ঘন কুয়াশার মত। চারপাশে জমাট ঠান্ডা আবরণ টেনে মানুষকে আচমকা একা করে দেয়। অন্তোষ্টি মিটে গেছে, আজ নিয়ে দশদিন হল প্রতিমা চলে গেছেন। আগামীকাল পারলৌকিক কাজ। প্রদীপ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না এই সরল সত্যটা। কেউ এত সহজে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারে! স্বামী, ছেলে, নাতি, বউ, কেউ কিচ্ছুটি জানল না। কত বকেয়া কাজ পড়ে রইল। মানুষটাতো এমন অবিবেচক কোনোদিনও ছিলেন না! তাছাড়া তিনি থাকবেন, প্রতিমা চলে যাবেন, এই ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে বেশী ভাবতে গেলে মাথা কেমন গুলিয়ে উঠছে। তাঁর থেকে প্রতিমা কম করে আট বছরের ছোট। তাঁর থেকে প্রতিমার শরীর অনেক বেশী মজবুত। মনে পড়েনা কবে তাঁর শেষ অসুখ বিসুখ করেছিল। তাঁর থেকে প্রতিমা অনেক বেশী

পরিশ্রমী, চিরকাল। দুই হাত দিয়ে সংসারটাকে আগলে রেখেছে কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। ডাক্তারদের ভুল হয়েছে, প্রতিমা অজ্ঞান হয়ে ছিল, ওরা মৃত ভেবেছে। অসম্ভব তো নয়। কাগজ খুললেই ভুরি ভুরি এমন খবর পড়েন। আজকের খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন প্রদীপ। ডাক্তারদের গাফিলতির খবর পেলে শুদ্ধকে পড়াবেন। ছেলেটা কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে। বৌমা স্তব্ধ হয়ে সব কাজ করে যাচ্ছে। মনার মা থেকে থেকে ডুকরে ডুকরে ওঠে। নয়ন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। বাড়িটা কেমন খাঁ খাঁ করে গিলতে আসে। কোন কাজ সময়ে হয়না। জমাদার এসে গেটের তালা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাড়ির লোকের মনোযোগ আকর্ষন করার চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে যায়। দুধের প্যাকেট মাটিতে পড়ে থাকে। ঠাকুরঘরে আলোটুকু কেউ জ্বালায় না। খেতে খেতে কোনোদিন দুপুর দুটো বাজে। প্রতিমা থাকতে সবকিছু কেমন নিখুঁত ছন্দে হত।

একটা মানুষের অনুপস্থিতি কোনো কিছু দিয়েই পূরণ হওয়ার নয়। অনিয়মের মাঝে পড়ে তুমুল রাগ মাথাচাড়া দেয়। প্রতিমার এমন অকৃত্য ব্যবহার দু:খ ভুলিয়ে মাথা ঝিমঝিম করে রাগ আনে। রাগ দেখাবার মানুষটা নেই তাই আবার নিজের সাথে যুদ্ধ শেষে নীরবে গিলে নেন। চিরদিনই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন। প্রতিমা বলতেন, শুধু সঙ্কটে পড়ে নয়, সুখে দু:খে প্রতিদিন নিয়ম করে ঈশ্বর সাধনা করা কঠিন কাজ। সবার দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের অহং ভুলে কারুর চরণে প্রাণমন সমর্পণ করতে সকলে পারে না। প্রতিমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মবোধ ছিল, বাড়াবাড়ি না করেও নিয়মিত জপ তপ করতেন। তবে কি ভগবান আছেন? তিনি তাঁর দুয়ারে কোনোদিনও মাথা নোয়াননি, সেই পাপে শেষ বয়সে তাঁর এই দুর্গতি?

-বাবা। রিনো এসে ঘরে ঢোকে। কাচ্চা পরিহিত, উসকোখুসকো কাঁচা-পাকা চুল, দাড়ি-গোঁফ আর শীর্ণ দেহে ছেলেটা কেমন বুড়িয়ে গেছে। ছোটাছুটির অন্ত নেই। কালকে মায়ের কাজে লোক খাওয়াবেনা পাত পেড়ে। সামান্য মিষ্টি-সরবতের আয়োজন আর প্রতিমার সেলাই স্কুলের মেয়েদের একজন গান গাইবে। এই সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করার আগে তাঁর অনুমতি চাইতে এসেছিল। প্রদীপ কি বলবেন! তাঁর যে প্রত্যয়েই আসছেনা প্রতিমা আর কোনোদিনও এই ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের দিকে এক পলক চেয়ে বলবেন না, কিগো, খিদে পায়নি? ছেলেকে বলেছেন তাঁকে না জড়াতে। যেমন ইচ্ছে তেমন করেই মায়ের শেষ কাজ করুক সে। চোখ ভিজে আসে প্রদীপের। মা যে ছেলেটার কতটা ছিল তা তিনি জানেন। রিনো আবার বলে,
-বাবা, তোমার পাসপোর্টটা দিও। ভিসার দরখাস্ত করতে হবে। গভীর অনিচ্ছায় মাথা নাড়ান প্রদীপ।
-আমি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। এখানে জন্মেছি, তোমার মা এই বাড়ি থেকে গেছেন, আমিও এখানেই শেষ দিন অবধি থাকতে চাই।
-একবার ঘুরে এসে সিদ্ধান্ত নিও।
-না না আমাকে টানাহেঁচড়া করার চেষ্টা কোরোনা। নিজের মত শান্তিতে থাকতে দাও।
-বাবা, তোমাকে এখানে একা রেখে আমি অশান্তিতে থাকব। এখানে কে তোমার দেখাশোনা করবে?
-ওখানেও বা কে আমার দেখাশোনা করবে? তোমরা তো সকাল থেকেই দৌড়তে থাক। বরং আমি গেলে তোমাদের অসুবিধে বাড়বে। এখানে মনার মা আছে।
-মনার মায়ের বয়স হয়েছে, কবে আছে কবে নেই।
- এতই যদি চিন্তা তবে তুমি ফিরে এস। বলতে না চেয়েও মুখ ফসকে কথা ক'টা বেরিয়ে গেল প্রদীপের। আড়চোখে দেখলেন ছেলের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। কেন যে বললেন কথাটা। এখন প্রতিমা নেই যে মাঝে পড়ে সব সামলে দেবেন। মনের মধ্যে ছেলের জন্য প্রবল টান, স্নেহধারা, অথচ মুখে প্রকাশ করার সময় তা কেমন

করে যেন অন্য চেহারা নেয়। রিনো যখন তাঁকে ওদেশে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল, ছেলে তাঁর জন্যে এত ভাবে মনে করে সত্যিকারের ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন কিন্তু মুখে প্রকাশ করার সময় সেই আবেগ ছেলেকে বুঝিয়ে উঠতে পারলেন না। আবার ভুল করে বসলেন।

–আলমারির লকারে দেখো পাসপোর্ট রাখা আছে হয়ত। তোমার মা ই সব রাখতেন। বলেই গলা ধরে এল প্রদীপের। প্রতিমার সম্পর্কে কিছু বলতে এখন থেকে 'রাখত', 'করত' ব্যবহার করতে হবে। যাবতীয় কাজ কর্ম, বলা কওয়া নিয়ে প্রতিমা এখন স্মৃতি। তাঁকে জব্দ করে দূরে চলে গিয়ে তাঁর অবস্থা দেখে খুব হাসছে। সারাটাজীবন খালি শত্রুতাই করে গেল।

শুদ্ধ উঠে লকার খুললো। ছোট বড় নানা ধরনের ব্যাঙ্কের কাগজ পত্রের ফাইল। একটা চন্দন কাঠের বাক্স। ক্লাস এইটে স্কুল থেকে তাদের পুরী বেড়াতে নিয়ে গেছিল সেখান থেকে মায়ের জন্য কিনে এনেছিল সে। খাটে বসে বাক্সটা খুললো। প্রদীপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। নানা সময়ে মাকে লেখা চিঠি, লক্ষনৌ থেকে মায়ের জন্য কিনে আনা ছোট্ট আতরের শিশি, পুরোটাই ভরা। মা প্রাণে ধরে কখনো ব্যবহার করে উঠতে পারেনি। ক্লাস নাইনে লেখা শুদ্ধের প্রথম কবিতা। আমেরিকা থেকে তিয়াসের জন্য ছুটে এসে ওর এনগেজমেন্টের খবর পেয়ে প্রচন্ড রাগে দলিত মর্দিত করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তিয়াসের কিছু চিঠি। পরে যখন মনে পড়েছিল তখন আর খুঁজে পায়নি। কিশোর বয়সের গিটার নিয়ে ক্ষেপেছিল, রাত জেগে বানানো নোটেশান, মা সব যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিল। শুদ্ধকে কোলে নিয়ে তরুণী মায়ের চেয়ারে বসা ছবি। পাশে একমাথা কালো চুলে, কালো ফ্রেমের মোটা চশমায় তরুণ বাবা। দুজনেই হাসছে। মস্ত বড় কাজলের টিপ পরে শুদ্ধ মায়ের কোলে মিশে আছে। প্রদীপ হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিলেন। জল নামছে গাল বেয়ে, ছবিটা চোখের সামনে থেকে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

খোলা বাক্সের সামনে শুদ্ধ বসে আছে নি:স্তব্ধ। তার জীবনের অনেকগুলো হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির সাথে এক লহমায় দেখা হয়ে গেল। শুদ্ধ তো ভুলেই ছিল, একমনে শুধু সামনে এগিয়ে চলছিল। মা আবার তাকে তার বিস্মৃত জীবন ফিরিয়ে দিল। তার যত কিছু অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা টুকরো টাকরা মায়ের কাছে মহামূল্য ছিল। বাক্সটা বন্ধ করে দিল শুদ্ধ। বাক্স আরো অনেক জিনিসে ভর্তি, কিন্তু এখন সেসব দেখার মত মনের জোর নেই। সামনে অনেক কাজ, মনকে শক্ত রাশে বেঁধে রাখতে হবে। লকার খুঁজে বাবা মায়ের পাসপোর্ট বের করল। মায়ের পাসপোর্ট এক্সপায়ার হতে আরো সাত বছর বাকী। পাসপোর্ট ভ্যালিড রইলো, মানুষটা এক্সপায়ার করে গেল! বাবারটা খুলে তারিখ দেখল। ফিরে গিয়েই বাবার গ্রীন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেবে। বাক্স হাতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল শুদ্ধ, তখনো প্রদীপ ফটোটার দিকে চেয়ে আছেন। তাকে বেরোতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন।

– এটা নিয়ে যাও। ছবিটা বাড়িয়ে ধরলেন। শুদ্ধ হাত বাড়ালো।
–রিনো, তুমি তো কেবল একটা বাক্স নিলে। তোমার মায়ের অমন অনেক জিনিস ছড়ানো পুরো বাড়িময়। সেগুলো কিকরে নেবে? এই বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র, বাসন কোসন, বাগানের গাছে তোমার মায়ের হাতের ছোঁয়া। তাদের কি হবে? প্রদীপের গলা ভেঙে আসে। বৈশাখের ঝড়ে ওই লেবু গাছটা শিকড় উপড়ে পড়ে গেছিল। মালী এসে বললো তুলে ফেলে নতুন গাছ লাগাবে। তোমার মা কিছুতেই রাজী হলেন না। লোকজন

জোগাড় করে সেই বিশাল গাছকে খাড়া করালেন। শুদ্ধ জানালা দিয়ে লেবু গাছটা দেখল। অজস্র লেবু ফলে আছে। রোদ পড়ে গাঢ় সবুজ পাতা ঝলমল করছে।
-তোমার ঘরে নতুন ইজি চেয়ারটা, তোমরা আসবে বলে কিনেছে। তোমরা শোবে তাই নতুন গদি করালো। শখ করে পর্দা পাল্টালো ঘরে ঘরে। বৌমার জন্য বাথরুমে গরম জলের হিটার, দাদুভাইয়ের জন্য ওই মস্ত টেডি বেয়ার? এইসবই কি আমরা অবহেলায় ফেলে চলে যাব, বাবান? প্রদীপের গলার আর্তি কান এড়ালোনা তার। কতদিন পরে বাবা তাকে ওই নামে ডাকল। ক্ষীণ চৈতন্যে আসছে , বাবাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেও ওই লেবুগাছটার মত বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না সে। শুদ্ধ বাবার দিকে চাইলো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। বুক খোলা ফতুয়ার নীচে পাঁজরের হাড়গুলো গোণা যায়। এক সময়ের ঘন চুলের কয়েক গাছি অবশিষ্ট। চোখ দুটো গভীর কোটরে ঢোকা। মুখে শোকের কালো ছায়া। তিন সপ্তাহ আগে যখন এসেছিল এত খারাপ দেখতে লাগেনি। বাবা বাঁচবেনা বেশীদিন, এখান থেকে উপড়ে নিয়ে গেলে হয়ত সেই প্রক্রিয়াটা তরান্বিত হবে। কি করবে শুদ্ধ? তার অযত্নে ফেলে রাখা জিনিস মা সারাজীবন বুকে করে আগলে রাখলো সে কি মায়ের প্রিয় যত কিছু লুটিয়ে ফেলে চলে যাবে? তারপর আত্মগ্লানিহীন ক্লিষ্টশূন্য কাটবে তো বাকি জীবনটা? পা দুটো দুর্বল লাগে শুদ্ধর, ধপ করে বাবার পাশে বসে পড়ে।

মা চলে যাবার পর আরো একটা রাত নির্ঘুম কাটে। এতদিন শোকের প্রাবল্য মনকে অসাড় করে রেখেছিল এখন সেখানে জায়গা নিচ্ছে একটু একটু উত্তেজনা। সকাল থেকে অনেক অনেক কাজ। ঘুমোনোটা জরুরী ছিল। গভীর রাত অবধি লরেনের সাথে আলোচনা করেছে। ওর মতামত জিজ্ঞেস করেছে। এতবড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ঠিক করছে না বোকামি করছে জানেনা। লরেনের যত চিন্তা বাড়ুমকে নিয়ে। শুদ্ধ ওকে বোঝালো ডাক্তার, হাসপাতাল, স্কুল সবই সহজলভ্য যদি পকেটে পয়সা থাকে। তাছাড়াও বাড়ুমের বাবা এদেশে জন্মেছে, বড় হয়েছে আর এখনো সুস্থ সবল বেঁচে আছে। অনেকদিন পরে প্রাণখুলে হাসল দুজনে। লরেন বললো এদেশে পাকাপাকি থাকতে পারবে কিনা জানেনা তবে চেষ্টা করতে আপত্তি নেই। লরেনের এই কথায় মনটা বড় শান্তি পেয়েছে। লরেন রাজী না হলে, ওকে ছেড়ে, বাড়ুমকে ছেড়ে কিছুতেই সে এখানে একা থাকার কথা ভাবতে পারত না। তিন দিন পরে ফিরে যাবে লরেন, শুদ্ধ যাবে এক সপ্তাহ পরে। এদিকের সবকিছু ছেড়ে খানিক দিনের জন্য আমেরিকায় ফিরবে তারা পাঁচ বছরের সংসার ঝোলায় ভরে আবার ফিরে আসবে বলে। হয়ত বাকী জীবনের জন্য! না: সে কথা এখনই বলা যায়না। তার হাতের ওপর মাথা রেখে লরেন অঘোরে ঘুমচ্ছে। বাড়ুম ঘুমের মধ্যে কেঁপে উঠল আচমকা। সন্তর্পণে লরেনের মাথা বালিশে নামিয়ে রেখে পুত্রের কপালে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিল শুদ্ধ। সকাল হতে আর কত দেরী? ছেলেবেলার মত ছুট্টে গিয়ে বাবাকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবার ছেলেমানুষি তাগিদ অনুভব করে শুদ্ধ। জরাদীর্ণ মুখে কেমন শান্তির পরশ লাগবে তা দেখার আকাঙ্খায় জালালার দিকে পাশ ফিরে একদৃষ্টে অন্ধকার তরল হওয়ার অপেক্ষায় থাকে সে।

[শুরুর ছবিঃ An Old Man and His Grandson দমেনিকো গিরাল্যান্দাইও (ইতালি ১৪৪৯-৯৪)]

ঢেউয়ের গানের শব্দ

শিবাংশু দে

১
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে
ওপারের থেকে;
সমুদ্রের কানে
কোন কথা কই আমি এই পারে- সে কি কিছু জানে?
আমিও তোমার মতো রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে
ঢেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার বার
তোমার আমার।" (কয়েকটি লাইন-ধূসর পাণ্ডুলিপি)

কিছু কিছু স্বপ্ন ছেলেবেলার মতো। পেরিয়ে আসার পর আবার ছুঁতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তারা আর ধরা দেয়না। শুধু সিপিয়া রঙের অ্যালবাম। আবছা হয়ে যায়। তবু হারিয়ে যায়না। পুরীর সমুদ্রতীর মানে আমাদের শাদাকালো ক্লিক-থ্রি ক্যামেরার চৌকো ফ্রেমে হাসিমুখ মা, প্রসন্ন বাবা, তিন ভাইবোনের ছুটোছুটি। পিছনে নিঃশব্দে বাজেন হেমন্ত, 'শেষ পর্যন্ত', এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু। কেন যে গৌরীপ্রসন্ন ষাটসালে 'লিখেছিনু' লেখেন? 'সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে আমি মুছিয়া গেলাম'। এই ইমেজারিটাকে মেলাবার বাধ্যতা ছিলো নাকি? রাতের সমুদ্রের পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজিৎ ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছেন সুলতা চৌধুরির জন্য। ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার ফেনা, ফসফরাস নিয়ে অন্ধকার বালিয়াড়িতে। আমাদের পুরী ছিলো এই সব কিছু ।

সাহেবরা পাঠালেন বোম্বাইতে। যাও, এদেশে ওর থেকে ভালো আর কোনো জায়গা নেই। যেকোনো বুদ্ধিমান লোকের ওখানেই সিদ্ধি, ওখানেই নির্বাণ। কিন্তু বোম্বাই তো আমাকে টানেনা কখনও। ঐ পোকামাকড়ের মতো ছুটন্ত মানুষের পিণ্ড আর হৃদয়হীন অ্যাসফাল্টের রাস্তায় অন্তহীন গাড়িঘোড়ার ছুটোছুটি। আমাদের ক্লান্ত করে। ভেবেচিন্তে বলি, হুজুর আমরা গাঁয়ের লোক। এখানে নিহায়ৎ অজনবি। আমারে ছাইর‍্যা দ্যান। তাঁরা হাসেন। আরে নির্বুদ্ধি, ছ'মাস থেকে যা। তার পর নিজেই কখনও যেতে চাইবি না। তবু বলি, ছাইর‍্যা দ্যান হুজুর। শেষে তাঁরা বলেন, তবে গাঁয়েই যা। ভুবনেশ্বর, বোম্বাই-হায়দরাবাদের সামনে গ্রাম ছাড়া আর কী? আমি তো পুলকিত। ভুবনেশ্বর মানে প্রতি সপ্তাহশেষে পুরী। দেশি সাহেবদের চোখে নোংরা, ক্যাওটিক, সাব-অল্টার্ন সমুদ্রে লাগামছাড়া বাঙালি পর্যটকের ঢল। দাদাবৌদির হোটেল আর ভেজা নাইটি পরা পৃথুলা বঙ্গরমণীদের অনন্ত শোভাযাত্রা। উপরি রয়েছেন জগড়নাথ প্রভুর করুণাময় দুটি চোখ আর মানুষের অশেষ ভিক্ষার অবসর। সব চলতা হ্যাঁয়। আমিও তো অমনই পাতি বাঙালি। মলাট দেখে হয়তো অন্যরকম লাগে। তবু সেটা তো মলাটই। প্রতি সপ্তাহশেষ হয়তো যাওয়া হয়নি। কিন্তু কতো বার গেছি এই চারবছরে তা গুণে ওঠা যাবেনা। যেদিন বিকেলবেলা আমার চেম্বারের মস্তো কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখি আকাশ কালো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। একটু পরেই ঝমঝম। নিচের পাঁচ নং জাতীয় সড়ক প্রায় ভাসাভাসি। একটু পরেই থেমে যায়। যেভাবে এসেছিলো, সেভাবেই বৃষ্টি ফিরে যায় নিজের বাড়ি। যেতে যেতে হাওয়াটাকে ঠান্ডা করে যাওয়া। জুড়িয়ে যাওয়া পুড়িয়ে দেওয়া সাতচল্লিশ ডিগ্রির আগুন জ্বালা। প্রাক বর্ষার জল ঝরা শুরু । আবহাওয়া দফতরের কথা মিলে যাওয়াটা কাকতালীয়। বর্ষা এলো, আর কী চাই?

পরদিন সকালে প্রাতরাশ টেবিলে একটু কথার কথা। ব্যস, ঠিক হয়ে যায় হপ্তাশেষের ছুটির নিমন্ত্রণ। যাওয়া হবে সমুদ্রের কাছে। অফিস থেকে একটু তাড়া করে ফিরে আসা। খাওয়া দাওয়া। সোয়া চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারলে রাস্তায় গাড়ির জাম অনেকটা এড়ানো যায়। বিকেলের আলো থাকতে থাকতে সোজা ' এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু'.....

মায়ের নেশা ছিলো, দুতিন দিন ছুটি পাওয়া গেলো, ব্যস, চলো পুরী। রাতের ট্রেন, খুর্দা রোডে ঘুম ভাঙাতো আড়কাঠি পান্ডা। ঘুমভাঙা চোখে বাবা'র স্বর, আমাদের পান্ডা আছে, ভারত সেবাশ্রম যাবো। সাক্ষীগোপাল,চন্দনপুর হয়ে ট্রেন পৌঁছে যেতো পুরী। তখন ছিলো প্রায় ঘুমন্ত এক রেলস্টেশন। নামাবলী,পৈতে আর সাইকেল রিক্শা। কিন্তু পুরী চিরকালই কমপ্লিট প্যাকেজ। ধর্ম,জিরাফ, বাজার, খাবার, সব নিয়ে বাঙালি যা চায়, 'সবকা উত্তম প্রবন্ধ হ্যাঁয়'.... ডাউন সাইড বলতেও তো তাই। এতো বেশি নানা মডেলের বাঙালির কিচিরমিচির,হাঁকডাক। এই মাপের শব্দদূষণ এদেশে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেনা।

২

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তইতা মোক্ষদায়িকা ।।

বেরোতে বেরোতে সোয়া চারটে। এই সময়টা লর্ড জগন্নাথের জ্বর হয়, তিনি প্রকাশ্যে দর্শন দেন না। তবু লোকের কমতি নেই। জগন্নাথের স্নানযাত্রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন। চন্দন যাত্রার শেষে প্রচুর হইচই বাদ্যভান্ড সহকারে তাঁরা তিন ভাইবোন স্নান করলেন সোনা কুঁয়ায়, মন্দিরের পূর্বদিকে। তার পরেই বেশ জ্বর এলো তাঁদের। সাধারনের দর্শন নিষেধ হলো। বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ সারাদিন বসে বসে দেবতার জন্য কবিরেজি ওষুধ বানাচ্ছেন,

খবরকাগজে রোজ সেই সব ছবি।
এর মধ্যেই দুরাত্তির সমুদ্রের কাছে ঘুরে আসা।

নবকলেবরের সময় তৈরি হয়েছে আলিশান রাজপথ। আমার বাড়ি থেকে ভোর ভোর বেরোতে পারলে পুরীর অতিথশালা গাড়িতে ঠিক এক ঘন্টা। কিন্তু চার বছর আগে ছবিটা ছিলো অন্যরকম। সেই সংকীর্ণ কটক-পুরী অসম্ভব জনবহুল পিচ রাস্তা। একদিকে গাড়ি এলে অন্যদিকে ধারে নেমে পড়া। সে রকম একটা সময় মেঘলা বিকেলে বেরোনো পুরীর পথে। রসুলগড়ের মোড় পেরোলুম ঠিক সাড়ে চারটে। যদিও গাড়ির ভিতরটা ঠান্ডা, কিন্তু বাইরের রোদেও প্রতীক্ষিত স্নিগ্ধতা কিছু ছিলো। তন্বী, কৃশা মেঘেরা যেন গা ধুয়ে এদিক ওদিক আকাশে অলসগামিনী। কটক-পুরী সড়ক যেন আজ আশাতিরিক্ত সহজ মুডে আছে। সাইকেল, বাইক, ভাঙ্গা লরি, টার্বো ট্রাক, কেউই যেন তোমাকে ধাক্কা দিতে আগ্রহী নয়। তবুও মনে মনে তো সতত গাইতে থাকা, 'ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার'। সাধুর সাবধানতা....

তীর্থ

নদীর পর উত্তরা পেরিয়ে ধৌলির মোড়। তার পরেই পুরী জেলা শুরু। তখনও চার লেনের রাস্তা তৈরি হচ্ছিলো এখানে। মাঝে মাঝে কাজ হয়ে গেছে, তবে বেশিটাই তখনও অসমাপ্ত। এই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেলে এক ঘন্টায় ভুবনেশ্বর থেকে পুরী। পিপলি একটা বড়ো গাঁট। বাই পাস তৈরি হচ্ছে। পিপলি বাজার এড়িয়ে রাস্তা বেরিয়ে যাবে একদিকে নিমাপাড়া হয়ে কোনার্ক আর ডানদিকে সাক্ষীগোপাল হয়ে পুরী। পিপলি বাজারের মোড় পথিকদের কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। একজন রোগা পুলিশ টুপি-লাঠি নিয়ে সিটি বাজিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার উপর উপচে পড়ছে

দোকানদানি। অ্যাপ্লিকের লন্ঠন, ব্যাগ আর দেওয়াল সজ্জা। বাঁদিকে কোণার্কের রাস্তা, ডানদিকে গেলে খুর্দা আর নাক বরাবর সাক্ষী গোপাল। এ জায়গাটাও আজ আশাতিরিক্ত সভ্য ব্যবহার করলো। সবার মনেই যেন আজ নবীন মেঘের রং লেগেছে।

রঘুরাজপুর পেরোলেই রাস্তার দুধারে ছায়াঘন বৃক্ষের সারি। এই পথ দিয়ে গত তিনহাজার বছর ধরে কে যায়নি? তীর্থযাত্রী, পুণ্যার্থী, বণিক, সৈনিক, রাজা, ভিখারি, নটী, বধূ, ভারতের আত্মা আর কোটি কোটি পেটরোগা বাঙালি। সতশঙ্খ পেরিয়ে সাক্ষীগোপাল, তারপর চন্দনপুরের রেললাইনের পার, মনে হয় এইতো পুরী পৌঁছে গেলুম। রাস্তার ধারে ডাবের স্তূপ। গাছ থেকে সদ্য পাড়া। চোখ বুজে চুমুক। মন ভরে।

বাঁদিকে বটমঙ্গলা মন্দির রেখে পুরী ঢোকার তেমাথা। ডানদিকের রাস্তা যাচ্ছে সাতপাড়া, চিলিকা আর বাঁদিকে গেলেই পুরী গ্র্যান্ড রোড, আঠারোনালা পেরিয়ে। আমি যাবো আমাদের অতিথিশালায়, চক্রতীর্থ রোডে। গ্র্যান্ড রোডের মোড় । একদিকে শ্রীমন্দির, অন্যদিকে গুণ্ডিচাবাড়ি। পেরিয়ে ভিআইপি রোড ধরে গন্তব্যে চলেছি, ডানদিকে জেল, তার পর হাসপাতাল রেখে। হঠাৎ দেখি রাস্তা বন্ধ। কাজ হচ্ছে। একটি পুলিশ ওড়িয়ায় বললো স্টেশন হয়ে ঘুরে যেতে।

বহুকাল পুরী স্টেশন আসিনি। বিশাল চক মেলানো আড়ম্বর তার এখন। উপরে গম্বুজ, গেরুয়া আর শাদা রং করা প্রাসাদ। চারদিকের ছোটো ছোটো দোকানপাট, বাড়িঘর, খর্ব আবহে , বেশ মহিমান্বিত তার দাঁড়িয়ে থাকা। তার পাশ দিয়ে জেলা ইশকুল পেরিয়ে সরু রাস্তা সোজা পৌঁছোচ্ছে চক্রতীর্থ রোড। সেখানেই আমাদের অতিথশালায় দুরাত্তির বাস। গাড়ি ঢুকিয়ে প্যাঁটরাটি ঘরে রেখে আমরা উধাও সমুদ্রের দিকে। রাস্তা যাচ্ছে বাঁদিকে চক্রতীর্থ বেলাভূমি রেখে, আরো এগিয়ে , যেখানে একলা পাথরের নেতাজি পশ্চিমমুখী হয়ে 'দিল্লি চলো' দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে বাঁদিকে ফিরে বিএন আর, আহা আমাদের ছোটোবেলার স্বপ্নের বি এন আর, বাইরে থেকে দেখতুম।
মনে পড়ে যায় সুনীলের,
'... ভিখিরিদের মতো চৌধুরিদের গেটে দঁড়িয়ে দেখেছি রাস উৎসব, অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা, কতো আমোদে মেতেছে, তারা আমার দিকে ফিরেও দেখেনি,
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস আমরাও একদিন...
বাবা আর নেই
আমাদেরও দেখা হয়নি....'

আজ হয়তো দেখতে যেতে পারি, কিন্তু সে আমিও আর নেই, নেই সেদিনের বি এন আর। যেখানে ঘরে বসে সমুদ্র দেখা যেতো একদিন। সবুজ খড়িদেওয়া সারি সারি ফরাসি জানালা, নারকেল বীথির ফাঁক দিয়ে ডাক দিতো। ভাবতাম সত্যজিৎ কি এখন এখানে আছেন, বা তপন সিংহ। বাঙালির শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলিকে বিশ্রাম দিতো ঐ সরাইখানার ঘরগুলি আর আমাদের মতো ইতরজনের স্বপ্ন জাগিয়ে রাখার ছলনা...
আজ তার নাম চাণক্য বি এন আর। বাঁদিকে রেখে এগিয়ে গেলেই ডানদিকে আমাদের অতিথশালা। সামনেই রাস্তার বাঁদিকে সেই প্রাসাদের মতো বাড়িটার কঙ্কাল। ছোটোবেলা থেকে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে গেলেই রিকশা থেকে চোখে পড়তো। চারদিক ফাঁকা নিসর্গের মাঝে একটা রোমান্টিক পোড়োবাড়ি। তখন তো রাস্তা থেকেই

বালিয়াড়ি শুরু। ডানদিকে সোজা সমুদ্রের জাঁকালো গর্জন। এখন হোটেল-মোটেল-বাড়িঘরের জঙ্গল। দেখাই যায়না তাকে। সমুদ্রও কেমন মিইয়ে গেছে মনে হয়। সে বাড়িটাও যেন গত আধশতকে পোড়োবাড়ি থেকে হানাবাড়ি। কিন্তু দেখলেই একটা টান টান রহস্যের ইশারা। এইতো পৌঁছে গেলুম....

৩

দেবতা হিসেবে জগন্নাথের একটা সম্পূর্ণ অন্যতর মাত্রা আছে ভারতবর্ষের কোটি কোটি দেবতার সমারোহে। অনার্য কিরাত জাতির পূজ্য একটি নিখুঁত সাররিয়ালিস্টিক বিগ্রহ, কীভাবে ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি পেয়ে বিষ্ণুর মর্যাদা পেলো তিন হাজার বছরের অভিযাত্রায়, খুব আকর্ষণীয় বিষয়। কিন্তু আমি সেদিন জগন্নাথে নেই, আছি তাঁর কোল ছাপানো বেলাভূমির ম্যাজিক বাস্তবতায়।

বলি, গাড়িটা এখানেই থাক। হেঁটেই যাই না হয় বিচে। মাতাপুত্রী রাজি, কিন্তু জানি অনেকটা রাস্তা, সবটা হেঁটে যাওয়া হয়তো হবেনা। মেফেয়ার আসতেই একটা অটো গা ঘেঁষে, স্বর্গদ্বার, স্বর্গদ্বার... চড়ে বসি। নামা হলো স্বর্গদ্বারের শ্মশানের পাশে, চৈতন্য যেখানে পাথর হয়ে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যাচ্ছেন। অসংখ্য শাড়িকাপড়ের দোকানপাট আর সারি সারি ঠেলাগাড়িতে ভেটকি, পার্শে, পমফ্রেট, চিংড়ি ভাজার দোকান। সন্ধের ঝোঁকে অগণিত ভোজনবিলাসী মত্ত হয়ে সেসবের সদ্গতি করে যাচ্ছেন। অনেকদিন আগের একটা গপ্পো মনে পড়ে গেলো। সেদিন ঐখানে বেড়াতে গিয়ে আমার স্ত্রী 'বায়না' ধরলেন মাছভাজা খাবেন। আমি খাওয়াদাওয়া নিয়ে বিশেষ স্পর্শকাতর নই, কিন্তু ঠিকঠাক বাঙালি নই বলে খাওয়ার ব্যাপারের ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধির বালাই বড়ো তাড়না করে। ভদ্রমহিলাকে নিরস্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। তখন অদূরে একটা অগ্নিকুন্ডের দিকে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, এই বাজারের মধ্যে কে অমন আগুন জ্বেলেছে। আমি বলি, ওটা হচ্ছে, 'আগুন আমার ভাই'...

-মানে?

-মানে... 'যেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে, এই নাচনে নাচবে রঙ্গে, সকল দাহ মিশবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই...'

-মানে???!!!

-মানে... ওখানে কারুর বালাই ঘোচানো হচ্ছে... ওটা বিখ্যাত স্বর্গদ্বার শ্মশান...

-অ্যাঁ...

-আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখছো না কেমন ছাই উড়ে এসে মাছভাজা গুলোকে গার্নিশ করছে, এমনি এমনি কি এতো স্বাদ হয়...?

-তিনি দৌড়োতে থাকেন, অথবা বলা যায় উড়তে থাকেন উল্টোদিকে।

তার পর থেকে যখনই সেইখানে যাই আমি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মাছভাজা খেতে অনুরোধ করি। এবারেও করলুম। কিন্তু তিনি যথারীতি ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবার আমি সমুদ্রের কাছে বসবো।

বালি ভেঙে ভেঙে যতোটা জলের কাছে যাওয়া যায়। সারি সারি চেয়ার পাতা। তাকেও এগিয়ে নিই একটু। বড়ো ব্রেকার গুলোর জল ভেঙে পড়ছে পায়ের কাছে। আর সেই আওয়াজ। মানুষ আর কতোটুকু নকল করতে পারে তাকে? ঢেউয়ে গানের শব্দ শুনেছিলেন জীবনানন্দ। সেই গান অহরহ। শ্রেষ্ঠতম ধ্রুপদশিল্পীও ভিখিরির

মতো অপেক্ষা করেন সারাজীবন। যদি ঐ পুকারের এক সহস্রাংশও কখনও কন্ঠে ধরা যায়।
জীবনানন্দ মনে পড়ে যাচ্ছিলো বারবার। ' অদ্ভুত হাওয়ার রাত ছিলো সেইদিন...'
সেই অনিমিখ অন্ধকার, অবিনীত জলোচ্ছ্বাস, জলজ লবণাক্ত উড়িয়ে দেওয়া মন জুড়োনো হিমহাওয়ার মাতামাতি, সমুদ্রের কাছে তো এই জন্যই আসা। মুখর ঊর্মিমালার কাছে উন্মুখ ছেঁড়াখোঁড়া মানুষ আমি, শুধু শুনি, বলার তো কিছু নেই।

৪

দু-এক মূহুর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধু সারস....

পুরী যাবো আর চক্রতীর্থের সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখবো না তাতো হতে পারেনা। তাই শোবার আগে এলারাম সাড়ে চারটেতে।পৌনে পাঁচটার মধ্যে সুজ্ঞিমামা বাড়ি ছাড়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন এখানে। এলারাম বাজিলেন ঘোর অন্ধকারে। ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে দেখি আকাশে ঘন ধূসর মেঘ আর টিপটিপ বৃষ্টি।বৃষ্টির দেবতার প্রতি সেই প্রথম একটু রাগ হলো। সূর্যোদয়ের পরেই না হয় মেঘ পাঠাতি।
সত্যি আমাদের দুমুখপনার তুলনা নেই। এই বারো ঘন্টা আগে পর্যন্ত হা মেঘ, জো মেঘ করেছে যে লোক, সে এখন মেঘ চাইছে না। সইত্য সেলুকস....

সাড়ে সাতটায় বিছানা ছাড়ে যে বান্দা ,তাকে যদি সাড়ে চারটেতে উঠতে হয় তবে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিকে আর বাঁধ দেওয়া যায়না। বাজার স্ট্র্যাটেজি একটু পাল্টে বেশ কোলাহল সহকারে সমুদ্রের উপর সূর্যের বদলে সমুদ্রের উপর মেঘ দেখতে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দেওয়া গেলো। পরের মেয়ে যদিও সামান্য অনিচ্ছে সহকারে উঠে পড়লেন, কিন্তু নিজের মেয়েতো সেই এক রক্ত। বিস্তর নহি ছোড়নে কা... । তবে উদ্যমে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়? ব্যাজারমুখে সেও উঠে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের পুরোনো ট্রেক, অর্থাৎ পান্থনিবাসের গলি দিয়ে ঢুকে চক্রতীর্থের ভেজা বালির পথ ধরে সোজা দক্ষিণে স্বর্গদ্বারের দিকে খালি পায়ে হাঁটা। এখন সেখানে একগাদা বিরাট বিরাট হোটেলের দানব প্রাসাদ। সেই রকম এক ছয় সকালে আকাশে নো আল্ট্রাভায়োলেট আর বাতাসে নো কার্বন ডাই অক্সাইড। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের সেই ঘোর অপছন্দের বাণীটিকে কয়েক মূহুর্তের জন্য সত্যি মনে হলো। মেঘের ছায়ায় শাঁওলি আকাশ।সমুদ্রের অন্যপার থেকে ধেয়ে আসা তুখোড় হাওয়া যেন গৌতম বুদ্ধের চোখের মতো করুণা স্নিগ্ধ হয়ে গেছে জলের প্রেমে। সোনালি বালির সুদূর বিস্তার আর নোনা জলের ছলকে ওঠা প্রিয়গামিনী উচ্ছ্বাস ...., পৃথিবীর থেকে অনেক পাওয়া এখনও বাকি থেকে গেছে।

কিন্তু দেশে সংগ্রামী জনতার কোনও অভাব তো নেই। বেশ ভাববিহ্বল হয়ে আমরা একবার জল,একবার বালি মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখি একজায়গায় বেশ ভিড়। লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলুম কোনও দুর্ঘটনা হলোনাতো।কাছে গিয়ে দেখি জেলে নৌকো থেকে মাছ নেমেছে আর নানা মডেলের 'নতুনদা'র দল তারসপ্তকে কই মাছের দরাদরি করছেন। কী আশ্চর্য? এনারা কী পুরীতে এইজন্য এসেছেন? যদি কই মাছ নিয়ে জীবনসংগ্রাম করারই ছিলো তবে কলকাতাতে করলেই হতো।এখানে কেন? পরে ভাবলুম, হয়তো

আমাদেরই পদ্যটদ্য করে মাথা বিগড়ে গেছে। জীবনের সার সত্যটা মাথায় ঢোকেনা।
আর একটু এগিয়ে পুরী হোটেলের সামনের বালিয়াড়িতে চেয়ার টেনে বসি। সমুদ্রকে অনুভব করার জন্য আমি কোনকালেই জলে নেমে হুটোপাটিতে স্বস্তি পাইনা। বিশেষত যখন দেখি শত শত নেয়াপাতি ভুঁড়ি,ডোরাকাটা অন্তর্বাস আর শুনি চীৎকৃত উপভোগের পরুষ কলরব। অথবা প্রায় বিয়েবাড়ির পোষাকে অথবা আজকের ফ্যাশন রেজ, মঙ্গলাহাটের ছাপা ছিটের 'ম্যাক্সি'তে আবৃত পৃথুলা রমণী দলের অর্গ্যাজমিক কোলাহল। বিদেশবাসী বন্ধুরা হয়তো বলতে পারবেন, সাহেব-মেমরাও কি সমুদ্রের জল ছোঁয়ার আতিশয্যে এরকম উচ্চকিত প্রতিক্রিয়া জানাতে চায়? না আমাদেরই রক্তে সমুদ্রের সঙ্গে এরকম ভুল উদযাপনের ব্যাধি রয়েছে। সমুদ্র স্নানের মতো একান্ত বিনোদন, যা শুধু নিজের সঙ্গেই উপভোগ করা যায় , তাকে এমত কার্নাল বিজ্ঞাপনে পর্যবসিত করা। কে জানে, যাদৃশী ভাবনা যস্য। হয়তো আমিই ভুল জানি। আনন্দ পেলেই হলো।

নজরদারী

৫

মেরিন ড্রাইভ থেকে পশ্চিমদিকে যে গলিগুলো সমান্তরাল বেরিয়ে যায়, সেগুলোতে বাঙালিদের রসনাতৃপ্তির সমূহ আয়োজন রয়েছে। এটা সবাই জানে।তবে ভোজনবিলাসীরা ঘুরে ঘুরে বাজার জরিপ করেন। সস্তায় অপুষ্টিকর বাঙালির খাবার কোথায় সবচে ভালো। অথেন্টিক ওড়িয়া ভোজনের সন্ধান চলছিল এতোদিন। গুগলটুগল করে পাওয়া গেলো তাকে শেষ পর্যন্ত। ঠেকটির নাম 'ওয়াইল্ড গ্রাস'।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন তবে সেখানেই করা যাবে এমত সিদ্ধান্ত নেওয়া গেলো। ঠেকটি ভি আই পি রোডে, চাঙ ওয়া'র পাশেই। দুপুরদিকে পৌঁছে দেখি বেশ জনসমাগম রয়েছে রোব্বার বলে। তবে এই জনতাকে মনে হলো স্থানীয় রসিকদের জামাত। একটু দূরেই জলকেলিক্লান্ত বাঙালি পর্যটকদের কোনও সন্ধান সেখানে নেই। রেস্তোঁরাটির

রূপসজ্জা বেশ রুচিসম্মত।চারদিকে বাগানে বেশ সবুজ সাজানো ল্যান্ডস্কেপিং করা আছে। ভিতরেও অনুচ্চকিত সহজ সজ্জা, মনোরম আবহ। তাদের ভোজনসূচিটিও বিশদ ও আকর্ষক। নানা পদের বিবরন রয়েছে সেখানে। সাদাসাপ্টা বেগুনপোড়ার বর্ণনাও ইংরিজিতে কতো মিস্টিক মুডে লেখা যেতে পারে সেটা লক্ষ্যনীয়। মাতাপুত্রী মিলে বেশ খানিকটা গবেষণা করে ঠিক করলো ঘিয়-অ আরন মাটন খাওয়া যাক। সোজা বাংলায় পুরোনোদিনের ঘিভাত (যা এখন বিশেষ বানাতে বা খেতে দেখিনা কাউকে) তার সঙ্গে বেশ পাপীগোছের মাংসের ঝোল। স্বীকার করতেই হবে রান্নাটা বেহতরিন। যদিও বহুকাল লালমাংস খাওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করেছি, কিন্তু সমূহ নরকবাসের সম্ভাবনা নিয়েও এই পদার্থ ছাড়া যায়না। ভেবেছিলুম নৈশভোজটিও সেখানে সারবো। কিন্তু রাজা রিপুদমন রাউতরায় সেজে রাতে আর ওমুখো হইনি। ও রকম গুরুভোজনের পর চাঙ ওয়ার ইন্দোচায়না ভোজই প্রশস্ত। পরের বারের জন্য সংরক্ষিত থাক আপাতত।

৬

এ পথে আমি যে গেছি বারবার ভুলিনি তো একদিনও....

কোনও যাওয়ার গল্পই তো ভুলে যাবার জন্য নয়। বেঁচে থাকাই তো কয়েকটিমাত্র মূহুর্তের ঊর্ণনাভজাল। তার সঙ্গে জড়াজড়ি করে জীবনটা কখন ফুস হয়ে যায় টেরও পাওয়া যায়না। এই জাল ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। আহিরভৈরবের কোমলঋষভ থেকে কোমলনিষাদের আরোহ যেমন বেজে ওঠে এক অলখ নিরঞ্জন ব্যান্ডমাস্টারের দৈবী ট্রাম্পেটে, কোনও এক অনন্তযাত্রার অনিঃশেষ আবহসঙ্গীত।

পরদিন ভোরবেলা সঙ্গিনীকে নিয়ে যাই এবারের মতো চক্রতীর্থের সূর্যোদয়কে বিদায় জানাতে। সূর্য কি জানতে পারে দুটো অপদার্থ অর্থহীন মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ভেজা বালুতে খালি পা ডুবিয়ে।

বোধ হয় জেনেছিলো। হঠাৎ ঘন ধূসর মেঘ থেকে উঁকি দিয়ে এক ঝলক আলো বলে উঠলো, আবার এসো, কথা আছে।

ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক-না হারা,
আবার জ্বলবে সাঁজে আঁধার-মাঝে
তারি নীরব চাওয়া.....

[ছবি: লেখক]

প্রতিধ্বনি

অমিত সেনগুপ্ত

একটা ভূতুড়ে ধূলোর কুন্ডলী পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল সূর্যের গনগনে আঁচে শুয়ে থাকা মাঠের ওপর, অনাবৃষ্টিতে জ্বলে খাক হয়ে পড়ে থাকা মাঠ।

যেন কেউ নির্দেশ দিয়েছে যে নিথর এ তল্লাটে কোন প্রাণের আভাসটুকু পর্যন্ত না থাকে। তাই এই মাটি, ছিল মোলায়েম সবুজের চাদর বেছানো ক্ষেত, এখন চাবড়া চাবড়া হয়ে পড়ে আছে মরণের দোরগোড়ায় বসে থাকা এক শীর্ণ বৃদ্ধের বলিরেখাময় মুখের মত।

মাটির বন্ধন ছাড়িয়ে আলগা হয়ে উঠে আসা যত ধূলোবালি ছন্নছাড়া এলোমেলো হাওয়ার ঘূর্ণিতে ভেসে ওঠে, নাচে গরম হাওয়ার সঙ্গতে। দূরে পেছনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মরা গাছের সিল্যুয়েট, আর তাদের ভাঙ্গা ডাল, কালো। গরম তাতের ভেতর দিয়ে ঠাহর করলে দূরের প্রান্তররেখা কাঁপে, চোখে ঘোর লাগে। যেন দেখা যায় মানুষের আবছা অবয়ব। মরীচিকার মত, কিন্তু তারা নড়ে, ধীরে এগোয়। প্রাণ, প্রাণের চিহ্ন এগিয়ে আসছে হাওয়ায় ভর করে, জীবনের স্পন্দনে। ওরা কারা?কি চায়?

পথকষ্টের বোঝা নিয়ে তারা এগোতে থাকে, প্রতিটি কষ্টকর পদক্ষেপের যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে তারা এগোতে থাকে একটু বিশ্রামের খোঁজে, অন্তত বেঁচে থাকা যায় এমন কোন জীবনের খোঁজে। তারা কাছে আসতে থাকে, তাদের ছায়া বড় হতে থাকে, তাদের চলার গতি আরও ধীর, তাদের প্রাণশক্তি আরও স্তিমিত মনে হতে থাকে। তাদের দৃষ্টি লক্ষ্যবিহীন, গন্তব্যহীন, তাদের কাছে সময় যেন অর্থহীন, স্থবির।

এখানে এক মরা শুকনো গাছের নীচে বসা কঙ্কালসার দেহটা আঁকড়ে ধরে আছে তার আদরের ছোট্ট শরীরটাকে। শুকনো স্তনের কিছুই দেবার নেই তার সন্তানটিকে। তবু চেষ্টা, অর্থহীন, দলা পাকানো যন্ত্রণা বুক বেয়ে ওঠে গলার কাছে, অলৌকিকের আশায়।

তার মাথা ঘোরে, চারিদিকের পৃথিবী দোলে, ছানিপড়া চোখের মত দৃষ্টিতে সবই আবছা লাগে। এগিয়ে আসা দলটার মধ্যে থেকে গোঙানির শব্দ আসে, তাকে ছাপিয়ে কান্নার আওয়াজও এসে ধাক্কা দেয়। ওরা যে এগিয়ে আসছে, সংখ্যায় অনেক, সকলের একই শুকনো চেহারা, জ্বলে যাওয়া, বালির ঝড়ে বিধ্বস্ত, এগিয়ে চলা মৃত্যুর মিছিল।

কি হবে?

সে এবার মুখ নীচু করে কোলের জীবনটার দিকে তাকালো অসহায়ভাবে।পালাবে? কিন্তু ওঠার শক্তিই নেই। দুর্বল, ভীষণ দুর্বল। তাই বসেই থাকে সে এক শূন্যতার মাঝে জীবনের শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায়। কিন্তু ভাবতে থাকে যে এইভাবে এগিয়ে আসা অহেতুক মৃত্যুকে সে মেনে নেবেনা। তার চোখে অসীম যন্ত্রণার চিহ্ন, যে বেদনায় চোখ ফাটিয়ে নামে জল, কিন্তু তার শুকনো চোখে ঝরে পড়ার মত একফোঁটা জলও আর অবশিষ্ট নেই। সুন্দরী সে ছিল। কোনকালে, মানে লোকে বলত। এখন শুকিয়ে যাওয়া পোড়াকাঠটি আঁকড়ে ধরে তার কোলের প্রাণীটিকে। দোল খাওয়াবার চেষ্টা করে, যেন সবই ঠিক আছে, আবার চেপে ধরে বুকের কাছে, হারানোর ভয়ে। আবার ভাবে সব হারানোর মুখোমুখি তারা, হার নিশ্চিত, মৃত্যু। এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। তবু হাত দিয়ে মাছি তাড়ায় শিশুটির শুকনো শ্লেষ্মা লেপা মুখের ওপর থেকে। একটু থামে, ভাবে আর কতক্ষণইবা, কোন লাভ নেই মাছিদের তাড়িয়ে, তারাও তো মৃত্যুরই মতই অমোঘ, এই মুহূর্তে।

তার শরীরের শক্তি নিঃশেষ মনে হয়, অসহায়ভাবে সে একবার দেখে নিজের কোলের দিকে, শিশুটি তাকিয়ে আছে, তার দৃষ্টিতে কত যন্ত্রণা, আহা। এই শিশু, তার একমাত্র সন্তান, তার সমস্ত ভালবাসায় ঘিরে রাখা সন্তান নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তের, শেষ মুহূর্তের। শরীরে শেষ শক্তি নিংড়ে নিয়ে, সব সাহসকে জড়ো করে সে তার শরীরের ওপরের বস্ত্রখন্ডটিকে সরিয়ে ফেলে, উন্মুক্ত হয় একটি শীর্ণ দেহ, শুকনো চামড়ায় জড়ানো হাড়ের খাঁচা।

তার হাত পৌঁছোয় তার শূন্য বুকে, মেলায় হারিয়ে যাওয়া পদপিষ্ট বাচ্চাছেলের ফাটা বেলুনের মত ঝুলে থাকা অকেজো স্তনে, অন্য হাতের শীর্ণ আঙ্গুলে তুলে ধরে বাচ্চাটার মাথা। সযত্নে নিয়ে আসে বুকের কাছে, যদিও জানে কোন আশা নেই। তবু ভাবে তার আদরের সন্তান যেন শেষ সুযোগ পায় একবার বেঁচে ওঠার, হেসে

ওঠার, খেলার ছলে হাত পা ছোঁড়ার।

শিশুটি তাকিয়ে থাকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে, অপলক চোখে। একটি মাছি মুখের চামড়া ছোঁয়, মাথাটা ঝোঁকে, মায়ের বুকের দিকে, জীবনের শেষ রসদের দিকে। মা সর্বশক্তি দিয়ে বৃন্তটি তার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ধরে শেষ আশায়, সে প্রাণপনে টানার চেষ্টা করে, মা ও শিশুর বেঁচে থাকার এ এক অভিনব যৌথ লড়াই। তাদের নড়াচড়া এবার স্তিমিত হয়ে আসে, ধীরে, আরও ধীরে। কোলেরটি এবার চোখ বোজে ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায়, জীবনের শেষ শক্তিবিন্দু নিংড়ে নিয়ে।

মেয়েটির চোখ জ্বালা করে, শ্রান্তিতে; এবার যখন সে চোখ বোজে, চোখের কোণা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল, প্রথম অশ্রুবিন্দু, অনেক অনেক দিন পরে। কোলের শিশুটিও শুয়ে আছে চোখ বুজে শেষ শান্তিতে। মেয়েটির গলা দিয়ে উঠে আসে গোঙ্গানি, তারপর জীবনে প্রথমবার মেয়েটি গেয়ে ওঠে মৃত্যুর বরফশীতল গান, গানের সুর ঘুরে বেড়ায় গরম হাওয়ার ঘূর্ণিতে, এগিয়ে আসা দলটাও যোগ দেয়, সেই করুণ সুরের প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে শুকনো মাঠে, কাঁদো প্রতিধ্বনি কাঁদো।
আর মাথার ওপরে সূর্য গনগনে তাপ ছড়াতে থাকে।

[দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক ইলান ওসেনড্রাইভারের ‘Echoing’ অবলম্বনে।]

আমেরিকা আবার, শেষবার

মোহিতলাল

মিলেনিয়াম পার্ক, শিকাগো

১

আগের বার গিয়েছিলাম বস্টনে, উত্তর গোলার্ধের ফেব্রুয়ারীতে , রাস্তার পাশে গাদা করা কাদা বরফ, হাড় কাঁপানো শীত, হালকা বৃষ্টির মাঝে। প্রথম দেড়দিন শহরে, ওরা বলে ডাউন টাউন, জেটল্যাগ কাটাতে তারপর দ্য গ্রেট হার্ভার্ড ইউনিতে। বাকী কদিন তো ওদের হোষ্টেলেই, এক বিল্ডিংএ থাকা, সেখান থেকে বেরিয়েই অন্য বিল্ডিংএ ক্লাশ। নাহ না হার্ভার্ড শুনে ভাবতে বসবেন না বিরাট কিছু একটা, তেমন কোন স্কলার নই

আমি, সেটা ছিল একজিকিউটিভ ডেভালপমেন্ট, মানে বড়দের পাঠশালা। একটু লেকচার একটু মেলামেশি, ককটেল। সব মিলিয়ে পাইয়ে দেয়া টাইপের। নতুবা আমার মতো আধা-পঢ় মিস্ত্রী হার্ভার্ডের চৌহদ্দিতে পা রাখে কোন সাহসে।

বস্টন প্রবাসের গল্প অন্য কোন দিন বলা যাবে তোলা থাক এখনকার মতো। আসলে শুরু করেছিলাম গল্প কিন্তু কোন কারণে দুপাতা লিখেই বন্ধ হয়ে যায় আমার চিরাচরিত সঙ্গী অলসতার কারণে। আর এসব জিনিশ গরম গরম লিখে ফেলাই ভাল, নতুবা ঝাপসা হয়ে আসে স্মৃতি, যোগ হয় মনের মাধুরী।

অতএব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কালে ফিরি। বিড়ালের ভাগ্যে আরও একবার আমেরিকা যাবার শিকে ছিঁড়েছিল এই সেপ্টেম্বরে, শিকাগোয় ইন্টারন্যাশনাল মেশিন টুলস মেলা দেখতে। যেটা কিনা আমার মত মানুষ যারা লোহা কেটে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কাছে মক্কা যাবার মতো। দ্য আলটিমেট পিলগ্রিমেজ। এটাই দ্বিতীয় এবং শেষবার; এই জীবনে আর হবে না সম্ভব। আমার যা শরীরের অবস্থা নিজে থেকে আমেরিকা যাবার ইনস্যুরেন্স করতে গেলে ভদ্রাসন বিক্রী করতে হবে, গৌরীসেনের খরচেই কেবল সম্ভব।

এবারের গল্পই আগে বলি, গরম গরম জিলিপির মতো। শুরু থেকেই শুরু করি। (আহা ইন্টেরিয়র কাফে তে নাসিরুদ্দিনের এই ডায়ালগ ও ডেলিভারি জীবনেও ভুলবো না) ।

২

অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের রাজধানী একটা শহর বটে। ছোট্ট , সাকুল্যে সাড়ে তিন লাখ লোকের বসতি। সরকারী শহরই বলা যায়, প্রতিটি তিনজনের একজনই পাবলিক সারভান্ট, মানে সরকারী চাকুরে। এখান থেকে কোন সরাসরি বিদেশী উড়ান নেই, সেই সাড়ে তিনশো কিমি ধেয়ে সিডনী থেকে। শহরটা একেবারে ড্রয়িং বোর্ড থেকে বানানো যেমন চন্ডীগড়। ব্যাপারটা একটু শরিকী রেষারেষি। ১৯০০ সালে যখন সাতটা বিভিন্ন কলোনী নিয়ে কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়ার জন্ম হলো তখন কোথায় রাজধানী হবে তাই নিয়ে সিডনী ও মেলবোর্নের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। সিডনীর পাল্লা ভারী ছিল, শেষমেশ আপোষ হলো এমন যায়গায় হোক যেটা কিনা সিডনীর ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে না হয়। অতএব এই রাজধানী। পার্লামেন্ট বসলে এমপি রা উড়ে আসেন, নিজেদের অ্যালাউন্সে বাড়ী ফ্ল্যাট ভাড়া করে, খরচ বাঁচাতে দুতিনজন ভাগাভাগি করে একই ফ্ল্যাটে। দেশের মতো নয় যে ল্যুটেনের বাংলো লুটে পুটে খাবেন।

তো রবিবারের ভোরে এয়ারপোর্ট পানে গন্তব্য সিডনী, মোটে ২৫ মিনিটের উড়ান কিন্তু বায়নাক্কা সব এয়ারপোর্টের মতো ই। কোনরকমে প্যাক করা। উফ এই প্যাকিং আমার অসহ্য লাগে। পরের বার বিয়ে করতে গেলে পাত্রী গৃহকর্মনিপুণার বদলে সুটকেশ প্যাক করতে দড় কিনা তার বিজ্ঞাপন দেবো। তার মানে এই নয় যে যখন তখন সুটকেশ গুছিয়ে 'ম্যায়কে' যাবার নিমিত্ত।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ঢাউস সুটকেশটা চালান করে দিয়ে যখন সিকিউরিটির ঝামেলায় ব্যস্ত, হঠাৎ মনে পড়লো, আমার সেই পুরানকালের ফোনটা সুটকেশে নেই তো। সেটা তো সোজা শিকাগোতে বুক করা। আর আমেরিকা যেতে যা নিরাপত্তার বলয়, ব্যাটারী সমেত মোবাইল ফোন, তাও অন করা; হয়ে গেল আমার যাত্রা। পাগলের

মত খুঁজেই যাচ্ছি- হাতব্যাগে, পকেটে। আসলে এত হ্যাপা এখানকার সরকারী নিয়মে। বিদেশ যেতে গেলে দুটো কনট্যাক্ট চ্যানেল থাকতেই হবে। একটা ইউনিভার্সাল রোমিং ফোন, অন্যটা ইমেল। মানে আমি বিপদে পড়লে যাতে যোগাযোগ করতে পারি। অফিসের সিকিউরিটি অফিসার একপ্রস্থ ব্রিফিং করে গেছেন। বিদেশে কিং কর্তব্য। জঙ্গী হানা হলে, আটকে পড়লে। মোটকথা আমার কাছে চার চারটে মোবাইল ডিভাইস। নিজের ফোন (আমেরিকায় গিয়ে লোক্যাল ফোন কার্ড ভরে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য), অফিসের স্মার্ট ফোন, আইপ্যাড ছবি তোলার জন্য আর ম্যাক এয়ার সাহিত্য ভ্রমণকাহিনী এইসব লেখার জন্য। মোটকথা ছেলের চেয়ে ছেলের পিলে ভারী। শেষ অবধি খুঁজে পাওয়া গেল কিন্তু ততক্ষণে এই শীতে বেশ ঘেমে উঠেছি।

৩

এমনিতে এরকম দেশ বিদেশ ঘোরার প্রয়োজন পড়ে না আমাদের মতো টেকনিকাল লোকেদের। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য একটু মগজ ঝালিয়ে নেয়া, চোখের দেখা কি সব কান্ড কারখানা হচ্ছে নতুন নতুন বিষয়ে, নইলে অন্তর্জাল তো সদাই হাজির। হোয়াই আমেরিকা? প্রতি দুবছর অন্তর শিকাগোতে মেলা বসে, সারা পৃথিবীর তাবড় তাবড় সব কোম্পানী দেখাতে আসে তাদের নতুন সব মেশিন পত্তর, ছোটখাটো কোম্পানীও থাকে। এ প্রায় শোনপুরের পশু মেলার মতো। লোক? প্রায় লাখখানেক হয়, আর একজিবিশান হল? উরেব্বাস। পুরো হাওড়া স্টেশনের সব প্ল্যাটফর্ম ধরে যাবে, নতুন পুরোনো সব বা তারও বেশী। এলাহি কান্ড। তিন তলা, নর্থ, সাউথ ইষ্ট, ওয়েষ্ট; তার ওপর এদিক সেদিক তো আছেই। বই মেলায় মিলন মেলা গ্রাউন্ডে যদি লোকে হাঁফিয়ে ওঠে তো এখানে! এরা বলেই দেয়, কম্ফর্টেবল জুতো পরে আসতে।

এনিওয়ে আগের কথায় ফিরি। সিডনী টু এলে উড়ান ১৫ ঘন্টার। অভ্যেস নেই, দেখি একসেট পাজামা লম্বা হাতা টী-শার্ট ধরিয়ে দিল। কি ব্যাপার? না প্যান্ট শার্ট ধরা চুড়ো পরে কি ঘুমোনো যায়। বোঝো কান্ড। এ সেই কলকাতা টু রাঁচী এক্সপ্রেসে আগেকার দিনের মতো। আমাদের অনেক সহযাত্রীকে দেখতাম, খড়গপুর ছাড়াতেই ধোপদুরস্ত পাটভাঙ্গা পাজামা পাঞ্জাবীতে বদলে, হোল্ড অলের ফিতে খুলে বিছানা করে শয়ন। নাহ, আমি কোনদিন ও রাস্তা মাড়াইনি। একে তো ঝামেলা আর এক রাত্তির প্যান্ট শার্ট পরে শুলে এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে; হাওয়া খেলানো? আরে মোলো যা! এখানেও দেখলাম অল্প কয়েকজন বদলে নিলো অফ বোথ সেক্স। আমি ভাবছি টয়লেটের ঐ স্বল্প পরিসরে জামাকাপড় বদলাতে গেলে বেসিনে, প্যানে, ড্রিপ সিঞ্চিত মেঝেতে জামা কাপড়ের কোনা লেগে তো যাবেই, এ ম্যা, তাই পরে শোয়া। অনেক হয়েছে ধ্যাষ্টামো। তা যাউকগা, তোমার ছাগল তুমি সামনে না পেছনের দিকে কাটবে তোমার ব্যাপার। তবে কিছু লুজ লুজ বেশিনীকে কিন্তু মন্দ লাগে না।

চোদ্দ ঘন্টা একটানা উড়ান , শেষ হতেই চায় না। ঐ বড়জোর আট ঘন্টা তাও বাড়ী যাবার সময় তাড়াতাড়ি কেটে যায়, ফেরার সময় যেন শেষ হতেই চায় না। বিজনেস ক্লাশের চেয়ার, কত তার কায়দা কানুন, এটা সেটা টিপে দেখছিলাম। এই এয়ারলাইন সীট পেটেন্ট দুনিয়ায় ভীষণ অ্যাক্টিভ বিষয়। কত কত যে নিত্যনতুন চেয়ার আবিষ্কার হয়েই চলেছে। এক তো কম্ফর্ট দুই কত চেয়ার ঐ মেঝেতে ঢোকানো যায়, , ঢোকাও, আইন বাঁচিয়ে যত bums on seat ততই আয়। অবশ্য সেসব ইকনমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে তো শুধু আরামই লক্ষ্য। আপাত দৃষ্টিতে এইসব নিপাট ভালমানুষ চেয়ারগুলোর পেটে কত কত linkage, ইলেকট্রিক মোটর কিছুই বোঝার উপায় নেই বাইরে থেকে। এবং সেগুলো বেশ ঘিচিমিচি কমপ্লিকেটেডও বটে।

সময় কাটতেই চায় না, ঘুম আর কতটুকু। আর খাবো ই বা কত, সারাক্ষণ অর্ডার করলেই তুরন্ত এসে যাচ্ছে এটা সেটা। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার একটা বিশাল মুখবন্ধ টিউবের মধ্যে কত কত উঁচু দিয়ে পাড়ি দিচ্ছি সব ঐ টেকনোলজির ওপর ভরসা করে। চারপা থেকে দুপায়ে যবে থেকে মানুষ হাঁটতে শিখলো, দুটো হাত ফ্রী হয়ে গেল, মগজ তো ছিলই আগে শুরু হয়ে গেল এটা সেটা আবিষ্কার করা, সে ই নেশা চলছে তো চলছেই।

৪

অবশেষে দীর্ঘ উড়ান শেষে লস এঞ্জেলেস। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। না খুব একটা মনে দাগ কাটে না। সিঙ্গাপুর চাঙ্গি'র সাথে তুলনাতেই আসে না। যে যাই বলুক না কেন সিঙ্গাপুর দেখলে খুব গর্ব হয়, আমরাও পারি। মাটি ছুঁতেই তড়িঘড়ি ছুটতে শুরু, কারণ শিকাগো যাবার উড়ানের মধ্যে ফারাক মাত্র ঘন্টা তিনেক, যত আগে ইমিগ্রেশন থেকে বেরোতে পারবো ততটাই সময় বেশী পাবো, সেখানে এক নেট বন্ধুর সাথে মুখোমুখি গল্প করার। কথা আছে, ইমেল চালাচালি হয়েছে গত মাস দুয়েক ধরেই।

প্রায় পাঁচশো লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, লাইন এগোচ্ছে লাইনের গতিতে। যদিও সরকারী পাশপোর্ট কিন্তু এলিয়েন তো বটি। ওহ, নতুন একটা শব্দ শেখা গেল, টেন প্রিন্ট মানে দশ আঙুলের টিপ সই। বারাসাত রেজেষ্ট্রী অফিসে মুহুরী ধরে ছাপ নেওয়ালো আর ধরিয়ে দিলো কালি মোছার ন্যাকড়া। মনে মনে গালি দিচ্ছিলাম, এ আবার কি রে বাপু, এক আঙুলে মিটলো না! তা দেখি পৃথিবীর উন্নততম দেশেও দশ অঙ্গুলী! কে বলে 'অঙ্গুলী করনা' অশুভ!

হন্তদন্ত হয়ে বাইরে পদার্পণ, মুক্ত আলোকে, মুক্ত বাতাসে। গাড়ীর শব্দ, লোকজন ব্যস্ত পৃথিবীর এক টুকরো ঝলক। কোন কারণ নেই, বিলেত, ফরেন ফরেন করে কেমন একটা মোহময় ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই self sufficient হবার কালে, দেশে থাকতে। আর বিদেশী, ফরেন ভোগ্যবস্তুর জন্য জিভ লকলক করতো। থাঙ্কিউ, রাও সাব, প্রধানমন্ত্রীজী বিধিনিষেধের গেট খুলে দেবার জন্য।
চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার নেট বন্ধুকে, কই আমাদের মতো কাউকে তো দেখতে পাচ্ছিনে, প্রথমবার ভেট হবে একটু উত্তেজনা তো ছিলই। তাঁর সস্ত্রীক আসবার কথা। শুধু উপহার সামগ্রী কিনতে আমি একদিন ছুটি নিয়ে একাই গাড়ী চালিয়ে গেছি সেই নান টিয়েন টেম্পলে, তিনশো পঞ্চাশ কিমি দূরে। দামী নয় কিন্তু সেখানে অতীব মনোহারী মিনা করা পেন্ডান্ট মেলে পিতলের অবশ্য। কেন, আর কি উপহার খুঁজে পাইনি, আসলে আমি চেয়েছিলাম একটু আনকা কিছু, সেখানে গেলেই একটা দুটো কিনে রাখি, উপহার হিসাবে ঐ গিল্টিকরা গহনা অতুলনীয়। আর এরকম eccentric খেয়ালের বশবর্তী হওয়াতে আমার বিলক্ষণ নাম আছে।

এতক্ষণ ফোন বন্ধ ছিল, মেসেজ পাঠাতেই দু:খপ্রকাশ, তিনি জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন, অতএব , ফির কভি।একটু যে নিরাশ হইনি তা নয়। আসলে একটা সাসপেন্স কাজ করছিল কিনা। এই নয় যে প্রথমবার প্রেমিকার মুখোমুখি হতে যাবার টানটান উত্তেজনা কিন্তু এত ইমেল চালাচালি করে শেষ অবধি ফক্কা! অফিসেও একটু নাম খারাপ হয়ে গেছে এই নিয়ে। আমি ঘ্যান ঘ্যান করেছি LA তে যেন একটু বেশী সময় যাতে পাই পরের উড়ান ধরার মাঝে। সরকারী অফিস, কত নিয়ম কানুনের বেড়াজাল। শ দুয়েক এক্সট্রা টাকা লাগতো, আমি গাঁট থেকে দিতেও রাজী ছিলাম, ব্যাপারটা বড় সাহেবের অ্যাপ্রুভাল অবধি পৌঁছোয়, তিনি নিজে আমার

ঘরে এসে দু:খ প্রকাশ করে গেলেন, আমি দিতে চাইলেও সরকার তা গ্রহণ করতে পারেন না। ধ্যুস, মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেষ অবধি, এই!

৫

আমেরিকার এয়ারপোর্টগুলো বড্ড কেজো টাইপের, আমি তো কুল্লে চারটে দেখেছি, এলে, ডালাস, বস্টন আর শিকাগো। আমার মন্তব্য ঠিক নাও হতে পারে। এলে'র অ্যারাইভাল হল তো বৃহৎ গুদাম বিশেষ, অন্ধকার সেখানে কাটেই না। মাইলের পর মাইল সেখানে নিজের গেট অবধি পৌঁছোতে হাঁটতে হয়, না আছে ট্রাভেলেটর না কিছু। বড্ড কাঠখোট্টা ধরণের। হয়তো ট্রাফিক বেশী বলেই। শিকাগো ও ডালাস, এত নীচু ছাদ যে আরও ঘুপচি লাগে। মরুকগে, আমি কতই বা যাই বা যাবো, আমার ভারী বয়েই গেল। বলেই ফেলি, আটকে যদি পড়তেই হয় তো সিঙ্গাপুরে বা সুবর্ণভূমি ব্যাঙ্ককে। প্রথমটাতে আমি এক মাস বাইরে না বেরিয়েও আরামে কাটাতে পারি। চা কফি তো জলের দাম, পৃথিবীর কোথাও দু ডলারে এক কাপ কফি মিলবে না এমনকি আমাদের অতি প্রিয় এনেসসিবিআই তে। সেখানে তো যে কাগজের কাপে দেয়, তার তুলনায় খবরের কাগজের ঠোঙ্গা অনেক শক্তপোক্ত। স্বাদের কথা ছেড়েই দিলাম। সেই ক-অ-বে হাওড়া স্টেশনের কফি হাউসে (?) জীবনের প্রথম কফি খাই চার আনা দিয়ে, তার চেয়েও জঘন্য।

এলে থেকে আমার গন্তব্য শিকাগো O'Hare এই ও হেয়ার মানে হেয়ারের পুত্র পদবী কার নামে তা এখনও জানা হয়নি। পৃথিবীর অনেক কিছুই তো জানি না, নিশ্চয়ই কেউকেটা কেউ হবেন। আমি ঠিক কিনা জানি না, সেই যে নিউ ইয়র্ক JFK নাম দেওয়া শুরু হলো সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে, যথা রাঁচী বিরষা মুন্ডা হাওয়াই আড্ডা।

আগেই বলেছি সরকারী নোকরের বিনা পয়সাতেও ফার্ষ্টক্লাশে উত্তরণ না মুমকীন। আমায় নতুন যে বোর্ডিং পাশ দেয়া হলো, তাতে দেখি জ্বল জ্বল করছে, First class। অন্য সময় হলে আনন্দে লেজ খাড়া হয়ে যেত কিন্তু এই ক্ষেত্র ভিন্ন। হায়রে, কি করে জবাবদিহি করবো, 'হুজুর, আমি জেনেশুনে পাপ করিনি'। কেউ শুনবে বলে মনে হয় না। কাচুমাচু করে সার্ভিস কাউন্টারে গিয়ে বললাম, চাইনা আমি ফার্ষ্ট ক্লাশ, দাও ফিরে সেই বিজনেস বা ওয়াই ক্লাশ। এই বয়সে চাকরী গেলে খাবো কি করে, দো ওয়াক্ত কি রোটি?

যাইহোক, তিনি বললেন এই উড়ানে ফার্ষ্ট ও ইকনমির মধ্যে আর কোন ক্লাশই নেই, মায় আমেরিকাতেই নেই। তা বেশ, সুপার রিচ ও গরীব কেবল দুটো ক্লাশ। ভারতীয় রেল তো আরও এক কাঠি ওপরে। নো থার্ড ক্লাশ। আমি তবু বললাম, জোড়হাতে,'তুমি যদি আধলাইন আমার বোর্ডিং পাশের উলটোপিঠে লিখে দাও তো আপকী বড়ী কৃপা হোগী'। তিনি দেখলেন, ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রী, একটু দয়া হলো। টিপিক্যাল ভারতীয় মনোভাবে আর বলিনি, সই করে দাও বা স্ট্যাম্প মেরে দাও। শুধু নামটা নোট করে নিলাম, আর সময় ও তারিখ। তারিখ? তারিখ তো টাইম মেশিনে উলটো দিকে যাচ্ছে। ওতেই চলবে; আসলে দরকার ছিল না। একটা মিনিটস দিয়ে সই করে দিলেই যথেষ্ঠ হতো, কিন্তু সারাটা জীবন ঐ গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অ্যাটেস্ট করেই তো কাটালাম। যেন গেজেটেড হলে ধর্মপুত্তুর। তবে এই নিয়ে একটা গল্প মনে পড়লো। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। তখন সদ্য সদ্য পাশ করেছি, চাকরীর জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি। আমার একদা রুমমেটের সঙ্গে কোন এক ইন্টারভিউতে দেখা, ওয়েটিং হলে। কথায় কথায় বললাম, জানিস বারবার ঐ গেজেটেড অফিসারের সই করাবার আর দরকার নেই, আমি কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের একটা রাবার স্ট্যাম্প বানিয়ে নিয়েছি এক

টাকা বারো আনা দিয়ে। আমাদের গভর্নমেন্ট কলেজ। সে ছোঁড়া বলে কি, আরে রাখ, আমি কলেজের প্রিন্সিপালের নামে স্ট্যাম্প বানিয়েছি, এই দ্যাখ, বলে ফোল্ডার ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল। আমি তো তাকে চিনি, 'গুরু মান লিয়া'।

৬

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের জাহাজগুলো আমাদের দেশের টিনের বাসগুলোর মতো। নো ফ্রিলস। নারকেলের ছোবড়ার গদি, ঠিক তাই নয় তবে এক্সট্রাপোলেট করলে যা দাঁড়ায়। আগেরবার তাই দেখেছিলাম। সেটা ছিল ইকনমি। মনে হয়না তাতে উঁচু ক্লাশ ছিল। অথবা এমন হতে পারে হার্ভার্ডের খাঁকতি মেটাতে গিয়ে আমাদের অফিস ঐ করে খরচ বাঁচিয়েছে যাতে বাজেট না টপকায়। পার ডে ২০০০ ডলার ফ্ল্যাট রেট ওখানকার ট্রেনিং এর। ওরা পৃথিবীর সকলকে মার্কেটিং থেকে সব কিছুতে জ্ঞান বিতরণ করে, আপনি আচরি ধর্ম ও প্র্যাকটিশ করেন। তো আমেরিকান এয়ারলাইন্সে সেবার খাবার দাবারের বালাই ছিল না, জল তেষ্টা পেয়েছে, জলের বোতল চাইবো অনেক ভেবে চেয়েই বসলাম। দাম জিজ্ঞেস করতে বললো- ফ্রী। আমি ভাবতে বসেছিলাম, ঐ ৬০০ মিলি জলের জন্য দশ ডলার না হেঁকে বসে!

এবার তো ফার্স্টক্লাশ। না ব্যবস্থা মন্দ নয়, নিজস্ব খুপরী। তবে এয়ারবাস A380 র মতো বিলাসবহুল নয়, না না চড়িনি, সিডনীতে ওদের মেন্টেন্যান্স বেসে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়েছিলাম বছর খানেক আগে। এসব কুঠরী জিয়েফ টিয়েফ সঙ্গী থাকলে তবেই না জমে! আগের সতেরো ঘন্টা আধ ঘুম আধজাগা, তাই একটু তন্দ্রা মতো ই এসেছিল। লী কুয়ান ইউ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ট্র্যান্স আটলান্টিক concordএ যাচ্ছেন আর ভাবছেন, এই কয়েকশো যাত্রীর মধ্যে তিনিই একমাত্র যে কিনা গরুর গাড়ীর ওয়াগনকে যানবাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমি ভজুয়া তেলী, ভাবছিলাম, 'কর লে বেটা ফুটানি, ছটা ছয়ের বনগাঁ লোকালের কথা ভুলে মেরে দিলি?' অথবা শীতকালে যখন বিলের মুখে নদী শুকিয়ে যেত, বেশ কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হতো। মামার বাড়ী যাওয়ার সময় মায়ের সঙ্গে চেপেছি দু একবার।খুব টুং, টাং শব্দ হচ্ছে, প্লেনটার ডানাগুলো একটু কাঁপছে, মানে নীচে নামছি আর কি। ওয়েলকাম টু শিকাগো O'Hare।

৭

এই এক ভারী জ্বালাতন, কোথায় কোন ক্যারুসেলে মাল তুলবে দেবা ন জানন্তি। বহু পথ, বহু গেট পেরিয়ে চলছি তো চলছি। ট্যাঁশ আমেরিকান উচ্চারণের কলরবে মুখর বিকেলের এয়ারপোর্ট। ডাইরেকশন তেমন ফুলপ্রুফ নয়। তীরগুলো দু এক জায়গায় দ্ব্যর্থক, জিজ্ঞেস করার মতো কাউকে দেখিনে। আর লক্ষ্য করছি বড্ড লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছি। ও হরি, এ তো উল্টোদেশে পৌঁছে গেছি, কিপ টু দ্য রাইট। আমার ডি -এন-এ তো সর্বদাই বাম দিকে অভ্যস্ত, বাম ভাবনায় জড়িত। ধাক্কা তো লাগবেই। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে। তিন চারদিন সময় লাগলো ধাতস্থ হতে, তাও মাঝে মাঝেই, সিঁড়ি দিয়ে নামতে অপ্রস্তুত অবস্থা। এই জন্যেই ওদের দেশের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, ওবামা সবাই বাঁহাতি?

ব্যাগপত্তর নিয়ে এবার সমস্যা কেমনে ডাকি ট্যাক্সি। কোথায় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এনেসসিবিআই হলে নো সমস্যা, তারা কিছু বলবার আগেই মালপত্র ডিকিতে ওঠাবার জন্য এক পায়ে খাড়া। আগে তো তুলে নিই, ভাড়ার বাঁশ পরে দিলেও চলবে! একজায়গায় দেখি শাটল ট্যাক্সির বুথ। ভয়ে ভয়ে বললাম, কোথায় পাবো তারে? আসলে

ক্যারুসেলের পাশে বড় বড় করে আনসলিসিটেড রাইডের অফার না নিতে চেতাবনী দেয়া, তাতেই তো আরও ঘাবড়ে গেছি। পয়সা বেশী নিক, বিল তো দেবে, তা হলেই হলো; অফিসের ক্রেডিটকার্ড। আর টিপস দেওয়াও না মুমকীন নয়, টিপস নেওয়া ইয়েস! শিকাগো সম্বন্ধে লোকে যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, আসবার আগেরদিনই তো টিভিতে দেখাচ্ছিল, সেখানে গতবছর যতলোক গান ভায়োলেন্সে মারা গেছে পুরো ইরাকের যুদ্ধে তত সেনা মারা পড়েনি। সেখানে নাকি দিনে দুপুরে ছিনতাই হয়, গুলি চলে।

ট্যাক্সিওয়ালা ভাই আবার আমি যে হোটেলের নাম বলছি তা চেনেও না। তার দোষ নেই, সেটি যে একটি অনামা হোটেল ক্রমশ: প্রকাশ্য। ঠিকানা লেখা কাগজটা দিতেই কাজ হলো। আসলে হয়েছে কি, এই সময় ঐ মেলা উপলক্ষে প্রায় লাখ খানেক লোক এই শহরে এসে হাজির হয়। মেলা কতৃপক্ষ ফ্রী শাটল বাসের ব্যবস্থা করে। তাই হোটেলগুলো সব সিটির মধ্যে, ওদের ভাষায় ডাউনটাউনে। এক এক ক্লাস্টারে এক একটা রুট। ব্যবস্থা মন্দ নয়, একেবারে flawless, যে কদিন ঐ বাসে গেছি কোনও অসুবিধে হয়নি। রুট চার্ট, কোথায় থামবে সবই পূর্বনির্ধারিত, কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। আমাদের অফিস থেকে তাদের মাধ্যমেই হোটেল বুক করেছে। একটু দেরী করে ফেলেছে, ফলে হোটেলটি যাকে বলে অগামারা। তবে খুবই convenient লোকেশন। সব কিছুই হাতের মধ্যে, হাঁটা পথের মধ্যে। ভাল রেস্টুরেন্ট বড় গ্রসারী সুপারমার্কেট সব কিছুই। প্রথমদিন একটু কিন্তু কিন্তু করছিলাম, অফিসে ফোন করবো কিনা; পরে ভেবে দেখলাম মোটে তো এক সপ্তাহ, ফালতু শোরগোল তুলে কি লাভ, এর চেয়েও খারাপ হোটেলে, শিয়ালদার নোংরা মেসে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। তার ওপর জখন লস এঞ্জেলেসে বেশীক্ষণ থাকার জন্যে দরবার করতে গিয়ে অলরেডি বিরাগভাজন হয়েছি।

আসলে এটি একটি ব্যাকপ্যাকার্স হোটেল টাইপের, অধিকাংশ ঘরই চার চারটে বাঙ্ক বেডের, মেয়েদের আলাদা ছেলেদের আলাদা, সেই ঘরের মধ্যে অবশ্য অ্যাটাচড বাথ। আবার কিছু কিছু ডরমিটরি আছে সেখানে কমন বাথ। এবং আমার মত পার্টির জন্যে সিঙ্গল রুম , যেমনটি হোটেলে হয়ে থাকে, তবে ঘুপচি কিন্তু বিছানা পত্র, বাথরুম ঝকঝকে। একতলাতে ভেতরের দিকে একটা বার, কিছু সোফাপাতা হল মতো, সেখানে বেশ ঝিং চাক মিউজিক অনেক রাত অবধি, সন্ধে হতেই ভিড় বাড়তে শুরু করে। আর ব্যাকপ্যাকার্স দের বা ঐ ধরণের ট্যাটু মার্কা লোকজন চেক-ইন চেক-আউট করছেই সারাদিন ধরে। অল্প কিছু ঘর দুটো তিনটে তলা বোধ হয় হোটেলের মত ঘর। একতলাতে আবার কম্যুনিটি কিচেন। বেশ নতুন এক অভিজ্ঞতা। সব কিছুরই ভাল কিছু থাকে। বলছি পরে।

৮

ঘরে ঢুকেই তো মাথা ঘুরে পড়ার মতো অবস্থা। জল নেই, নেই কোন জল খাবার গেলাস, বার ফ্রীজ তো সম্রাট সম্রাট শাহজাহানের বিলাসিতার সমতুল। পুঁটলি পোঁটলা খুলে ভাবছি কিং কর্তব্য অত:পরম। শরীরও আর বইছে না। তবে আবহাওয়া মনোরম; প্রথম প্রথম ফারেনহাইটে আন্দাজ করতে পারছিলাম না, সেই F-32X 5/9 না কি যেন করতে মন চাইছিল না। আজব দেশ বটে, ফারেনহাইট, মাইল, কোয়ার্টার মাইল, পাউন্ডে ওজন; সব কিছু গুলিয়ে গেছে। বস্টনে অসুবিধে হয়নি, হার্ভার্ড বলে কথা, লোকজন এমনকি অ্যাডমিন স্টাফও শিক্ষিত। এ তো ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল! এসেছি শীতের দেশ থেকে , আহা হালকা ২৩-২৪ সেলসিয়াসে মনে পুলক জাগারই কথা। ট্রেডমার্ক হাফ পেন্টলুন আর কালো শার্ট পরে বেরোলাম, জল ও এটা সেটার সন্ধানে। জলের বোতল কিনবো কিন্তু সে কোথায়? এদিকে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। রিসেপশানে বলতেই

মেয়েটি (অবশ্যই মেয়েটিকে, ছেলেটিকে নয়) দেখালো আধ মিনিট হেঁটে গেলেই সুপার মার্কেট। তবে জল নাকি নীচে বেসমেন্টে কিচেনে আছে, বুঝলাম না, কিচেনই বা কি, কেন!

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে কত যে সত্যি! ঢুকলাম সেখানে, সেই চিরপরিচিত দৃশ্য। জল বাছতেই লেগে গেল প্রায় দশ মিনিট, কি ধরণের জল, কত লিটার, কত দাম হিসেব করতে তো সময় লাগে। নাকি? মাইরি জলেরও ভ্যারাইটি! না না আমি রঙ্গীন বা এরেটেড ওয়াটারের কথা বলছি না, প্লেন জল, টিউকল চিপলে যে জল ওঠে অথবা কলকাতার রাস্তায় বিনা স্টপকক ওয়ালা নল থেকে পড়েই যায়। ওহ, তার আগে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছি কোথায় ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, রাস্তায় বেরোনো নিরাপদ কিনা। মেয়েটি ভয় ভাঙাবার জন্যে বললো, আমি মেয়ে হয়ে যদি রাত দশটায় নিরাপদে ঘুরতে পারি তুমি কেন নয়? 'তুমি ভাই, লোক্যাল। আমি পরদেশী'। সে বললো, এই সেরেছে, আমি এসেছি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কাজের খোঁজে, এখানে তোমার মতই পরদেশী। বুঝলাম, হোটেলগুলোতে হঠাৎ ভিড় সামলাতে লেবার ইমপোর্ট করেছে দূরদুরান্ত থেকে। জল ও টেক অ্যাওয়ে কন্টেনারে স্যালাড মিশ্রণ ভরে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। রেস্টুরেন্ট পড়ে মরুক, কে যাচ্ছে, ক্ষিধেও তেমন নেই। স্যালাডে কি না ভরিনি, ডিমের সাদা, চিকেন রোষ্ট, অলিভ, লাল পেঁয়াজকুচি, এটা সেটা। মন্দ নয়, ৪ ডলারে ডিনার সমাপ্ত। রেজগি ও তেমন চিনি না, সেখানে এক পয়সারও চল আছে; আমাদের তো কমকরে পাঁচ পয়সা আর ৫ টাকার নোট। আমেরিকায় তো দিব্যি এক ডলারের নোটের ছড়াছড়ি। আসলে জিনিষপত্র এমন শস্তা!

বাড়ীতে একটা ফোন, কোম্পানীর ফোনে। সেখানেও চিত্তির। স্মার্ট ফোনে অভ্যেস নেই, কিছুতেই (+) লিখতে পারি না, কল করবো কি করে? আমার তো মান্ধাতা আমলের ফোন। শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে, কন্ট্যাক্টসে গিয়ে প্লাস চিহ্ন দিতে পারলাম। বন্ধুগণ, খুব হাসাহাসি করছেন তো? এবার শুনুন তবে। পুরানো টেকনোলজির উপকারিতা।
ঘড়ি তো নেই, আসবার আগে খুঁজে পেতে আদ্যিকালের সোনালি চেন ওয়ালা, দম দেওয়া , সোনালী ঘড়িটা পেলাম। তাতে দম দিতে হয়। গলাবন্ধ কোটে যেমনটি বোতাম ঘর থেকে পকেটস্থ থাকে। তাইই সই। কলারের ঘরে আটকে বুকপকেটে চালান। LA অবধি দীর্ঘ উড়ানে প্যান্ট্রির কাছে একটু হাত পা খেলাচ্ছি, ঘড়ি দেখতেই বিমানবালা বললেন, বাহ বেশ তো। আসলে তাঁরও তো সময় কাটানোর দরকার, সকলে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি বললাম, এই নাও, দ্যাখো। চেন আমার কলারে আটকানো, ঘড়ি তাঁর হাতে। নির্দোষ ফ্লার্টিং কি একেই বলে?

৯

পরদিন রবিবার, অফিসিয়ালি জেটল্যাগ কাটিয়ে ওঠবার জন্য ফ্রী একটা দিন। এইবারও আমেরিকা আমার পোষায়নি, ওরা আমাদের চাইতে ১৫ ঘন্টা পিছিয়ে আর সেটাতেই আমার কলকব্জা সব বিদ্রোহ করে, গতবারও, এবারেও। সকালে উঠতেই দেরী, কথামত কিচেনে ঢুঁ মারলাম, রিসেপশান থেকে ইকড়ি মিকড়ি কি সব বললো। ঘরটা বন্ধই থাকে সকালবেলাটা ছাড়া। পরে অবশ্য দরজার কার্ড দিয়ে খোলা যায়। কয়েকটা গোল টেবিল, চেয়ার, টিভি, দুটো ফ্রীজ, স্টোভ আর ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের silo। দুধ, জুস সবই অন দ্য হাউস। আছে কলা, অরেঞ্জ ও আপেলও। ব্যবস্থা মন্দ নয়। একটি মহিলা, হোটেলের ইউনিফর্ম পরা, প্লেট কাটলারী ওয়াশার থেকে ধুয়ে নিয়ে আসছে। এদের দেখি সিরিয়ালে খুব ভক্তি, ডিমের কোন চলন নেই। পরে অবশ্য আমি নিজেই এক বাক্স ডিম এনে মজুত করি ফ্রীজে, নাম লেখার জন্য টেক্সটারও সেখানে। এত লোক চলা ফেরা করছে, উঠে

চা কফি আনছে কোন হট্টগোল নেই। ওহ, এই ব্যাপার, ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। তারপর থেকে নো লুকিং ব্যাক। অধিকাংশ লোকজন দেখি গলায় মেলার আইডি লটকানো- এটা পরদিন সোমবারে। অস্ট্রেলিয়ানদের মতো আমেরিকানদের খেজুরে আলাপ করার অভ্যেস নেই, সবাই দেখি স্পীকটি নট। আসলে আমাদের এখানে সেই প্রথম থেকেই লোকজন কম, দুশো, তিনশো লোকের ছোট শহর সব, বড় মেট্রো শহর বাদ দিলে। কান্ট্রিতে মানে গ্রামে তো একটা পরিবার মাসের পর মাস একাই থাকে। সেজন্যেই বোধহয় এদের বসুধৈব কুটুম্বকম। অচেনা লোকের সঙ্গে গল্প ফেঁদে বসে। এমন এমন ফার্মও আছে মালিক ও ক্যাজুয়াল কাজের লোক মিলে বড়জোর পাঁচ জন। বউ এর প্রসব বেদনা উঠলো তো চলো পানসী, গাড়ী নিয়ে নিকটস্থ হাসপাতাল ৫০০ কিমি দূরে। সপ্তাহে একবার ছোট প্লেনে চেপে ডাক্তার আসে, ফ্লায়িং ডক্টর সার্ভিস। ডাক্তার নিজেই প্লেন চালিয়ে আসে।

বেলা দশটায় জমিয়ে ব্রেকফাষ্ট সাঁটা হলো। আবার ঘুম, ঘুম। একটা নাগাদ ভাবলাম ঘুরেই আসি। কাল থেকে তো চাক্কি পিসিং আছেই। রিসেপশানে সেই মেয়েটি ও অন্য একজন। দ্বিতীয়জন লোক্যাল, দ্রষ্টব্য কি কি তার ফিরিস্তি দিলো। এখানেই বলে রাখি, আমি খুব ট্যুরিস্টি টাইপের লোক নই, ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে, এটা দেখলাম, সেটা দেখে টিক মারার মানসিকতা নেই। বেসিক্যালি অলস, আর কালীদা সেই কারণেই জীবনে কিছুই করা হয়ে উঠলো না। সবই নেক্সট লাইফের জন্য তোলা রয়েছে। নাহ পরের বার আর মানুষ হবার হ্যাপা পোষাবে না, বড্ড চিন্তা করতে হয়, শয়তান মুখে- মধু- পেটে- বিষ লোকেদের সামনা করতে হয়, ফুটানি ওয়ালাদের বাকতাল্লা সহ্য করতে হয়। এসব কিসের জন্য? আমি নেই তো বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কিছুই নেই, ফালতু নিজেকে কষ্ট দেয়া। দরকার নেই আর মানুষ হয়ে। পাখী হলে বেশ হয়, যথা মাছরাঙা; এ জন্মে বাঙ্গালী হোনেকে নাতে মাছের প্রতি দুর্বলতা তো থাকবেই। কিছুই করিব না, মৎস ধরিবো খাইবো সুখে।

শিকাগো খুব গোছানো শহর, grid পদ্ধতিতে ব্লক, রাস্তা। একটা জিরো পয়েন্ট আছে তার পরিপেক্ষিতে সব রাস্তার কো-অর্ডিনেট। সেখান থেকে নর্থ, সাউথ ইত্যাদি। ঠিক মাথায় ঢোকেনি তবে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। 900 N মিশিগান এভেন্যু বললে লোকে ঠিক বুঝে নেবে জায়গাটা কোথায়। N মানে নর্থ, সব রাস্তারই আগে N, S. E, W লাগানো থাকে। আমি আবার দিক কানা। নর্থ, ইষ্ট ওয়েষ্ট বুঝি না। দক্ষিণ বা পূব হলে আমাদের গ্রামের বাড়ীর কো-অর্ডিনেটে চলে যাই মনে মনে। সাউথ মানে বাড়ীর সামনে, গ্রীষ্মকালে মধুর বাতাস নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আসে, ইষ্ট হলো পূর্ব পাকিস্তানের দিকে, বাঁ দিকে, সূর্য্য যেদিক থেকে ওঠে সকালে, মুসলমান পাড়ার দিক থেকে। এইটা পেয়ে গেলেই নর্থ, ওয়েষ্ট কোন সমস্যাই নয়।

গন্তব্য গ্যালারী অফ কনটেম্পোরারী আর্ট, সবই নর্থে। তার আগে অবশ্য লোক্যাল ফোন কার্ড কিনতে হবে, বন্ধুদের সাথে গল্প করতে হবে। অফিসের রোমিং ফোনে কোন বিধিনিষেধ নেই, তবু আমি করবো লোক্যাল কল, তা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসবে শুধু শুধু, বিবেকে লাগে।
খুঁজতে খুঁজতে এক বিশাল শপিং সেন্টারে হাজির। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, রাস্তাঘাটে লোকজন থাকলেও দোকান পত্তরে ভিড় নেই বললেই চলে। তবে রবিবারের বাজার রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়। পরে দেখলাম এই শহরে লোকজন বেশ রেস্টুরেন্ট প্রিয়, সবদিনই ভিড়, আর রেস্টুরেন্টের সংখ্যাও কম নয়, এখানে সেখানে সর্বত্র। দোকানে , সে আবার অনেক তলায়, আমিই একমাত্র খরিদ্দার। লোকজনই নেই, আবার কেউ জিজ্ঞেস করলেও ঠিকমত জবাব দেয় না। বাঁ দিকের escalator নীচে নামে ডানদিকেরটা ওপরে ওঠে, সেই একই কল, কীপ টু দ্য রাইট। ফুটপাথেও তাই। ফোনের দোকানে খুব কাচুমাচু করে বললাম, আমি অল্প কয়েকদিনের অতিথি,

কোন সিমকার্ড মিলবে? কি, কেন কিছুই বলতে হলো না। ওরাই- দোকানে দুটি মাত্র মেয়ে একটি সাদা অন্যটি কালো, বোঝালো তুমি ৩০ ডলারের কার্ড কেন, তোমার পক্ষে ঠিক হবে, ৩০ মিনিটে কানেকশন পেয়ে যাবে। আমি তো পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে গেছি, আইডি তো লাগবেই। নো নাথিং, কিচ্ছুটির প্রয়োজন নেই। আমি তো থ, কন্যে বলে কি! ইহা সত্য। পরে ভেবে দেখলাম, যে দেশে দোকানে গিয়েই বন্দুক, পিস্তল কিনে ফেরা যায় ফুলকপি কেনার মতো, সেখানে ফোনের সিম তো নস্যি।

আবার হন্টন। গ্যালারীতে পৌঁছোলাম তখন প্রায় তিনটে বাজে, আর ঘন্টা খানেক বাদেই বন্ধ হবে, মিছামিছি কেন কিছু টাকা গচ্চা দেওয়া। বেশ লাগছে কিন্তু, আমি কোন হরিদাস মিশিগান এভেন্যুতে হেঁটে বেড়াচ্ছি, যেন রাঁচী মেন রোড বা ব্যাঙ্গালোরের এমজি রোড। যেন কত যুগ ধরে এখানেই আছি। সত্যি শহরটাকে খুব ভাল লেগে গেছে এই একদিনেই যেমনটা লেগেছিল বম্বেতে এম-টেকের অ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে গিয়ে, লাভ অ্যাট ফার্ষ্ট সাইট।

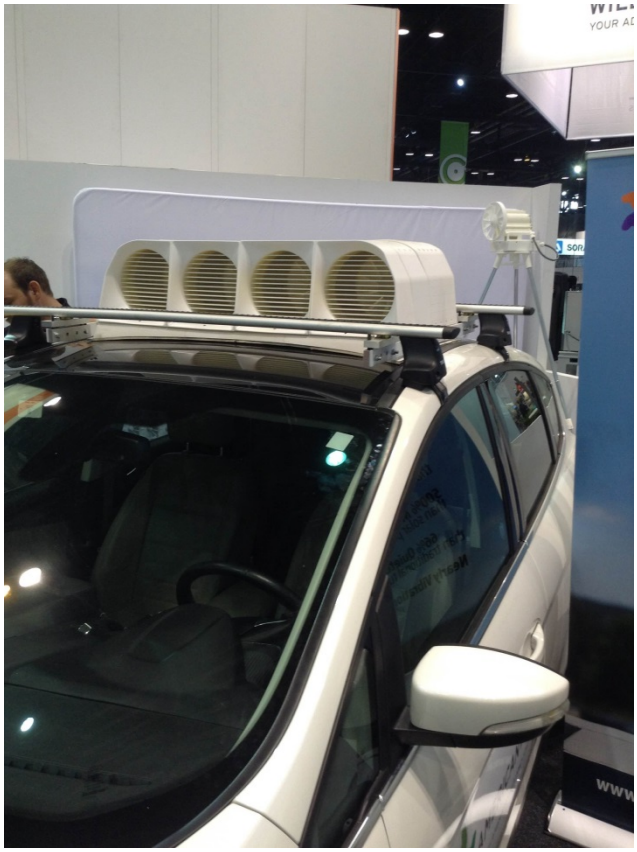

একজিবিশনে হাইব্রিড গাড়ী, তার ওপর হাওয়া কল

১০

বেশ লাগছিল কিন্তু হাঁটতে। এবারের লক্ষ্য Navy pier দ্রষ্টব্য স্থান বলে নাম আছে। হোটেল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার চলে এসেছি, দেখাই যাক, এত hype কিসের জন্য। আসলে লেক মিশিগানের পাশে প্রমেনাড, রেস্টুরেন্ট,বেশ কিছুটা বাঁধানো জায়গা, লোকজন, বাচ্চা কাচ্চা, বেশ একটা মেলা মেলা পরিবেশ, ছুটির দিনের গঙ্গার ধার। এখানেই প্রথম ঠোক্করটা খেলাম। ৪২ ডলারে নদী ভ্রমণ। দেখেই আসি কি না কি। একেবারে গালে চড় মেরে, একটা ছোট্ট খাল মতো, ওটাই নাকি শিকাগো রিভার, লঞ্চে করে ঘোরালো, অমুক বিল্ডিং, তমুক বিল্ডিং। নিউ ইয়র্ক দেখিনি তবে শিকাগোর হাই রাইজ বিল্ডিং দেখবার মতো, একটু পরে এক ঘেঁয়ে লাগে যদিও, সবচেয়ে যেটা ভাল লাগলো তা হলো একদম খাড়া সরল রেখা আকাশপানে উঠে গেছে, কিছু কিছু ইঁটের দেওয়াল (ফলস?) দেখে ব্রিকলেয়ারদেরকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। নিখুঁত অ্যালাইনমেন্ট। শহরের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ী (ওরা বলে Metra) চলে গেছে, অধিকাংশ মাটির ওপর দিয়ে, আমি চড়িনি, সময় সুযোগ ও সাহস হয়নি। মজার জিনিষ হলো, ওপরে স্কাইস্ক্রেপার তার গ্রাউন্ড ফ্লোর দিয়ে রেললাইন পাতা। রেল কোম্পানী আকাশ বেচেছে নাকি বাড়ীওয়ালা একতলা বেচেছে কে জানে। ভাবি কলকাতায় মেট্রোর পথ নিয়ে কত ঝামেলা আর এখানে। প্রানের শহর তিলোত্তমা হোক সকলেই চায় বাট নট ইন মাই ব্যাকইয়ার্ড!

ঘুরে তো বেড়াচ্ছি অথচ রাত আটটায় ডিনারের নিমন্ত্রণ একজন প্রথিতযশা বাঙ্গালী শিক্ষাবিদ কাম ঐতিহাসিকের বাড়ীতে। নামটা আর উল্লেখ করলাম না, সকলেই একবাক্যে চিনবেন। এখানে থাকতে দু একবার এর ওর বাড়ীতে ডিনারে দেখা সাক্ষাত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে গল্পও করেছি, তিনি আমাদের গানও শুনিয়েছেন। পন্ডিত লোক কিন্তু অমায়িক। পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন বছর দশেক হবে বোধহয়। ওখানে যাচ্ছি, একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে ভালই লাগবে; আমার জানারও ইচ্ছে কিছু ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে কোন সূত্র ধরে এগোবো, অ্যামেচার কৌতুহল; বহুদিন ধরে জানবার ইচ্ছে আমরা ঐ গ্রামে কোথা থেকে কি করে বসতি করলাম।

একটু হঠকারিতা হয়ে গেছে, রাস্তা চিনি না তেমন করে সবে প্রথম (দ্বিতীয়) দিন। একবার ভাবলাম সোজা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাই। ওঁকে দেবার জন্যে সামান্য উপহারও সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছি। এদিকে হোটেলে ফিরতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, কোথায় তেইশ নম্বরে যাবো তা না আমি ১৫০ নম্বরে। আসলে ফুটপাথ দিয়ে বার কয়েক হোটেলের সামনে দিয়েই গেছি, আই লেভেলে কোন বোর্ড নেই, নাম দেখতে গেলে অন্য ফুটপাথে বা রাস্তা থেকে। ছি, ছি দেরী করে ফেলেছি। ফোন করবো করবো করেও করিনি, ওদিকে রোক চেপে গেছে, হোটেলটা খুঁজে পাবো না তাই কি হয়, সন্ধেও হয়ে গেছে, একই ফুটপাথ দিয়ে বার বার যাচ্ছি একটু ভয়ও করছে। অবশেষে হোটেলের ঘরে পৌঁছে ফোন করে শুনি, আমার দেরী দেখে আর যোগাযোগ না করতে পেরে তিনি খেয়ে নিয়েছেন তার শারীরিক কারণে। দুদিন বাদে তাঁর সুইডেন যাবার কথা, অতএব এ যাত্রা হলো না। কি লজ্জা, কি লজ্জা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারার লজ্জা। এদেশে এলে অবশ্যই জানাবেন, এই বলে ঘটনার ইতি।

১১

যে কারণে এতদূর উড়ে আসা। আজ সেই মহামেলার শুরু। কিচেনে ব্রেকফাষ্টে দেখি বেশকিছু পাবলিকের গলায় মেলার আইডি ঝোলানো ব্যাজ। এদের কাজ নিখুঁত, আগেই পোষ্টে আইডি পাঠিয়ে দিয়েছিল, ম্যাপ, কোথায় কোন হলে কি, ইন্টারনেট সাইটে নিজের পাতা। এইটাতে আমি বেশ ফাঁকি মেরেছি, স্টেজে মারবো বলে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম প্লেনে WiFi পাবো, বসে বসে বানিয়ে নেবো আমার প্ল্যান, কোথায় কোথায় যাবো। ধ্যুস ওয়াই ফাই এর বালাই নেই। অফিসের কম্প্যুটার নিলেই ভাল করতাম কিন্তু নিজেরটা বয়ে এনেছি । সবই , উলটে গেল; শ্যাম রাধা সকলি! দেখুন জনগণ, আগে আগে কেয়া হোতা হ্যায়।

কোন স্টপে শাটল থামবে বলা ছিল কিন্তু এদেশে তো সবই উলটো। বাস থামে রাস্তার ডানদিকে, মাথা ঠান্ডা না রাখলে সব গুলিয়ে যাবে। তা গলায় ব্যাজওয়ালা পাবলিকদের জটলা দেখে সমস্যা মিটলো। কিরকম অদ্ভূত নিয়মে সব গাড়ী চলছে, অনুধাবন করার চেষ্টা করছি, ওভারটেক লেন বাঁয়ে। সারা শহরে মাঝে মাঝে আন্ডারপাস, পুক পাক করে দুশো আড়াইশো মিটারের টানেলে বাস ঢুকে পড়ছে, ওপরে রেল লাইন। রেল বাসের এমন পিরীত সচরাচর দেখা যায় না, আমি দেখিনি। মিনিট কুড়ির পথ, রেল ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে এদিক সেদিক করে শেষে মেলা প্রাঙ্গণে। কোন শহরের আন্ডার-বেলী না দেখলে দেখা সম্পূর্ণ হয় না, জনগণ প্লীজ আমার মুখে কথা গুঁজে দেবেন না। এই রেলইয়ার্ডের পাশে স্তুপীকৃত স্লীপার, এটা সেটা, বিশ্রামরত ইঞ্জিন, ছড়ানো ছেটানো বগী, মালবাবুর অফিস। বেশ লাগে কিন্তু। মেলবোর্ন সেন্ট্রাল বলুন বা হাওড়া , ট্রেন স্টেশন পেরোলে বাড়ীর ব্যাকইয়ার্ডের পেছন দিয়ে লাইন পাতা, গাদা করা পুরোনো আসবাব, ভাঙ্গা বেড়া, চালে লতানো পুইঁশাক; মানে 'জীবন যেরকম' সব জায়গাতেই এক।

এটা পার্মানেন্ট একজিবিশান সেন্টার। পেল্লায় সব হল, বাস আড্ডা, ফোয়ারা, ভলান্টিয়ারে ছয়লাপ। তুলনা দেবার মতো কোন মেলায় যাবার সুযোগ আমার ঘটেনি, এখানেও এগ্রি-মেশিনারী শো দেখতে গেছি, মাইনিং মেশিনারীর মেলাও। কিন্তু এর সাথে কারুর তুলনা হয় না। প্রায় চাঙ্গি এয়ারপোর্টের একটা টার্মিনাল।

এইবার নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে, সেরেছে আগে থেকে পড়া করে এলে ভাল হতো। বৎস, কীপ কুল। আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে একতলার রিসেপশান হলেই একটা কম্প্যুটার টার্মিনালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখানেই নর্থ, সাউথ, ইষ্ট দিয়ে ডাইরেকশন। আগে জানলে একটা পকেট কম্পাস নিয়ে বাড়ী থেকে বের হতাম। সারা পৃথিবীর নামী দামে সব কোম্পানী তাদের লেটেষ্ট ডেভলপমেন্টের পশরা দেখাতে এনেছে, এসেছে সারা দুনিয়া ঝেঁটিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত সব শিক্ষিত, আধা শিক্ষিত মিস্ত্রী। এসেছেন বিভিন্ন নামকরা টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের মাষ্টার। অলিম্পিকের সঙ্গে কিছুটা তুলনা হয় বোধহয়। পাতি পাবলিকের জ্ঞাতার্থে জানাই এটি বিশেষ করে লোহা কেটে পার্টস বানাবার প্রযুক্তির ওপর। সেই লেদ মেশিনের উন্নততর সব টেকনিক, ভাই, ভায়রাভাই ইত্যাদি। এসব বলে বিরক্ত করতে চাই না। আমি তো আবার অল্পবুদ্ধি এবিষয়ে। তবে জনগণ জানলে আঁতকে উঠবেন, এই সবের অধিকাংশ কাস্টমার হলো গোলা, গুলি, বন্ধুক, কামান মানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি আর গাড়ী তৈরীর কোম্পানী।

যুদ্ধ। আমার প্রমোশন, আমাদের বোনাস অর্থাৎ আমাদের বউ ছেলেমেয়ের পুজোর দামী জারদৌসি, ফুকেতে ভ্রমণ নির্ভর করছে সে অদৃশ্য শত্রুর স্ত্রীরা কি নিঁখুত ভাবে বিধবা হন, ছেলেমেয়েরা পিতৃহীন হন তার ফন্দী এঁটে। এবং উল্টোটাও সত্যি। দিস ইজ লাইফ, মিষ্টার কালীদা!

ঘুরছি তো ঘুরছিই, এ স্টল থেকে অন্য স্টলে, চকিত চমকে কি তার দেখা বোঝার সময় মেলে; ঐ একটু আইডিয়া, ব্যস। বাকীটা brochure, পেন ড্রাইভ থেকে। সব স্টলই দেদার হস্তে বিলোয়। একেবারে রথের মেলার মতো ভিড়। ওরা বলেই দিয়েছিল, ধরাচুড়ো না পরে কম্ফর্টেবল জামা জুতো পরে আসতে, হাঁটতে তো হবেই মাইলের পর মাইল আক্ষরিক অর্থে। ভাগ্যিস একটু বাছগোছ করে নিয়েছিলাম! মিলনমেলার মতো কোন কোন স্টলমালিক দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে জলের বোতলও বিলোচ্ছে। আরে, নামকরা সব কোম্পানী, অঢেল তাদের রিসোর্স। সন্ধের আগে, মেলার ঝাঁপ বন্ধ করার আগে তো এখানে সেখানে ফ্রী হ্যাপি আওয়ার।
প্রথম দিন তো তালে গোলে লাঞ্চ মিস। মেলা কতৃপক্ষ ঢুকতেই একটা লাঞ্চ কুপনের কার্ড ধরিয়ে দিয়েছিল, এটা অবশ্য স্পেশাল, সে কথা থাক। কিন্তু যখন খেয়াল হলো তখন ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে লাঞ্চ হলের। হলের মধ্যে সার্ভিং কাউন্টার, কোনটা প্যাসিফিক এলাকার খাবার, কোনটায় ইটালিয়ান, কোনটায় অমুক তমুক। এখানে সিস্টেম হলো খাবার প্লেটে নিয়ে তারপর পয়সার কাউন্টারে। যত দাম ঐ কার্ড থেকে খসে যাবে। বাব্বা, ব্যবস্থা বটে; সারাবছর ধরে বোধকরি বেশ কিছু লোক এইসবই করে। কোন রকম বিচ্যুতি চোখে পড়েনি।

পরদিন অবশ্য আর মিস করিনি, ঝাঁপ তুলতেই হাজির, চিকেন আর মাশরুম দিয়ে ঝোল, কোন দেশীয় রান্না কে জানে পরপর তিনদিন ওটাই খেয়েছি। সিঙ্গল ট্র্যাক মাইন্ড?

১২

সন্ধেবেলাটা কিছুই করবার নেই, দামী হোটেল হলে তবু ঘরে বসে আয়েস করে কাটানো যেত, এদের ঘর তো ঘুপচি, জানালা দিয়েও কিছু দেখবার নেই। নীচে বারে গিয়ে বসবো কিন্তু সেখানে তো একেবার হিপ হপ, ট্যাটুখচিত জেন-Y এর ভিড়, উদ্দাম মিউজিক, আধো অন্ধকার, সোফাগুলো খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়, তার ওপর আমি একা। বিদেশ বিভুঁয়ে সতর্কতা অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত। যা সব পার্টি, আমায় চোখ রাঙিয়ে বললেই আমি ওয়ালেট হাতে তুলে দিতাম। ইংরেজী হলেও বা কি আমার কাছে সিলেটি বাংলার মতো। আজ আর শঠে শাঠ্যং ডিনার নয়। রিসেপশানই বললো কাছেই মেক্সিক্যান রেস্টুরেন্ট, ঠিক পিছনের ব্লকেই। এদের এই ব্লক সিস্টেমটা আমার খুব মনে ধরেছে। আমি যে শহরে থাকি সেটি প্ল্যানড এবং মহামান্য আর্কিটেক্ট ছোট রাস্তাগুলোকে লুপ বানিয়েছেন। মানে, মেন রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা বেরিয়ে কিছুটা বেড় দিয়ে আবার বেশ কিছুটা দূরে সেই মেন রাস্তাতেই এসে মিশেছে। গ্রাম ছাড়া ঐ আঁকা বাঁকা পথের মতো। যেমন ধরুন আপনি ওলাবিবি লেনে ঢুকবেন , মেন রাস্তা বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট থেকে ওলাবিবি লেন বেরিয়ে আবার বঙ্কিমেই এসে মিশেছে। এমনকি ওলাবিবিতে যেতে আপনি কোন এন্ট্রান্সে ঢুকবেন, না জানা থাকলে হাতড়ে বেড়াবেন। হারিয়ে গেলে কো-অর্ডিনেট ধরে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সেই ভুল ভুলাইয়ার মতো একেবারে।
আমেরিকা বড় শস্তাগন্ডার দেশ। খাবার রেস্টুরেন্ট আমাদের তুলনায় জলের দাম। সাধেই তারা সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ করে বেড়ান! বালবাচ্চা যাতে সুখে ঘরকন্না করতে পারে সেই জন্যেই তো।

বিশাল বড় হলের মতো রেস্টুরেন্ট। ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা। উঁচু না নীচু টেবিলে বসতে চাই? ঠিক বুঝলাম না, একে গাঁয়ের মানুষ, আমি যে শহরে থাকি সেটা প্রায় গাঁ, তার ওপর রেস্টুরেন্টে যাওয়ার খুব একটা অভ্যেস নেই। আসলে হাই বার স্টুল টাইপের লম্বা টেবিলের চারপাশে, চার বা ছ'জন বন্ধুবান্ধব মিলে গজল্লা করবার পক্ষে উত্তম, একেবারে বারের সামনে না বসে। অন্যগুলো যেমনটি হয় তবে সিঙ্গল চেয়ার নয়, সোফা টাইপের বেঞ্চি। আমি একা।প্রথম যখন শিকাগো যাবার খবর পেলাম আনন্দে আটখানা হয়ে কাছাকাছি কোন বন্ধুরা

থাকে গুগল কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: শিকাগো থেকে ড্রাইভিং দূরত্বে থাকা এক পরিবার ব্যক্তিগত জরুরী কাজে আটকে পড়লেন, অন্য আর একটি পরিবারের সাথে ইমেল যোগাযোগ কোন কারণে কেটে গেল। সেই ঐতিহাসিকের নিমন্ত্রণও মিস করেছি আগেই লিখেছি। মোটকথা এযাত্রা আমার কপালটাই খারাপ। তাই কি?

ভাগনী আসবে বলেছিল, ওখানে ইউনিতে পড়তে গেছে, মামা ভাড়াও দেবে টিকিট কিনবে সব ঠিকঠাক। সে ছাত্র হিসাবে বিনা পয়সায় মেলাতেও ঢুকতে পারতো, তার পড়ার লাইনে অনেক কিছু দেখারও ছিল। মামার তো পকেট গরম, খাওয়াতে মামার তো প্রায় কোন খরচই নেই। অফিস আবার উদার, তাদের লোকজন যেন বিদেশে থাকে দুধেভাতে, বেশ ভাল অ্যালাউন্সও দেয়! কিন্তু বাদ সাধলো ঐ হোটেল, ঘরে এক্সট্রা বেড দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই, মিথ্যে বলেনি, ঐ তো ঘুপচি ঘর। যদি জানতাম ওটাতে বাঙ্ক ভাড়া পাওয়া যায় তাহলে মামা ভাগনী পালটা পাল্টি করেও নিতে পারতাম। অন্য হোটেলে তাকে রাখার ঝামেলা, পাবো কিনা জানিনা। আর আমার অভিজ্ঞতা হলো এসব ব্যাপারে নিজে কিছুই না করাই ভাল, অফিস থেকে যা ব্যবস্থা করবে গুড বয়ের মতো মেনে নিলেই হলো, নতুবা বেগড়বাই কিছু হলে, দোষ আমার ঘাড়েই বর্তাবে। সেধে নো টেকিং বাঁশ! ভাগনীকে প্রবোধ দিলাম, ছুটিতে বরং এখানে আসিস বেশী দিনের জন্য, মামা দেবে টিকিটের দাম।

টেবিলে বসতেই, এক জামবাটি কর্ন চিপস ও দুটো ছোট বাটিতে সালসা, টক টোম্যাটোর ও তেঁতুলগোলা অন্যটা। এই জিনিষটা বেশ লাগলো। এটা অন দ্য হাউস, ফ্রী। খদ্দের এসে হাপিত্যেশ করে বসে থাকবে কখন খাবার আসবে বরং কিছু তো চেবাতে থাকো। কর্ন চিপসের পরিমাণও কম নয়। এখানে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে নগদ দু ডলার দিয়ে পাঁপড়ের অর্ডার দিলে, ঠিক গুনে গুনে দুটি ধরিয়ে দেবে, মানে যত পারো ধসিয়ে নাও। ফ্রীতে কিছুই নয়, অথচ দাম বেশী ও খাবারের পরিমাণও কৃপণের মতো। বস্টন থেকে চন্দনা বলে দিয়েছে মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে কি অর্ডার দেয়া যায়। চন্দনাদের পুরো গুষ্ঠি আমেরিকায়, আগেরবার ওদের সরস্বতী পুজোয় বিশাল আকারের ইলিশ মাছের পীস সাঁটিয়ে এসেছি। পৃথিবীর যত ভাল জিনিষ সব আমেরিকাতেই গিয়ে হাজির হয়, সে মহান আইনস্টাইনই হোন বা পৌনে দুকেজি ওজনের পদ্মার ইলিশই হোক। পয়সা থাকলে কি না হয়। টাকমাথা অ-সংস্কৃতিমনস্ক অথচ বিত্তবানদের গলাতেই সুন্দরীগণ মালা দেন। বিত্তভোগ্যা বসুন্ধরা!

সংক্ষেপে ভালই খেলাম, চন্দনা বর্ণিত নামগুলো ওয়েটারকে দেখাই, কোনটাই উচ্চারণ করতে পারবো না, মনেও নেই। মন্দ নয়, গরম গরম ও ফ্রেশ। বড় রেস্টুরেন্ট তো, বিশাল হলটা দুভাগে বিভক্ত, সর্ব সাকুল্যে দেড়শো জন আনায়াসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খেতে পারে। মোট দক্ষিণা ষোল ডলার , বলে দিয়েছিল টিপস মাষ্ট বিশ পার্সেন্ট, দুখানা কড়কড়ে দশের পাত্তি ধরিয়ে, ঢেকুর তুলতে তুলতে নিষ্ক্রমণ।অষ্ট্রেলিয়ায় টিপসের চলন নেই, তবে দিতে চাইলে কেউ কি আপত্তি করবে!

আমার সাথে একটি মেয়ে কাজ করে, সে কিছুদিন ওয়েটারের কাজও করতো মুনলাইটিং। বলতো, কাস্টমার টিপস দিলেই টুক করে জামার মধ্যে, কারণ গ্রীক মালকীন টিপসেও ভাগ বসাতো। কি অদ্ভূত কায়দায় পয়সা নোট সরাতো আমরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তাম। গল্প করতে বসলে তাকে সবাই মিলে ধরতো, দেখা তো আর একবার!

১৩

পরদিন সকালে একটু দেরীতে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে কিচেনে। সবই সেল্ফ সার্ভিস, আমি আবার একবাক্স ডিম কিনে ফ্রীজে রেখেছিলাম। ঐ মাইক্রো ওয়েভেই scrambled করে নিতাম। নুন গোল মরিচ কিচেনেই থাকতো। ভার্জিনিয়া-জিনা এসে টেবিলে। মধ্যবয়সী চল্লিশের আশেপাশে, মাইনাসই হবে ট্রু ব্লু আমেরিকান। কথাবার্তাতে সেই অ্যাকসেন্ট, আহামরি দেখতে নয়, একটু বিষাদময়ী মুখের আড়া। কি কেন ঠিক মনে নেই, মনে করে লিখবার সময়ও নেই। পরিবেশ নিয়ে আগ্রহী সে। আমাদের মেলাতে সেই নিয়ে কিছু আছে কিনা। আমি আবার renewable, green energy'র মতো নতুন টেকনোলজিতে ইন্টারেস্টেড। বেশ কিছু নতুন নতুন এক কিলো ওয়াটের উইন্ড এনার্জি কনভার্টার দেখে এসেছি। সে আগ্রহী, মেলায় যেতে। ভালই হলো, আমি এমনিতে বক বক বকম টাইপের, একা একা কাঁহাতক ফোনে, বন্ধুদেরকে ফোনে বিরক্ত করি, আমার নাহয় মেলা দেখার সপ্তাহ, তাদের তো রেগুলার কাজ। তাছাড়া খোদ আমেরিকান একটি মেয়ে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলছে, মন্দ কি।

অনেকক্ষণ কথা হলো কিচেনেই। আমার জ্ঞানগম্যি অত্যন্ত অগভীর, না সাহিত্য, পপ মিউজিক, না রাজনীতি কোন কিছুতেই পাঁচ মিনিটের বেশী কথোপকথন চালাতে পারি না, হোঁচট খাই। বেস বলের কিছুই বুঝি না, জিনা দেখলাম শিকাগো বুলস এর ফ্যান। আমায় ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা করে খুব বোঝাচ্ছে রুলস। ঐ গদা দিয়ে বল ঠেঙানো আমার কোনদিনও ভাল লাগে না। কিন্তু বন্ধুগণ বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলুন আমার কি তা কবুল করা সাজে। তাছাড়া বারংবার বলতে হচ্ছে, একটু ধীরে বলো। ইয়াঙ্কী উচ্চারণ নাকি কানে কালা হয়ে যাচ্ছি, কে জানে।

মেলায় সে আজ যেতে পারবে না, কি যেন কাজে ব্যস্ত তবে রাত্তিরে ডিনারে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, কথা হয়ে রইলো। তিন চার দিন ধরে তো ম্লেচ্ছ খানা খেয়েই চলেছি, আর পারা যাচ্ছে না। আবার অতদূর একা যেতে সাহসেও কুলোচ্ছে না, ট্যাক্সি করেই হোক না কেন। ভালই হলো, বক বক করাও যাবে, সাথীও মিললো। নির্ভয়ে চলাফেরা করা যাবে।

আমি তাড়াতাড়ি ফেরৎ এসে ভাবলাম সায়েন্স মিউজিয়ামটা দেখেই আসি। রিসেপশান থেকেই নির্দেশিকা মিললো, কিছুদূর হেঁটে গেলেই ৬ নম্বর বাস। আবার সেই গন্ডগোল, বাস কোন শেডে দাঁড়াবে, এ আবার তিন চার মাথা রাস্তার জংশন। বাসে স্টপ আসবার আগে বোর্ডে নাম দেখায় ও ভয়েস প্রম্পট, আমাদের মেট্রোর মতো। বেশ কাজের তবে মেট্রোতে তিন ভাষায় শুনতে বিরক্তিকর লাগে। প্ল্যাটফর্ম 'রাইটে' সকলেই বোঝে তা নয় ডাইনে তরফ, ডানদিকের চক্করে কান ঝালাপালা করে। জনগণ লক্ষ্য করেছেন কি, দরজা পাশাপাশি খোলের হিন্দী কি লেখা থাকে? দরজা 'পাস পাস খুলতা হ্যায়।' এই না হলে বঙস হিন্দী।

এখানেও সেই কল, সাড়ে চারটেয় বন্ধ হয় আমার হাতে কুল্লে দুঘন্টা। টিকিট কাউন্টারে দেখি সিনিয়রদের নিমিত্ত কনসেশনের সুবন্দ্যোবস্ত রহিয়াছে। পটাক করে ড্রাইভারস লাইসেন্সে হাত, দুটো টাকাও যদি ছাড় পাই তো মন্দ কি। কালো মহিলাটির বোধহয় আমার 'পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র জিনিয়া মূরতি' দেখে মায়া হলো, টিকিট ধরিয়ে দিল, টাকা দিতেই হাত দিয়ে ইশারা, কমপ্লিমেন্টারি। আমি গদগদ হয়ে থ্যাঙ্কিউ২, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ফলোড বাই আর এক সেট জোড়া থ্যাঙ্কিউ।

মিউজিয়াম হো তো অ্যায়সা। সুনামির মডেল, টর্নেডোর মডেল দেখে মন ভরে গেল। আর সেই বিখ্যাত U boat। আস্ত ইউবোট এনে রেখেছে, কোন মডেল নয়, একেবার অরিজিনাল। বেশী কিছু দেখা হলো না, গেট বন্ধ হয়ে যাবার সময় হয়ে এলো। বাস ধরে ব্যাক টু হোটেল।

রিসেপশানে ধরিয়ে দিলো বিষাল একটা পার্শেল, দূর আমেরিকার কোন প্রদেশ থেকে এক নেটবন্ধু পাঠিয়েছেন, ঘরে ফিরে দেখি তাঁর মেসেজ ফোনে বিপ বিপ করছে। উরেব্বাস, বিশালাকার একটা IFA শীল্ডের মতো তার ওপর শুকনো ফ্রুটস দিয়ে একটা ন্যাশপাতি (pear) বানানো। অপূর্ব সেই উপহার। 'তোমার pear যারে দাও তারে দাও খাইবার শক্তি!" অত কে খাবে আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারবো না, অষ্ট্রেলিয়াতে কড়া নিয়ম, নো ভেজিটেবল, ফ্রুটস, দুগ্ধজাত বস্তু আনা বারণ। ফেলে দিতেও গায়ে লাগে। এত সুন্দর জিনিষটা।

নাহ , জিনার কোন মেসেজ নেই। না ফোনে না রিসেপশানে। তার রুম চেঞ্জ করার কথা ছিল, ৯১৩ এর জায়গায় আমার মনে ছিল ৯৩০, সেখানে জিনা নেই। কি আর করা, আবার সেই মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট, একই খানা। এবার আর ঢেকুর তোলা নয়, বিস্বাদের পেট ভরানো। মেয়েটির সাথে কনভার্সেশন বেশ জমেছিল, আমেরিকা, হিলারী থেকে তৃতীয় বিশ্ব। কয়েকটা উজ্জ্বল মুহূর্তের ইতি!

১৪

ক্ষণিকের আলাপ কিন্তু ভালই লেগেছিল, মনে হলো যেন কত দিনের চেনা, পরিচিত এক বন্ধু। জিনার কথা বলছি। এরকমটাও তাহলে ঘটে। এক তো অসম বয়স, আমি সেই কোথাকার তৃতীয় বিশ্বের এক ফ্যা ফ্যা করা পরদেশী পথিক আর সে একজন আমেরিকান যুবতী। মানে আমার তুলনায় তাকে যুবতীই বলা যায়।

ভুল লিখেছি আগের প্যারাগ্রাফে, ফোন নম্বর বিনিময় হয়নি, আমার তো ঐ মান্ধাতা আমলের ফোন, পকেটে নিয়ে ঘোরার অভ্যাস নেই। শুধু রুম নম্বর বিনিময় হয়েছিল। আর কথা হয়েছিল, যেহেতু তার ঘর বদলাতে পারে, সে আমাকেই নক করবে। আমি যথারীতি নাইন থার্টি আর থার্টিন গুলিয়ে ফেলেছি। হয় শুনেছি ভুল নয় স্মৃতি করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। সে তো ফোন নম্বর দিতেই চেয়েছিল। পরেও দেখেছি তার ফোনপ্রীতির নিদর্শন। মেলায় স্টলে স্টলে ঘুরছি, এক স্টল থেকে অন্য স্টলে যাবার পথে ফোনে কুট কুট করেই যাচ্ছে, নোট লিখে রাখছে । আর কথায় কথায়, আই হ্যাভ টু লুক আপ বলেই ফোন গুগল!

পরদিন খুব সকালে উঠেছি, নীচে ব্রেকফাষ্টে নামবো এমন সময় দরজায় ঠক ঠক। রুম সার্ভিস এত সকালে? ইটস মি, জিনা। এই তিনটে শব্দ জীবনেও ভুলবো না। যেমন 'অমিত রায় ব্যারিষ্টার' অথবা তিন ভুবনের পারে'তে তনুজার আধা ধরা গলায়, 'আমি কি তাই বলেছি?'

জিনা শিকাগোতেই থাকে গত এগারো বছর ধরে, দূরে কোন শহরে তার মা বাবা। নিজের কথাই বলছিল অকপটে। সেই তখন নয়, পরে কথাবার্তা ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে। তার কোন ধারণাই নেই ভারতবর্ষ কোন গ্রহে, অষ্ট্রেলিয়া বলতে অবশ্য সিডনীর নাম জানে। কম্যুনিকেশন আর কি যেন বিষয়ে খুবই আগ্রহী কিন্তু ইউনিভার্সিটি আমেরিকাতে ভীষণ খরচ সাপেক্ষ যদি না কেউ তেমন মেধাবী হয় আর স্কলারশিপ না জোটাতে পারে। ছোটখাট কাজ করে, ইচ্ছে আছে পয়সা জমিয়ে কোনদিন আবার পড়তে ফেরৎ যাবে। রাজনীতি,

পৃথিবী ও আমেরিকায় অসাম্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সজাগ তার দৃষ্টিভঙ্গী। বলছিল, আমেরিকায় লোয়ার মিডল ক্লাশ থেকে শ্রেণী উত্তরণ একেবারেই অসম্ভব, সমাজ ব্যবস্থাই তেমনি। নাইন ইলেভেন নিয়েও সে ধন্ধে আছে অনেক আমেরিকানের মতো। আমি সুযোগ পেয়ে আমার এক নেটবন্ধুর আপলোড করা ভিডিয়ো থেকে সদ্যলব্ধ জ্ঞান উদ্ধৃত করলাম, আমিও কত কিছু খবর রাখি! (হে নেটবন্ধু তোমায় ধন্যবাদ, কখনও দেখা হলে, ঠকাস করে এক বোতল লাফ্রো টেবিলে রাখবো, প্রমিস!)

গতকাল সে আটকে পড়েছিল, রাত অনেক হয়ে গেছে বলে আমায় আর নক করেনি। কি করে বলি আমি অপেক্ষায় ছিলাম অনেকক্ষণ, নাহ তেমন কিছু নয় পাঠক, পিওর আন-অ্যাডল্টারেটেড হেমকষা (=নিকষিত হেম)। কথা হলো আজ সে দুপুরে মেলাতে গিয়ে পৌঁছোবে, রিসেপশানে , ফোন নম্বর নিলো আর আমায় একটা মিসড কল। নাহ, এবার একটা যুতসই স্মার্টফোন নিতেই হবে।

১৫

খুব করে অলটার্নেট আর রিনিউয়েবল এনার্জি'র স্টলগুলো সার্চ করে নিলাম। আগের দিন যদিও দেখেছি, আরও নতুন নতুন কিছু যদি থাকে। হে মম পাঠকগণ, আমার এই রিনিয়ুড এনার্জি'র কারণ নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন, হয়তো "তারই" জন্য। টান টান উত্তেজনা, যেন আমি প্রাঙ্গনে শিরীষশাখা, অপেক্ষা করে আছি সে কি এলো, সে কি এলো। টস করি? ব্যাটাদের পয়সা গুলো এমন ছোট সাইজের যে টস করবো তার উপায় নেই, নোটগুলো ও তেমনি এপিঠ ওপিঠ, ১, ৫, ১০, ২০ সব নোটই একরকম দেখতে। আজব দেশ বটে।

একটা নাগাদ মেসেজ, আমি রিসেপশন হলে। ছোট, ছোট: এ তো প্রায় হাওড়ার এক নম্বরে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন ঘোষণা করলো নতুন প্ল্যাটফর্মের ২১ নম্বরে। তবু ভাগ্যি, সাঁতরাগাছি অবধি পাঠায়নি। ডানা কোথায় পেতাম?কোথায় রিসেপশানে? কোথাও দেখা নেই। এখানে তো হাজার গন্ডা রিসেপশান, মেলার, কনফারেন্সের, এক্সিবিটরদের, সে কোনটার কথা বলছে, কে জানে। 'আমি গ্রানাইটের ফোয়ারার পূবে'। আবার পূব, পশ্চিম? হবেই তো, যে ১১ বছর শিকাগোতে কাটিয়েছে তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমার তো ডবল হ্যান্ডিক্যাপ; এক তো পুরোনো ফোনে মেসেজ টাইপ করা, দুই দিকভ্রান্তি। ভয়েস কল করবো কিন্তু এই চাপা কিন্তু হাই ডেসিবেল গন্ডগোলের মধ্যে কি শুনতে পারবো, বুঝতে পারবো তার অ্যাকসেন্ট। বাইরে একটা ফোয়ারা রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তো বেলে পাথরের। গোলেমালে ভুলেই গেছি গ্রানাইট কালো রঙের। সারাজীবন স্ট্র্যান্ড রোড চষে বেড়িয়েছি আর ভুলে গেলাম। মেয়ের বাড়ী তৈরীর সময় তার কিচেনে তো গ্যালাক্সি গ্রানাইটের বেঞ্চটপ লাগিয়েছি অনেক বেছে। তাছাড়া যত হাই প্রিসিশান মেজারিং এ কালো গ্রানাইটের টেবিল ব্যবহার হয়।

'লুক আপ, অন ইয়োর লেফ্ট', বাব্বা অবশেষে দেখতে পেলাম। ওপরে একটা রেস্টুরেন্টে সে খেতে খেতে উঠে এসেছে, 'ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল, আধ খাওয়া ফেলে এসেছি, চলো সেখানে'। আরে মারো গুলি তোমার স্যান্ডউইচের, এসো আমার সাথে। চিকেন মাশরুমের ঝোল খাবে। এই খাবার জায়গা আবার বেশ দূরে , কয়েকটা ওপর নীচ এসক্যালেটরে, ফার্লং দুই হেঁটে অবশেষে টেবিলে মুখোমুখি। সামনে চিকেনের ঝোল ভাত, দেরী বলে ভিড়ও নেই বললে চলে, শোরগোলও কম। আমি টুক করে পকেট থেকে কাঁচা লঙ্কা বের করে মনের সুখে খেতে শুরু করলাম। লোক লজ্জা খুব একটা নেই।

কথা বলছি, সেও অনর্গল বলে চলে; এটা সেটা যাকে বলে পিওর আড্ডা, এখান থেকে সেখানে আলোচনা মোড় নিচ্ছে। আমি আবার নাওয়া খাওয়া ভুলে গল্প চালিয়ে যেতে পারি। কিরকম অদ্ভূত একটা অনুভূতি, তিনদিন আগেও যাকে চিনতাম না, তিনদিন পরে যার সাথে জীবনেও আর কোনদিন দেখা হবে না, দুজনেই জানে সে কথা। অথচ গল্প করছি, খাচ্ছি; আমার মরিচদানি আটকে গেছে, পালটে নিয়ে এলো পাশের টেবিল থেকে! বহু বছর আগে এমনই একটা দুপুরের কথা মনে পড়লো। বিটি রোড থেকে L9 চেপে তার সাথে প্রথমবার। নিউ মার্কেটের মাশে, রক্সির কাছে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, বেশ বাহারী নাম (রং মহল?); সাজেষ্ট করেছিল আমারই অনুজ এক প্রেমকরনেওয়ালা বন্ধু। তখন তো পকেট খালি, দু দশটা টাকা তাই জামার ভেতরের পকেটে, প্যান্টের কোমরে চোরা পকেটে রাখা। Tooti-frooti অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, টল গ্লাসে সার্ভ করলো। ৫ না ছ টাকা দাম, সেই বাজারে অনেক। আর এই সুদূর ডবল বিদেশে প্রায় সেই রকমই বাতাবরণ। পকেটে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, অ্যালাউয়ান্সের কড় কড়ে নোট। তখন ছিল ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন, এখন শুধুই অন্ধকার। কি কনট্রাষ্ট অথচ কত সাযুজ্য! শুধুই, 'মুখোমুখি বসিবার'।

১৭

যে জন্যে আমার আসা এবং তারও। স্টলে স্টলে পদার্পণ। সে নন-টেকনিক্যাল মানুষ কিন্তু বিষয় বুঝতে এক্সপার্ট। তাইই হয়। ক্লাইমেট কন্ট্রোল কমিটি কিন্তু কন্ট্রোল করে নন- টেকনিক্যাল ব্যুরোক্রাটগণ। স্টলওয়ালারা আবার মহিলা দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে বোঝাতে শুরু করে, সুবিধা আমারও। ফ্রীবি উপচে পড়ে, পেন, ল্যানিয়ার্ড, চাবির রিঙ, নতুন ধরনের ম্যাক্স স্টেপলার, বাহারী ব্যাগ, টুপী। অবশেষে পরিশ্রান্ত। তার খুব ইনটারেষ্ট ছিল গাড়ীর ছদে বা হাই রাইজ বিল্ডিং এর ছাদে ছোট ছোট এক কিলো ওয়াটের উইন্ড মিল এ। সাধারণ ৫, ৬ কিমি বেগে বাতাস বইলেও সেটা কাজ করে এত এফিসিয়েন্ট। দু:খের বিষয়, সেই স্টলটা আর খুঁজে পেলাম না, সবই এক রকম দেখতে, আলোয় আলো, গমগমে আওয়াজ, ক্ষান্ত দিলাম। তার ভ্যানিটি ব্যাগ ও অন্যান্য সব আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, 'আমি একটু রেষ্ট রুম থেকে আসছি।' দেখলাম টয়লেট কে রেষ্টরুম বলা এখানে চালু, দেশে যেমন বাথরুম। দাঁড়িয়ে আছি আর মনে পড়ছে, বহু যুগ আগে কোন এক বুধবারে গ্লোব সিনেমার লবি'তে একজন তার ব্যাগপত্তর আমায় ধরিয়ে,'একটু আসছি'! সাউন্ড অফ মিউজিকের নুন শো।

মেলার শাটল বাসে হোটেলে ফেরৎ, পরিশান্ত দুজনেই। এত খাটুনি আর ধকল! আমায় যদি আবার যেতে বলে ঐ মেলা দেখতে আমি পগার পার। ঠিক হলো,মুখহাত ধুয়েই কোন একটা বারে,'to wet the whistle'। আমায় বোঝালো গলা ভেজাতে ঐ টার্মস ই ব্যবহার হয় ওখানে।
একদম ডাউনটাউন আশে পাশে হোটেল , রেস্টুরেন্ট, বারের ছড়াছড়ি। এই কদিনে আশে পাশের রাস্তাগুলোর নামে সড়গড় হয়ে উঠেছি। গিয়ে বসলাম একটা হাই স্টুলে, চারজনের ছোট্ট টেবিল। কি অর্ডার করবো, যে দেশে জলের ভ্যারাইটি মাথা খারাপ করে দেয়, সেখানে বীয়র বাছতে হলে কি অবস্থা আন্দাজ করতে পারছেন? সে নিল ডার্ক বীয়র আমি যেন কত চিনি, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওয়েটারকে, মেক্সিকান লাগার- করোনা? আছে, বাঁচা গেল।

এদেশে দেখছি বারগুলো বেশ ভদ্রস্থ, সব ধরণের লোকজন, মেয়ে পুরুষ সবাই আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় পাবগুলোতে বড় বেশী গোলমাল, হৈ হট্টগোল। কাচের দেওয়ালের ওপারে চলমান জীবন এদিকে ধীর লয়ের আড্ডা, বীয়রে চুমুক, এটা সেটা। হোটেলে আছে আপাততঃ সরকার থেকে অ্যাপার্টমেন্ট দেবে কবে তার অপেক্ষায়, আগেরটা

কেন ছাড়তে হলো কি একটা বললো যেন। থাকবেন আর শিকাগোতে, চলে যাবে বাপ মায়ের কাছে। আমার কথাও বললাম খুলে। কোন সুদূর গরীব দেশের লোক আমি, ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে কোথায়। কোনরকম সংকোচ না করে বললাম, এই পরিবেশ গ্রীন হাউস গ্যাস আমার গ্রামে সাজে না, যেখানে কোন রকমে দুটো চাল (নো ডাল, এখন মহার্ঘ্য) জুটলো তো চুলো ধরাবে কি দিয়ে? কুড়োনো পাতা, শুকনো গাছের ডালই একমাত্র জ্বালানী। ভাগ্যভাল নিজেদের গাছ গাছালি, পাটকাটি আছে। গ্যাস সিলিন্ডার, সে তো চা করবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়।

দ্বিতীয় গ্লাস সে পুরো খেতে পারেনি, আমায় এগিয়ে দিল। 'চেখে দেখি ডার্ক বীয়র কেমন খেতে'। বললাম আমরা এক গেলাসের বন্ধু হলাম, আম্মো দেশের কহবৎ। জিনা তো হেসে কুটোপাটি। (বলুন তো গেলাসের কোন দিকে চুমুক দিলাম?)

ডি ডি ডিনার? আমার তো মশলাদার খাবারের জন্য craving শুরু হয়ে গেছে। আজ যেতেই হবে সেখানে, ছলে বলে কৌশলে, যে করেই হোক। কাঁচুমাঁচু করে বললো, ট্যাক্সিতে না গিয়ে আমি কি তার গাড়ীতে যেতে ইচ্ছুক, তার নাকি ছ্যাকরা গাড়ী। একটা পার্কিং লটে রাখা আছে, বেশ দামে। হবেই, স্পেস যেখানে প্রিমিয়াম। কাছেই, অনেক অনেক তলা উঁচুতে উঠে বসলাম তার গাড়ীতে, অভ্যাসমত আমাদের প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে মানে বাঁদিকে যেতেই আবার হাসি পেল, এখানে তো লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। না, না গাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল ই। পেছনে অবশ্য এটা সেটা গাদা করা, স্বাভাবিক।

গাড়ী চলেছে আমেরিকার সেই বিখ্যাত রাস্তা দিয়ে, কিছুটা বোধহয় ফ্রীওয়ে ছিল, চার চার আট লাইনের, লেক মিশিগানের ধার দিয়ে। বোঝালো রাস্তার এপারে জলের কিনারের জায়গা সরকার সর্ব সাধারণের জন্য রেখে দিয়েছে, মাইলের পর মাইল। সেখানে কোনপ্রকার ডেভালপমেন্ট করতে দেবে না। আমাদের অষ্ট্রেলিয়াতে উলটো, লেক বা সমুদ্রের ধারে সব প্রিমিয়াম অট্টালিকা।

বেশ লাগছিল কিন্তু। সব জিনিষের ভাল দিক আছে, তাই না? যদি এখানকার আমার নেটবন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে না পড়তো তাহলে কি আমি এই ড্রাইভে যাবার সুযোগ পেতাম? কে বলেছে, ঈশ্বর মহান নন, তিনি অবশ্যই ভক্তের ভগবান। জয়রামজীকী।

১৮

স্থান উসমানিয়া রেস্টুরেন্ট, ডেভন স্ট্রীট। বেশ বড়সড় রেস্টুরেন্ট। আসলে আমরা গুগল খুঁজে অন্য রেস্টুরেন্টে যাবো ঠিক করেছিলাম। প্রথমে অবশ্য ভাল লঙ্কার খোঁজে বাংলাদেশী দোকানে, রাস্তার মোড়ে। সেখানেই বললো, উসমানিয়াতে, রাস্তার ওপারে যেতে। আমি চিকেন কি যেন একটা আর নান। জিনা ভেজিটেরিয়ান, পালক পনীর ও নান। পেট ভরা দুজনেরই, দেরীতে লাঞ্চ তার ওপর বারে খুচ খাচ পেটে পড়েছে। বিশালাকার নান, আর্ধেকটাই শেষ করতে পারিনি, দুজনের একই অবস্থা। ডগি ব্যাগে অগত্যা। তারটায় আমার বড় পোরশান বেঁচে যাওয়া নান দিলাম, খুব প্রশংসা করছিল নানের। আমারটায় তার বেঁচে যাওয়া ছোট টুকরো। কিচেনে ফ্রীজে রেখে দিলেই চলবে। ব্যাক টু পার্কিং লট। ওহ, রাস্তাটায় খুব একটা লোকজন নেই, একা এলে গা ছমছম করতো পাশের গলিতে।

ফিরে এসে সেই পার্কিং বাড়ীতে, নিয়ম হলো, একবার বাইরে গাড়ী নিয়ে গেলে ঢুকতে গেলে ১২ ডলার দিতে হবে। আমিই বললাম, আমার তো ট্যাক্সি ভাড়া লাগতো ই, কিছুতেই রাজী হবে না, 'লেট আস স্প্লিট ইট, হাফ অ্যান্ড হাফ্'। শেষে নিলো। ব্যাকটু হোটেল , খাবার ফ্রীজে চালান ও গুডনাইট। পরদিন সে খুব সকালে বেরিয়ে যাবে। বলে দিল কন্টেম্পোরারি আর্ট মিউজিয়ামে না গিয়ে বরং শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট যেতে, নাম শুনে কে বলবে এটা আর্ট গ্যালারী ১৫৯ বছরের পুরোনো এবং এখানেই বিবেকানন্দ তার বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস জিনার সাথে আলাপ হয়েছিল।

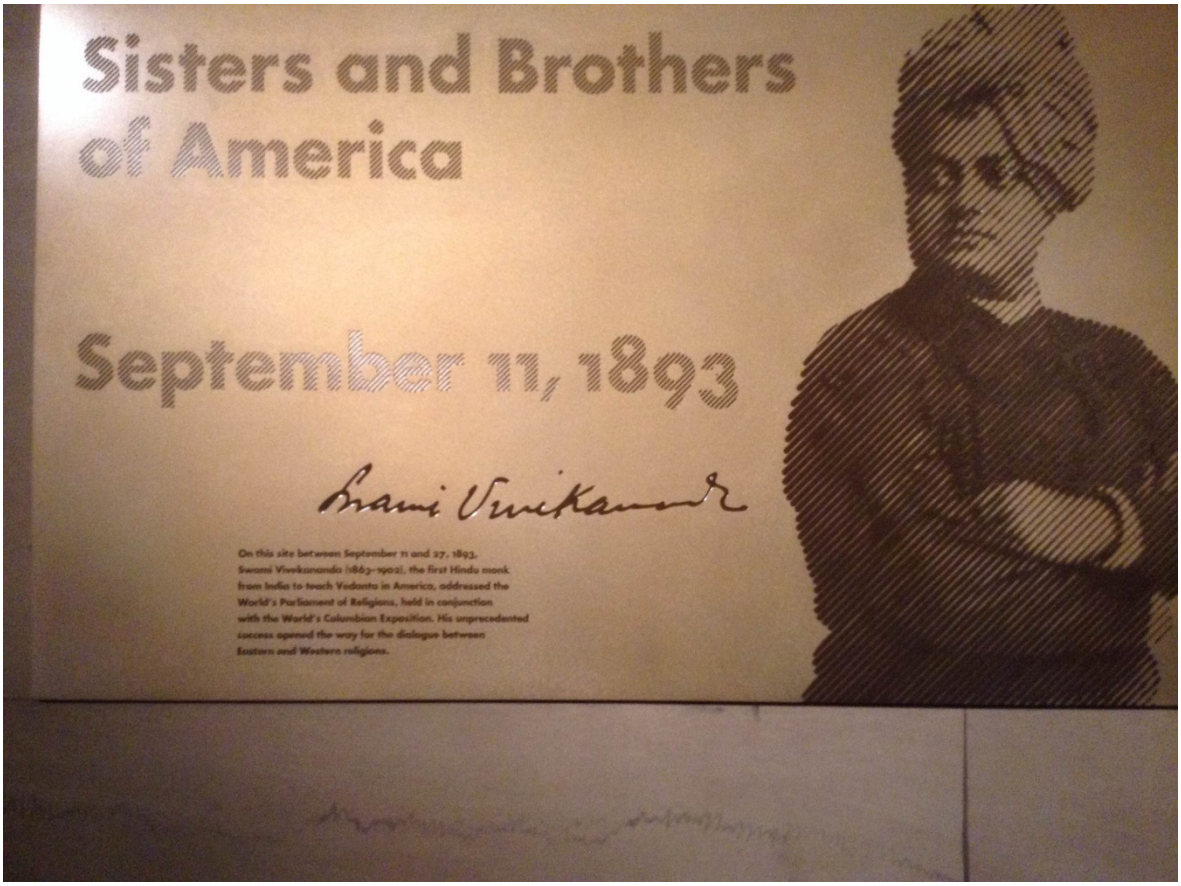

শিকাগো বক্তৃতার স্মৃতিফলক

গতকালই জিনার সঙ্গে ওসমানিয়া রেস্টুরেন্টে কথা হচ্ছিল, আজ কি করবো। তার আজ কাজ আছে, সন্ধে সাতটা অবধি। আমি তো এমনিতে খুব একটা রিসার্চ করিনি, কেবল মিউজিয়াম অফ কন্টেম্পোরারি আর্টে যাবার বাসনা ছিল। জিনা বললো, অতি অবশ্যই যেন আর্ট ইন্স্টিটিউট অফ শিকাগোতে যাই।এবার এমনিই গুগল সার্চ করতে গিয়ে দেখি, ওহ হরি, এখানেই স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন। কি অদ্ভূত সমাপতন। সংক্ষেপে সারি, দেখা টেখার পর একজন ব্ল্যাক আমেরিকান গার্ডকে (বলাই বাহুল্য, মেয়ে গার্ড) জিজ্ঞেস করলাম, ভাই তোমাদের কি কোন হল, অডিটোরিয়াম আছে? সে বললো, এমনিতে বন্ধ থাকে তবে চলো তোমায় দেখাচ্ছি। এখানে গার্ডেরা তেমন হেল্পিং টাইপের নয় আদৌ, আনলাইক ইন ডাউন আন্ডার। কিন্তু অনেকটা হেঁটে আমায় পথ দেখালো, যেতে যেতে, চিবেচাঙ্কো টাইপের কি যেন বললো আমায়, তারপর যথারীতি– দ্য গ্রেট বিবেকানন্দ।

আমায় বললো কি করে উচ্চারণ করতে হয়। জ্ঞান দিতে হলে আমি সবার আগে, ভিভেক মানে কনসেন্স, নন্দ মানে জয়। তিনি তো খুব খুশী। যাই হোক হলে গেলাম, সেই স্টেজে হাত ঠেকিয়ে মাথায় দিলাম, সেখানে দাঁড়ালাম; বাইরে বেরিয়ে দেখি একটা প্লাক লাগানো, তাঁর ছবি ও সেই ফেমাস- সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, এক তাক লীফলেট, তাঁর ছবি সহ।

১৯

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট। কি বলে বোঝাবো কত ভাল লেগেছে। জিনা শুধু একটি কারনেই তোমায় সারাজীবন মনে রাখতাম। সে ই বলে দিয়েছিল, মিশিগান এভেন্যু থেকে ১৫১ নম্বর বাস ধরতে। 'কি করে সব মনে রাখো?' "আরে ভুলে যাচ্ছো কেন, এই শহরে আমি এগারো বছর আছি।' আমার প্রশ্নটা বেশ বোকাবোকাই ছিল। আমি কি বলতে পারবো না ২৬ নম্বর ট্রাম কোথা থেকে কোথায় যায়!

গ্যালারীর বাড়ী খুব সুন্দর ডিজাইন, বিশেষ করে গ্যালারী গুলো। খুব নীচু নয় আবার উঁচুও নয় সিলিং। ছাদএ কিছু কিছু কাচ লাগানো, তাই বিনা ফ্লাশেই ছবি তোলা যায়। ফ্লাশ অবশ্য ব্যবহার করতে মানা। এখানকার ন্যাশনাল গ্যালারীর উঁচু সিলিং, একটু অন্ধকার ভাব কেমন যেন intimidate করে। টিকিটে আবার সিনিয়র বলে ছাড়। শিকাগোর বাসিন্দা হলে ফ্রী এনট্রি।

এসব ছবি দেখা কি ভাগ ভাগকে হয়! তবু মানে, ম্যাতিস, অ্যান্ডি ওয়ারহোল এবং আমার ফেভারিট দালির অসাধারণ সব সংগ্রহ। নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত পোট্রেটও দেখলাম। কিছু ভাস্কর্যও, পুরোনো রোমান, গ্রীক আমলের।

বেরিয়ে জিনার সাজেশন অনুযায়ী মিলেনিয়াম পার্ক। এর নেমসেক উদ্যান অবশ্য দেখেছি বাবুঘাটে! ঠেলায় করে খাবার দাবার বিক্রী হচ্ছে, খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। কিন্তু কি খাই, সেটাই তো সমস্যা। ঠেলা মানে আমেরিকান ঠেলাগাড়ী, মোটর চালিত ভ্যান, তাতে রান্নার সুব্যবস্থা। সবেতেই তো হয় বীফ, নয় পর্ক। শেষে একটা ভেজ টারো, আড়াই ডলারে। যাচ্ছেতাই খেতে, পয়সা জলে। আসবার পথে এবার হেঁটেই ফিরলাম, ২৫ মিনিটের পথ। এত সুন্দর ফুটপাথ, লোকজন আছে তবে গিজগিজ করছে না।

হোটেলে ফিরে আজ আর কোথাও খেতে যাওয়া নেই। ফ্রীজে তো কালকের অভুক্ত অংশ আছেই। । আগামীকাল শেষ রজনী। আর্ট ইনস্টিটিউটে আরও একবার যেতে হবে, সুন্দর সুন্দর ছবির প্রতিলিপি দেখে এসেছি, সবই mount করা বর্ডার দিয়ে। কেবল বাঁধাবার অপেক্ষা। খোলে তো সাড়ে দশটায়, মডার্ন আর্ট সেকশনটা আরও দেখার ইচ্ছে, দুপুরে আবার উসমানিয়াতে, খেয়ে দেয়ে সোজা এয়ারপোর্ট সেখান থেকেই।

১৯

"যাবার সময় হলো বিহঙ্গের"। সকালেই জিনার মেসেজ, ব্রেকফাষ্ট টেবিলে দেখা হবে। ওহ বলতেই ভুলে গেছি, তার আগেরদিন তার হাতে ঐ কাজু, কিশমিশ, পেস্তা, আখরোট মন্ডিত IFA শীল্ড তুলে দিয়েছি, বিনম্র অনুরোধে। কারণটাও বলেছি। সে নিয়েছে। আসলে কি আর উপহার দেবো, আমি আবার এ বিষয়ে খুঁতখুঁতে, উপহারটি যুতসই, আমার মনোমত হওয়া চাই। দামী নাই বা হলো। মোটকথা, দামী ওয়াইন বা জলভরা সন্দেশ খেয়ে

নিলেই তো ফুরিয়ে গেল। একটা খুচরো পয়সা বা একটা তরকারী কুটবার ছুরি অনেকদিন মনে গেঁথে থাকবে। কারণ আর কিছুই নয়, এক লহমার অমরত্ব অর্জন করা। অনেক অনেক দিন, অনেক বছর বাদে হয়তো প্রাপকের মনে পড়বে আমার কথা, এমনিই। উপহার দিচ্ছি মানে এই নয় যে তার প্রেমে আমি গদগদ, আমার উদ্দেশ্য অসৎ।

আমি উত্তর দিলাম, তার সাহচর্য্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, তার কথা ও ছবি নিয়ে যাবো সঙ্গে করে।
'তুমি কখন আমার ছবি তুললে?"
'আরে তাই কখনও হয়, তোমার অনুমতি না নিয়ে ছবি তুলবো! দেখা হলে নেবো।'

টেবিলে তার মুখ একটু যেন আনমনা। তার কাজ আছে আজ। যখন ফিরবে ততক্ষণে আমি ডালাসের পথে। ছোট্ট এক প্যাকেট মিষ্টি বিস্কুটের ট্রে তুলে দিলো আমার হাতে, উপহার। বিস্কুটটা একটু আনোখা, লোক্যাল বেকারীর, আগে দেখিনি। নিলাম দুহাত পেতে। বাই বাই ও একটা hug।
আমি আইপ্যাড নিয়েই কিচেনে গিয়েছিলাম। 'ছবি নেবো যে, দাঁড়াও এক মিনিট্'।
'নাহ, আমি ঠিক স্বচ্ছন্দ নই, আড়ষ্ট লাগে।'
OK তবে তাই হোক, বিদায় বন্ধু বিদায়।

ঘরে ঢুকে কেমন একটা অনুভূতি হলো। মিষ্টি বিস্কুট খাই না, এড়িয়ে চলি অথচ আমার খুবই প্রিয়। আধখানা ভেঙ্গে মুখে দিলাম বাকীটা ওয়েষ্ট বিনে।

সাড়ে দশটায় আর্ট গ্যালারী খুলবে, গোছগাছ সেরে নিচ্ছি, ফিরে এসেই তো চেক আউট। মেসেজ এলো, তোমার সঙ্গ আমিও খুব উপভোগ করেছি। দু মিনিট বাদেই আবার টুং।
সাবজেক্ট লাইন ফাঁকা, শুধু তার একটা ফর্মাল ছবি, সেজেগুজে তোলা, ফাইল চিত্র।

উপসংহার: বার্ড হিটের জন্য শিকাগো থেকে ডালাস পৌঁছুতে দেরী, কানেক্টিং সিডনী ফ্লাইট মিস। ডালাসে পড়ে পাওয়া একটা পুরো দিন। কেনেডি মিউজিয়াম, সেই বাড়ীর ছ'তলার ঘর, যেখান থেকে অসোয়াল্ড গুলি চালিয়েছিল। সে গল্প, ছবি অন্য কোনদিন।

[ছবি: লেখক]

পুনর্জলোজন্ম

মধুশ্রী বসু

বৈঠা বাইছো কাদের তরে?
সেইতো ঘন্টা কতক পরে
বালি ঠেকবে তাদের পায়ে।

সইতে পারলে ভাসাই ভালো।
তাই-কি জলেই আগুন জ্বালো?
মীনজন্ম সোনার কাঠি?

নাইতে করলে আবার বেলা;
হয়তো তাতেই মজলো ভেলা।
খালি শ্যাওলা জমলো গায়ে।

ছইতে ঢাকছো কাদের শরীর?
ওইতো ভগ্নাবশেষ তরী -
দিন ফুটতে ফুটতে মাটি।

তোমার নৌকো ভাসছে দূরে;
ওদের পুনর্জন্মপুরে
এবার জোয়ার আসছে। সামাল!
ওরাও আমার মতই কাঙাল।

দাঁড় বাইছো কাদের তরে?
কারো সামর্থ্য নেই ঘরে;
তাই বালির বসতবাটি।

সইতে পারলে ডোবাই ভালো।
তাই-কি জলের আগুন জ্বালো?
ঘাইজন্ম সোনার কাঠি।

শব্দ ঝাঁপি

সমীর দাস

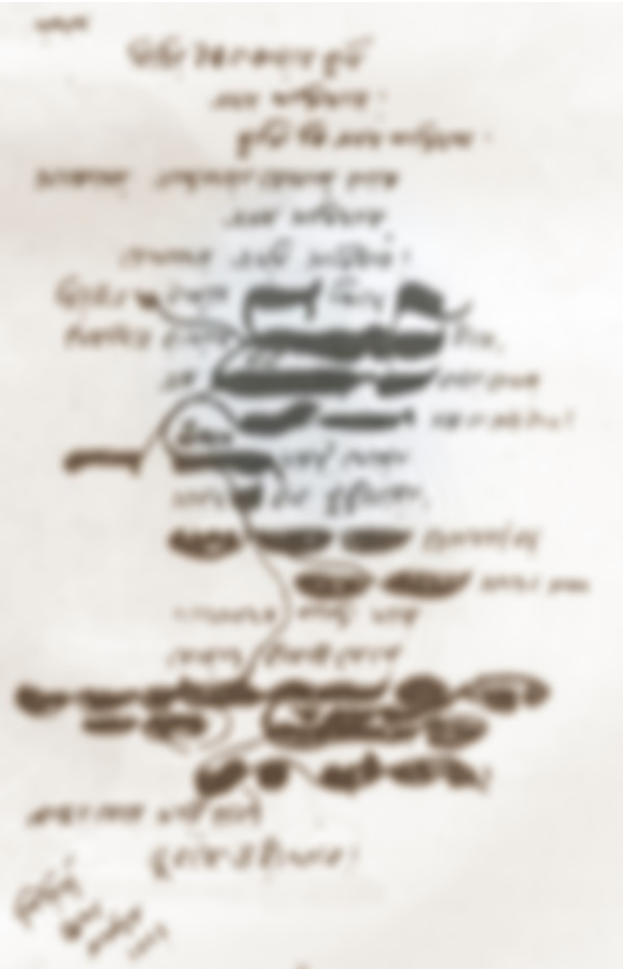

কতকাল হয়ে গেল, আমি কেবল শব্দ কুড়িয়ে যাই। কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমি জড়ো করি আমার মনের ঝাঁপিতে। যে শব্দেরা আমাদের বাঁচায় , তারাই আবার কখনও কখনও মারে। আবার তেমন করে বুলিয়ে দিতে পারলে তারাই হয়ত সারিয়ে তোলে মনের ক্ষত। শব্দ'রা আমাদের 'বন্ধু' , নিত্যসঙ্গী - তাদের কি আর যত্নে না রেখে পারা যায়। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বিলীন হয়ে যায় - কিন্তু শব্দেরা শবদেহের সাথে বিলীন হয়ে যায় না - থেকে যায় সারাজীবন - সবার অলক্ষ্যে।

সকাল হবার অনেক আগেই শুরু হয়ে যায় আমার শব্দ কুড়োনোর কাজ। যখন আকাশ হালকা নীল - সূর্য উঠতে তখনও অনেক দেরি , পুবের আকাশে তখনও লাগে নি লালের ছোঁয়া , হাওয়ায় যেন একটু শীত শীত ভাব - একটা নাম না জানা পাখি এসে ঠক ঠক করে ঠোকরাতে থাকে আমাদের ব্যালকনির কাঁচের দরজায়। চিড়িক চিড়িক ডাক আবার ঠক ঠক , চিড়িক চিড়িক ডাক আবার ঠক ঠক - যতক্ষণ না কেউ উঠে দরজা খুলে দিচ্ছে - আমার ঘুম ভাঙানিয়া বন্ধু ঠক ঠক শব্দ করেই চলে। আমার শব্দের ঝাঁপিতে তুলে রাখি সেই নাম না জানা বন্ধুর ঠকঠকানি।

এরপর ভোরের শিশিরের ঝলমলে হাসির শব্দ। দিনের নতুন রোদের সাথে শিশিরের হুটোপাটি খেলার শব্দ। টপাটপ তুলে রাখি - ঝাঁপি ভরতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীতে কোলাহল বাড়তে থাকে। শব্দেরা একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব আর রক্ষা করতে পারে না - সূক্ষ্মতা হারায়।

চমক ভাঙে নির্জন দুপুরে ধুনুচিওয়ালার পিড়িং পিড়িং শব্দে - ঢাকা দেওয়া সকালের ধরে রাখা শব্দের ঝাঁপি ঘরের কোন থেকে টেনে বের করে এনে তাতে ভরে দেই নতুন শব্দ। এরপর ভেন্টিলেটারের ফাঁকে চড়ুইশাবকের কিঁচকিঁচ ডাক - আর সেই ডাক শুনে পালা করে চড়ুই বাবা মায়ের আসা যাওয়ার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ। নিস্তব্দ দুপুরে কড়ি বড়গা থেকে ঝুলে থাকা সিলিং ফ্যানের অবসন্ন , মাদকতা মেশানো একটানা ঘড়র ঘড়র শব্দ। টুকরো টুকরো এই শব্দেরা এক এক করে জড় হতে থাকে আমার শব্দের টুকড়িতে।

এরপর চারটে বাজলে রাস্তার কলে জল আসার শব্দ। দূরে চলে যাবার শব্দের রঙগুলো বুঝি কেমন লাল লাল, কমলা গোছের। আকাশের ছড়ানো উঠোনে সারা মেঘ জুড়ে তখন সূর্যাস্তের আয়োজন। নদীর রাঙা জলে যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

কাছে আসার শব্দের রঙ যেন বোধহয় সোনালী - সোনালী অলঙ্কার , সোনালী ওড়না তাতে সোনালী জড়ির কাজ।

সন্ধ্যা নামে একসময়। গাছে গাছে পাখিদের কিচির মিচির শব্দ। ঘরে ফেরা কিছু পাখির ব্যস্ত ডানার শন শন শব্দ। অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোঁপে সন্ধ্যামালতীর ফুঁটে ওঠার শব্দ। দুরে কোন মন্দিরে বা গেরস্ত বাড়িতে সন্ধ্যারতীর সাথে শাঁখ বাজার শব্দ। আরো দূরে কোথায় কোন মসজিদের আযানের করুন সুরে - ফিকে সন্ধ্যে গাঁঢ় হতে থাকে আর আমার শব্দের ঝাঁপিও পূর্ণতা পেতে থাকে।

চারিদিকে কোলাহল ক্রমশ শেষ হতে হতে মিলিয়ে যায় একসময়। শোনা যায় গাছেদের ফিসফিসানির শব্দ। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। টুকরো টুকরো মুখ , ঘটনা ভীড় করে আসে বাইরের জমাট অন্ধকারে। মনের ঘরে আর উঠোনে চলতে থাকে ভাবনাদের অবাধ যাতায়াত। একটা সময় চাঁদ ওঠে। সদ্য মাজা কাঁসার থালার মত ঝকঝকে গোল চাঁদ।

বৃষ্টির আজ মন খারাপ তাই জানালা বন্ধ করে বসে আছে - চাঁদের সাথে কথা বলতে তার একটুও ইচ্ছে নেই। মন খারাপের কারন অবশ্যই মেঘ - আজ সারাদিন মেঘের সাথে তার দেখা হয়নি। বৃষ্টির জানালায় এসে উঁকি দিয়ে তার মনের গোপন খবর নিয়ে , চাঁদ সারারাত ঝুম ঝুম পায়ে নূপুর বাঁজিয়ে - ভোরের ঠিক কাছাকাছি সে খবর পৌঁছে দেয় মেঘের জানালায়। সারারাত চাঁদের পায়ের ঝুমঝুম শব্দ তুলে রাখি আমার শব্দের টুকরিতে।

ততক্ষনে ভোর হতে আর বেশী বাকি নেই। ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। একটু পরেই হয়ত কানে আসবে সূর্যের দরজার খিল খোলার শব্দ - আর তার পরেই আমার ঘুম ভাঙানিয়া বন্ধুর চিড়িক চিড়িক ঠক ঠক।

এছাড়াও আরো অনেক অনেক শব্দ আমার টুকড়িতে না চাইতেও জমা হয়। ভয়ংকর সেই দাঁত নখ যুক্ত শব্দগুলো মাঝেমাঝেই তীক্ষ্ণ বর্শার মত কানে বেঁধে - বুকে ব্যাথার রসদ যোগায় , আমার শব্দের সাজি ভারী করে তোলে - যেমন রোজ সন্ধ্যায় কোন কালো মেয়ের দৈত্যের খপ্পরে পড়ার শব্দ , আনন্দগাঁও থেকে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদনী রাতে , মাহী নদীর পাশে বসে সদ্য শিশুহারা রেশমার কান্নার শব্দ , হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে ধর্ষিতা বছর দশেকের মুসলমান মেয়েটার আর্তনাদের শব্দ যার নাম - বেগম সুষমা আমিনা চৌধুরী।

সামনে পুজো। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের এ মাসের পাতাটা দিয়ে যেন শুধু শিউলি ফুলের গন্ধ বের হচ্ছে - তাই সব ছাপিয়ে আমার শব্দের ঝাঁপির একদম উপরে এখন শুধু ঢ্যাং কুঁড়া কুঁড় শব্দ।

কবিতা

সুপর্ণা

নস্ট্যালজিক

গোলাপের ঝরা পাতার মত স্মৃতিগুলি
আঁকড়ে বসে আছি
কুঁড়ির আশায়

বর্ষার দিনে নিজের মনে আউড়ে যাওয়া কবিতার প্রতিধ্বনি, এখন এতো স্বাধীনতা পেয়ে গেছে অডিটোরিয়ামে পঁষট্টি ডেসিবেল ছাড়িয়েও উচ্চারিত হয়।

মন খালি চায় দায়িত্বহীন কৈশোর,
একাকীত্ব।

শব্দ নয়।

শরৎ এলো বুঝি বা

ঘুম থেকে জেগে উঠে
অলস চোখে চেয়ে দেখি
এক ফালি সোনালী রোদ্দুর
এসে পড়েছে জানলার গরাদ পেরিয়ে
ভালো লাগলো, ভারী ভালো লাগলো
সুন্দর এই সকালটাকে।
বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি
সবুজ পাতার ওপর জমেছে শিশির
সারা রাত ধরে।

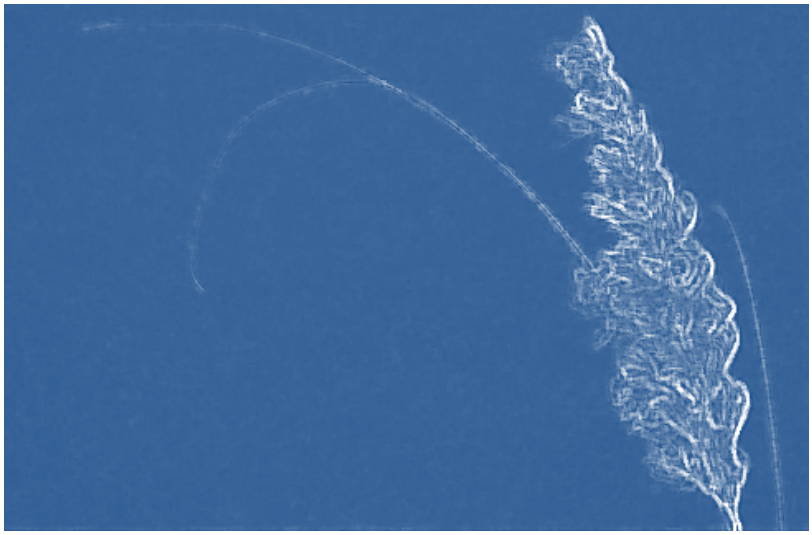

শিউলি ফুলে ভরে গেছে আমাদের ঝকঝকে উঠোন
তবে শরৎ এলো বুঝি
পূজোর ছুটির ঘন্টা বাজার সময়
হলো বুঝি।
শরৎ মানেই মনে পড়ে যায় ছবি
নীল আকাশ টুকরো মেঘ
আসা-যাওয়ার খেলা
কাশের দোলা, নতুন জামার গন্ধ
সব মিলিয়ে খুশীর আমেজ
কেমন যেন বাঁধন-ছেঁড়া ভাব।

অথবা সাতকাহন

কাকলি সেনগুপ্ত

নায়ক-চরিত্র আমার ছিলনা।

পালা পড়বার পর, হাসি কান্না
মেপে দিলেন নাট্যকার-
এঁকে দেওয়া বৃত্ত বা কাটাকুটি
ছুঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে রং মুছে গেল

মেকআপ মেকআপ বলতে বলতে
একটা নতুন সংলাপ ঢুকে এল
তার ওজন বুঝতে গিয়ে
কাঁটাঝোপের জায়গায় ঢুকলো
উচাটন আর মনকেমনের গল্প

আমিও কখন যেন পেরিয়ে এসেছি
বৃত্তসুখের সাতকাহন

অথ লাইব্রেরী কথা

অলোকা সরকার

১৯৭৮ এর জুন মাসের একদিন।

বেলা ১২/১২.৩০ লাইব্রেরীর কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকলেন গলদঘর্ম হয়ে যাওয়া প্রোফেসর রাও।ওনার স্ট্যাট-ম্যাথ ইউনিট থেকে লাইব্রেরী সামান্য কয়েক পা তাতেই উনি গলদঘর্ম হয়ে গেছেন।ফ্যানের তলায় একটু দাঁড়ালেন কারণ ওনার পরের গন্তব্য ডানদিকে থাকা সারি সারি ক্যাটালগ ক্যাবিনেট, সেখানে ঠিক মাথার ওপর ফ্যান নেই।ইতিমধ্যে দরজার বাঁ দিকে কাউন্টারের সামনে জটলা করা ৫/৬জন স্টুডেন্টদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে ওনার সঙ্গে কিছু কথা বলল।এটা এই ১০ তলা বিল্ডিঙ্গের দোতলা, এই ফ্লোরে শুধুই বই থাকে।এখান থেকেই ইস্যু হয়।

ক্যাটালগ দেখা শেষ।ওনার পরের গন্তব্যটাও জানা।উনি এখন চলে যাবেন সোজা চার তলায় যে ঘরে নতুন বই থাকে।স্তূপীকৃত নতুন আসা বইয়ের মধ্যে ওনার বিষয়ের কোন বই আছে কিনা দেখবেন। সাধারণতঃ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলেন না। একটু রাশভারী। উনি বেরোচ্ছেন ঢুকলেন প্রবীণ প্রোফেসর এক্স বসু।যদিও এক্স বাবু বলেই উল্লেখিত হতেন সাধারণতঃ।উনি এসেছেন এই বিল্ডিঙের পাঁচ তলায় ইকনোমিক রিসার্চ ইউনিট

থেকে।গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টা ,প্রায়ই কাগজে নাম দেখা যায়। অন্য সময় শার্ট,প্যান্ট পরেন এখন পরে আছেন ধুতি পাঞ্জাবি।উনি ঢুকতেই এগিয়ে এল ওয়াই-দা, লাইব্রেরীর বহু পুরনো লোক ,পদমর্যাদায় খুব একটা উচ্চস্তরের নয় কিন্তু।

ওয়াই এগিয়ে দিল নস্যির ডিবে।এক্স বাবু একটিপ নস্যি নিয়ে দু একটা কথা বলে এগিয়ে গেলেন(হ্যাঁ এতটাই ইনফর্মাল এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ ছিল তখন) ওই সেকশনের অ্যাসিস্টান্ট লাইব্রেরিয়ান জেড বাবুর টেবিলের দিকে। উনিও বেশ পুরনো লোক, এঁর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক । একটা সাজেশন কার্ড নিয়ে কিছু নতুন বই কেনার জন্য সাজেস্ট করে গেলেন।অ্যাপ্রুভাল এর জন্য সেটা যথাসময়ে যথাস্থানে তিনি পেশ করবেন।
এক্স বাবু এবার চল্লেন স্ট্যাকের ভিতর..... ইকনমিক্স কিছু বই দেখবেন..... ইকনমিক্সের বই এর আলমারি গুলো থাকে একেবারে শেষ প্রান্তে.....হারিয়ে গেলেন উনি আলমারির অরণ্যে।

ইতিমধ্যে তিনতলা থেকে একটা হালকা চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এটা প্রায় রোজকার ব্যাপার।পুরো তিনতলাটাই হল জার্নাল সেকশন।কাউন্টারের অংশটুকু বাদ দিয়ে সিঁড়ির একদিকে পুরোটা জুড়ে জার্নালের ডিসপ্লে র‍্যাক। সব জার্নালের সাম্প্রতিকতম ইস্যুটি সেখানে রাখা থাকে।জার্নালের ভল্যুম কমপ্লিট হলে সেগুলো বাঁধানো হয়ে আলমারিতে ওঠে।তখন এক একটা জার্নালের যা ওজন হয় তা তুলতে ওয়েট লিফটিং এর কাজ হয়ে যায়। এই বিল্ডিঙের গ্রাউণ্ড ফ্লোরের অর্ধেকটা জুড়ে রিপ্রোগ্রাফি সেকশান চলতি কথায় জেরক্স।কারুর কোন জার্নালের কোন আর্টিকেল জেরক্স করার দরকার হলে রিক্যুইজিশন স্লিপ জার্নালের কাউন্টারে জমা দিলে সেই বাঁধানো ভল্যুমটি নীচে রিপ্রোগ্রাফিতে নিয়ে যেতে হত। কাজটা করতে হত হেল্পার, তেলুগু টানে বাংলা বলা তারিণী আর ভোজপুরি বুলি মিশিয়ে বাংলা বলা তেওয়ারীকে। অত ভারি ভারি জার্নাল বয়ে নীচে নিয়ে যাওয়া.....দু জনের কারুরই পছন্দ ছিল না, নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতে চাইত।

আজকে তারিণী আর তেওয়ারীর মধ্যে চ্যাঁচামেচির বিষয়টা হল, আগের দিন প্রোফেসর এ টু জেড রাও(ইংরাজী বর্ণমালার অর্ধেক এর বেশী বর্ণ দিয়ে তৈরী ওনার একগজী নামটাকে সাধারণ জনে সংক্ষেপে এ টু জেড করে নিয়েছে) বেশ কয়েকটা জার্নাল রেখে গেছিলেন কতগুলো আর্টিকেল জেরক্স করে আনার জন্য। অথচ সেগুলো জেরক্সে গিয়ে ওঠেনি। জার্নালের বহর দেখে দুজনেই পিঠটান দিয়েছে।এখন চলছে দোষারোপের পালা। অন্যসময় দু জনের ঝগড়ায় সেকশনের সবাই মজা পায় অনেকসময় তাতিয়েও দেয় , আজকে ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে গেছে। এগিয়ে এলেন বিভাগীয় প্রধান.....বাবা বাছা করেই হোক বা ধমকধামক দিয়েই হোক এক্ষুণি কাজটা করাতেই হবে.....একটু পরেই প্রোফেসর রাও আসবেন।

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং টেলিফোন বাজছে ৪ তলায় আক্যুইজিশন ইউনিটে।
--আপনাদের ওখানে কি তাপস দা গেছেন
--কোন তাপস দা
--আরে জিওলজির প্রোফেসর-ইন-চার্জ
--ও তাপস চৌধুরী...হ্যাঁ এসেছিলেন তো...বেরিয়ে গেছেন তা অনেকক্ষণ.. সার্কুলেটিং এর দিকে যেতে দেখেছি..

ততক্ষণে সুবিন্যস্ত আলমারীর অরণ্য পেরিয়ে তাপস চৌধুরী পৌঁছে গেছেন এই ফ্লোরেরই অন্যপ্রান্তে থাকা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী নামক সব পেয়েছির দেশে।এখানে জেনারেল ইন্টারেস্টের বই থাকে।ছেলেময়ে দুটির জন্য বই নিতে হবে।বড়টি স্কুলে পড়ে । এনিড ব্লাইটনের ভক্ত ওর জন্য একটা ব্লাইটনের বই নেবেন, নিজেই পড়ে নেবে।ছোটটি এখনও পড়তে শেখেনি গিন্নির ফরমাশ ওর জন্য ঠাকুমার ঝুলি নিয়ে যেতে হবে,গিন্নি পড়ে দেবেন।এখনো মনে পড়ে প্রথম যে দিন এখানে এসেছিলেন তাজ্জব হয়ে গেছিলেন যখন বই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে একটা আলমারিতে আবিষ্কার করেছিলেন সহজপাঠ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুপাঠ্য গুলো ছাড়াও বেশ কিছু বই যা বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ । ৮০ বছর উত্তীর্ণ হওয়া আই-এস-আই-এর মতো এই রকম একটি শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে এই বই পাওয়া যাবে স্বপ্নেও ভাবেন নি। প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ব পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন বিষয়মুখী আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি কারণে গড়ে উঠেছিল এই সংগ্রহ। গিন্নির জন্য নিলেন একটা হাল আমলের বাংলা উপন্যাস আর নিজের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । বইটা অনেকদিন ধরেই পড়ার ইচ্ছে ছিল, আজ পেয়ে গেলেন। নাঃ অনেক দেরী হয়ে গেল...নামার সময় জার্নাল সেকশনে দেখে যেতে হবে Journal of Sedimentary Petrology র লেটেস্ট ইস্যুটা এসেছে নাকি।

২০১৬ র জুন মাসের একটা দিন ।বাইরে প্রচণ্ড গরম। লাইব্রেরীর কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকল কেউ একজন। না:, ইনি স্টুডেন্ট রিসার্চ স্কলার প্রোফেসর কেউই নন, নাম করা পাবলিশারের একজন প্রতিনিধি, অর্ডার সংক্রান্ত কোন কাজে এসেছেন। গন্তব্য লাইব্রেরী অফিস। ঢুকেই তিনি বললেন (মনে মনে অবশ্য) বাঁচলাম।লাইব্রেরী এখন পুরোটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

তারিণী আর তেওয়ারীর ঝগড়াও আর হয় না। কারণ জেরক্সের জন্য জার্নাল নীচে নিয়ে যাবার আর দরকারই হয় না পুরো ব্যবস্থাই এখন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। আছে একাধিক প্রিন্টার ,একাধিক জেরক্স মেশিন।

প্রোফেসরদেরও আর লাইব্রেরীতে বিশেষ আসতে হয় না বই বা জার্নাল ইস্যু করতে ,কিম্বা নতুন বই/জার্নাল কেনার জন্য সাজেশন দিতে অথবা ক্যাটালগ দেখতে। যে যার জায়গায় বসে সে সব কাজ সেরে ফেলেন অনলাইনে।

লাইব্রেরীটা আছে। ঘুমিয়ে।

(কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়)

বিটলসদের “মোনালিসা”

অধীশ চক্রবর্তী

“সার্জেন্ট পেপার্স লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড”

বিস্ফোরণের আগে একটা প্রস্তুতি পর্ব থাকে। কখনও কখনও সেই প্রস্তুতি পর্ব হয় দীর্ঘ এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখা। বিটলসদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিটলসরা রক মিউজিকের জগতে ফেনোমেনন হয়ে উঠেছিল। আটলান্টিকের দু-পারেই লাইভ শো ঘিরে তীব্র উন্মাদনা। একের পর এক অ্যালবাম আর হিট সিঙ্গল বেরচ্ছে। খ্যাতি, অর্থ, সমালোচকদের প্রশংসা সবই তখন অনায়াসে আসছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হতাশা জমছিল। নতুন কিছু করতে না পারার হতাশা। জনতার আবদার মেনে পরের পর শো-তে একই গান গেয়ে যাওয়ার ক্লান্তি গ্রাস করছিল ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভাবে। অ্যালবাম যেমন বেরনোর বেরচ্ছিল, সেসব বিশাল মাপের হিট-ও হচ্ছিল কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল।

১৯৬৬-তে বেরল "রিভলভার"। মেজাজের দিক থেকে অনেক সিরিয়াস, প্রথমদিকের অ্যালবামগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। সেই অ্যালবাম যথারীতি বিপুল হিট। ওদিকে ম্যানেজার ব্রায়ান এপস্টাইন সমানে লাইভ শো-র আয়োজন করে যাচ্ছে কিন্তু লাইভ শো-তে গাইতে হচ্ছে পুরনো গান গুলো-ই। বিরক্ত জন লেনন এক সাক্ষাৎকারে বলে ফেলল, স্টেজে বিটলসদের চারটে মোমের মূর্তি দাঁড় করিয়ে দিলেও শো হিট হয়ে যাবে। ৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে টোকিওতে একটা বড় শো করতে গেল বিটলসরা। এই শো বিটলসদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। শো-এর সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু ইউরোপ বা অ্যামেরিকার শো-এর চিৎকৃত উন্মাদনা জাপানে দেখা গেল না। ধীর, শান্ত জাপানীরা চুপ করে বসে গান শুনল। আর বহুদিন পরে স্টেজের ওপরে বিটলসরা নিজেদের গাইতে শুনল। এবং নির্ভুল বুঝে নিল পার্ফম্যান্স একেবারে যাচ্ছেতাই হয়েছে। টোকিও শো কুখ্যাত হয়ে আছে বিটলসদের জঘন্যতম লাইভ পার্ফম্যান্সের এক বড় উদাহরণ হিসেবে। এরপর ফিলিপাইন্সের ম্যানিলায় শো করতে গিয়ে ফার্স্ট লেডী ইমেল্ডা মার্কোসের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করে বিটলসরা এবং উত্তেজিত জনতার হাতে মার খেতে খেতে বেঁচে যায়।

পরের শো অ্যামেরিকায়। সেই অ্যামেরিকা যে দেশে বিটলসম্যানিয়ার জন্ম। সেই অ্যামেরিকা যেখানে বিটলসদের হোটেলের ঘরের বালিশের কভারের ছোটো ছোটো টুকরো এক ডলার করে বিক্রি হয়েছিল। এবারে অ্যামেরিকা যাওয়ার আগে জন লেনন দুম করে বলে বসল, বিটলসরা যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও বিখ্যাত। নিন্দার ঝড় উঠে গেল অ্যামেরিকায়। ক্ষমা চেয়েও বিশেষ লাভ হল না। স্যান ফ্রানসিস্কোয় লাইভ শো প্রায় অর্ধেক ফাঁকা গেল।

"উইদিন ইউ, উইদাউট ইউ"

হতোদ্যম, হতমান হয়ে বিটলসরা ঘরে ফিরে এল। এসব ক্ষেত্রে সাধারাণত যা হয়, বিটলসদের ক্ষেত্রেও তাই হল। চাপা ক্ষোভ ফেটে বেরল। ঠোঁটকাটা জর্জ হ্যারিসন সাফ বলে দিল আবার যদি লাইভ শো করতে হয় তাহলে ও দল ছেড়ে দেবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। তাছাড়া বাকিরাও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। অতএব ঠিক হল গান বাজনা আপাতত কিছুদিন বন্ধ রেখে যে যার নিজের মত অন্তত কিছুদিন বাঁচবে। সেই সুযোগে পল ম্যাককার্টনি সিনেমায় মিউজিক দিল, লেনন একটা সিনেমায় অভিনয় করল, হ্যারিসন গেল রবিশঙ্করের কাছে সেতার শিখতে।
এইসব করে যেই একঘেয়েমি কেটে গেল, নতুন কিছু করার ছটফটানি অসহ্য হয়ে উঠল। বিটলসরা আবার এক জায়গায় এল কিন্তু লাইভ শো আর নয়। সবার মাথাতেই নতুন নতুন আইডিয়া গিজগিজ করছে, সেগুলোকে আকার দেওয়াটাই তখন প্রধান কাজ। সাফল্যের জন্য আকুল কামনা আর নেই, সাফল্যের শীর্ষ তো ছোঁয়া হয়ে গেছে আগেই। এবার পরিণত মনের শিল্পীর সৃজনশীলতাকে নতুন খাতে বইয়ে দেওয়াটাই কর্তব্য।
এরমধ্যে পল ম্যাককার্টনি একবার অ্যামেরিকা থেকে একা একা ফিরছিল, সঙ্গে এক পরিচিত ভদ্রলোক। প্লেনে ম্যাককার্টনি একবার কি কথায় সল্ট অ্যান্ড পেপার বলে, সেই ভদ্রলোক সেটা শোনেন সার্জেন্ট পেপার। নামটা ম্যাককার্টনির মাথায় ঢুকে যায়।

নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঠিক করা হয় যে, নতুন অ্যালবামের সব কিছুই হবে আলাদা। শুধু লিরিক আর মিউজিক নয়, সাউন্ডও হবে একদম নতুন ধরনের। সেই মতো গান লেখা চলতে থাকে। সুর দেওয়া, অ্যারেঞ্জমেন্ট

করাও হতে থাকে। অ্যালবামের নাম ঠিক হয় সার্জেন্ট পেপার্স লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড।
৬৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অ্যাবে রোড স্টুডিওতে রেকর্ডিং শুরু হয়। প্রোডিউসার যথারীতি জর্জ মার্টিন। বিটলসদের সাফল্য এবং উত্থানের পেছনে এই ভদ্রলোকের অবদান প্রচুর। বিটলসদের সঙ্গে এতটাই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে ওনাকে ফিফথ বিটলও বলা হত।
এই সময় বিটলসরা নিজেদের কাজে মগ্ন। কোন লাইভ শো নয়, কোন সিঙ্গল নয়। বিটলসদের মত হাই প্রোফাইল গ্রুপ হঠাত একেবারে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় গুজব রটে যে বিটলস ভেঙে যাচ্ছে।

"লুসি ইন দা স্কাই উইথ ডায়মন্ড"

১৯৬৭ সালের শুরুর দিকে দুটো সিঙ্গল বেরয় বিটলসদের। তারপর আবার সব চুপচাপ। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সার্জেন্ট পেপারের রেকর্ডিং শেষ হয়। ততদিনে ঠিক হয়ে গেছে অ্যালবামের কভার কেমন হবে।

১৯৬৭-র ১লা জুন ব্রিটেনে বেরল সার্জেন্ট পেপার্স লোনলি হার্টস ক্লাব ব্যান্ড। একদিন পরে অ্যামেরিকায় বেরল সেই অ্যালবাম। রক মিউজিকের এক নতুন যুগের শুরু হল। বলা হয় রক মিউজিকের দুটো যুগ- সার্জেন্ট পেপারের আগে আর সার্জেন্ট পেপারের পরে।

এই অ্যালবাম ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অ্যামেরিকা আর কানাডায় এক নম্বরে পৌঁছায়। এখনো পর্যন্ত তৃতীয় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া রক অ্যালবাম এবং রোলিং স্টোন ম্যাগাজিনের বিচারে বিশ্বের সর্বকালের সেরা রক অ্যালবাম। আর্ট রক ঘরানা এই অ্যালবাম থেকেই শুরু, পরে পিঙ্ক ফ্লয়েড বা জেথ্র টাল-এর মত গ্রুপ যে ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই অ্যালবামের প্রতিটা গানই অন্য গানের চেয়ে আলাদা। মেজাজ আলাদা, লিরিকের ধরন আলাদা, সাউন্ড আলাদা। টাইটেল ট্র্যাকের তীব্র গীটার রীফের পাশাপাশি আছে "উইদিন ইউ, উইদাউট ইউ"-এর মৃদু সেতার। পপ রক ঘরানার "হোয়েন আই অ্যাম সিক্সটি ফোর"-এর পাশাপাশি আছে সাইকেডেলিক রক "লুসি ইন দা স্কাই উইথ ডায়মন্ড"। "গুড মর্নিং গুড মর্নিং" -এ কুকুরের ডাক, মোরগের ডাক, পাখির ডাক মিলেমিশে সৃষ্টি হল এক অনবদ্য ক্যাকোফনি। এই গানে স্পষ্ট প্রভাব পড়ল বিচ বয়েজ-এর "পেট সাউন্ড" অ্যালবামের সাউন্ডের। আবার, সাইকেডেলিক রকের ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রেটফুল ডেড-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে দিক থেকে দেখলে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল সার্জেন্ট পেপারে। অ্যামেরিকান রকের জগতে যে ব্রিটিশ ইনভেশন শুরু হয়, বিটলসরা ছিল তার বর্শামুখ। এবার বিটলসদের অ্যালবামে প্রভাব পড়ল অ্যামেরিকার এই দুই গ্রুপের।

সার্জেন্ট পেপার রক অ্যালবাম কিন্তু এতে ক্লাসিকাল নির্ভর গান-ও আছে। জর্জ হ্যারিসনের "উইদিন ইউ, উইদাউট ইউ" ভারতীয় সঙ্গীত প্রভাবিত। খামাজের সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। আবার, "এ ডে ইন লাইফ" এর ৪০ পীস অর্কেস্ট্রা আর পিয়ানোয় আছে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালের প্রভাব।

পিটার ব্লেকের ডিজাইন করা অ্যালবামের কভার-ও নিজের জোরেই এক শিল্পকর্ম। সাইকেডেলিক আর্টের এই বিখ্যাত নমুনায় বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের কআর্ড বোর্ড কাট আউটের সামনে মার্চিং ব্যান্ডের পোষাকে বিটলসরা দাঁড়িয়ে। তাতে কার্ল মার্ক্স আছেন, মেরিলিন মনরো-ও আছেন। পরমহংস যোগানন্দ আছেন আবার আইনস্টাইনও আছেন। মহাত্মা গান্ধীর ছবি শেষ মুহূর্তে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিপুলাকার বক্সার সনি লিস্টন আছেন আবার তন্বী মে ওয়েস্ট-ও আছেন। এমনকি শ্যামাচরণ লাহিড়িও উপস্থিত। একদম সামনে লাল শাড়ি আর সোনার মুকুট পড়া লক্ষ্মী মূর্তি।

সবমিলিয়ে এই অ্যালবাম শুধু রক মিউজিকের জগতে নয়, সামগ্রিকভাবে শিল্পের জগতে এক অনন্য সংযোজন। টিম রীলি তাঁর বিখ্যাত বইয়ে এইজন্যই এই অ্যালবামকে বলেছেন, "মোনালিসা অফ বিটলস"।

নাটক

প্রিয়রঞ্জন অধিকারী

দৃশ্য :- ১

ইন্দ্রলোকে বিরাট হইচই,ফ্রান্সের জঙ্গি হানায় দেবরাজ ইন্দ্রের মন ভীষন উতলা।এমারজেন্সি মিটিং কল করে সবাইকে জানানো হল ইন্দ্রলোকে থাকতে গেলে প্রত্যেকের আধার কার্ড লাগবে। ওই কার্ডছাড়া হাত বাড়িয়ে মন্ডা মিঠাই পাওয়া বন্ধ,বিনা কার্ডে রম্ভা মেনকার হাম হাম গুড়ি গুড়ি নাচ দেখাও বন্ধ,বেণু বনে প্রেম করা বা বসে থাকাও নিষিদ্ধ। দেবরাজ কোনও রিস্ক নিতে চাননা। তাই কার্ড নির্মানের মেশিনের জন্য খবর গেল বিশ্বকর্মার দপ্তরে কিন্তু ওনারা স্বয়ং ব্রহ্মার চাপে স্বর্গডেঙ্গু প্রতিরোধক টিকা প্রস্তুতির মেশিনারি নির্মানে ব্যস্ত। কৈলাস থেকে যে হারে পটাপট ডেঙ্গু বডি পাঠানো হচ্ছে, দেবতাদের সুরক্ষার জন্য স্বয়ং ব্রহ্ম দেবের চাপ আছে। তাই প্রস্তাব ক্যান্সেল। ইন্দ্রদেব তখন ঠিক করলেন দুজন দুজন করে একই প্রফেশনের ভূতপূর্ব মানুষকে মর্তে পাঠাবেন কার্ড বানানোর জন্য। সেই রকমই দুই জুড়ির প্রথম জুড়ি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্র আর দ্বিতীয় জুড়ি হলেন উত্তমকুমার আর ভানু, কিন্তু ইন্দ্রদেবের একটা শর্ত ছিল। জুড়িকে চেনা কোনও জায়গায় ল্যান্ড করাবেন আর হাতে গুগল ম্যাপ লোড করা একটা ডিভাইস থাকবে যাতে শুধুমাত্র একবার আউটগোয়িং হবে। যাইহোক বিশেষ দিনে ইন্দ্রলোকের স্পেশস্যাটেল জুড়ি দের মর্তে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। (প্রথম জুড়ি কে এক শ্মশানে ছাড়া হল আর দ্বিতীয় জুড়িকে টালিগঞ্জের ষ্টুডিও পাড়ায়) তারপর.....

দৃশ্য : ২

(শ্মশানে তখন অনেক রাত। কিছু দূরে আগুন জ্বালিয়ে জনাদুয়েক মানুষ কি যেন করছে। একটু এগিয়ে দেখা গেল দুজনে বসে মদ্যপান করছে। তাদের কথা শুনে বোঝা গেল একজনের নাম হাতকাটা শিবা আর এক জনের নাম ড্যাবরা ডোম।বঙ্কিম আর শরৎ তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই....)

শিবা: আরে মামা! তোমরা কে গুরু? এই রাতের বেলায় অমন যাত্রা পার্টির মত সেজে আর একজন কন্যাদায়গ্রস্থ বাপের মত,কেস খেয়েছ মনে হচ্ছে?

বঙ্কিম : বৎস! তব শ্রুতিবিদারক টিপ্পনী কিঞ্চিৎ বন্ধ রাখিয়া, আমাদিগের ব্যান্ডেল যাইবার উপায় দর্শাইতে পারিবে কি?

শিবা : লে বঙ্কা! বাংলা বাংলা শোনাচ্ছে। কিন্তু এমন জাপানী বাংলাতো আগে শুনিনি। তুমি কি বলতে চাইছো মামা?

শরৎ : আরে না না ভায়া, উনি তোমায় একটা ঠিকানা জিজ্ঞাস করছেন শুধু। তার আগে তুমি একটা কথা বল, যেটা তোমরা গলায় ঢালছ সেটা কি সুরা?

শিবা : না,দাদু এটাকে আমরা টান্টু বলি। দু গ্লাস মেরে নাও সব পাতলা হয়ে যাবে। নেবে নাকি?

শরৎ : দাও দেখি!

শিবা : দেরে ড্যাবরা দাদুকে দু পেগ।

ড্যাবরা : (গ্লাস এ ঢেলে) নাও দাদু চোখ বন্ধ করে মেরে দাও।

শরৎ : (গদ গদ করে দু গ্লাস নেওয়ার পর, একমুঠো মুড়ির চাখনা আর এক কামড় লঙ্কা খেয়ে) এ কেমন জিনিষ খাওয়ালে বাছা, সব কেমন সুন্দর হয়ে গেল। এ জিনিষ আমার চুনি বাবু পেলে, দেবদাস বেটাকে আরও আগে পটকে দিত।

শিবা : মালটা দু পেগেই আউট রে ড্যাবরা। শারুক খান আর জ্যাকি শ্রফের গল্প শোনাচ্ছে।

ড্যাবরা : গুরু একটু ল্যাগ ডাষ্ট দাও, কত জান তুমি।

বঙ্কিম : বৎস! তুমি কি বলিতে পারিবে লৌহপথগামিনী দাঁড়াইবার পথটি কোনদিকে?

শিবা : এই মালটা মটকা গরম করছে কেনরে ড্যাবরা?

বঙ্কিম : শরৎ! চল বাছা ইহারা আমাদিগের বস্তুর সহিত তুলনা করিতেছে।

শরৎ : ভাই আমার উনি ইষ্টিশানে যাওয়ার রাস্তাটা জিজ্ঞাস করছেন।

শিবা : ও তাই বল। এখান থেকে সোজা চলে যাও, মেন রাস্তা পাবে। ওখান থেকে টোটো ধরলেই ষ্টেশন।

শরৎ : টোটো আবার কি বস্তু?

বঙ্কিম : আমাদিগের টোঁ টোঁ করিয়া ঘুরিবার সময় নাই।

শিবা : আরে মামা ওটা যে কি যান, যে চড়েছে সেই জানে।

বঙ্কিম : চল শরৎ যাওয়া যাক।

শরৎ : চলেন গোঁসাই চলেন।

দৃশ্য :- ৩

(টলিউডের অন্ধকার ষ্টুডিও পাড়ায় উত্তম কুমার আর ভানু হাঁটছে)
উত্তম : হ্যাঁ রে ভানু এ কোথায় এলাম? কিচ্ছু চিনতে পারছি না যে।
ভানু : এয়ে হলো গিয়া আমাগো টালিগঞ্জো, আজকাল এডারে টলিউড কয়।
উত্তম : সে বলুক কিন্তু ওই বড় বিজ্ঞাপণ টা কিসের দেখতো।
ভানু : আজ্ঞে দাদা। (এই বলেই ভানু রাস্তা থেকে ইঁট তুলে ছুড়তে উদ্যত হয়)
উত্তম : আরে কি হল রে তুই রেগে উঠলি কেন?
ভানু : রাগুম না, হালার কালকের পোলাপান কয় কিনা আমি মহানায়ক, তাহইলে কি আমাগো দাদা টলিগঞ্জ পাড়ায় চপ ভাজত নাকি?
উত্তম : আর ওদিকেরটায় কি আছে রে?
ভানু : আজ্ঞে দাদা, মা ঠাকরন গিন্নীদের উপদেশ ঝাড়ছেন। আপনাগো নাম কইররা। কইতাসেন আপনিও খাইতে খুব ভালবাসতেন।
উত্তম : ওই খেয়ে খেয়েই তো গেলামরে অকালে।
(একটু চমকিয়ে) আরে ভানু এই ষ্টাচুটা তো আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা কালো পাথরের কেন? আর গায়ে মাথায় ওইসব সাদা সাদা কি লেগে আছে?
ভানু : দাদা তাজমহল সাদা কইরা যা কেস খাইসে তাই বাঙালি কন্যার প্রথম প্রেমিক ডারে লইয়া আর রিস্ক নেয় নাই। আর ওই যে সাদা সাদা দেখতাসেন ওইগুলো হইল গিয়া রিওয়ার্ড। ওই সেনাদলে যেমন ইষ্টার লাগানো থাকে ওই রথম ব্যাপারডা।
উত্তম : কি অপমান! চল চল তাড়াতাড়ি কাজ সেরে স্বর্গে ফিরি।
ভানু : হ্যা দাদা! তাই চলেন।

দৃশ্য :- ৪

(সকাল থেকে আধারকার্ড নির্মানের লাইনে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম আর শরৎ)
অফিসার : নেক্সট।
বঙ্কিম : কি করিতে হইবে বৎস?
অফিসার : টুপি আর ওই ড্রেস টা খুলে মানুষের মত ড্রেস পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।
বঙ্কিম : ইহাই আমার পরিচ্ছদ।
অফিসার : এই মালটাকে কেউ বোঝা রে, এখানে যাত্রা হচ্ছেনা।
শরৎ : (লাইনে দাঁড়িয়ে) কত্তা যা বলছে করে ফেলুন ঝামেলা করে পরতা হবেনা।
বঙ্কিম : শরৎ একি কহিতেছ? বিবস্ত্র করিয়া ছাড়িবে ইহারা। (বলতে বলতে জামা টা খুলতে লাগল)।
অফিসার : মার এই পাগলটাকে মার, ইয়ার্কি মারতে এসেছ?
(সকলে মিলে মারার জন্য তেড়ে আসতে লাগায় বঙ্কিম আর শরৎ দৌড়ে বাইরে আসে)

দৃশ্য :- ৫

অফিসার : নাম কি?
উত্তম : উত্তম কুমার
অফিসার : বাড়ী কোথায়?
উত্তম : বসতবাড়ী ভবানীপুর, অবসত টা ময়রা ষ্টিট।
অফিসার : কি করেন?
উত্তম : একটিং করি। চিনতে পারছেন না আমি সেই উত্তম।
অফিসার : গাঁজা কি দিনেও খান? কাজের সময় ফাজলামি না মেরে সোজা সাপ্টা বলুন।
উত্তম : আরে মশাই বলছিতো আমি সেই উত্তম কুমার, ম্যাটিনি আইডল।
(দৌড়ে ভানুর প্রবেশ)
ভানু : দাদাগো এরা আমার হাফ গেঞ্জিতে ফুটো তুলুমনা। আমি তো এই পইরাই কবে থেকে আসি। কইলাম আমি ভানু। কয় কিনা প্যাদাইয়া বানাইমু তোমায় হনু।
উত্তম : সেকিরে?
ভানু : দাদা এখন কি করুম?
উত্তম : কি করবি। চল পালাই। মার খেয়ে লাভ নেই।

দৃশ্য :- শেষ

(বিবেকের আগমন)

বিবেক :- সত্যি কি অদ্ভুত এই মানুষের মনগুলো, জীবিত অবস্থায় সম্মান নাই। মৃত্যুর পর মেকী ভালবাসা। যতদিন যায় মানুষের মনের থেকে মুছে যায় তার প্রিয় মানুষ গুলো। যদিবা ঈশ্বরিক ক্ষমতায় ফিরে আসে মৃত প্রান, ধরায় তার নাহি সম্মান। সকলের কাছেই একটাই বাস্তব যে গেছে তাকে ভুলে সব নতুন করে শুরু কর।

আধুনিক বাংলা গানের ভাষা - মূলধারা এবং অন্য ধারা

সোমেন দে

এককালে বাংলা গান সম্মন্ধে প্রবাদ ছিল 'কানু বিনা গীত নাই' । অর্থাৎ গানের বিষয় ছিল একটিই । রাধা কৃষ্ণের প্রেম । আসলে তখন সমাজে অনাত্মীয় নর এবং নারীর মধ্যে প্রেম হওয়াটা চালুই ছিল না । কারণ মেয়েদেরতো বিয়েই হয়ে যেত বয়স বারো তেরো ছুঁলেই বা তারও আগে । তাই জীবনে দাম্পত্য প্রেমের বাইরে আর কোনো প্রেম ছিল না, কিন্তু প্রেমের ক্ষিদে তো ছিল ।তাই বঙ্কিমচন্দ্র অবধি গল্প লিখিয়েদের প্রেমের কথা বলতে ইতিহাসের কাল অথবা পরকীয়া আশ্রয় করতে হয়েছে । সমসমায়িক সমাজের চরিত্রদের মধ্যে প্রেম দেখানোটা সময়চিত কাজ ছিল না ।

আর গান লিখিয়েরা গানের মধ্যে দিয়ে সেই প্রেমের যাবতীয় কথা বলা হত রাধা কৃষ্ণের নাম দিয়ে । বিদ্যাপতি, জয়দেব , ভারতচন্দ্র , কমলাকান্ত , রামপ্রসাদ সবাই হয় ভক্তিমার্গের অথবা দেব দেবীর প্রেম নিয়ে গান লিখেছেন । অষ্টাদশ শতকে রামনিধি গুপ্তই অবশ্য 'কানু বিনে' ব্যাক্তি প্রেমের গান লিখেছিলেন । কিন্তু তার তার জন্যে তাকে নাকি প্রচুর হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়ে ছিল । তার পর মোটামুটি বিশ- তিরিশের দশকে যখন বাঙালি মেয়েরাও অবিবাহিত অবস্থায় কালেজে যেতে শুরু করল , তখনি বাঙ্গালির জীবনে যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুরোদগম ঘটলো । আর তখনই কানু বিনেও প্রেমের গান লেখা হতে লাগলো । এর আগে বাংলা 'আধুনিক গান' এর জন্ম এবং প্রসার আসলে এ দেশে রেকর্ড ব্যাবস্থা চালু হবার পরেই ।আসলে 'আধুনিক' তকমাটি বাংলা গানের হটাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন । রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ নেই বলে আফসোস করেছিস' ।কিন্তু ঐ একবারই তার পর আর কোনো লেখায় তিনি আধুনিক গান শব্দবন্ধটি ব্যাবহার করেন নি । তাই এই আধুনিক গান নামটি ঠিক এখান

থেকে নেওয়া হয়নি নয় । 'আধুনিক গান' তকমাটি খুব সম্ভবত ব্যবসার সুবিধার্থে রেকর্ড কোম্পানিদেরই দেওয়া ।

আধুনিক বাংলা গানের কথা কি হতে চাইবে , কি বলতে চাইবে ,কি ধরতে চাইবে , কি ছুঁতে চাইবে, কি গ্রহন করতে চাইবে , কি বর্জন করতে চাইবে এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেকবার । মীমাংসা হয়নি । তাই গানের বিষয় কতটা আধুনিক হলে সে গান আধুনিক গান বলা যাবে তা নিয়ে কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই । তেমনি কতটা রাগের প্রভাব থাকলে সে গান কে আধুনিক না বলে রাগাশ্রয়ী বলা হবে , বা গানের বিষয় কতটা গ্রামীন হলে তাকে লোকগীতি বলা যাবে এ রকম কোনো ব্যাখ্যাও কোথাও পাওয়া যাবে না । ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠা গান 'তু লাল পাহাড়ীর দ্যাশে যা , রাঙ্গা মাটির দ্যাশে যা ' গানটিকে সবাই লোকগান বলে উল্লেখ করে থাকেন । কিন্তু এটি বছর চল্লিশ আগে একজন নাগরিক কবি অরুণ চক্রবর্তীর রচনা । সেই হিসেবে এটিকে আধুনিক গান বলাই উচিত । তেমনি অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গান শচীনদেব বর্মনের গাওয়া 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে' এই গানের ভাষা সে সময়ের তূলনায় যথেষ্ট আধুনিক হওয়া সত্বেও এই গান কে অনেকেই রাগাশ্রয়ী গানে তকমা দেন ।

আপাতত শ্রেণী বিভাগের চুল চেরা বিশ্লেশনে না গিয়ে আমরা আধুনিক বাংলা গানের প্রচলিত ধারণাটিকে আশ্রয় করি ।এবং আপাতত আধুনিক গানের সুরের কথা ভুলে গানের কথা নিয়ে দু কথা বলার চেষ্টা করি।

একটা বিশাল অংশের বাংলা গানের শ্রোতাদের এমন একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সেই স্বর্ণযুগের গানে গানের ভাষা যেমন সম্বৃদ্ধ ছিল এখনকার গানের ভাষা সেই তূলনায় বড়ই দুর্বল । সত্যিই কি তাই ? গ্রামাফোন ডিস্কে আধুনিক গানের রেকর্ড যখন থেকে শুরু হল সেই বিশের দশক থেকে আশির দশক অবধি এই বিরাট সময়টায় কয়েক হাজার বাংলা গান লেখা হয়েছে।যাঁরা গান লিখেছেন তাঁরা অনেকেই খুব উচ্চস্তরের কাব্যগীতি রচনা করেছেন ।কিন্তু সবাই নয় ।অনেক গানেরই কথা ঘুরপাক খেয়েছে একটা চেনা বৃত্তের চারিদিকে। কিন্তু খুব ভালো সুর তাকে উৎরে দিয়েছে । যুদ্ধ ,মন্বন্তর ,দেশভাগ থেকে নকশাল আন্দোলনের মত আলোড়ন তোলা ঘটনা , যা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিটি ধারায় গভীর ভাবে ছাপ ফেলেছিল , বাংলা গান কিন্তু এ সবের থেকে উদাসীন থেকেছে অদ্ভুত ভাবে । প্রায় সব গীতিকাররাই ব্যাক্তি প্রেমের আকূলতার বাইরে গিয়ে কোনো কথা বলবার চেষ্টা করেননি ।তাই বাংলায় 'অন্য ধারার গান' এর সংখ্যা খুব অল্প।তারি মধ্যে কেও কেও দু একটি করে গান লিখেছিলেন যেগুলির ভাষা গতানুগতিক প্রেম নয় । যেমন তিরিশের দশকে মোহিনী চৌধুরীর লেখা – 'পৃথিবী আমারে চায় / রেখো না বেঁধে আমায়' – এ গানে ব্যাক্তি প্রেম এবং দেশপ্রেম দুই প্রেমের আবেদন ছিল একই গানের মাধ্যমে । সুর করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত । প্রথম রেকর্ড করেছিলেন সত্য চৌধুরী।

গণনাট্য সঙ্ঘের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন পরেশ ধর । তাঁর লেখা এবং সুর করা একটি গান হেমন্ত মুখোপাধ্যারে কণ্ঠে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল যে গানটি কথায় ছিল একটি নিসর্গের ছবি আঁকার চেষ্টা । রবীন্দ্রনাথের পরে এ রকম প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে । গানটি হল –শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি।
সলিল চৌধুরীর 'গাঁয়ের বধু' এতটাই অন্যধারার গান ছিল যে হেমন্তবাবু প্রথমে এ গান গাইবেন না ভেবে ছিলেন। তাঁর ভয় ছিল এই গানের জন্যে শ্রোতারা প্রস্তুত নয় ।কিন্তু এই অন্যধারার গান যে কি আলোড়ন

তুলেছিল সে গল্প তো আমাদের জানা । এর পরে অনেক গানেই সলিল চৌধুরী তুমি-আমির প্রেমের বাইরে গিয়ে অন্যধারার গান লিখেছেন । যা ঠিক গণ সঙ্গীত নয় । কিন্তু অন্য অর্থে মানুষের উত্তরণের কথা বলে। সলিল চৌধুরীর গানের কথা একটি আলাদা বিষয়। এই নিবন্ধে তা নিয়ে আর বিস্তারে যাচ্ছিনা।

পিট সিগার বলেছিলেন – Right song at the right time can change history।
যেমন করে David Hasselhoff এর Looking for freedom গান বার্লিনের প্রাচীর ভাঙতে উৎসাহিত করেছিল হাজার হাজার মানুষকে , যেমন করে Stevie Wonder এর গান Happy Birthday , মার্টিন লুথার কিং এর জন্মদিন কে জাতীয় ছুটি ঘোষনা করার জন্যে আমেরিকায় একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল , যেমন করে John Lennon এর গান Imagine there's no heaven সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে শান্তির প্রতি সমর্থন জাগিয়ে তুলেছিল ,যেমন করে Louis Armstrong এর What a Wonderful world সারা পৃথিবীর মানুষ কে প্রকৃতি প্রেমিক হতে উৎসাহী করেছে , যেমন করে Bob Dylan এর 'Any day now, any day now I shall be released' সিভিল রাইটস আন্দোলন কে উজ্জীবিত করেছিল সে রকম ভাবে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবার মত আমাদের কোনো গান নেই । একমাত্র বন্দেমাতরম গান ঘটনাচক্রে একটা সময়ে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ।
কিন্তু আমরা আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে বাংলা আধুনিক গানের উৎসমুখে আমরা পেয়েছি দুজন বিরাট মাপের সঙ্গীত স্রষ্টা কে, যাঁরা গানের ভাষা এবং সুর এই দুই জগতেই অসীম ধন রেখে গেছেন ।বলা বাহুল্য তাঁদের নাম রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল । আজ অবধি আমাদের আধুনিক গানের ভাষা এই দুজনের দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত । কিন্তু তার পর তো সমাজ বদলেছে অনেক ভাবে । গানের ভাষার কি কোনো দায় নেই বদলে যাবার ?

যেহেতু রেকর্ডের গানের সঙ্গে একটা বানিজ্যের সম্পর্ক আছে , তাই রেকর্ডে গাওয়া আধুনিক গানের জন্ম লগ্ন থেকেই গানের ভাষার উপর কোথাও একটা বানিজ্যিক নিয়ন্ত্রন পরোক্ষ ভাবে কাজ করতে লাগল ।আধুনিক কবিতার যেহেতু production cost নেই বললেই চলে ,এবং তাকে বিপনন করতে হয় না তেমন ভাবে ,তার ওপর কোনো বানিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ কেও চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল না। কবিতা একেবারে স্বাধীন ভাবেই চলতে লাগলো কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ।আধুনিক বাংলা গান কিন্তু সে ছাড়পত্র পেলো না ।তাকে পণ্য হয়ে থাকতে হল। সেই থেকে আধুনিক কবিতা আর আধুনিক গানের - দুজনার দুটি পথ দুটি দিকে গেছে বেঁকে ।আর যত দিন গেছে দুটি পথের দুরত্ব বাড়তে বাড়তেই থেকেছে ।

রবীন্দ্র-নজরুল যুগ শেষ হবার পরে , শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্র যেহেতু সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন , তিনি একজন প্রথম সারির কবি হওয়া সত্বেও কিছু আধুনিক গান ও লিখেছিলেন । অন্য আধুনিক কবিরা সে পথ মাড়ান নি বললেই চলে । যেন যাঁরা গান লেখেন তাঁরা গীতিকার , কবি নন , এবং যাঁরা আধুনিক কবিতা লেখেন তাঁরা কবি গীতিকার হতে পারে না , এ রকমই একটা অঘোষিত ভাগাভাগি হয়ে গেল । এর ফলে যা ঘটলো , তার একটা দিক হচ্ছে আধুনিক গানে প্রেমই হয়ে উঠল নিরাপদ আশ্রয় ।সমাজ যতই বদলাক প্রেমের আবেগ বিশেষ বদলায় না । তাই প্রেমের গান বিষয় হিসেবে চিরকালীন এবং প্রেম শুধু নিরাপদই নয় , নিরপেক্ষ বিষয়ও বটে ।কারোর দিকে বা কিছুর দিকে আঙ্গুল তোলা নেই ।তর্ক ঝগড়া রাগারাগির সম্ভাবনা নেই । গান মস্তিস্কের বিষয় নয় শুধু হৃদয়ের বিষয় এ রকম একটা ভুল ধারণা কি করে যেন আম

জনতার মনের মধ্যে বসে গেল । তাই সেই প্রণব রায়-অজয় ভট্টাচার্য-সুবোধ পুরোকায়স্থ এর যুগ থেকে শ্যমল গুপ্ত-গৌরীপ্রসন্ন- পুলক বন্দোপাধ্যের যুগ অবধি গানের কথায়, কয়েকটি উজ্বল ব্যাতিক্রম ছাড়া , প্রেমের গন্ডীর বাইরে গিয়ে কিছু অন্বেষণের কথা তেমন করে ভাবেন নি ।সুরকারদের মধ্যেও comfort zone হয়ে উঠল প্রেম ।

একদা আই পিটিএর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারনে জোতিরীন্দ্র মৈত্র , পরেশ ধর , হেমাঙ্গ বিশ্বাস , সলিল চৌধুরি এবং তার পরে অভিজিৎ , প্রবীর মজুমদার , অনল চট্টোপাধায়রা অন্য গানের ধারা কে মাঝে মাঝে সঞ্জীবিত করেছেন । কিন্তু বাংলা আধুনিক গান একটু মাথা নেড়ে চেড়ে আবার ফিরে গেছে নিরাপদ প্রেমের চেনা আশ্রয়ে , বকুল বিছানো পথের ছায়াচ্ছন্ন রোমান্টিকতায় ।কিন্তু গৌরীপ্রসন্ন-পুলক বন্দোপাধ্যায়-মুকুল দত্ত দের পরে একটা সময় গানের কথা ক্রমশ দুর্বলতর হতে থাকল ।নতুন করে তেমন গুণী গীতিকারদের দেখা পাওয়া গেল না । আর সেই সব মেলোডির যাদুকররা একে একে চলে যাওয়ায় , দুর্বল কথাকে সুরের জোরে উৎরে দেওয়াও যাচ্ছিল না আর । এর ফলে বাংলা গানের জগতে একটা সার্বিক দৈন্যতা নেমে এল ।

ঠিক সেই সময়টায় সুমন এলেন এবং বাংলা আধুনিক গানের আঙ্গিনা অন্য-গানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ।গানের বিষয় আবার অনেক দিনের পর প্রেমের গন্ডি ছাড়িয়ে অনেক দিকে ছড়িয়ে গেল । আধুনিক গান সত্যিই আধুনিকতার হাত ধরল ।কবিতা এবং গান আবার কাছাকাছি এল । নচিকেতা-অঞ্জন দত্ত রাও লিখলেন কিছু অন্য-গান ।

সুমন সমসাময়িক জীবনটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন তার গানে । যে সব শব্দ বাংলা গানে ব্যাবহার করা হত না , মাত্রা , ছন্দ , scanning এই সব বজায় রাখার প্রয়োজনে , সেগুলিকে গানে অনায়াসেই এনে ফেললেন । তিনি দেখালেন গানের কথাকে বোধ্যতার গন্ডির মধ্যে রেখেও কতটা কাব্যিক এবং একই সঙ্গে কতটা জ্যান্ত করে তোলা যায় ।

নচিকেতা নিজেকে একটি ব্রান্ড করে তুলতে পেরেছেন তাঁর একধরণের ধাক্কা দেওয়া লিরিক্স্ এর মাধ্যমে ।নিজে একজন শক্তিশালী পারফরমার হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর গানের একটা আলাদা পরিসর তৈরি করে নিতে পেরেছেন । কিন্তু তাঁর গানের কোনো ধারা তৈরি হয় নি ।

অঞ্জন দত্ত গানের কথায় এক ধরণের গল্প বলার চেষ্টা আছে । নীচু তলার বা সাধারণ মানুষের গল্প । ট্রেনে লজেন্স বিক্রি করা ছেলেটি , বা বাজারে মুর্গি কাটার কাজ করা ছেলেটির কথা, বেকার ছেলেটার অবশেষে চাকরি পাওয়ার কথা বাংলা গানে উঠে আসবে সেটা কারো কল্পনাতেও ছিল না কোনোদিন ।তাঁর গানের এই নতুন ধরন কিছুদিনের জন্যে তিনি প্রবল জনপ্রিয়তা আদায় করে নিল ।

আর একজনের কথা আমাদের বেশির ভাগ আলোচনার বাইরেই থেকে যায় । তাঁর নাম মৌসুমী ভৌমিক । তিনি কিন্তু বাংলা গানের এক গহন পথের যাত্রী ।তিনি একেবারে প্রচারবিমুখ বলে মেডিয়র ঢক্কানিনাদ থেকে বাইরেই থাকেন ।কিন্তু তাঁর গানের বিষয় সুমনের মতই সমসাময়িক । কিন্তু চরিত্রে একেবারে আলাদা ।তাঁর বেশির ভাগ গানের সুরে এবং কথায় একটা বিষন্নতার অশ্রুবাষ্প ঘিরে থাকে।সেটাই গানের আসল সৌন্দর্য।

আর গানের কলিতে লেগে থাকে মধ্যবিত্তর রোজনামচার গন্ধ।

–'কিছু ফেলতে পারিনা / পুরোনো ট্রাঙ্কে পড়ে থাকা ছেঁড়া মোজা জোড়া
ছেঁড়া সোয়েটার , ফেলতে পারিনা
তোষকের নীচে জমানো প্যাকেট / মরচে পড়েছে কৌটোতে
তবু ফেলতে পারিনা ।
কিম্বা
'এখানে সকাল এখন সকাল মেঘলা সকাল
মাটি ভেজা ভেজা গন্ধ
তোমার আকাশে কত তারা ভাসে
তুমিতো দেখোনা
তোমার জানালা বন্ধ '

আর একটা কারণে মৌসুমী ভৌমিক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । কারণ তিনিই একমাত্র মহিলা শিল্পী যিনি নিজে গান লেখেন , সুর দেন এবং নিজেই গেয়ে থাকেন।

এর মধ্যে লোপামুদ্রা মিত্র গাইলেন কিছু বিখ্যাত কবিতাকে সুর দিয়ে । সুর করলেন সমীর চট্টোপাধ্যায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায় , নীরেন চক্রবর্তী, সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় জয় গোস্বামীর বেশ কিছু কবিতা গান হয়ে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে গেল । সুর এবং পরিবেশনার গুনে কিছু কবিতা-গান জনপ্রিয়ও হল । এর মধ্যে বেণীমাধবতো ফেনোমেনান হয়ে গেল । কিন্তু লোপামুদ্রা ছাড়া আর কেও এ পথে পা রাখলেন না ।

এর মধ্যে নব্বইয়ের দশকে বাংলা-ব্যান্ড এর জন্ম হল ।প্রথম প্রথম একটা হৈ চৈ পড়ে গেল । তরুণ ছেলেমেয়েরা যারা বাংলা গানে আধুনিক জীবনের গতি খুঁজে পাচ্ছিল না তারা ভীষন ভাবে গ্রহন করলো ব্যান্ডের গান কে । তাই ব্যান্ডের সুযোগ ছিল গানের কথায় নতুন কিছু বলার চেষ্টা করার । কিন্তু 'চন্দ্রবিন্দু' ছাড়া অন্য দল গুলি তাদের গানের মিউজিক্যাল এরঞ্জমেন্ট বদলানো নিয়ে যতটা ভাবনা চিন্তা করল , গানের কথা নিয়ে তেমন নতুন কিছু ভাবনা দেখা গেল না । যা একটা আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল সেই প্রবাহ যেন মাঝপথে স্তিমিত হয়ে গেল । চন্দ্রবিন্দু ছাড়া প্রায় অন্য সব বাংলাব্যান্ড কোন ভাঙ্গনের পথে হারিয়ে গেল । যারা টিকে আছে তাদের নতুন কিছুই বলার নেই । চর্বিত চর্বন করে যাচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ।

এত সব হওয়ার পর বাংলা গানের কথায় কি নুতন কিছু কি শোনা যাচ্ছে ? গানের বিষয় কি তার অভিমুখ বদলাল নাকি ফিরে গেল তার চিরচেনা আমি-তুমি-চাঁদ-তারা-ফুলের জগতে ?
এই মুহুর্তে অনুপম রায় অসম্ভব জনপ্রিয় একজন সঙ্গীতকার এবং গায়ক । তিনি হয়ত না জেনেই 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও' গান লিখে এই সময়ের যুবসমাজের একটি স্টেটমেন্ট রচনা করে ফেলেছেন । তাঁর গানের জনপ্রিয়তার সঠিক কারণটা অন্তত আমার বোধগম্য হয় না ।বেশির ভাগ গানেই বেশ মামুলি সুর। মাঝে মাঝেই ক্লান্ত করে ।তবে গানের কথায় আধুনিক কবিতা হবার চেষ্টা আছে । দুটি খুব জনপ্রিয় গানের মধ্যে আছে এরকম লাইন –

... যে ভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত
নতুন আলুর খোসা আর এই ভালোবাসা
আমার দেয়াল ঘড়ি কাঁটায় তুমি লেগে আছো .....
আর একটি -
কত কত দিন কাব্যহীন থেকে যায় ডিমের সাদায়
কিছু কিছু নাম প্রেমিকার জিভে জড়িয়ে যায় , কখনো বা কাঁদায় ...

গানের এই ধরণের কথা কি সাধারণ শ্রোতাদের কাছে সত্যিই বোধ্য হচ্ছে , নাকি অত্যন্ত ভালো সাউন্ডস্কেপের দৌলতে উতরে যাচ্ছে, গোটা গানের কথা আর ততটা জরুরী নয় । আরম্ভের দু এক লাইনই যথেষ্ট । এই সময়ের বিখ্যাত কবি শ্রীজাতও গান লিখছেন । তবে কবিতায় তিনি যতটা স্বচ্ছন্দ গানে ঠিক সে রকম ভাবে কোনো ছাপ রাখতে পারেন নি এখনো ।

সুমন ভবিষ্যত গানের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যুগান্তরের খবরটা যেন গানই বয়ে আনে । একুশ শতক এসেছে । যুগান্তরের সন্ধান গান এখনো দিতে পারেনি । তবু কোথাও কিছু বদলাচ্ছে হয়ত ।এই আকালেও কি কেও গান কে অস্ত্র করতে চাইছে ? সময় তার উত্তর দেবে ।
মূলধারার গান খুব ব্যাপক ভাবে না হলেও বোধহয় ধীরে ধীরে কিছুটা ছক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। একজন গীতিকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।গীতিকারের নাম সৈকত কুন্ডু । সৈকত এই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী গীতিকার বলে আমার মনে হয়। ব্যাক্তি প্রেমের গন্ডি ছাড়িয়ে সে যাবার চেষ্টা করছে অন্য গানের ভোরে । সৈকতের লেখা আর একটি সাম্প্রতিক সময়ের আধুনিক গান আমাকে চমকে দিয়েছে । তার কথা গুলি এই রকম।

'সিঁদুর-কৌটো উলটে গেছে নীল আকাশের গায়
মেঘ ছুঁয়ে মন রঙের চেয়ে রঙ্গীন হতে চায়
কোন বধু-সাজে গোধূলি-তরণী উঠলে হটাৎ হেসে...
একটা মেয়ে আকাশ দেখছে গণধর্ষন শেষে ।
ভাঙ্গা চাঁদ পড়ে আছে বহুদুরে , চুড়িগুলো আশেপাশে
ছিটে ফোটা লাল রক্তের দাগ লাজুক সবুজ ঘাসে ...
ছিঁড়ে যাওয়া সাড়ি উড়ছিল তার একটি প্রান্তে হাওয়া
এখনও কাঁপছে , বজায় রাখছে দু চোখে শুকিয়ে যাওয়া ;
চিত হয়ে স্থির পাথরের মত , সব পেয়েছির দেশে
একটি মেয়ে আকাশ দেখছে গণধর্ষন শেষে ।...'

আর একটি গানের কথায় আছে কবিতার স্নিগ্ধতা
'ধরে নাও, কিছু রোদ্দুর পড়ে থাকলো
এখন প্রশ্ন, কোনখানে তাকে রাখবে
সম্পর্কের নাম কেন তুমি চাইছ

আমি চলে যাবো তুমি চলে যাবে
রোদ্দুর পড়ে থাকবে'

আর একটি সৈকত কুন্ডুর লেখা গান শুভমিতার গাওয়া ,যেন সুমনের ছলাৎ ছল নদীর জলের গল্প বলা যেখানে শেষ হয়েছে , তার রেশ ধরে উঠে আসে -
শোনো সুজন বন্ধু শোনো শোনো নদীর হাওয়া
শোনো গাছের পাতায় পাতায় রোদের আসা যাওয়া
শোনো ঘর ভেঙ্গে যে দাঁড়ায় এসে একলা নদীর ধারে
তার দুচোখে তোমার দু চোখ ছলকে উঠতে পারে

চলকে ওঠে বুকের কথা ঢেউয়ের ফনা ছুঁয়ে
কারণ আমি সেই নদীটার জলের ওপর শুয়ে
রোজ ধুয়ে যায় জীবন আমার পার ভাঙ্গে দুই ধারে
ছলাৎ ছলাৎ গল্প নদীর কান্না হতেও পারে ...

সৈকতের লেখা শ্রীকান্ত আচার্যর গাওয়া একটি গান ইতি মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে । সে গানের ভাষায় এক আশ্চর্য টান আছে সোঁদা মাটির ।এ গান শুনলে খুব নিরাসক্ত থাকা যায় না , এক লাইন শুনলে পরের লাইনটার জন্যে কান পাততে ইচ্ছে করে । এই নড়বড়ে সময়ে যদি একটা গান সেটা পারে তাহলে সেটাই আর কম কি!

'তুমি ঠিক যেমন আছো তার থেকে ঠিক দুই পা দূরে
আমাদের ছোট্টো নদী বাঁকছে মেঠো বাঁশীর সুরে,
গেঁয়ো পথ গাইছে বাউল
বট ঝুরিটার দোলনা ফাঁকা,
ছায়া রোদ শিরায় শিরায়
মৌরি ফুলের গন্ধ মাখা,
যা ছিল তেমনি আছে
প্রশ্ন তুমি যাচ্ছো কিনা
আমি সেই নদীর বাতাস
আমার কোনো নাম দিয়ো না'

আশা করবো বাংলা গানের কথা ঠিকঠাক সময়কে ধরবার চেষ্টা করে যাবে ।গানের কথায় প্রেমিক বা প্রেমিকার মুখে পরষ্পর কে 'তুমি' থেকে 'তুই' বলে সম্বোধন করাতে নেমে এলেই সময়টাকে ধরা নয়, ওটা সময় কে ধরার ভান মাত্র ।

পুজোর খাওয়াদাওয়া

শুচিস্মিতা বন্দোপাধ্যায়

কর্ণ কোফতা কারি (৩-৪ জনের)
উপকরণ-
কোফতার জন্যে-
এক কাপ কর্ণ
এক কাপ গ্রেট করা গাজর
২ -৩ টেবিল চামচ ব্যাসন
১ টেবিল চামচ কর্ণ পাওডার
২টি কাঁচালঙ্কা
১ চা চামচ আদা বাটা
হাফ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো
অল্প গরম মশলাগুঁড়ো
স্বাদ মতন নুন
২ টেবিল চামচ কুচোনো ধনেপাতা

কারির জন্যে-
২ টি মাঝারি টমেটো পেস্ট
২ টেবিল চামচ টক দই
২-৩ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা
১ চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা
১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
হাফ চা চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো
হাফ চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো
২ টি তেজপাতা
২ চিমটে হিং গুঁড়ো
নুন স্বাদ মতন
১ চা চামচ চিনি
ইচ্ছে হলে অল্প ঘি দেওয়া যায়
কোফতা ভাজা ও রান্নার জন্যে হাফ কাপ সাদা রিফাইন্ড তেল
সাজানোর জন্যে ২-৩ টেবিল চামচ ফেটানো ক্রিম ও ২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচোনো

প্রস্তুত প্রণালী-

একটি সসপ্যানে জল ফুটতে দিয়ে ওতে কর্ণ ও অল্প নুন দিন। হিট কমিয়ে কর্ণ নরম হওয়া অবধি রাখুন। এবার জল ভালো করে ঝরিয়ে নিন।

এবার জল ঝরানো কর্ণের সাথে গ্রেট করা গাজর ও কোফতার মশলা, নুন, বেসন, কর্ণ পাওডার, কুচোনো ধনেপাতা মিশিয়ে নিন ভালোভাবে। এবার ঐ মাখা থেকে খানিকটা করে নিয়ে গোল-চ্যাপটা করে বল বানিয়ে নিন।
সব কটা বল বানানো হলে ডিপ প্যানে তেল গরম করে দুপিঠ বাদামি করে ভেজে তুলে রাখুন। প্যানের তেল বেশি মনে হলে একটু কমিয়ে নিন। গরম তেলে তেজপাতা ও হিং দিন। এবার ওতে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে মাঝারি আঁচে কষুন, পাশগুলো পুড়ে গেলে অল্প জলের ছিটে দিন। পেঁয়াজের রং পাল্টালে ওতে আদা-রসুন বাটা দিয়ে নাড়ুন। এক মিনিট মতন নেড়ে ওতে অল্প জলের সাথে হলুদ, ধনে, জিরে, দুরকম লংকাগুঁড়ো মিশিয়ে তেলে দিয়ে নাড়ুন। এবার ওতে টমেটো বাটা দিয়ে কষুন। খানিকটা পরে দেখবেন তেল ও মশলা আলাদা হয়ে গেছে। তখন পরিমান মতন গরম জল দিন, ফুটে উঠলে ঢাকা দিন। ৪-৫ মিনিট পরে দই তে নুন ও চিনি দিয়ে ফেটিয়ে কারিতে ঢেলে দিন। এবার একটি প্যানে ১ চামচ ঘি গরম করে ওতে গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নিয়ে কারিতে ঢেলে দিন। এবার কর্ণ কোফতা মিশিয়ে এক-দুবার ফুটিয়ে সার্ভিং পাত্রে ঢেলে ওপর থেকে ফেটানো ক্রিম দিন ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে সার্ভ করুন। ইচ্ছে হলে মশলা কষার সময় একটু বাদাম-পোস্ত বাটা মেশাতে পারেন । পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াও ভালো হবে।
ভাত, রুটি, লুচি সবের সাথেই ভালো লাগবে।

চিকেন কাটলেট

চিকেন কাটলেট বানাতে যা যা লাগবে-
৫০০গ্রাম হাড় ছাড়া চিকেনের মাংস,
৩-৪ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা,
১ টেবিল চামচ করে আদা-রসুন বাটা,
২ টি কাঁচা লঙ্কা র সাথে একমুঠো ধনেপাতা অল্প জলে বাটা,
নুন ও অল্প গোলমরিচ স্বাদ মতন,
২ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস,
২ টি ফেটিয়ে নেওয়া ডিম,
২/৩ কাপ ব্রেডক্রাম্বস বা বিস্কুট গুঁড়ো,
১ কাপ সাদা তেল ভাজার জন্যে।

প্রস্তুত প্রনালী-
প্রথমে বোনলেস চিকেনকে পছন্দমতন সাইজের পিস করে কেটে নিতে হবে। এবার ওতে পেয়াজ, আদা-রসুন, ধনেপাতা ও লঙ্কা বাটা, নুন-গোলমরিচ আর তার সাথে লেবুর রস মাখিয়ে এক ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এবার একটি চ্যাটালো বাটিতে ডিম ও এক চিমটে নুন দিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে আর একটি প্লেটে খানিকটা বিস্কুটগুঁড়ো ঢেলে ছড়িয়ে রাখতে হবে।
এবার মশলা মাখানো এক একটি চিকেনের পিস ডিমের গোলাতে ডুবিয়ে বিস্কুটগুঁড়ো মাখাতে হবে দু-পিঠেই। এইভাবে সব চিকেনের পিসগুলো গড়ে নিতে হবে। এবার একটি প্যানে তেল দিয়ে ভালো করে গরম করে আঁচ কমিয়ে নিয়ে দুটি করে গড়ে রাখা চিকেনের পিস দিয়ে ভাজতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে পুড়ে না যায়, দুপিঠ ভালো করে ভাজা হলে তুলে নিয়ে পেপার টাওয়েলে রাখতে হবে। এইভাবে সবকটা চিকেন কাটলেট ভাজা হলে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে তার সাথে টমেটো সস বা কাসুন্দির সাথে সার্ভ করতে হবে। এর সঙ্গে লম্বা করে কাটা শসা ও গাজর দেওয়া যেতে পারে।
গরম চায়ের সাথে বা ঠান্ডা পানীয়ের সাথে দারুণ জমবে।

ভাপা ইলিশ

ইলিশ পছন্দ করেন না এমন বাঙ্গালি খুব কমই অছেন। এই ইলিশ ভাপা খুবই প্রচলিত দিশ, তবুও আমি এই রেসিপিটি সবার সাথে ভাগ করে নিলাম। এর জন্যে চাই ভালো জাতের অন্তত এক কিলো সাইজের ইলিশ।

উপকরণ-
৫-৬ টি বড় সাইজের ইলিশের পিস (গাদা ও পেটি)
৩ টেবিল চামচ সর্ষে (সাদা ও লাল)
১ টেবিল চামচ পোস্তো, আর ২-৩ টি কাঁচালংকা, এক চিমটে নুন অল্প জলে বাটা
অল্প হলুদ গুঁড়ো
৩ টেবিল চামচ দই
স্বাদ মতন নুন
২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল
৩-৪ টি চেরা কাঁচালঙ্কা

প্রস্তুত প্রণালী-
মাছের পিস ধুয়ে একটি থালাতে রাখুন। এবার একটি স্টিলের টিফিন কৌটোতে টক দই এক চামচ জলে ফেটিয়ে ওতে সর্ষে-পোস্তো বাটা, ১/৪ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে ওপরে সর্ষের তেল ও কাঁচা লঙ্কা চিরে সাজিয়ে কৌটোর মুখ বন্ধ করে ফুটন্ত গরম জল ডেকচিতে দিয়ে ইলিশ মাছের কৌটোটি বসিয়ে কৌটোর ওপর ভারি কিছু চাপা দিয়ে ১২-১৫ মিনিট হতে দিন। আঁচ মাঝারি রাখতে হবে।
এবার গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। এই পদটির কোনো বিকল্প নেই।
মাইক্রো ওভেনে করতে গেলে একই মশলা ও তেল মাখিয়ে মাইক্রো ওভেন প্রুফ পাত্রে মশলা মাখানো মাছ রেখে ওপরে ঢাকা দিয়ে পাত্রটি একটি মাইক্রো প্রুফ ইডলি স্টিমারে জল দিয়ে বসিয়ে মাইক্রো মোডে ১০-১১ মিনিটে হয়ে যাবে। বার করে একবার দেখে নিতে হাবে। যদি ঝোল বেশি শুকিয়ে যায় তো অল্প জল দিয়ে আরও ২ মিনিট দিয়ে অফ করে দেবেন।

রবিবারের আলু দেওয়া মাংসের কারি

এই মাংসের পদটির কথা আমাদের ছোটো থেকে শুনে আসছি। তখনকার যৌথ পরিবারে রবিবার ছুটির দিন সবাই একসাথে দুপুরের আহার করত। আর সেই দিন সাধারণত বাড়ীতে মাংস আসত বাজার থেকে যাতে সবাই জমিয়ে আনন্দ করে একসাথে খাবে।

মাংসের কারির জন্যে যা যা উপকরণ লাগবে–
১ কেজি পাঁঠার মাংস
১০–১২ টি মাঝারি সাইজের আলু
১০ টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ
২ টেবিল চামচ আদাবাটা
৩ চা চামচ রসুনবাটা
৪–৫ টি মাঝারি সাইজের কুচো টমেটো
১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো,
১ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো,
১ চা চামচ কাশ্মিরী লাঙ্কাগুঁড়ো
১ টেবিল চামচ ধনেগুঁড়ো,
১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো
আস্ত গরম মশলা (৫ টি করে ছোটো এলাচ, ৫ টি লবঙ্গ, আর ৩ টি দারচিনি,
৩ টি তেজপাতা
১ ছোটো চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো
ছোটো হাফকাপ টক দই
১ চা চামচ চিনি ও নুন স্বাদ মতন
১৫০–১৭৫ গ্রাম সর্ষের তেল ও ১ টেবিল চামচ ঘি

প্রস্তুত প্রণালী-

প্রথমে মাংস ধুয়ে নিয়ে কোনো মশলা ছাড়া প্রেসার কুকারে এক কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন, খেয়াল রাখতে হবে মাংস বেশি গলে না যায়। মাংস প্রেসারে বসিয়ে ঐ সময় পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখুন, এর মধ্যে ৩ টি পেঁয়াজ বেটে নিন। আলু দু-টুকরো করে নিন। টমেটো কুচিয়ে নিন।

প্রথমে তেল গরম করে আলুগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে রাখুন। এইবার ঐ তেলে তেজপাতা ও আস্ত গরম মশলা থেঁতো করে দিন। গরম মশলার সুগন্ধ বেরোলে ওতে কুচোনো পেঁয়াজ দিয়ে ভাজতে থাকুন রং পাল্টানো অবধি। এবার বাট পেঁয়াজ দিয়ে কষতে থাকুন, একটু পরে ওতে আদা-রসুন বাটা দিয়ে নাড়ুন। এরপর অল্প জলে হলুদ, লঙ্কা, কাশ্মিরী লঙ্কা, ধনে-জিরে গুঁড়ো গুলে দিন। মিনিট খানেক পরে ওতে কুচোনো টমেটো দিয়ে নাড়ুন। খানিকটা সময় দিন টমেটো গলা অবধি। এবার প্রেসার কুকারের ঢাকা খুলে ঝোল ও মাংস আলাদা করে রাখুন। এবার টমেটো গলে তেল বেরোলে ওতে মাংস দিয়ে কষুন ভালো করে। আঁচ খুব বেশি বাড়াবেন না। এবার ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে নেড়ে ঢাকা দিন। মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে নেড়ে নিন। খানিকটা কষে নিয়ে সেদ্ধ মাংসের জল টি দিন। ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিন। যখন আলু ও মাংস ভালো করে সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন টক দইতে পরিমাণ মতন নুন ও চিনি দিয়ে ফেটিয়ে মাংসের ঝোল এ ঢেলে দিন। নুন-মিষ্টি ও ঝাল পছন্দমতন দেবেন। প্রয়োজনে আর একটু গরম জল মেশাতে পারেন। এবারে মাংসের ওপরে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে পাত্রে ধেলে নিন। গোবিন্দভোগ চাল বা বাসমতির সাথে ভালই যাবে। এই রান্নাটি খুবই সাধারণ, তবে সবার সঙ্গে বসে আড্ডা মারতে মারতে রবিবারের দুপুরে এই আলু দেওয়া মাংসের ঝোল খুবই উপাদেয় লাগে।

চিংড়ির পোলাও

খেতেও যেমন সুস্বাদু তেমন রান্না করতেও ঝামেলা নেই।

উপকরণ-

২৫০গ্রাম বাসমতি চাল

২৫০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো মাঝারি সাইজের বাগদা চিংড়ি

১ টি মাঝারি সাইজের কুচোনো পেঁয়াজ

২ টি করে ছোটো এলাচ, লবঙ্গ আর ২ টি দারচিনির স্টিক

২ টি তেজপাতা

হাফ চামচ করে হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো

১ টি বড় সাইজ টমেটো বাটা

নুন স্বাদ মতন

১ চা চামচ চিনি

১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস

১টি মাঝারি পেঁয়াজ, ৪ কোয়া রসুন ও ছোটো এক টুকরো আদা একসাথে মিক্সিতে জলের ছিটে দিয়ে বেটে নিতে হবে

৫-৬ টেবিল চামচ সাদা তেল আর তার সাথে ইচ্ছে হ'লে অল্প ঘি দেওয়া যেতে পারে

হাফ চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো

সাজানোর জন্যে ২-৩ টেবিল চামচ কুচোনো ধনেপাতা।

প্রস্তুত প্রণালী-

চালটা ধুয়ে ১৫ মিনিট জলে ভিজিয়ে ঝরঝরে করে ভাত বানিয়ে রাখতে হবে। ভাত ফোটার সময় অল্প নুন ও ১ চা চামচ তেল দিতে হবে। চিংড়ি মাছ ধুয়ে অল্প নুন হলুদ আর এক চিমটে লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে এক চামচ তেল গরম করে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে।

এইবার একটি প্যান বা কড়াইতে বাকি তেল ও ঘি গরম করে ওতে আস্ত গরম মশলা থেঁতো করে নেড়ে নিয়ে তেজপাতা দিতে হবে, মশলার গন্ধ বেরোলে প্রথমে কুচোনো পেঁয়াজ দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাজতে হবে। রংটা একটু পাল্টালে ওতে পেঁয়াজ-রসুন-আদা বাটা দিয়ে কষতে হবে। একটু পরে ওতে হলুদ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নিয়ে বেটে রাখা টমেটো দিয়ে কষতে হবে। যখন মশলা থেকে তেল বেরোবে তখন ওতে ভেজে রাখা চিংড়ি দিয়ে নাড়ার সময় একটু চিনি ও অল্প নুন মেশাতে হবে। এইবার সেদ্ধ করা ভাত চিংড়ির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে ওপর থেকে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিন। তৈরী চিংড়ির পোলাও। যে কোনো আমিষ পদের সঙ্গে চলবে।

চিতল মুইঠ্যার কারি

মনে হয় খুব ঝামেলা রান্ন করতে। কিন্তু একেবারেই তা নয় কারণ যেখান থেকে চিতলের গাদা কিনবেন ওরাই মাছের কাঁটা ছাল ছাড়িয়ে দেবে আর যদি একটু-আধটু কাঁটা থাকেও বাড়িতে এসে বেছে নেবেন।

মুইঠ্যার উপকরণ-

৫০০ গ্রাম চিতলের গাদা
১ টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ বাটা
১ চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা
১/৩ চা চামচ হলুদ
১ চা চামচ ধনেগুঁড়ো
১/২ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
১/২ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো
১/২ চা চামচ গরমমশলাগুঁড়ো
নুন স্বাদ মত
দু-চিমটে হিঙ গুঁড়ো
২ তি মাঝারি সাইজের সেদ্ধ করা আলু
২ টেবিল চামচ কুচোনো ধনেপাতা
২/৩ কাপ তেল মুইঠ্যা ভাজার জন্যে

কারি বানানোর উপকরণ-

২ টি মাঝারি আলু ডুমো করে কাটা
১/৩ কাপ ফ্রোজেন কড়াইশুঁটি
একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ বাটা
১/২ চা চামচ রসুন বাটা
১ মাঝারি চামচ আদা বাটা
১ টি বড় টমেটো বাটা
১/২ চা চামচ হলুদ্গুড়ো, ১/২ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, ১/২ চামচ কাশ্মিরী লাঙ্কাগুঁড়ো, ১/২ চা চামচ গরমমশলাগুঁড়ো
২ টেবিল চামচ টক দই
তেল
নুন স্বাদ মতন ও ১ চা চামচ চিনি
২ টি তেজপাতা ও আস্ত গরম মশলা
২-৩ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচোনো

মুইথ্যা গড়া-

কাঁটা ও ছালবিহীন মাছে সেদ্ধ-মাথা আলু ও তেল ছাড়া অন্য সব মাশলা ও ধনেপাতা কুচি, নুন মিশিয়ে বড় বড় দলা করতে হবে। এবার কড়াই বা প্যানে জল দিয়ে ফোটাতে হবে। জল যখন ফুটবে তখন চিতলের দলাগুলো জলের মধ্যে সাবধানে ছাড়ুন। এক পিঠ ৫ মিনিট রাখার পর আস্তে করে চামচ দিয়ে উল্টে দিন। আরও ৫ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন বেশি শক্ত না হয়ে যায়। আর সব সময়েই ফুটন্ত জলে দেবেন নাহলে ছেড়ে আসবে।

এইবার একটু ঠান্ডা করে ধোকার মতন করে কেটে নিন।

এবার প্যানে তেল গরম করে মুইঠ্যা দুপিঠ বাদামি করে ভেজে তুলে নিন। হয়ে গেলো মুইঠ্যা ভাজা।

এবার কারি কিভাবে বানাবেন-

মুইঠ্যা ভাজার তেল বেশি মনে হলে একটু কমিয়ে নিন। ঐ তেলে কেটে রাখা আলু হাল্কা আঁচে ভেজে তুলে রাখুন। অল্প জলে গুঁড়ো মশলা গুলে নিন। তবে গরম মশলা নয়।

এবার গরম তেলে আস্ত গরম মশলা ও তেজপাতা দিয়ে নেড়ে নিয়ে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে কষুন , রং পাল্টালে

ওতে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। মিনিট খানেক পর জলে গোলা মশলা দিয়ে নাড়ুন। একটু জলের ছিটে দেবেন। এবার টমেটো বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন, হিং দিন, নেড়ে নিয়ে ভেজে রাখা আলুগুলো দিন। একটু পরে দেখবেন তেল-মশলা আলাদা হয়ে গেছে। অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে রাখুন। আলু নরম হয়ে এলে ফ্রোজেন কড়াইশুঁটি দিয়ে নেড়ে আন্দাজ মতন গরম জল দিন। যখন সব সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন টক দইতে নুন-চিনি ফেটিয়ে কারি তে মিশিয়ে দিন। এবার ভাজা মুইঠ্যা কারির মধ্যে দিয়ে গরম মশলাগুঁড়ো মিশিয়ে দিন। অল্প ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে সার্ভিং পাত্রে ঢেলে ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে সুগন্ধি চালের গরম ভাতের সাথে চিতল মুইঠ্যা পরিবেশন করুন।

আগেকার দিনে মা-ঠাকুমারা পৌষ সংক্রান্তিতেই নানা রকমের পিঠে-পুলি বানাতেন| আর সেই দিনটির অপেক্ষাতে বসে থাকতাম| কত রকমের পিঠে- পুলি যে বানাতেন তা বলে শেষ করা যাবে না|
আমি দুটি পিঠের রেসিপি এখানে দেবো| তার মধ্যে একটি গোকুল পিঠে, এটি বানানো যেমন সহজ তেমনি খেতেও সুস্বাদু|

গোকুল পিঠে

পুরের জন্যে যা যা লাগবে-
১ ও ১/২ কাপ কোরানো নারকেল
১ ও ১/৪ কাপ চিনি
১ কাপের একটু বেশি গ্রেট করা খোয়া | যদি খোয়া না পাওয়া যায় তার পরিবর্তে সম পরিমান মিল্ক পাওডার দেওয়া যেতে পারে
১ চা চামচ ছোটো এলাচের গুঁড়ো

ব্যাটারের জন্যে-
১ কাপ ময়দা
১ কাপ দুধ, তার সাথে ৩-৪ টেবিল চামচ মিল্ক পাওডার মিশিয়ে নিলে ভালো হয়
১ টেবিল চামচ গলানো ঘি
১/৪ চা চামচ সোডা-বাই-কার্ব
রসের জন্যে-
২ ও ১/২ কাপ চিনি
২ কাপ জল
ভাজার জন্যে এক কাপ তেল ও ১ টেবিল চামচ ঘি

কিভাবে বানাবেন-

প্রথমে একটি নন স্টিক প্যানে নারকেল কোরা ও চিনি মিশিয়ে মাঝারি আঁচে পাক দিতে থাকুন| এবার ওতে খোয়া বা মিল্ক পাওডার মিশিয়ে ক্রমাগত নাড়ুন| যখন দেখবেন প্যানের গা থেকে মিশ্রণটি ছেড়ে আসছে তখন গ্যাস বন্ধ করে প্যান নামিয়ে নিন আর ওতে এলাচের পাওডার মিশিয়ে নিন| গরম অবস্থাতেই হাতে গোল করে নিয়ে চ্যাপ্টা করুন| এইভাবে সবগুলো গড়ে নিন|
এই নারকেল-খোয়ার পুর বানানোর আগেই কিন্তু ব্যাটার টি তৈরী রাখুন| আর রসও বানিয়ে রাখুন| রসটি কিন্তু ঘন হবে|
ব্যাটার গোলার জন্যে একটি সামান্য বড় বাটি চাই| প্রথমে ময়দার সাথে সোডা-বাই-কার্ব মিশিয়ে নিন| এবার ঘিয়ের ময়ান দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন| এবার আস্তে আস্তে দুধ মেশান ময়দার সাথে আর সমানে নাড়তে থাকুন যাতে দলা পেকে না যায়| যদি দেখেন গোলাটি বেশি ঘন তবে অল্প দুধ মেশাতে পারেন| বেশি পাতলা না হয়| ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে |
এবার একটি প্যানে তেল ও ঘি দিয়ে গরম করতে হবে| তেল ভালোভাবে গরম হলে অল্প আঁচ কমিয়ে একটি করে গড়ে রাখা নারকেল-খোয়ার চাকতি দুধ-ময়দার গোলাতে ডুবিয়ে নিয়ে গরম তেলে ছাড়ুন| দু-পিঠ বাদামি করে ভেজে তুলে নিন| একসাথে ৩-৪ টি করে ভাজা যায়| সবগুলো ভেজে নিয়ে পেপার টাওয়েলে রেখে তেলটি শুষে নিতে হবে| এবার গরম রসে ফেলুন| কিছুক্ষন রসে রেখে (যাতে রসটি ভেতরে ঢোকে) তুলে নিন আর গরম গরম গোকুল পিঠে পরিবেশন করুন|

মুগের পিঠে

এটিও খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ঝামেলাও নেই। একে মুগসামালিও বলা হয়।

মুগের পিঠের উপকরণ-

পিঠের খোল-

এক কাপ মুগের ডাল

২ টি মাঝারি সাইজের রাঙালু

১ কাপ ময়দা

১/২ বা আর একটু কম চালের গুঁড়ো

১ চা চামচ গলানো ঘি

পুরের জন্যে-

২ কাপ নারকেল কোরা

১ কাপ গ্রেট করা খোয়া

১ কাপ বা একটু কম চিনি

১ চ চামচ ছোটো এলাচের গুঁড়ো

রসের জন্যে-

১ ও ১/৪ কাপ চিনি

২ কাপ জল

ভাজার জন্যে-

১ কাপ সাদা তেল ও অল্প ঘি মেশাতে পারেন

প্রস্তুত প্রণালী

পুরের পদ্ধতি-

প্রথমে পুরটি তৈরী রাখুন। যেমন করে গোকুল পিঠের পুর করবেন সেই একই পদ্ধটিতে নারকেল-চিনি মিশিয়ে মাঝারি আঁচে খানিকটা নেড়ে খোয়া বা মিল্ক পাওডার মিশিয়ে আবার নাড়তে থাকুন যতক্ষন না প্যানের গা থেকে মিশ্রণটি ছেড়ে আসে। এবার এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে গ্যাস থেকে প্যান নামিয়ে রাখুন আর গরম অবস্থাতেই ছোটো ছোটো গোলা নিয়ে হাতে পাকিয়ে গোল করে গড়ে রাখুন।

বাইরের খোল বানানোর পদ্ধতি-

মুগ ডাল শুকনো প্যানে ভাজুন, যখন ডালের সুগন্ধ বেরোবে তখন প্যান নামিয়ে ডাল ধুয়ে নিয়ে অল্প জলে সেদ্ধ হতে দিন। যেন বাড়তি জল না থাকে। যদি মনে করেন জল থেকে গেছে তাহলে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেবেন। এবার রাঙালু প্রেসারে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে জল ঝরিয়ে চটকে নিন। সেদ্ধ করে মাখা মুগ ডালের সাথে সেদ্ধ মাখা রাঙালু মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠিক হওয়া চাই। এবার ময়দা, চালের গুঁড়ো ও ঘি একসাথে মিশিয়ে মুগ ও রাঙালু মিশ্রণে দিন। ভালো করে সব কিছু মেশানোর পর দেখুন বেশী ভিজে লাগছে কি না। মনে হলে আর একটু ময়দা মেশাতে পারেন। এবার এই মাখা থেকে খানিকটা গোলা নিয়ে বলের মতন করে মধ্যিখানে গর্ত করে নারকেল-খোয়ার পুর ভরে মুখটি সাবধানে বন্ধ করে দিন। এর গড়নটি লম্বা পুলির আকারে গড়তে পারলে ভালো হয়। এইভাবে পুর ভরে সবকটি গড়ে ফেলুন।

ভাজার পদ্ধতি-

এইবার ডিপ প্যানে তেল ও ঘি দিয়ে আঁচ গরম করুন। যখন ধোঁয়া উঠবে তখন আঁচ কমিয়ে গড়ে রাখা পুলি ২-৩ টি করে ছাড়তে থাকুন। দু পিঠ সোনালি করে ভেজে তুলুন। এইভাবে সবগুলো ভেজে পেপার টাওয়েলে রাখুন। তেল টেনে নেওয়ার পর একটি কানা উঁচু পাত্রে মুগের পুলিগুলো রাখুন।

রস বানানোর পদ্ধতি–

একটি মাঝারি সসপ্যানে জল ও চিনি মিশিয়ে ফুটতে দিন| অল্প ঘন (পাক্তয়ার রসের মতন) হলে গ্যাস থেকে নামিয়ে মুগের পুলির ওপর গরম রস ছড়িয়ে দিন| একটু রেখে গরম গরম মুগের পিঠে বা মুগসামালি পরিবেশন করুন| অতি সুস্বাদু খেতে|

দিল্লী চাট

চঞ্চল দাস

আদেশ হল যে আমাকে নাকি দিল্লীর খাবারের ওপর কিছু লিখতে হবে। লেখার শুরুতেই জানিয়ে দিই যে আমি খুব বড় খাদ্যরসিক নই। তাই, পছন্দ-অপছন্দ ডিফার করতেই পারে।

তবে সবার আগে দিল্লীর ক্যারেক্টারের ওপরে কিছু বলি। প্রথমত, দিল্লীওয়ালা বলে আর কিছু নেই। মুসলিম সম্প্রদায়, রাজস্থান আর ইউপি থেকে আসা অনেক জনগণ এখন পুরোনো দিল্লীর দিকে সরে গেছে। যারা বংশ-পরম্পরায় পৈতৃক ভিটেতে আজো বিরাজমান, তার বেশিরভাগি বিজনেস ক্লাস। রাত্রে বাজার বন্ধ হলে রাস্তায় তাস আর ক্যারাম বোর্ড পড়ে যায়। নিচে ছেলে তাস খেলছে, আর তিন তলা থেকে বাবা চেঁচিয়ে বলছে "উল্লু দা পটঠা, কুইন কো মার"- শুনতে পাবেন। চাট কচৌরি-সব্জি কুলফি এখনো সেই পুরোনো স্বাদেরই পাবেন।এদের কোনো দোকানে গেলে আগেই জোর করে কচৌরি বা কুলফি খাইয়ে দেবে।আপনার কিছু কেনার প্ল্যান না থাকলেও চক্ষু লজ্জায় কিনতে বাধ্য হবেন। এই পরম্পরা এখনো এখানকার দোকানে গেলে পাবেন।

কিন্তু নতুন দিল্লীর ক্যারেক্টার অন্য রকম। বাঙালী, বিহারি, ইউপি ওড়িশা, তামিল, তেলেগু- কারা নেই? একটা সাহজ হিসেব দিই। ১৯৮৫-৮৬ অবধি বাঙালি দূর্গাপোজোর সঙখ্যা ছিলো ৩৮০টা। এখন যে কটা হয়েছে জানিনা। ইয়ং ওয়ার্কিং কাপল পুরো দিল্লীতে ছড়িয়ে আছে। দশটা-পাঁচটার অফিস আওয়ার্স আজকে গল্প মনে হয়। রাত্রে বাড়ি ফিরে রান্নার বদলে রেস্টুরেন্ট বা হোম ডেলিভারিই এখন সব থেকে পপুলার। তাই নানা রকমের রেস্টুরেন্টের সংখ্যাদিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তাই কোন রেস্টুরেন্ট ভালো বা খারাপ, তা বাছাই করা খুবই মুস্কিল। এই লেখাতে আমি ইন্টারন্যাশানাল ফুড চেইনের রেস্টুরেন্ট গুলোকে এড়িয়ে যাবো।

আগেই জানাই, করিমস-এ গিয়ে আগেভাগে বিরিয়ানির খোঁজ করবেন না। শুরু করুন মাটন বুর্রা দিয়ে। বিস্বাশ করুন, এত সফট মাটন আগে খেয়েছেন কিনা সন্দেহ জাগবে। আপনি মাটন রান ও নিতে পারেন; তাতে এক প্লেটে প্রায় চার পাঁচ জন খেতে পারবেন। যাঁরা আবার চিকেন পচন্দ করেন, তাঁরা চিকেন নূরজাহান বা চিকেন জাহাঙ্গিরি চেখে দেখেত পারেন। সাথে নিত পারেন কাশ্মিরী রোটি। সবার শেষ নিন তন্দুরি বকরা - একটা গোটা বকরা ড্রাই ফ্রুট, বাসমিত চাল, কিমা দিয় তন্দুর বানানো। দাম ৯০০০ টাকা। একদিন আগে অর্ডার দিতে হয় এডভান্স দিয়ে।
কি, চেখে দেখবেন? নাকি, সেই ঘিসাপিটা বিরিয়ানি খেয়ে এসে বলবেন - করিমস এ খেয়ে এলুম! আরেকটা ডিস না বললেই নয়। ইস্টু। এটা ইংরেজদের স্টুর ভারতীয় সংস্করন। আজকাল পাওয়া যায় কিনা বলতে পারবো না, তবে সে যে কি জিনিষ, তা না খেলে বোঝা যাবে না!

এবার যাওয়া যাক কিছু অজানা জায়গায়। এগুলো ছোটো এবং সেকেলে রেস্তোরাঁ, কিন্তু খাদ্য রসিকেরা এদের খবর রাখেন। একটি হল গ্রীন পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাছে - রোসাঙ্গ কাফে। এখানকার পর্ক স্পেয়ার রিবস, মণিপুরি ভাত আর রাইস বিয়ার দুজনের জন্য ১০০০-১২০০ টাকার মতন।

এবার চলে আসুন হজ খস-এ। সন্ধের পর এখানে ঢুকলে মনে হবে কোনো বিদেশি পাড়ায় ঢুকে পড়েছেন। সোশ্যাল, অ্যান্টি সোশ্যাল বারে গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন। দু-একটা ড্রিঙ্ক, সাথে একটু নাচ। একবার যদি ফার্স্ট ফ্লোরে চলে যান, তো পে ছনে দেখতে পাবেন রাতের অন্ধকারে হজ খস লেক। চাঁদনি রাতে অপূর্ব লাগে দেখতে!রাত বারোটা থেকে একটা অবধি খোলা পাবেন। দুজনের খাওয়া ১৬০০-র মধ্যে হয়ে যাবে।

অথবা পাব হপিং করুন। বেশির ভাগ বারে এনট্রি ফী নেই, তবে কিছু জায়গায় শুধু কাপল এন্ট্রিই এলাউড। রঙদে বসন্তি, আর্বান ধাবা, ডার্টি এপ্রন, এজোটে, স্কুটার অন দ্য ওয়ল..... আর কত নাম বলব! সব পাশাপাশি, যেখানে ইচ্ছে ঢুকে পরুন। তবে বেশি ভীড়ভাড় যদি এড়াতে চান, তো চলে আসুন সফদারজঙ্গ এনক্লেভের বি-৬ ব্লকের দ্য পিয়ানো ম্যান জ্যাজ বার-এ! বসে বসে লাইভ ব্যান্ড শুনুন। সাথে ড্রিঙ্কস আর মন পসন্দ খাবার। খরচা কিন্তু খুব বেশি হবে না। ১৮০০ টাকায় দুজনের খাদ্য ও পানীয় হয়ে যাবে।

খাবারের জায়গার ব্যাপারে Delhi University কিছু কম যায় না! ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস এ ব্যাপারে সবার ওপরে! বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশনের কাছে রাকেশের দোকান।সকাল ছটায় খুলে যায়।চলে সন্ধে সাড়ে ছটা অবধি। ওখানকার ব্রেড পকোড়া, আলু পুরি আর সামোসা না খেলে বোঝা যাবে না, কি জিনিস!

এক সময়কার Indian Coffee House এখন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের স্টাফ ক্যান্টিন। গত বাইশ বছর ধরে ইউনিভার্সিটির দুই কর্মী চালাচ্ছেন।মাটন কাটলেট, মাটন দোসা আর স্প্রীঙ রোল। সাথে এগ কারি আর জেলি উইথ ক্রীম খান। কিন্তু কাউন্টারে বসা গান্ধি টুপি পরা বাবাজির সাথে দুটো কথা না বলে কিন্তু আসবেন না! ওঁনার ঠাট্টা ইয়ার্কি মস্করা চুটকি যে না শুনেছে..... আমার তো মনে হয় দিল্লীতে স্ট্যান্ড আপ কমেডি বোধহয় বাবাজিই শুরু করেছিলেন। আর আছে হর্শ-এর মোমোজ পয়েন্ট। হন্সরাজ কলেজের কাছে। চেখে দেখুন স্পাইসি চিকেন আর ফ্রায়েড পর্ক মোমো।

আমাদের শেষ খাবার জায়গা নর্থ ক্যাম্পাসের শগুন। এটি একটি সাউথ এশিয়ান রেস্টুরেন্ট। ভিয়েতনামিজ, বার্মিজ আর থাই খাবার এদের স্পেশ্যালিটি। এদের খাবারের সাথে দেখবার মতন হল এদের ambiance। দিল্লী ইউনিভার্সিটির গল্প বলতে বসলে তো পুরো মহাভারত হয়ে যাবে। তাই চলে আসা যাক দিল্লীর একসময়কার প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসে। এখন আর সেই দিন নেই, যখন সবাই ছুটতো কনট প্লেসে অফিস করতে। এখনো হয়ত কিছু আছে, কিন্তু বেশিরভাগই ছড়িয়ে পড়েছে গুরগাঁও, নয়ডা আর গাজিয়াবাদের দিকে। এখন কনট প্লেস হয়ে গেছে হ্যাং আউট প্লেস। কত যে রেস্তো-বার খুলেছে, গুণে বলা যাবে না। আমি বরং সোজা চলে আসি কাকে- দা-ধাবায় । চোখ বন্ধ করে সোজা অর্ডার দিন বাটার চিকেন আর নান বা তন্দুরি রোটি। কোনো কথা বলবেন না - খেয়ে টাকাটা মিটিয়ে সামনের দোকান থেকে একটা মিষ্টি পান মুখে দিয়ে বলুন বাহ ভই বাহ!

বাংলায় লিখবো আর বেঙ্গল রেস্টুরেন্টের কথা বলবো না, তা তো হয় না! এক সময় দিল্লীতে রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যার নিরিখে বাংলা সবার চাইতে এগিয়ে ছিলো। মাঝে অনেক কমে গিয়েছিলো, তবে যে হারে বাঙালি রেস্টুরেন্ট খুলছে, তাতে আশা করি বাঙালীর সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে।অনেক বাংলাদেশিও এসেছেন। বেশ কয়েকটা ভালো রেস্টুরেন্ট খুলেছে। দাম আর কোয়ালিটির নিরিখে বেশ ভালোই। সব থেকে মজার ব্যাপার হল, এদের মধ্যে অনেকগুলোতে টাকা লাগিয়েছে অবাঙালিরা। আমি যেখানটায় থাকি, সেখানেই তো ৫-৬টা বাঙালি রেস্তোরাঁ আছে। কদিন আগেই ছুটেছিলাম কবিরাজি কাটলেটের লক্ষ্যে। খেয়ে দেখলাম, তবে আর খাবো না। কান ধরেছি। চিত্তরঞ্জন পার্কের গুলো যদি বাদ দিই, তবে Hi Kolkata বেশ নাম করেছে এখানে। এদের মালিক হরিয়াণভি। ওদের নিজেদের মাছের ভেড়ি আছে হরিয়াণা তে। তবে ইলিশ ও পাবদা কোথা থেকে আসে, জানি না। জামাইষষ্ঠিতে আমি এদের পার্মানেন্ট খদ্দের। ম্যানেজার বাবু বাংলাদেশের। আমাকে জামাই আদরেই খাওয়ান। এদের ইলিশ মাছ ভাজা, মাছ ভাজার তেল আর লঙ্কা ভাজা দিয়ে আমি শুরু করি। বড়ি দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল আরেকটা খাওয়ার মতন পদ। ভাতটা ওরা তেজপাতা আর লবঙ্গ দিয়ে ফোটায়। গন্ধটা তাই একটু আলাদা। খেতে কিন্তু বেশ। শেষে ডাব বা লিচুর পায়েস দিয়ে শেষ করি। হ্যাঁ, মিষ্টি পান তো থাকেই।

এবার শেষ করি দিল্লী কি শান, মোতি মহল দিয়ে। ১৯৪৭-এর পার্টিশনের পরে সহায় সম্বলহীন কুন্দন লাল গুজরাল দিল্লীতে আসেন। দরিয়াগঞ্জের এক কোনায় ছোট্ট পুঁজি নিয়ে খোলেন এক ধাবা। নাম দিলেন মোতি মহল। দেখতে দেখতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা দিল্লীতে। এদেরই আবিষ্কার বাটার চিকেন আর দাল মাখানি, যা খেতে তাবড় তাবড় পলিটিশিয়ান এখানে এসেছেন। কুন্দন লালজীর নাতি মণিশ লাল গুজরাল আজকে এই রেস্টুরেন্ট চালায়। দেশে বিদেশে প্রায় ১২০টা ব্রাঞ্চ চলছে। মণিশ"Gourmand Cook Book Award" পেয়েছে।

কি ভাবছেন? হে হে। আমি জানি।

কবে আসছেন দিল্লীতে? আমায় জানিয়ে আসবেন কিন্তু।

পেনসন বই

সুতপা সেন

কলিং বেল টা বেজে উঠতেই তৃণার সব সময়ের সঙ্গী ললিতা গিয়ে দরজা খোলে ,তৃণাও রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে দেখতে যায় ,ততক্ষণে বন্যা পাশে রাখা চটির র‍্যাকেএ চটি খুলতে খুলতে ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে ফেলে তৃণা কে,ওদের চোখাচোখি হতেই তৃণা অবাক হোয়ে তাকিয়েই থাকে বন্যার দিকে। বন্যা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তৃণার হাতটা ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলে—কি রে ?আমায় আবার এত অবাক হয়ে দেখছিস কেন ?কাল এসেছি এখানে ,ইচ্ছে করেই তোকে খবর দেই নি, এইবারে সারপ্রাইজ দেবো বলে,বুঝলি?তৃণার মুখটা করুণ হোয়ে যায়।বন্যার দিকে তাকিয়ে বলে—কেন ?তোর খবর দিয়ে আসতে কি অসুবিধা ছিল ? আজ দ্যাখ,কিছুই সেই রকম আনাজ পাতি নেই ,আমি তো ভাবছিলাম সেদ্ধ ভাত খেয়ে নেব।

বন্যা ওর দিকে তাকিয়ে বলে – তৃণা ,আমি কখন এসেছি ,বসতেও বলবি না ?কেবল কি খেতে দিবি সেই চিন্তায় পাগল তুই।ছাড় তো ওইসব।

ললিতা দূরে দাঁড়িয়ে তার তৃণা দিদির কান্ড দেখে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। এগিয়ে এসে দিদিকে বলে –দিদি ,তুমি ওই দিদিকে নিয়ে বোসো ,আমি সব দেখে নিচ্ছি। তার আগে তোমাদের জন্য চা বানাই ?

তৃণা কিছু বলার আগেই বন্যা বলে ওঠে—হ্যাঁ হ্যাঁ ললিতা ,তুমি বেশ আদা দিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে এসো তো।তৃণা আর বন্যা সোফায় গিয়ে বসে। বন্যার দিকে তাকিয়ে তৃণা বলে—আচ্ছা বন্যা,তুই কি রে ?আমার একটাও চিঠির উওর দিস না কেন রে ?আমি এতো চিঠি লিখতে ভালোবাসি,আর তুই ?নিজে থেকে তো লিখবিই

না ,আমি লিখলেও উত্তর দিবিনা।
বন্যা এবারে তৃণা কে জড়িয়ে ধরে বলে -এই জন্যই তো তোর কাছে হঠাৎ করে চলে এলাম।
তৃণা দূরে সরে গিয়ে বলে-যাঃ তোর সাথে আর কথাই বলব না।
এর মধ্যে ললিতা চা ,তার সাথে একবাটি মুড়িমাখা নিয়ে হাজির।ললিতা ব'লে-নাও তোমরা খেতে থাকো , আমি একটু এই কাছের বাজার থেকে ডিম নিয়ে আসি। দুপুর বেলা তোমাদের জন্য খিচুড়ি ,ডিমভাজা ,আর পাঁপড় ভাজা বানিয়ে দেব।
বন্যা লাফিয়ে উঠে ব'লে -বাঃ ললিতা তোমার জবাব নেই ,তুমি নিজে নিজেই কি দারুণ মেনু ঠিক করলে?
ললিতা হেসে ফেলে বলে-হ্যাঁ বাড়ীতে হঠাৎ করে কেউ চলে এলে আমি এইভাবেই মেনু ঠিক করে নিয়ে রান্না করি,দিদিকে যাতে এই নিয়ে আর চিন্তা করতে না হয়।
এই বলে ললিতা বেরিয়ে যায়।

বন্যা দ্যাখে ,তৃণার এই সব দিকে কোনো নজরই নেই ,অভিমান করে বসেই আছে ,তখন বন্যার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। আবার গুছিয়ে বসে তৃণাকে মানাতে চেষ্টা করে।
বন্যা বলে-আসলে কি বলত তৃণা ,আমার চিঠি লিখতে ভীষণ আলিস্যি লাগে ,তোর চিঠি পাবো বলে হাঁ করে বসে থাকি ,কারণ তোর চিঠি ত কথা বলে,কিন্তু উত্তর দিতে গেলেই আমি একটা লাইন ও ঠিক করে লিখতে পারিনা,প্লীজ তুই এইভাবে মুখভার করে বসে থাকিস না।
এই শুনে তৃণা ওর সরলতায় ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে, এই মেয়েকে আমি শোধরাতে পারব না। নে এবারে চা আর মুড়িমাখা খা,বলে বন্যা ওর দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দ্যায়।

দুইজনে চা খেতে খেতে অনেক গল্প করতে থাকে। আবার বেল বেজে ওঠে। তৃণা এগিয়ে যায় দরজা খুলতে , দ্যাখে ,বান্টি মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে ,কিরে ?তুই দাঁড়িয়ে আছিস যে ?আয় আয় ঘরের মধ্যে আয়,বলে বান্টি কে সাথে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বন্যার দিকে তাকিয়ে বলে—এই দেখ্ বান্টি এসেছে ,আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে এরা ,বলে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বান্টি নীচু হয়ে দুজনকেই প্রনাম করে ,কিন্তু বসতে চায় না।
তখন তৃণা বলে—কি হয়েছে বল ?
বান্টি বলতে শুরু করে—পিসী জানো ,মাম্মাম কাল দেশ থেকে ফিরেছে ?মাম্মাম হচ্ছে বান্টির পিসী।
তৃণা বলে—হ্যাঁ কালই তো ফেরার কথা ছিল। তা কি হোয়েছে তোর মাম্মাম এর?
বান্টি—মাম্মাম ট্রেন থেকে নেমে দেখে কাঁধের ব্যাগ টা নেই ,তাতে মাম্মাম এর পেনসন বই ,বেশ কিছু টাকা সব ছিল।
তৃণা—সেকি ?পেনসন বই হারিয়ে গেল ?তোর বাবা যায়নি স্টেশনে?
বান্টি-হ্যাঁ বাবা তো গেছিল ,বাবাই তো রেলের পুলিশ কে লিখিত অভিযোগ দিয়ে এসেছে ,কিন্তু মাম্মাম খুব কান্নাকাটি করছে,তুমি যেতে পারবে?
তৃণা বলে -আচ্ছা তুই যা আমি একটু পরে আসছি।

বান্টি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে চলে যায়।
বন্যার দিকে তাকিয়ে তৃণা বলে-জানিস তো,পিউদি আনম্যারেড আর চাকরী ও করেনা ,তাই ওঁর বাবার ফ্রীডম

ফাইটারের পেনশন টা মেশোমশায় মারা যাবার পর থেকে নিয়মানুযায়ী উনিই পান ,এই ব্যাপারে বাচ্চুদা,ওদের ছোটো বিবাহিত বোন পারুল কারো কোনো আপত্তি নেই।আর দেখ পেনশন বইটাই হারিয়ে গেল। এই বলে তৃণা খুব আফশোষ করতে থাকে।

বন্যা সব শুনে বলে দ্যাখ ভাগ্যে থাকলে হয়ত পেয়েও যেতে পারে।সেই তো ভাগ্যে থাকলে তবে তো!!বলে তৃণা বন্যার পাশে এসে বসে পড়ে।

এর পরে তৃণা বন্যাকে স্নান করতে পাঠায়। স্নান সেরে বন্যা আর তৃণা ললিতার বানানো খিচুড়ি ডিমভাজা ইত্যাদি খেয়ে একটু বিশ্রাম করতে ঘরে ঢুকেই তৃণা বন্যাকে বলে—তুই একটু গড়িয়ে নে ,আমি একটু ওদের বাড়ী গিয়ে ঘুরে আসি।

এই বলে তৃণা বান্টিদের বাড়ী গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায়। গিয়ে শোনে পিউদি নাকি খেতেও চাইছেনা , ঘরে শুয়ে আছে।

বৌদি বলে—দ্যাখো না তৃণা ,তুমি দিদিকে ডেকে একটু খাওয়াতে পারো কিনা।

তৃণা পিউদির ঘরে গিয়ে ওর পাশে বসে ,বলে -তুমি না খেলে তো শরীর খারাপ হোয়ে যাবে। এদিকে তুমি বেশীক্ষণ খালি পেটে থাকতেই পারোনা ,সেইখানে না খেলে চলবে কি করে ?

বলে জোর করে এনে পিউদিকে খাবার টেবিলে বসায়। তারপরে সব ঘটনা আবার ওনার মুখে শোনে।

তৃণা বলে-পিউদি, আমার মনে হয় তুমি বোধহয় ট্রেনের সিটেই ফেলে চলে এসেছো ,দেখো যদি ভালো লোকের হাতে পড়ে ,তাহলে ফেরৎ পেতেও পারো। নাও এইবার খেয়ে নাও তো ,বলে জোর করে খাইয়ে তৃণা বাড়ী ফিরে আসে।

বন্যা শুয়েই ছিল ,তৃণা এসে ঢোকাতে বলে -কিরে?কিছু খবর পেলো ওনারা ?

তৃণা –নারে !এত তাড়াতাড়ি...বলেই বলতে থাকে,জানিস তো বন্যা ,এই পিউদি হচ্ছে আমাদের পাড়ার সকলের ভীষন প্রিয়। কারণ উনি ভীষন হাসিখুশী ,আর পরোপকারী মানুষ। এই তো সেদিন ওদের পাশের বাড়ীর মাসিমা পড়ে গিয়ে পা মচকে গেল ,বাড়ীতে ছেলে ,ছেলের বৌ সব আছে ,কিন্তু সেই পিউদি র ডাক পড়ল , পিউদি গিয়ে চুন,হলুদ গরম করে ওনার পায়ে লাগিয়ে দেয়,তারপর ধীরে ধীরে সেই মাসিমা সুস্থ হোয়ে ওঠেন। তাই ওনার এই সময় পাশে থেকেও কিছুটি করতে না পেরে নিজেকে খুব অসহায় লাগছে রে!

বন্যা উঠে বসে বলে-কিন্তু দেখিস তৃণা,আমার মন বলছে ওনার এই সমস্যার সমাধান কোনো না কোনো ভাবে হবেই।

বিকালে তৃণা ,বন্যাকে নিয়ে ওদের বাড়ী আবার যায়।বন্যার কথা ওরা তৃণার মুখে সবসময়ই শোনে তাই আর নতুন করে আলাপ করিয়ে দিতে হয় না।ওরা বলে তোমাদের এই দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব খুব ভালো লাগে দেখতে।

বন্যা তখন বেশ গর্বের চোখে তৃণার দিকে তাকায় ,তৃণা বলে -কি রে এইভাবে তাকাচ্ছিস যে ?কি ভাবছিস , তুই একাই এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রেখেছিস নাকিরে?তুই তো ঠিক করে চিঠিও দিসনা ,কেবল মাঝে মাঝেই হুস করে কোনো খবর না দিয়েই আমার কাছে ছুট্টে চলে আসিস।পাগলী একটা।

ওদের এই মিষ্টি বার্তালাপে পিউদিও হেসে ওঠে।এইভাবে বন্যা খুব তাড়াতাড়ি ওদের সবার সাথে মিশে যায়। আধঘন্টা পরে বন্যা বলে-চল এবারে উঠি।

বৌদি বলে ওঠে –আরে!উঠি কি ?আমদের বাড়ীতে এই প্রথম এলে এক কাপ চা না খেয়ে চলে যাবে ?সে কি কথা!বন্যা বলে-চা ,হ্যাঁ দাও তো,এই দ্যাখো তোমাকে 'তুমি' বলে ফেললাম।

বৌদি বলে ওঠে-ওমা,তুমি ডাক শুনতেই তো বেশী কাছের মনে হয়। তৃণা তো আমাদের বাড়ীর ই একজন , আজ থেকে তুমিও তাই,বুঝলে?
বন্যা খুব হাসতে থাকে। চা -টা পর্ব হোতে হোতেই বেশ আড্ডা হয় ,তবে ওই পেনসন বই এর কথা কথার মাঝে এসেই যায়।
তৃণা আবার পিউ এর কাছে গিয়ে বলে -পিউদি ,বুঝতে পারছি তোমার মনটা খুবই বিচলিত হোয়ে আছে , আর সেটাই খুব স্বাভাবিক।কিন্তু কি করবে বলো?নিজের মনকে একটু সান্তনা দাও,এক দুদিন অপেক্ষা করো,একটা রাস্তা নিশয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।
ওদিকে বৌদির সাথে বন্যা বেশ গুছিয়ে গল্প করছে।
তৃণা পায়ে পায়ে বন্যার কাছে গিয়ে বলে-কি রে ?বাড়ী যাবি না ?এইখানে বেশ জমিয়ে গল্প শুরু করেছিস তো?
বন্যা তখন তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি সোফা থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে বলে -আরে অনেক দেরী হোয়ে গেল তো !
সবাইকে বিদায় জানিয়ে তৃণা ,বন্যাকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেল।কিন্তু তৃণার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল একটাই চিন্তা ,কিভাবে পিউদির ব্যাগ টা ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে।পরদিন সকাল বেলা বন্যা চলে গেল ,তৃণা আবার সেই একা একা ।...তবুও ললিতা আছে সাথে ,আর পাশেই বাচ্চুদারা আছে ,তাই সবসময় একা একা লাগে না।

তৃণা অবসর সময়ে টিভি দেখেনা বেশী। তবে ললিতা সিরিয়াল দেখে ,তাই সন্ধে হলেই টিভিটা চালিয়ে দিয়ে , তৃণা গল্পের বই নিয়ে বসে পড়ে।বন্যা চলে যাবার দুদিন বাদে এইভাবেই তৃণা বই নিয়ে বসেছে ,হঠাৎ বেল বাজানোর আওয়াজ। ললিতা দরজা খুলে দেখে বৌদি দাঁড়িয়ে।
তৃণা তাকিয়ে বলে-আরে এসো এসো,বলে এগিয়ে যায়,বৌদি বলে-না-গো বসার জন্য আসিনি ,তুমি একবারটি আসতে পারবে আমাদের বাড়ী ?তৃণা –কি ব্যাপার গো?
বৌদি -এসো না ,বলে বৌদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।
তৃণা ললিতা কে বোলে ওদের ফ্যাল্টের দিকে এগিয়ে যায়। গিয়ে দ্যাখে –একজন অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন।
তৃণা ভাবে-একি ,এনাকে তো আমি চিনিনা ,তা বৌদি আবার আমায় ডেকে আনল কেন ?এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু ইতস্তত ভাবে ওদের ঘরে ঢুকতেই পিউদি এগিয়ে এসে তৃণাকে নিয়ে বসায়। তৃণা ইশারায় জানতে চায়-ইনি কে ?
তখন পিউদির হাসি হাসি মুখে বলে-এনার নাম মাধব দে। ইনিই ট্রেনে আমার ব্যাগটা দেখতে পান,বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুলে দেখেন ,পেনশন বই ইত্যাদি আছে ,সেইখান থেকে ঠিকানা পেয়ে আমাদের বাড়ী তে এসেছেন।

তৃণা তো হাঁ করে ওনাকে দেখতে থাকে।মনে মনে ভাবে এইভাবেও হারানো জিনিষ ফেরৎ পাওয়া যায়!তৃণা বেশ কিচ্ছুক্ষণ ওনার দিকে তাকিয়ে থাকে,ভদ্রলোকের চেহারাতে কোনো আভিজাত্য নেই ,একদম সাদা মাটা।তৃণার মনের ভেতরটা এক মুগ্ধতায় ভোরে যায়।কিছুক্ষণ বসে থেকে মাধব বাবুকে নমস্কার জানিয়ে পিউদির আনন্দে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ব'লে-তোমরা ওনার সাথে কথা বল,আমি আসি। সেই আনন্দের রেশ টুকু নিয়ে তৃণা বাড়ী ফিরে আসে।
এদিকে ললিতা তো উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে ,তাই তার দিদি ফিরতেই নানান প্রশ্ন।তৃণা চুপটি করে ওর দিকে

তাকাতেই ললিতা বুঝে যায় ,চা বানাতে হবে ,তাই আর কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি চা বানিয়ে নিয়ে আসে। তৃণা আরাম করে চা খেতে খেতে হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে –জানিস ললিতা ,লোকে বলে না এই দুনিয়ায় কারোকে বিশ্বাস করা যায়না ,কিন্তু আমি তোকে আগেও বলেছি ,এখন ও খুব জোর গলায় বলছি–মানুষকেই বিশ্বাস করা যায়।

ললিতা –একটু ইতস্তত করে বলে,কি বলছ ?তার মানে পিউদিদির হারানো ব্যাগ ফেরৎ পাওয়া গেছে ? তৃণা হেসে বলে–হ্যাঁ রে,ট্রেনে যে ভদ্রলোকের হাতে ব্যাগটা পড়েছিল ,উনি নিজে এসেছেন ব্যাগটা ফেরৎ দিতে , একটা জিনিষও খোয়া যায়নি রে !তাই তো ওদের বাড়ীতে আনন্দের হাট বসেছে রে!পুজা আসতেও তো আর বেশী বাকী নেই বল!খুব নিশ্চিন্তি লাগছে এই ভেবে যে ওরা মনের আনন্দে দুর্গাপুজা উপভোগ করবে। ললিতা সব শুনে বেশ গম্ভীর হোয়ে ব'লে –এই দুদিন তোমার মুখের চেহারা যা হোয়েছিল না ,সে কেবল আমিই জানি। দিদি তুমি কেবল পরের জন্য ভেবে ভেবেই দিন গুলি কাটিয়ে দিলে।

তৃণা –তার মানে ?এতে তোর আনন্দ হয় না?এইভাবেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি ,তাহলে ত জীবনে অনেক পাওয়া হয় ,বুঝলি ?নে এখন রান্না শুরু কর ,আমি বন্যাকে ফোন করি ,বলতে বলতে তৃণার ফোনের রিং টোন...আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে.. বেজে ওঠে।

ললিতা ব'লে দেখো গিয়ে বন্যাদিদিই .....ললিতার কথা শেষ হয়না ,তৃণা দেখে ললিতার কথাই ঠিক ,তাই হাসিমুখে ললিতার দিকে তাকিয়ে মোবাইল কানে লাগিয়ে ব'লে–হ্যালো।.....

প্রেম ও দাঁত

ভোঁদড়

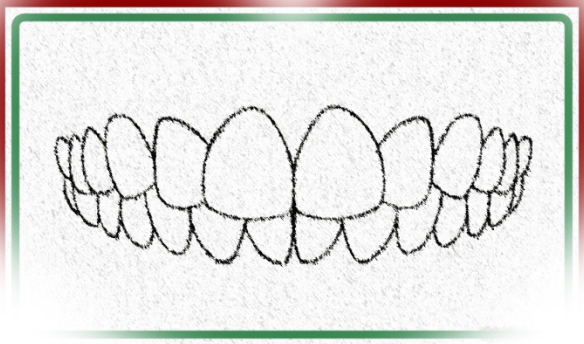

আমাদের বাঙাল বাড়ী| আমার মত যারা, তারা জানেন বাঙাল বাড়ীতে মানুষের যাতায়াত একটু বেশী থাকে| কেউ এলে জড়িয়ে ধরে,

- ওরে অটইল্যা, ওরে পটইল্যা, তগো আর দ্যাখুম এমন আশা তো ছিলই না| ক্যামন আছস তরা, শইন্যাদাদা ক্যামন আছেন, মনাকাকার ছানি কাটান হইল? পূবের ভিটার অরা এখন কোথায় থাকে, ইত্যাদি প্রভৃতি|

ওদিক থেকে
- ও পিসি গো, পা খান দ্যাও, পেন্নাম করি| তোমার বৌমারে ডাক, এই মানকচুখান তুইল্যা রাখুক| মা তো আর বাইর অইতে পারে না, এই একখান পাটালি গুড় দিয়া দিল, মুড়ির টিনে তুইল্যা রাখ| এই বুঝি তোমার নাতি? কেমন রাঙা নাতি হইছে তোমার| বলতে বলতে আমার গালে দুইটা টিপি, হাতে একখান লেবু লজেন্স| এইসব অন্তহীন চলতেই থাকে|

তা আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকের মধ্যে দু'জন গ্রাম সম্পর্কিত দাদুর যাতায়াত ছিল| একজনকে বাবা ডাকত ফণীকাকা| সেই সুবাদে আমি ডাকতাম ফণীদাদু| শালপ্রাংশু মহাভূজ মানুষ, গায়ের রঙটি একেবারে বুট পালিশ| আমি ফণীদাদু ডাকলে ঠাকুর্দার পিসি খুব রেগে যেতেন – ফইন্যারে তুই নাম ধইর‍্যা দাদু ডাকস ক্যান? শুধু দাদু কইতে পারস না? কিন্তু ইওরস ট্রুলি সেই বয়েসেই যথেষ্ট 'বাঙালে' গোঁয়ার ছিলেন| তিনি কোনভাবেই শুধু দাদু বলতে রাজী হতেন না| এক তক্তপোষে চারজন দাদু, শুধু দাদু ডাকলে কাকে ডাকলাম বুঝবে কি করে| ফনিদাদু তখন আমাকে কোলে বসিয়ে বলতেন – থাউক পিসি, আমারেই তো কয়| তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন – দাদুর আমার বড় জিদ, বাঙাল দ্যাশের নাম রাখব| এই ফণীদাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী| যৌবনের অনেকগুলো বছর আন্দামানে কাটিয়েছিলেন| তার প্রতিফলস্বরূপ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে দারিদ্র্য ওনার নিত্যসঙ্গী ছিল| খেতে ভালবাসতেন, অথচ সামর্থ্য ছিল না| তাই আমার বড়মা, মানে ঠাকুর্দার পিসি, ফণীদাদুকে না খাইয়ে ছাড়তেন না| খাওয়ানো মানে সবসময় ভাত নয়, আমাদের অবস্থাও তখন ভাল না| হয়তো মুড়ি-চিঁড়ে মেখে দিলেন| ফইন্যা এখন একবাটি চিঁড়া শ্যাষ করতে হাঁপায়| মনে আছে রে ফইন্যা, সেইবার বানের সময় চিঁড়া-মুড়ি

সব শ্যাষ| তুই আর মাখন (আমার ঠাকুর্দা) সাঁতরাইয়্যা গিয়া দশ-বারটা কাডাল পাইড়্যা আনলি? এই ফইন্যা একা তিনটা কাডাল শ্যাষ কইর‍্যা কয়, খুদা পুরা গ্যাল না| ফনিদাদু শুনতে শুনতে হাসে আর খায়|

অন্যজন ছিলেন মহারাজদাদু| ইনি ফণীদাদুর বন্ধু ছিলেন| একসাথে রাজনীতিও করেছিলেন কিছুদিন| কিন্তু রাজনীতিতে খুব তাড়াতাড়ি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাম কৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হয়ে যোগ দেন| উনি নিয়মিত একটা সময় অন্তর আমাদের বাড়ীতে আসতেন| আমার ঠাকুর্দা নিজে খুব একটা ধার্মিক না হয়েও এই মানুষটির প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কারণে মিশনকে একটা নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন| বাবাও সেই সাহায্য অনেকদিন, বোধহয় মহারাজদাদুর মৃত্যু অবধি বজায় রেখেছিল| যতদূর মনে পড়ে, ওনার মৃত্যুর পর অন্য একজন সন্ন্যাসী ওনার নোটবই হাতে করে এসেছিলেন| কিন্তু বাবা সেবারে এই সাহায্য বন্ধ করে দেয়|

ফণীদাদু ছিলেন হাসিখুশি মানুষ, ইংরাজীতে যাকে বলে গ্রিগোরিয়াস| আর মহারাজদাদু স্বভাবে মৃদুভাষী| নাস্তিক ফণীদাদুর সাথে মহারাজদাদুর দু-চারটে খোঁচা সবসময়েই বিনিময় হত| একদিন দুজনে ভাত খেতে বসেছেন| বাড়ীতে সেদিন মাংস| ফণীদাদু মাংস খেতেন, কিন্তু নিরামিষ পছন্দ করতেন| উনি একটুকরো মাংস খেয়ে বড়মাকে বললেন - পিসি, তোমার ঘরের রান্ধন কিছু আছে নি? বাল্যবিধবা বড়মা নিরামিষ খেতেন| আমার সেই বয়েসে কেউ যে মাংস ফেলে নিরামিষ খেতে চাইতে পারে তাতে বড়ই আশ্চর্য্য লেগেছিল| আমি জিজ্ঞেস করলাম - তুমি মাংস খাবে না কেন? ভাল হয় নি? মহারাজদাদু একটু মধুর হেসে বললেন - অর যে দাঁত পইড়্যা গেছে দাদুভাই|

খাবার পর মহারাজদাদু কীর্তন ধরলেন| তাতে প্রেম কথাটা অনেকবার ছিল| গাইতে গাইতে মহারাজদাদুর চোখ দিয়ে জলের ধারা গাল বেয়ে পড়ছে| আমি আতাক্যালানের মত জিজ্ঞেস করলাম - কাঁদছ কেন মহারাজদাদু? ধারাল হেসে ফণীদাদু শোধ নিলেন - অর যে দাঁত পইড়্যা গেছে দাদুভাই|

কেন মহারাজদাদু শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন কিছুই বুঝলাম না| কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে প্রেমের সাথে দাঁতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে|

মনশ্চক্ষে দেখতে পারছি যাবতীয় পদিপিসী ও খোকার মা বঙ্গজননীরা, অর্থাৎ যাদের হাতে অধিকাংশ বাঙালী - মানুষ হয় বলতে পারছি না, কিন্তু খোকাজীবন অতিবাহিত করে, তারা এই অবধি এসে আতঙ্কিত (যার থেকে আঁতকে ওঠা এসেছে) হয়ে উঠছেন| বালকের সামনে এহেন অশালীন আলোচনার দায়ে কি শাস্তি হওয়া উচিত তার আলোচনায় কয়েককোটি করাল কন্ঠ নিনাদ করছে| পৃথিবী পেরিয়ে মহিষারোহী ধর্মরাজের সাথে যখন দেখা হবে তখন যতক্ষণ না মহাকায়স্থ আমাকে ট্র্যাপডোর খুলে পুন্নাম, অবীচি, অসিপত্রবন, তমিস্রা ইত্যাদির কোন একটিতে নিক্ষেপ করেন, ততক্ষণ তারসপ্তকে আমি এই পৃথিবীতে আমাকে কি কি অবিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে থাকব| সেই দীর্ঘ লিস্টিতে আমার জননান্তর সৌভাগ্যক্রমে পদিপিসীদের অ্যাডাল্ট সুপারভিসন বাদ যাবে| বাল্যে, যৌবনে এবং এই শেষ প্রৌঢ়ত্বে আমার জীবনে যারা সেই ভূমিকা নিতে পারতেন তারা অশেষ দয়া করে তাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে আমার মত অভাজনকে অবজ্ঞাভরে বাদ দিয়েছেন|

শিয়োক নদীর দেশে

ঋত্বিক কুমার লায়েক

মনে করো একটা কালো পাহাড় | ৮০-৯০ ডিগ্রী খাড়াই উঠে গেছে স্বর্গের দিকে | পাহাড়ের গায়ে একটা ঘাসও নেই | সবুজের কোনও চিহ্ন নেই | চুড়োগুলো শুধু সাদা রঙে রাঙানো | এবার মনে করো একটা নীল নদী, যেটা পাহাড়ের নিচের উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে | সেই গাঢ় নীল রঙের চারপাশে আছে কিছু সবুজ : পপলার, আপেল, অ্যাপ্রিকট, ওয়ালনাট | সেই গাছগুলো ভর্তি রঙবেরঙের পাখিতে: ওয়ারব্লার, শ্রাইক, ফিঞ্চ, ব্যাক্ট্রিয়ান ম্যাগপাই, চকোর আর ঈগল | এবার ঐ সবুজের সামনের ধরা যাক একটা মরুভূমি | সাদা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়ি গুলো যেন কোন শিল্পী সাজিয়ে দিয়েছে | সেই বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাক্ট্রিয়ান উট | এই দুকুঁজো উটগুলো সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে মঙ্গোলিয়ার গোবি থেকে এসেছিল মধ্য এশিয়াতে | রেশম পথের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির সর্বশেষ রোমন্থন এই অদ্ভুত প্রানীর কুঁজে |এই স্বপ্নরাজ্যই নুব্রা উপত্যকা, লাদাখের শীতল মরুর মাঝে এক টুকরো ওয়েসিস | নুব্রা মধ্যপ্রাচ্য আর তিব্বতের এক আশ্চর্য সমন্বয় হয়েও প্রচন্ডভাবেই ভারতীয় | তন্ত্র, বৌদ্ধ আর ইসলামের ত্রিমুখী স্রোত এসে মিশেছে এই শিয়োক নদীর জলে | তিব্বতের চ্যাংথ্যাং অঞ্চলে জন্ম হওয়া এই নীল নদী শিয়োক নুব্রা উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তর পশ্চিমে | কারাকোরামের বুক চিরে এই নদী গিয়ে মিশেছে স্কার্দু উপত্যকায় সিন্ধুতে |

শিয়োক

মাহিন্দ্রা জাইলো গাড়িটা তখন লেহ শহর থেকে লাদাখ পর্বতের গায়ে উঠতে শুরু করেছে | গুলাম আব্বাস আমাদের নুব্রা-শিয়োকের গল্প শোনাচ্ছিল | খার্দুংলাতে পাকা রাস্তা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে | কিন্তু খার্দুংলা-জোজিলা দিয়ে ক্যারাভান চলছে তিন চার হাজার বছর ধরে |পারস্য থেকে তাশখন্দ সমরখন্দ হয়ে রেশম পথের একটি শাখা এসে ঢুকতো পামীর অঞ্চলে | সেখান থেকে স্কার্দু, নুব্রা হয়ে সিন্ধু অববাহিকা হয়ে এসে পৌঁছাতো কাশ্মীর উপত্যকায় | সেখান থেকে সিন্ধুর ব-দ্বীপের বন্দর (করাচী) অবধি গিয়ে শেষ হত রাস্তা |সেই খার্দুংলা আমরা পেরোবো ভেবেই গা ছমছম করছে | গাড়ী পাকদন্ডী বেয়ে উঠে চলেছে | পুরো রাস্তাটা সামনে দেখা যাচ্ছে | আমাদের চেনা জানা দার্জিলিং, সিকিম, হিমাচলের রাস্তার থেকে এ রাস্তা আলাদা| হিমালয়ে পাহাড়ের পাথর দেখা যায় না| পাইন-ফার-রোডোডেন্ড্রন-ম্যাগনোলিয়া ওখানে পাহাড়ের ভয়াল রূপ টা বুঝতে দেয় না | এই স্তোক-লাদাখ-কারাকোরামের জাত আলাদা | এখানে একদম নিচ থেকেই পুরো রাস্তা দেখা যাচ্ছে | আর উচ্চতা আর বরফ দেখে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠছে | গাড়ী একটু ভুল করলেই ৩০০০ ফুট নিচে | তবে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে স্তোক পর্বতশ্রেনীর আরো অনেক শৃঙ্গ দৃশ্যমান হচ্ছে | স্তোকের মধ্যমনি স্তোক কাংড়ি পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে মুকুটের মতো ঝকঝক করছে | গাড়ির জানালা দিয়ে আমি পটাপট ছবি তুলতে লাগলাম |

স্তোক পর্বতমালা ও স্তোক কাংরি

এক ঘন্টা পরেই রাস্তার দুদিকে বরফ শুরু হয়ে গেল | যদিও লাদাখ পর্বতমালায় তুষারপাত হিমালয়ের চেয়ে কমই হয়, তবু গাড়ি পিছলে যাবার জন্য এই বরফই যথেষ্ট | ভারতীয় সেনাবাহিনীর যন্ত্র এসে বরফ সাফ করে দিয়ে যায় প্রতিদিন | আস্তে আস্তে আমরা উঠে এলাম খার্দুংলা টপে | লেখা আছে ১৮৩৮০ ফুট উচ্চতার এই গিরিবর্ত্ম পৃথিবীর উচ্চতম মোটরপথ | যদিও এখন সেটা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে ও চীনের কারাকোরাম হাইওয়েতে উনিশ হাজারী রাস্তা আছে বলেও শোনা যাচ্ছে কিন্তু আপাতত আমরা উচ্চতম মোটরপথে আছি এটা ধরে নেওয়াই বেশী আনন্দদায়ক | খার্দুংলা টপে ১৫-২০ মিনিটের বেশী থাকা উচিত নয় | একে অত কম তাপমাত্রা, তার উপর ঝোড়ো হাওয়া বইছে, আর সর্বোপরি অক্সিজেন নেই বললেই চলে | এক পা হাঁটতে দম বেরিয়ে যায় | আর যায়গাটা খুব নোংরা | সব ট্যুরিষ্টকেই প্রকৃতি এই খারদুংলা টপেই ডাক দেন আর সবাই এই টপেই সেই ডাকে সাড়াও দেন | বরফের রাজ্যে সেই সাড়া চিরন্তন হয়ে রয়ে যায়| লাদাখের সবচেয়ে নোংরা জায়গা বোধ হয় খারদুংলা টপ | যাই হোক আমরা ঐ ৫ মিনিটও ছিলাম না |

খার্দুংলা

কিন্তু গাড়ি নামতে শুরু করতেই দেখি লম্বা জ্যাম, আর্মি ট্রাক আর বাস মুখোমুখি আর কোনও দিকে সরে দাঁড়ানোর কোনও জায়গা নেই | সুতরাং গাড়ি পেছোবে | ব্যাক গিয়ারে উঠবে খার্দুংলা টপে | ওরে বাবারে! যাই হোক কিভাবে কোনও গিরিপথে জ্যাম হয় আর সেই জ্যাম থেকে কিকরে নিস্কৃতি মেলে সেটা লেখা বাহুল্যমাত্র | দেশে বিদেশের থাইবার পাশের গল্প টা পড়ে নিও | আমাদের ড্রাইভার গুলাম সাহেব চোখ বন্ধ করছিল কিনা জানি না, তবে আমি মন ভরে দেখেছিলাম কারকোরাম কে | স্তোক পিছিনে ফেলে এসেছি | সামনের কালো পাহাড়ই কারাকোরাম | লাদাখ পাহাড়ের গায়ে মাটি আছে, ঘাস আছে, বালি আছে | তাই রাস্তাও আছে | কারাকোরামে ওসবের বালাই নেই | ওখানে আছে শুধু গ্রানাইট আর কংগ্লোমারেটের কলাম | হাজার হাজার ফুট সোজা উঠে গেছে উপরের দিকে | আর আছে ছোটো ছোটো অ্যালুভিয়াল ফ্যান যেগুলো আবার আড়াআড়িভাবে ফেটে গিয়ে অজস্র ক্রিভাস তৈরী করেছে | রাস্তা এঁকেবেঁকে নেমে চলল |

পথে দুটো ছোট চটি পড়ল : খার্দুং আর উত্তর পুলু | উত্তর পুলু ছাড়িয়ে একটা ঘাসবিহীন আল্পাইন মেডো পড়ল আর সেটা শেষ হতেই চোখে পড়ল শিয়োক কে | একটা বাঁকানো ভি আকৃতির উপত্যকার মধ্য দিয়ে নীল রিবনের মত পড়ে আছে | আকাশের আর নদীর নীল, মেঘের আর বরফের সাদা আর পাহাড়ের লাল এর হাজার টা শেড মিলে একটা অদ্ভুতুড়ে জগৎ তৈরী হয়েছে | সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগছে গাড়ির ভিতর থেকে ছবি তুলতে | সেটার অবশ্য অনেকগুলো কারন | যখন একটা ফ্রেম ভাল লাগছে, ক্যামেরা তাক করার আগেই গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে | আলো এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে প্রতিক্ষণে এক্সপোজার বদলাতে হচ্ছে | আমি সবুজ রঙের উপর মিটারিং টা করতে ভালোবাসি কিন্তু সবুজ কোথাও নেই | সুতরাং মিটারিং খুব বাজে হচ্ছে | ছবিগুলো দেখেলেই এখন বুঝতে পারছি লাদাখে ফটোগ্রাফির চ্যালেঞ্জ টা |

কারাকোরাম

নামতে নামতে গাড়িটা নেমে এলো শিয়োক উপত্যকায় | পাহাড়ি রাস্তা ফুরোনোয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম | শিয়োক উপত্যকা ঠিক ক্যানিয়ন নয় | একদিকের কারাকোরাম উঠে গেছে সোজা, কিন্তু অন্য দিকের লাদাখ পর্বত যথেষ্ট ফ্ল্যাট, উপত্যকাও এখানে বেশ চওড়া | যাই হোক আরো ঘন্টা ২ লাগবে হুন্ডার আসতে, আমাদের ২ দিনের গন্তব্যস্থল | অনেকক্ষন থেকেই আমার ইচ্ছে করছিল নদীর কাছে যেতে কিন্তু নীল জলের ধারাটা রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে থাকায় গুলামভাই থামাচ্ছিল না গাড়ি | ডিস্কিটের কাছাকাছি একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে নদীটা কাছে | গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলাম নদীর দিকে | নদীর জলের নীল রঙের কারন বুঝতে পারলাম না | এ নীল কাছ থেকেও নীল |

নদীবক্ষে পড়ে আছে হাজার হাজার রঙীন পাথর | নীল, সবুজ, খয়েরি, সাদা ইত্যাদি | দু একটা তুলেও নিলাম ছোটো দেখে | বাড়িতে আমার সংগ্রহশালার শোভাবর্ধন করবে | পাহাড়ি নদী আমি আগেও দেখেছি | কেদারের মন্দাকিনী, গুরুদংমারের তিস্তা, রকির কলোরাডো বা ভার্জিনিয়ার শেনানদোয়া | কিন্তু এই রঙ আগে কখনও দেখিনি | ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় শুধু নদীর পাশে বসে | আর একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে, তা হল আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও ট্যুরিষ্ট নেই কোনওদিকে | এই শিয়োক, এই কারাকোরাম এখন শুধুই আমাদের | ডিস্কিটে থামা হল না | বালির ঝড় উঠেছে | কোনওদিকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না | এক ঘন্টার মধ্যে বরফ থেকে বালির ঝড়!

নুব্রা-শিয়োক সঙ্গম

হুন্ডার পৌঁছলাম তখন বিকেল ৫ টা | ক্যামেল ক্যাম্প অ্যান্ড রিসর্টের তাঁবুতে আমদের থাকার ব্যবস্থা | লোটাস দোরজি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন | আমরা ওনার তাঁবুতে এবছরের প্রথম অতিথি | তাই সেরা তাঁবুটা আমাদের দেওয়া হল, যার একদিকের জানালা খুললে দেখা যায় কারাকোরামের বরফঢাকা শিখর | জিনিসপত্র রেখে গুলামভাই চলে গেল ওর আত্মীয়ের বাড়ি | গরম গরম আলু পকোড়া আর জাফরান দেওয়া চা খেয়ে আমরা বেরোলাম গ্রাম দেখতে | গাইড আমাদের দোরজি ভাই | হুন্ডার শিয়োক নদীর উপর একটা ছোট্ট গ্রাম | পপলার আর কাঁটাঝোপের প্রাচুর্য | কাঁটাঝোপ কারন হুন্ডার এর ভিতরেই আছে বালিয়াড়ি | আর আছে ব্যাক্ট্রিয়ান উট | আজ অবশ্য সাফারি হবে না বালিঝড়ের জন্য | পরের দিন বিকেলে চেষ্টা করা যাবে | আমাদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই দেখি সামনে দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে | দোরজি ভাই বলল ওট হুন্ডার নালার জল | লাদাখ পাহাড়ের বরফগলা জলে গোটা গ্রামের চাষ হয় | শিয়োক অনেকটা নিচে | ওটা সেচের কাজে খুব একটা লাগে না | আমাদের কিছুটা এসে দোরজিভাই দেখিয়ে দিল শিয়োকের দিকের রাস্তাটা | হুন্ডারে বৌদ্ধ আর ইসলামের সহাবস্থান | এখানে ওখানে শোর্তেন (চৈত্য) আর মনি দেওয়ালের ছড়াছড়ি | ধর্মপ্রান বৌদ্ধরা শোর্তেন আর মনি দেওয়ালকে ক্লকওয়াইজ প্রদক্ষিন করে জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে | এতে পাপক্ষালন হয় আর পরের জন্মে নির্বানের দিকে কিছুটা এগোতে পারে |

হুন্ডার

বালিঝড় টা ছিলই | নদীর কাছে যাওয়া গেল না | ক্যাম্পে ফিরে এলাম | পশ্চিম আকাশে লাদাখ পাহাড়ের উপরে তখন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে | দোরজিভাই বলল যে নুব্রা-শিয়োকে বৃষ্টি খুব একটা হয় না | কিন্তু আমাদের চওড়া কপাল বলেও একটা জিনিস আছে | আমি পাহাড় যাব আর বৃষ্টি হবে না সেটা ইতিহাসে কখনও হয়নি | আগের বছর কেদারনাথ গিয়ে কেদারনাথ টা ধ্বংসই হয়ে গেল | বৃষ্টি নামল অঝোরধারায় | পাহাড়ে বৃষ্টি দেখার মধ্যে একটা অন্যরকম রোম্যান্টিকতা আছে | পপলার-অ্যাপ্রিকট এর পাতায় বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলাম বাইরের ত্রিপল ঢাকা ডাইনিং অ্যারেনাতে বসে | লাদাখের মাটির সোঁদা গন্ধ, এটাও কিন্তু সবার অভিজ্ঞতা হয় না |

শিয়োকের তীরে তাঁবু

দোরজিভাই এর অন্য কোনও অতিথিও নেই, আর অন্য কোনও কাজও নেই | আমাদের গল্প শোনাতে লাগল | দোরজিভাই কিন্তু যে সে পাত্র না | একে নুব্রার রাজপরিবারের বংশধর, তার উপরে আবার এক্স আর্মিম্যান | সুতরাং গল্পের কোয়ালিটি নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই | শুধু একটাই মুশকিল হচ্ছিল | দোরজিভাই এর হিন্দী টা বড়ই লাদাখি | অনেক শব্দের অর্থই বোঝা যাচ্ছিল না | ইংরাজী বা হিন্দী প্রতিশব্দ না জানায় ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছিল না | আমি তার কিছু শব্দ লিখে নিয়ে পরের দিন গুলামভাই কে দিয়ে মর্মোদ্ধার করিয়েছিলাম | তো যাই হোক | এবার গল্পটা বলা যাক | ক্লাস ৭ পাস দোরজিভাই এর সাল তারিখ মনে নেই | এমনকি নিজের ঠাকুরদার নাম ও মনে নেই | অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না | আমাকে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার নাম জিজ্ঞেস করলে আমিও বলতে পারব না | যাই হোক আমার শুধু মনে হচ্ছিল দোরজি লোটাসের ঠাকুর্দার নাম হওয়া উচিত দোবরু পান্না | তিব্বতি লাদাখি পরিবারে দোবরু পান্না নাম যদিও হতে পারে না | কিন্তু লেখকের কিছু স্বাধীনতা থাকা উচিত | সুতরাং আমি ওনাকে দোবরুই বলব |

সময়টাও ধরা যাক বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক | দোবরুর বাবা ছিলেন ডাকসাইটে রাজা | অবশ্য আমার মানে হল লাদাখের রাজার অধীনে করদ রাজা | যাই হোক ওসব জিজ্ঞেস করলে দোরজিভাই এর অবস্থা আমাদের ভাইভার ছেলেগুলোর মত হবে | সবকিছুতেই বলবে ইয়েস স্যর | তখন হুন্ডারের সব জমি দোবরুদের | আপার হুন্ডারে তৈরী হয়েছে বিরাট রাজপ্রাসাদ | নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে কালী আর অবলোকিতেশ্বরের মন্দির | উটশালে শয়ে শয়ে উট | রাজার খ্যাতি তখন দিস্কেট, লেহ, তুর্তুক থেকে শুরু করে বাল্টিস্তান অবধি ছড়ানো | লাসা থেকে স্বয়ং ত্রয়োদশ দলাই লামা আশীর্বাদ পাঠান | তিব্বত থেকে প্রজ্ঞাপারমিতার অনুলিখন করে নিয়ে আসা হয় | সোনার রঙে লেখা সেই পুঁথির পাতাগুলো এখনও প্রাসাদে রাখা আছে | গল্প টা এখনও অবধি ঠিক রূপকথার মত | এর পরের গল্পটাও তাই | সেই হুন্ডারের স্বর্ণযুগে তিব্বত থেকে এলেন এক লামা | রাজা তাঁকে সমাদরে বরণ করলেন | তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল নতুন গোম্পা নির্মানের | দিস্কেট বা থিকসের চেয়েও ভাল গোম্পা হবে হুন্ডারে | কিন্তু লামার মাথায় অন্য মতলব ছিল | অবলোকিতেশ্বরের নামে তিনি রাজার কাছের লোকজনদের সরিয়ে ফেললেন | কেও গেল নির্বাসনে, কেও বা কারাকোরামের রেশমপথে পড়ে থাকা নরকংকালের সংখ্যাবৃদ্ধি করল | বেচারা দোবরুর আর রাজা হওয়া হল না | পিতার মৃত্যুর পর পথে বসল দোবরু | বৌ, ছেলে অর ছেলের বৌ কে নিয়ে শিয়োক নদীর ধারে এক মাটির ঘরে জায়গা হল তার | দোবরু রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু লামার ঐশ্বরিক শক্তির সাথে মোকাবিলা করার সামর্থ্য ছিল না তার | দোবরুর ছেলে সামান্য চাষবাদ করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল | তার ছোটছেলে আমাদের দোরজি ভাই | আর্মি তে গিয়ে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায় দোরজি | অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ায় | পাথরের বাড়ি বানায় | এখন রিটায়ারমেন্টের পর ট্যুরিজম করছে | একমাত্র মেয়েকে লেহ তে পড়াচ্ছে |

মনার্কি আর থিওক্র্যাসির লড়াই এর প্যাটার্নটা তিব্বতের দলাই লামা থেকে পারস্যের আয়াতোল্লা খোমেইনি সর্বত্র এক | ধর্মভীরু মানুষ রাজাকে ততদিনই ভয়ভক্তি করে যতদিন তিনি ঠিকঠাক পূজো দিয়ে যাচ্ছেন | লামা-পুরুত-মোল্লাদের সাথে জিতে যাওয়া ততটাও সহজ নয় | তাইত এতো কিছুর পরও দোরজি বলে, লামারা যাই করুক, হাজার হলেও বুদ্ধের অবতার | দোরজি বেঁচে থাকার জন্যই লামাদের উপর কৃতজ্ঞ | সম্পত্তি রাজপ্রাসাদ প্রতিপত্তি নাই বা রইল |

বৃষ্টি থেমে গেছে কখন খেয়ালই করি নি | মেঘটা হালকা সরে উল্টোদিকের কারাকোরামের মাথায় তখন সোনালী রং ঢেলে দিয়েছে | দোরজি উঠে পড়ল | আমাদের ডিনারের রান্নার তদারক করতে হবে ওকে | আর বলে গেল আমাদের শেষ দিন নিয়ে যাবে মন্দির আর প্রাসাদ দেখাতে |

হুন্ডারে সকাল হল পাখির কলকাকলিতে | তাঁবুর বাইরে এসে দেখি ঝকঝকে রোদ উঠেছে | আগের রাতে প্রচুর বরফ পড়ায় কারাকোরামের গায়ে সাদা চাদর | ঠান্ডাটাও যেন বেড়েছে একটু | গুলামভাই হাসিমুখে হাজির জাইলো নিয়ে | লাদাখের যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হল সব্বার সময়জ্ঞান | দশ মিনিটও কেও দেরী করে না | আর গাড়ির ড্রাইভার মদ্যপান না করায় অনেক বেশী নিশ্চিন্তে থাকা যায় | গতবার সিকিমের লাচেনে ভোরবেলা উঠে গুরুদংমারের জন্য ড্রাইভারের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম তিনি আগের রাতে প্রচুর বিয়ার টেনে ঘুম দিচ্ছেন | লাদাখে ঐ ঝামেলাটা নেই | সকাল সকাল পরোটা আর আলুর দম খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম | আজ আমরা যাবো তুর্তুক | লাইন অফ কন্ট্রোলের ৪-৫ কিমি দূরের গ্রাম | শিয়োক পাশ দিয়েই রাস্তা | তুর্তুক, ত্যাক্সি হয়ে শিয়োক ঢুকে পড়েছে বাল্টিস্তানে |
রাস্তা আজ সহজ | অনেকটা অংশই নদীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে | কোনও খাদ নেই | দুদিকের দুই পাহাড়ের বৈপরীত্য চোখ এড়ায় না | লাদাখ পাহাড়ে রং কম, খাড়াই কম, উচ্চতাও কম, শীর্ষে বরফও নেই | কারাকোরাম ভয়ংকর | একটার পর একটা শৃঙ্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছি | এই পর্বতমালার অন্যদিকেই সিয়াচেন হিমবাহ, বিশ্বের দুর্গমতম যুদ্ধক্ষেত্র |

লাইন অফ কন্ট্রোল ও সিয়াচেনের আগেই ফুরিয়ে গেছে | সিয়াচেন এখনও বিতর্কিত | সিয়াচেন থেকে বেরিয়ে আসা নুব্রা নদীর নামেই এই এলাকাটা নুব্রা উপত্যকা | উত্তর পশ্চিম দিক থেকে নুব্রা এসে শিয়োকে মিশেছে একটা অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক নিয়ে | আমরা অবশ্য নুব্রা শিয়োকের সঙ্গম ছাড়িয়ে এসেছি আগের দিনই |

সিয়াচেন জন্ম নিয়েছে বাল্টোরো কারাকোরামের গায়ে | আর একটু এগিয়ে গেলেই পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কে-২ বা কোগির (ভারতের শিশুপাঠ্য ভুগোল বইতে এই শৃঙ্গ এখনও গডউইন অস্টিন, কিন্তু স্বাধীনতার ৬৫ বছর পর পাকিস্তানে ঐ নাম আর কেও বলে না), গাসেরব্রুম, ব্রড পিক ইত্যাদি আট হাজারি মনসবদারেরা | ১৪ টার মধ্যে ৪ টে এই বাল্টোরো কারাকোরামে | তবে ভারতের ভাগে একটাও পড়েনি | শুধু এই চারটেই বা কেনো? ঐ ১৪ আট হাজারির মত্র একটি ই আমাদের দেশে, আমাদের চেনা কাঞ্চেনজঙ্ঘা | লাইন অফ কন্ট্রোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বলে রাস্তায় সিকিউরিটি বেড়ে গেছে | ইনারলাইন পারমিটের গল্পটা এবছর বন্ধ হয়েছে কিন্তু গাড়ি থামিয়ে আইডি দেখানো, নাম লেখানো গুলো আছে | তবে একটা জিনিস ভাল | রাস্তায় আর কোনও ট্যুরিস্ট না থাকাতে লাইন দিয়ে হচ্ছে না | তবে আর্মিকেও কুর্নিশ | কেও কোথাও নেই ধারেকাছে | দুটো লোক বন্দুক নিয়ে বসে নদীর সেতু পাহারা দিচ্ছে | আমি গিয়ে একজনের সাথে কথা বললাম | বললাম আপনাদের দেশ খুব সুন্দর | লোকটা হেসে বলল এ জায়গা টা জঘন্য | শুধু ন্যাড়া পাহাড় | তুর্তুক যান | ওখানে হরিয়ালি আছে | কত ফুল, ফল, পাখি |

ওহো বলা হয়নি | আজ শিয়োক নীল নয় | আগের রাতে প্যাংগং ও নুব্রাতে বৃষ্টি হয়েছে | সেই জল নদীতে পড়ে নদী আজ ঘোলা | আজ জলও অনেক বেশী | একটু বিরক্ত লাগছে সেই জন্য | চওড়া উপত্যকা শেষ হয়ে একটা ক্যানিয়ন শুরু হল | আর তারপরই আমরা নড়বড়ে কাঠের সেতু দিয়ে নদী পেরিয়ে গেলাম কারাকোরামের গায়ে | এই প্রথমবার | পাহাড়ি রাস্তাতে ভয়ের কারন মূলতঃ একদিকের খাদ | গাড়িটা সামলাতে না পারলেই খাদ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়বে নিচে আর পপাত চ মমার চ | পাহাড়ের দিকটা সেদিক থেকে নিরাপদ | বৃষ্টিতে ধস না নামলে ভয়ের কোনও কারন নেই | দেখি সামনে কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে | গুলামভাই কাচ নামিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে | একটা লোক আঙ্গুল দেখিয়ে বলল শ্যুটিং রক | এ জিনিসের নাম শুনেছি | কলোরাডোর রকিতে সাইনবোর্ড দেখেছি | চোখে দেখিনি | এবার দেখলাম | জটায়ুর ঠিকই বলেছেন | নরকের নাম কারাকোরাম | পাহাড়ের গায়ের খাড়াইটা প্রায় ৭০-৭৫ ডিগ্রী | আর পাহাড়ের গায়ে সুন্দর করে কেও যেন সাজিয়ে রেখেছে বিভিন্ন মাপের পাথর | গোল গোল পাথর | আরো উঁচুতে কোনও অ্যালুভিয়াল ফ্যানের সিমেন্টিং কাদা টা কড়া রোদে ফেটে গেছে | আর এই লুজ পাথরগুলো নেমে এসেছে এই পাহাড়ের গায়ে | পুরো তো নেমে আসেনি এখোনো | কিন্তু যখন খুশী আসতে পারে | ভাবতে ভাবতেই দেখি ঝড়ের বেগে একটা মাঝারি সাইজের পাথর নেমে এসে রাস্তায় গোঁত্তা খেয়ে শিয়োকের বুকে গিয়ে ঝপাং | দেখলাম গুলামভাই ও ভয় পেয়েছে | এতো পুরো মাইনফিল্ড | মিনিট পনের দাঁড়ানো হল | তারপর আস্তে আস্তে গাড়ি শুরু করল | আমাকে বলল জানালার কাচ তুলে দিয়ে ও পাহাড়ের দিকে কড়া নজর রাখতে | কোনও পাথর গড়িয়ে আসছে দেখলেই গাড়ির স্পিড ম্যানিপুলেট করবে | আর এভাবে চলবে প্রায় ২-৩ কিমি | গুলামভাই গাড়ি চালাচ্ছে ডান দিকের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে | আর বাঁ দিয়ে ৫০০ ফুটের খাদ | গাড়ি চলতে চলতে পাহাড়ের উপরে পাথরের গড়ানো শুরু হওয়া দেখলাম গোটা দশেক | যাইহোক আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েনি সেটার জন্য গুলামভাই এর স্যালুট প্রাপ্য |

রাস্তায় ছোট ছোট কিছু গ্রাম পড়ল | থয়েস, চ্যাংমার, চালুংকা হয়ে বগড্যাং | থয়েস নুব্রা উপত্যকার একমাত্র আর্মি এয়ারস্ট্রিপ | শীতকালে আড়াই হাজার টাকায় এখান থেকে লেহ সার্ভিস পাওয়া যায় নুব্রাবাসীদের জন্য | বগড্যাং একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম | বগড্যাং এর লোকজনের মধ্যে লাদাখি-তিব্বতি মঙ্গোলয়েড ছাপ নেই বললেই চলে | লম্বা, চোখা নাকমুখ,

গোলাপি ফর্সা গায়ের রঙ | মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার স্পষ্ট ছাপ | আর বৌদ্ধ স্তুপও কমে এসেছে চারদিকে | বরং মসজিদ দেখা যাচ্ছে | বগড্যাং এর পরই আবার নদী পেরিয়ে বাঁ দিকে চলে এলাম | তুর্তুকের কাছে চলে এসেছি | সবুজের আভা পাওয়া যাচ্ছে |

তুর্তুক ভারতের উত্তরতম গ্রাম। ১৯৭১ এর যুদ্ধের আগে তুর্তুক পাকিস্তানের অধীনে ছিল। ১৯৭১ এ ভারত বাল্টিস্তানের এই গ্রাম টা দখল করে নেয়। ২০০৯ সালে তুর্তুক খুলে দেওয়া হয় ট্যুরিস্টদের জন্য। অবশ্য বিদেশীদের পারমিশন এখনও নেই। তুর্তুক ভারতের একমাত্র জায়গা যেখানে বাল্টিস্তানের সংস্কৃতির দেখা মেলে। হাজার তিনেক লোকের বাস এই গ্রামে। ভাষা মূলতঃ বাল্টি, লাদাখি আর উর্দু। লাইন অফ কন্ট্রোল এই গ্রাম থেকে মাত্র ৩ কিমি। আমরা গ্রামে বসে বসে কারাকোরামের উপর পাকিস্তানি পোস্ট দেখলাম। ওখান থেকে একটা গোলা এসে পড়লেই গ্রামটা স্রেফ উড়ে যাবে। কার্গিল যুদ্ধের সময় নাকি এখানে ভয়ের পরিবেশ তৈরী হলেও যুদ্ধ হয় নি। আমাদের গাড়িটা দাঁড়ালো একটা নালার পাশে। লাদাখ পাহাড় থেকে নেমে এসে নালাটা গিয়ে পড়েছে নিচের শিয়োকে। গোটা গ্রামে জলের ব্যবস্থা এই নালা থেকেই। গুলামভাই আমাদের ৩ ঘন্টা সময় দিলে গ্রাম টা ঘুরে দেখার জন্য। তারপর লাইন অফ কন্ট্রোলের বর্ডার চেকপোস্ট দেখে ফেরত যাবো হুন্ডারে। কারাকোরাম জায়গাটা এমনিতে বিশুদ্ধ শীতল মরু। এক ফোঁটা ঘাস অবধি নেই। শিয়োক নদীর ওপাশে তাকালে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। এদিকে অবশ্য সবুজে সবুজ।

তুর্তুকে ক্রিকেট

তুর্তুক নালার জল সুন্দরভাবে গোটা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভূট্টা-গম-বার্লি চাষ হয়েছে চারদিকে। দুশো টা মত ঘর, অধিকাংশই গ্রানাইটের তৈরী। আমরা প্রথমে গেলাম গ্রামের উত্তর দিকে, যেদিক টা পুরোনো। একটা সবুজ রঙের মসজিদ আছে। একটু পরেই দুপুরের নামাজ শুরু হবে। লোকজন আসতে শুরু করেছে। তার পাশেই একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। স্কুলের ঠিক বাইরে একদল বাচ্চা শর্ট ক্রিকেট খেলছে। এই কলোনিয়াল খেলাটা কিকরে যে ভারতীয় উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেলো ভাবলে অবাক লাগে। বাচ্চাগুলোর সাথে টুকটাক কথা বললাম। ভাঙা হিন্দীতে। কোলকাতা ওরা জানে। আর জানে যে কোলকাতার 'দাদা' সৌরভ গাঙ্গুলী। ঘরবাড়ি গুলো বেশ ছিমছাম। আজ আমরা ছাড়া আর কোনও ট্যুরিস্ট নেই। গ্রামের লোকজনও বেশ মিশুকে। একজন কে গ্রামের ইতিহাস জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি বললেন পাকিস্তান এই গ্রাম ১৯৪৭ এ দখল করে নিয়েছিল। ১৯৭১ এ আমরা স্বাধীন হয়েছি। বুঝতে পারলাম না

একথার অর্থ। এই বাল্টি দের আত্মীয়-স্বজন সবাই ওপারে, স্কার্দুতে। আর এরা কোনওভাবেই ঠিক ভারতীয় নয়। পাকিস্তানিও নয়। এরা বরং মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধি। এখন ভারতীয় আর্মির ভয়েই বোধ হয় স্বাধীনতার বুলি আওড়াচ্ছে। কার্গিলের সময় নাকি আর্মি অনেককে বন্দী করেছিল স্পাই বলে। পরে অবশ্য সবাইকেই ছেড়ে দেয়। সেজন্য এরা নাকি আর্মির কাছে কৃতজ্ঞ। উত্তরের দিকটা ঘুরে নালা পেরোলাম ঝুলন্ত ব্রিজ দিয়ে। দক্ষিনের দিকটা অপেক্ষাকৃত নতুন ও ধনীদের এলাকা। বাড়িগুলো শুধু সুন্দর তাই না, একটা ডিজাইন আছে, ল্যান্ডস্কেপিং আছে। হাঁটার রাস্তা কংক্রীটের বাঁধানো। রাস্তার পাশ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। যারা পাথর ভাঙছিল তাদের দেখে ঠিক বাল্টি-লাদাখি-কাশ্মীরী বা হিমাচলীও লাগলো না। গায়ের রঙ বাদামী কালো। অদ্ভুত তো! গিয়ে কথা বললাম। ঠিক ধরেছি এরা কেও এখানের লোক নয়। এরা আমাদের দেশের লোক। ঝাড়খন্ড থেকে ঠিকে ধরে কাজ করতে চলে গেছে সুদূর তুর্তুকে। কি আশ্চর্য্য! কাজ দিলোই বা কে আর কেনই বা দিলো? হয়ত আর্মির হাত আছে এতে। আর্মির দুতিনজনের সাথে দেখা হল। দুপুরে খেয়ে দেয়ে গ্রামে চক্কর কাটতে বেরিয়েছেন। একজনের সাথে আলাপ হল। গোর্খা রেজিমেন্টের লোক, দার্জিলিং এ বাড়ি। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এখানে কেমন লাগে? ভাবলেশহীন মুখের উত্তর হল ডিউটি করি। ঠিকই তো। আর্মির আবার ভালো লাগার কিছু আছে নাকি? দেশ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা করে যাওয়াই কাজ। জিজ্ঞেস করলাম এই পাহাড় ভালো লাগে? একই রকম আবেগশুণ্য উত্তর এলো, নাহ, আমাদের দার্জিলিং এর পাহাড়ই ভালো। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। একটা দোতলা বাড়ির ছাদে নীল চোখের সুন্দরী মরিয়ম দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে এক গাল হেসে বলল তোমরা কোথা থেকে এসেছো? আমরা বললাম পশ্চিম বঙ্গাল। তুখোড় ইংরেজীতে বলল তুর্তুক এক দিনে আর কি দেখবে? সময় নিয়ে এসো। আমাদের যখন উৎসব হয় তখন এসে বেশ কিছু দিন থাকো। তবে তো বুঝবে। দেখতে দেখতে কখন দুপুর পেরিয়ে গেলো। নামাজও শেষ হয়ে গেছে। গুলামভাই কে খুঁজে বের করে রওনা হওয়া দরকার। নইলে হুন্ডার ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আর রাস্তার ঐ শ্যুটিং রক তো আছেই।

হুন্ডারে যখন ফিরলাম তখন আমাদের তাঁবুতে উৎসবের মেজাজ। দোরজি জানালেন সামনেই ট্যুরিস্ট সিজন, তাই হুন্ডার পঞ্চায়েত থেকে ঠিক হয়েছে কিছু সোশ্যাল-কালচারাল প্রোগ্রাম করার কথা, অবশ্যই কাঞ্চনমূল্যে। সেটার রিহার্শ্যাল শুরু করতে হবে। আজই তার প্রথম মিটিং। গ্রামের গণ্যমান্যরা সবাই নিমন্ত্রিত। মিটিং হবে, খানা-পিনা হবে, গান-নাচও হবে। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে আমরাও ওদের পার্টিতে জয়েন করতে পারি। আর আজকের খানা-পিনা কম্প্লিমেন্টারী। পয়সা লাগবে না। এরকম অসম্ভব অফার কি কখনও ফেলে দেওয়া যায়? এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আর লাদাখি পার্টির অভিজ্ঞতা কজনের থাকে ? দোরজি ভাই এর একটা বিরাট বড় ডাইনিং হলে হল পার্টির আয়োজন। কম করে তিরিশ জনের পার্টি। চিকেন, লাল রাইস এর একটা পোলাও মতন, কিছু শাক-সবজি, অ্যাপ্রিকট-ওয়ালনাট-আখরোট, আর প্রচুর হুইস্কি। ম্যাকডাওয়েল থেকে শুরু করে জনি ওয়াকার সবই আছে। এগুলো ঠিক কেনা না। আর্মির সস্তার পানীয় গিফ্ট পেয়েছে দোরজি ভাই। কারাকোরামের বরফ দিয়ে জনির ব্ল্যাক লেবেলের স্বাদ যে না পেয়েছে তাকে বোঝানো যাবে না। ওদিকে গান শুরু হল। নাচ টা আজ বাদই থাকবে। লাইটের ব্যবস্থা ঠিক হয় নি। এখানে সোলার প্যানেল আছে। কিন্তু কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছে কানেকশনে। অচেনা সুর আর অচেনা ভাষার এমন গান আগে কখনও শুনিনি। সবাই প্রচুর কথা বলছে, হাসছে। দোরজি আমার অসুবিধে টা উপলব্ধি করে আমার পাশে বসে থাকা উগ্যেল কে অনুরোধ করলেন কিছু কিছু কথা অনুবাদ করে দিতে। টুক টাক হিন্দীতে অনুবাদ করছিলেন উগ্যেল। বুঝলাম কথা হচ্ছে এ মরশুমে কিরকম ভিড় হবে তা নিয়ে। আর কদিন পর পর শো হবে সেটা নিয়েও। সপ্তাহে ৩-৪ দিন করা যেতেই পারে। গল্পে, গানে আর নেশায় রাত ঘনিয়ে এলো। দশটার সময় পার্টি ভাঙলো। এবার ঘুমোতে যেতে হবে।

বালিয়াড়ি

কাল এক্কেবারে সকালেই বেরোতে হবে। ব্যাকট্রিয়ান উটে চড়া এখনও বাকি। বালিয়াড়ি দেখে তারপর লেহ ফেরত। হুন্ডারের বালিয়াড়ি অনেকে বলেন ওভার-হাইপড। আমি অবশ্য ওভার-হাইপ এর কিছু পেলাম না। এখানে কি আমি সাহারা বা নিদেনপক্ষে থর আশা করেছিলাম নাকি? কারাকোরামের ভ্যালিতে এতো বালির উপস্থিতিই যথেষ্ট অবাক করার মত। শিয়োক নদীর একদম গায়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা এই ডিউন গুলো। প্রতিটা ডিউনই অর্ধচন্দ্রাকার, মানে ক্লাসিক শেপের। উচ্চতাও প্রায় ৫০-৬০ ফুট করে। বালির উপর খালি পায়ে হাঁটতে বেশ লাগছিল। সেই কাতারে আরব মরুতে বালিয়াড়ি দেখেছিলাম শেষবার। সেগুলো অবশ্য আরো বড় ছিল। ডিউন এর এক দিকে আছে উটগুলোর আস্তানা। শ'খানেক ব্যাকট্রিয়ান উট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলাম বলে একটা ছেলের সাথে কথা হল। সে বলল আমার উটে চড়ুন। এর নাম জোরো। জোরো আপনাকে কারাকোরামের সাফারি করিয়ে আনবে। সাফারি অবশ্য নামেই। ২০ মিনিট মত ঘুরিয়ে এনে যখন নামালো তখন প্রচুর দেরী হয়ে গেছে। গুলাম ভাই এর আর সময় নেই। এখুনি বেরোনো দরকার। রাস্তায় আবার শিয়োকের ধারে বসতে ইচ্ছে হতে পারে। এছাড়া অজানা অচেনা গুম্ফাও বেরিয়ে পড়বে এদিক ওদিক। আর দুপুরের পর খার্দুংলা তে না চড়াই বাঞ্ছনীয়।

ব্যাকট্রিয়ান উট

কথা টা অতীব সত্য। আর দেরী করলাম না। জাইলো গর্জন করে উঠল। আজ আমরা ফেরত যাচ্ছি। শিয়োক আবার ওর আসল নীল রঙ ফিরে পেয়েছে। একটা হলুদ পাখি হঠাৎ সামনে এসে আমাদের বিদায় জানালো। মনে মনে ভাবলাম এবার তো শুধু রেকি করে গেলাম। আসতে আবার হবেই। দুবছর পর সিয়াচেন খুলবে ট্রেকারদের জন্য, তখন সিয়াচেন যাবো। আর শীতে নদী জমে গেলে শিয়োক এর উপর দিয়ে প্যাংগং যাওয়া যায়। সেটাও কখনও চেষ্টা করা যেতে পারে। এবারের মত দুদিনই থাক।

কারাকোরামের রঙ

একলা শহর

প্রবুদ্ধ মজুমদার

১

কাঠমান্ডু

আইদান যখন দরবার রোডের মাথায় পৌঁছোলো তখন বিকেল| শরীর ক্লান্ত,কোথাও একটা বসতে হবে তাকে|

স্কটল্যান্ড থেকে নেপাল আসার পরিকল্পনা আইদানের অনেক দিন থেকেই ছিলো| শুধু নেপাল নয়, সাথে ইন্ডিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, যে তিনটে দেশ সে আগেও ঘুরে গেছে| শেষ দুটো জায়গায় অবশ্য চাইলেই দুম করে নেমে পড়া যায় না| অনেক নিয়ম, অনেক অনুমতিপত্র, অনেক ঝামেলা| তার ওপর আইদানের পেশা হল ছবি তোলা| এরকম পেশার লোকেদের ঘোরতর সন্দেহ করে অনেক দেশের সরকার| যদিও ও শুধুই নিরীহ প্রাণহীন স্থাপত্যের ছবি তোলে| প্রাণহীন অবশ্য কথার কথা, ভেঙ্গে পড়া হাভেলী আইদানের ছবিতে কথা বলে|

একটা দোকানের সামনে দাঁড়াতে হল তাকে, যেখানে একরকম পাতা পাওয়া যায়, তাতে মশলা পুরে চিবিয়ে খেতে হয়, কিছুক্ষণ পরে মুখের ভিতরটা মশলাদার স্বাদে ভরে যায়| আজই সে পাটন থেকে কাঠমান্ডু এসেছে জীপে লম্বা সফর করে| এখন সোজা হোটেলেই যাচ্ছিলো, তবু বিকেলের ঠান্ডায় আরো একটু বাইরে থাকতে ইচ্ছা করলো তার|

ঐখানেই দাঁড়ানোর কারণ হল একটা ভাঙ্গা ইঁটের স্তুপ| পানের দোকানটা, আর একটা দর্জির দোকানের আড়ালে শবদেহের মত উপুড় হয়ে রয়েছে| আধখাওয়া পেঁয়াজের মত চূড়াটা দেখে মনে হয় কোনো ধর্মস্থান| পানের

দোকানে একটা নিরুৎসাহ লোক বোধ হয় জীবনের শেষ পানটা বিক্রী করার জন্য বসে আছে|

-"পান|" নিজের নেপালী ভাষার পুঁজি থেকে একটা শব্দ বার করে আইদান|
লোকটা মাথা নীচু করে পান সাজতে বসে|
গলা খাঁকরায় আইদান|
--"জী?" নিরুৎসাহ দুটো চোখ আইদানের দিকে তাকায়|
শবদেহটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা করে আইদান|
--"মাজার| মসজিদ| হিন্দুস্তানী মসজিদ|" একসাথে অনেক তথ্য জানিয়ে দেয় লোকটা|

হিন্দুস্তান ইন্ডিয়ার আরেক নাম, যদিও আইদান জানে নেপালই একমাত্র হিন্দু দেশ| পানটা খেতে খেতে আর একটু এগোলো সে মসজিদের দিকে| আলো পড়ে এসেছে মাজারের চূড়ায়, এরকম সাবজেক্ট একজন ছবিওয়ালা ছাড়তে চায় না| তবে শুধু ছবি তুললে তার কাজ শেষ হবে না| ছবি, আর তার সাথে গল্প, দুয়ে মিলে তৈরী হবে আইদানের ফোটো-ডকুমেন্টারী|

পানের দোকানের লোকটা বলেছিলো এটা হিন্দুস্তানী মাজার| অর্থাৎ কারোর সমাধি রয়েছে এখানে, এবং সে হিন্দুস্তান থেকে এসেছিলো নেপালে| একটা ফলক আছে বটে, কিন্তু অর্ধেকটা ভাঙ্গা| কতগুলো সস্তা ফুলের গাছ টবে সাজিয়ে কেউ ঘিরে রেখেছে সমাধিটাকে| ফুল আছে যখন, তখন লোকও আছে, এই আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে এক বুড়োমতো লোককে দেখা গেলো, গোধুলির পড়ন্ত আলোয় প্রায় অদৃশ্য হয়ে ভাঙ্গা মসজিদের চাতালে বসে আছে| বুড়োর পরণে টোপী আচকান পায়জামা দেখে আইদান উর্দুতেই বরফ ভাঙ্গার কাজ শুরু করলো|

ভারতীয় উপমহাদেশে ছবি তুলতে আসার সুবাদে আইদানকে হিন্দী আর উর্দু শিখে রাখতে হয়েছিলো, খুব ঠেট না হলেও কাজ চালানোর মতো| বুড়োকে সমাধির ব্যাপারে জিগ্যেস করে জানা গেলো, এই সমাধির নীচে শুয়ে আছেন এক নারী| এই মসজিদ, এর পাশে একটা ছোটো মহল,যেটা এখন আর নেই, এমনকি নিজের সমাধিটাও ঐ নারীর তৈরী| ইনি ইফতিকার-উন-নিসা বেগম হজরত মহল, অওধের নবাব নাসিরুদ্দীন আবুল মনসুর মুহম্মদ ওয়জিদ আলী শাহ-এর প্রথম বেগম|

ওয়জিদ আলী শাহ-এর তিন রকম বেগম ছিলো:
খাস বেগম, যেমন নবাবের প্রিয়তমা বেগম সিকন্দর মহল, যার নামে সিকন্দরবাগ লখনউয়ের এক চমৎকার সামার প্যালেস;
মুখা বেগম, শুধু আনন্দের জন্য নিকাহ করে আনা এই অসহায় "বেগম" দের তিন দিন, তিন মাস বা তিন বছর পরই ফিরে যেতে হতো পুরোনো জীবনের পাঁকে| বনারসের সকাল আর লখনউয়ের সন্ধ্যা, এর নাকি রাজকীয় মহিমা| কিন্তু ঐ সন্ধ্যার অন্ধকারে এই মুখা বেগমদের দু:খী মুখগুলির ওপর কোনো আলো পড়েনা| শেরশায়রী আতর চিকন ঘজল কাবাব নবাবের শহর লখনউতে মুখা বেগমদের নি:শব্দ দীর্ঘশ্বাস পাথরে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে হারিয়ে যায়|
আর তিন নম্বরের বেগমরা হলো "পরী"| তাজদার-এ-লখনউ ওয়জিদ আলী শাহ সৌন্দর্যের "পুজারী" ছিলেন, হুরী-পরীদের প্রতি একটু বেশীই নজর| অথচ পাঁচ বেলা নমাজ পড়তেন, শরাব ছুঁতেন না| এই বিশেষ ক্লাসের

বেগমদের খুঁজে বার করা হতো লখনউয়ের অন্ধকার কোঠীগুলি থেকে| দেখতে সুন্দরী তো হতেই হবে, সাথে নাচে-গানে পারদর্শী হলে পরী হওয়ার সুযোগ জুটবে, কোঠী থেকে কাইজারবাগের আলীশান মহলে উড়ে আসতে পারবে আগুনের দিকে ধেয়ে যাওয়া পতঙ্গের মতো| আইদানের সামনে মাটির নীচে শুয়ে থাকা বেগম হজরত মহলও এমনই এক "পরী" ছিলেন| নবাবসাহেবের মহক পরী (সুগন্ধী পরী)|

সেই সন্ধ্যায় এই উজাড় সমাধি থেকে উঠে আসে অনেক অনেক কাহিনী| নবাব বাদশার ঝকমকে কাহিনী নয়, কতগুলি না-কামিয়াব মানুষের কাফিলা ধীরে ধীরে আইদানের চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায়| সেই কাফিলা'র সাথে সাথে চলে আইদান পৌঁছে যায় একলা এক শহরে|

২
অমীরন

আসফী ইমামবড়া থেকে ওয়জীরবাগ মুহল্লা যেতে চক এলাকা পার হতে হয়| উত্তরে গোল দরওয়াজা আর দক্ষিণে আকবরী দরওয়াজা, এর মাঝে একটুকরো জায়গার নাম চক, যেখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এই কাহানী| মাকড়সার জালের মতো অলিগলি ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে জজীরা (দ্বীপ)-এর মতো| মাকড়সার জালই বটে| ইক তুম হী নহী তনহা, উলফৎ কে মেরী রুসয়াঁ| তুমি একাই তো নও সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে সমাজে বদনাম| চক-এ তোমায় আসতেই হবে, আর এ জালে একবার জড়িয়ে গেছো তো মরেছো|

সে কিরকম রূপ? বটগাছের শীতল ছায়া সে নয়, বরং সাপের সোনালী পিছল গায়ের মতো খতরনাক| ছুঁতে নেশা জাগে, কিন্তু ছুঁলেই মওত, তবে এ মওত হলো মওত-এ-শাহয়ানা, রাজার মতো মৃত্যু|
অওধের শায়র লিখেছেন,
অ্যায় হুস্ন-এ-বেপরওয়াহ তুঝে শোলা কহুঁ শবনম কহুঁ
ফুলোঁ মেঁ ভী শোখী তো হ্যাঁয় কিসকো মগর তুঝসা কহুঁ
(নির্লজ্জ সুন্দরী তোকে আগুন বলবো না শিশিরের বিন্দু, ফুলের মধ্যে তো চপলতা আছে কিন্তু তুই কোন ফুলের মতো|)

[দিল্লী আর লখনউয়ের শায়রীর মধ্যে এটাই বড়ো তফাৎ| দিল্লীর শায়রীতে দর্দ আর রুহানী এহসাস (আধ্যাত্মিক অনুভব) রয়েছে| আর লখনউয়ের শায়রী হলো সুন্দরের নির্লজ্জ উপাসনা, তাতে নফসিয়ত (আবেগ) ভরপুর|]

চকের অলিগলিতে পা রাখলেই দেখা যাবে পর পর কোঠী, সরু দরজা দিয়ে ঢুকলেই তুমি পেয়ে যাবে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া অন্ধকার সিঁড়ি| সে রাস্তা বেহেস্তের না জাহান্নুমের সেটা তো তোমার নসীবই বলবে| সেরকমই এক কোঠীতে সকাল হয়| জালির বেআব্রু পর্দা চিরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আলো| এই ছোট্টো জানলা দিয়ে এতো তেজ রোশনী কি করে দাখিল হয় বুঝে ওঠেনা আমিরন| তবু সকালে ওঠা তার পুরোনো আদৎ| তাই চোখ দুটো খুলে যায় তার|
এ সেই চোখ, যা দেখে শায়র বলে ওঠে,
ইয়ে ভীগী হুই শাম কা মনজর তেরি আঁখেঁ,

মুমকিন হো তো ইক তাজা গজল অর ভী কেহ লুঁ
ফির ওড় না লে খাব কি চাদর তেরী আঁখেঁ...
(তোর ঐ চোখে সন্ধ্যার জলছবি আঁকা,
অনুমতি পেলে একটা নতুন কবিতাই নাহয় লিখে ফেলি,
কিন্তু আবার স্বপ্নের ওড়নায় ঐ চোখ ঢেকে নিস না)

শুধু চোখ নয়, অমীরন তো হুস্ন-এ-মুকম্মল, সর্বাঙ্গসুন্দরী| অর্ধনগ্ন দেহটা তুলে পালঙ্কের ওপর উঠে বসে অমীরন| হাতের মুঠিতে ধরা যায় এরকম কোমর ভেঙ্গে আড়মোড়া দেয়, আলস্য ধুয়ে নিয়ে যায় তার শরীরটাকে| কালকের মেহফিলের ধকল এখনো লেগে আছে মাথা থেকে পা অবধি| এ তার তকদীর, ভাগ্য| এমন কোনো মুহাফিজ (অঙ্গরক্ষক) কি আছে কোথাও যে সেই ভাগ্যের হাত থেকে তাকে হিফাজত করে| রোজ রাতের এই নকল ইশকের খেলা, গরম লোহার শলা'র মত বে-ইশক মুহব্বত| দিনের অমীরন রাতে উমরাও"জান", কোমরটা যার হাতের মুঠিতে ধরা যায়|

অমীরনের ঘর ফৈজাবাদে, ছিলো এককালে| আব্বা ছিলেন বহু বেগমের মকবরা (সমাধি)-র জেমাদার| আম্মী ছোটোখাতো ঘরেলু কাজ করতেন দিলাবর খানের হাভেলীতে| অমীরনের বয়স তখন নয়, ছোটো থেকেই খুবই সুন্দর দেখতে তাকে| গায়ে লাল গুলবদনের পায়জামা, কুর্তী, ওড়নী, হাতে রুপোর চুড়ি, নাকে নথনী, গলায় হার, একেবারে সোনার গুড়িয়া| শুধু কানের দুল তৈরী হতে গেছে সোনারের দোকানে| অমীরনের মাঙ্গনীও হয়ে গেছে ফুকীর ছেলের সাথে| তারা আবার নবাবগঞ্জের বড়ো জমিদার|

কিন্তু, নসীব| কি হতে পারতো অমীরনের সাথে, আর কি হলো| ঐ দিলাবর খান যার বাড়ীতে আমী রোজই যেতো কাজ করতে, সে ছিলো এক কুখ্যাত ডাকাত, জেলখাটা আসামী| আব্বার সাথে কড়ুয়া দুশমনী, আব্বা কোতোয়ালের সামনে দিলাবর খানের পর্দাফাশ করে দিয়েছিলো যে| কিন্তু দশ-বারো বছর পর কার সিফারিশে যেন দিলাবর খান ফাটক থেকে বেরিয়ে আসে| তারপরই শুরু হয় তার বদলা নেওয়ার খেলা| কবুতর দেওয়ার নাম করে অমীরনকে আড়ালে ডেকে মহল্লা থেকে তুলে নেয় দিলাবর খান আর তার সাগির্দ পীরবক্শ, আর সোজা নিয়ে ফেলে লখনউয়ের চকবাজারে খানম জানের কোঠীতে| আর কয়েকদিন পরেই শাদী তয় ছিলো অমীরনের, কিন্তু তার বদলে দেড়শো টাকায় বিক্রী হয়ে গেলো|

খানম জান অমীরনকে দেড়শো টাকায় কিনেছিলো ঠিকই| একটু দরদামও করেছিলো| কিন্তু জীবনে যত জিল্লত-ইজ্জত বদনামী- নেকনামী আচ্ছা-বুরা যা কিছু পাওয়া যেতে পারে, সবকিছু অমীরন পেয়েছিলো এই খানম জানের কোঠীতেই| নিজের মা-কে মনে পড়েনা হয়তো তার, কিন্তু এই বছর পঞ্চাশের শ্যামবর্ণা মোটাসোটা ভারিক্কী অওরতকে সে সারা জীবন মায়ের মতো ইজ্জত আর মুহব্বত করে গেছে| খানম জান, আর তার সমবয়সী খিদমতগারনী আর এক পাগলী বুড়ী হুসৈনী, এই দুই ফেরেশ্ত তার জিন্দগীতে এসেছিলো বলে অমীরন শত যন্ত্রণাকেও দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে পেরেছে|

সারা শহরের সৌন্দর্য যেন খানম জানের দোতলা কোঠীতে এসে জড়ো হয়েছে| অমীরন, খুর্শিদ, খানম জানের মেয়ে বিসমিল্লাহ জান, হাসির আওয়াজ, পায়েল আর সারঙ্গীর যুগলবন্দী, ঝাড়বাতির রোশনাই, পরীস্তান বোধ হয় এমনই

হয়| অমীরনের মতো লড়কীদের বলা হতো নৌচিয়াঁ (নর্তকী), যাদেরকে খানম জানের মতো খানদানী তয়ায়েফরা কিনে নেয়| এখানেই অমীরন একে একে শিখলো নাচা-গানা, ফার্সী বলা লেখা, শের-শায়রী| এই শিক্ষা তার ভবিষ্যতে অনেক কাজে লেগেছিলো, বড় বড় আমীর-রইসদের মেহফিলে, শাহী শাদী-দরবারে তার ডাক পড়তো, ইজ্জত পেতো|

হুসৈনী অমীরনের নাম দিয়েছিলো উমরাও সাহিবা| রাণীসাহেবা, সালাম, বলতো রোজ সকালে| বুড়ীর বচপনা দেখে হাসতো অমীরন| কোঠীর তয়ায়েফরা একটু নামডাক হলে জান খেতাব পায়| এই দুয়ে মিলে তৈরী হয়ে গেলো উমরাও জান| সেসময় লখনউয়ের নিশাত খানার অন্ধকার দুনিয়াকে উমরাও জানেরা তাদের ঝুটা শান দিয়ে উজালা করে রাখতো, আর রূপের জশন নিভে গেলে চৌধরনী সেজে নতুন জানেদের ইস্তেমাল করে শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতো, পানদানে জীবনের তিক্ত তজুর্বাকে উগরে দিতে দিতে|

অমীরনের নেশায় দীওবানা তো এই শহরের হাজার শক্শ, তার মধ্যে সবচেয়ে গৈর- জরুরী(অপদার্থ) বোধ হয় গওহর মির্জা| নিজেকে বলে খানদানী, বাপের দিক থেকে অবশ্য ঠিকই, তবে মায়ের কোনো খবর সে জানেনা, নামটাও জানা নেই| গওহর মির্জার হাতে পয়সা এলে কবুতরের মত ফড়ফড় করে উড়ে যায়, কিন্তু ওর সাদা চোখদুটোতে অনেক শায়রী আছে| অমীরন গওহরের সেই গভীর চোখের ভিরতকার শায়রীগুলো পড়ে নেয়, কোরা কাগজে লিখেও ফেলে দু-একটা নজম, পড়ে নিজেই হাসে| শুধু আয়না দেখে অমীরনের ঐ হাসি...

অমীরনের লেখা শেরগুলো পড়ার একমাত্র লোক ছিলো গওহর| বেশরম গওহর কোনোরকম রেয়াত করতো না, ছিন্নভিন্ন করে দিতো অমীরনের নরম নজমগুলোকে| কিন্তু শেষ রাতে একা কামরায় গওহর সেই শেরগুলোকেই বারে বারে জড়িয়ে ধরতো| একজন তয়ায়েফ জিন্দগীকে এত কাছ থেকে দেখে বলেই বোধ হয় বলতে পারে,

আরজু থি হামে ইৎনা জহেক সে মওত মিল জায়ে
সারি দুনিয়া মেঁ কিসি সে তো মুহব্বত হো জায়ে
জিতেজি পায়া না কুছ হমনে জমানেবালোঁ
অব জনাজে কো তো রুখসত কি ইজাজত মিল জায়ে
(প্রার্থনা ছিলো শান্তিতে যাতে মরতে পারি, প্রার্থনা ছিলো এতোবড়ো পৃথিবীতে কাউকে যেন ভালোবাসতে পারি, সেসব কিছুই তো হলো না এখন আমার শবযাত্রার কি বিদায় নেওয়ার অনুমতিটুকুও মিলবে না?)

৩
অওয়ধ

অওয়ধ, অযোধ্যা| তারই ওপর এক ছোট্টো বিন্দু লখনউ| রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ, নাকি লখনা নামক এক স্থপতি, কার নামে লক্ষ্মণাবতী নগরীর নামকরণ, কে জানে| তবে কোশল মগধ কুশান গুর্জর প্রতিহার থেকে রাজপুত, সুলতান মামুদ, বিজনোরের শেখ, রামনগরের পাঠান, জৌনপুরের শার্কি সুলতানদের হাত ঘুরে এই উর্বর ভূখন্ড অযোধ্যা অবশেষে জমা হয় দিল্লীর লোদী সালতানাতের হাতে| আবার শের শাহ সুরীর হাতে হুমায়ুঁর পরাজয়ের পর সুরী শাসকেরা কিছুদিন অওয়ধের তখতে বসলেন| অওয়ধের শান সেসময় ছিলো ফৈজাবাদ, লখনউ তখন ছোটো এক শহর, লক্ষ্মণ টিলার আশেপাশে সামান্য কিছু জনবসতি রয়েছে|

তোমরা লখনউকে বলো নবাবের শহর| শুনে হাসি পায়| নবাব! আরে লখনউতে কজন সাচ্চা মুজাকার (পৌরুষদীপ্ত) নবাব ছিলো বলতে পারো? কোম্পানীকে লাখ লাখ টাকা নজরানা দিয়ে তখতে বসার ইজাজত খরিদ করাকে কি নবাবী বলে? না তাকত না ইখতিয়ার (কর্তৃত্ব) না ফৌজ| কিশাণ ভিস্তী নাই নাখুদা (মাঝি) ধোবীদের থেকে মাশুল নিয়ে নিয়ে খাজনা ভরিয়ে তোলাকে কি নবাবী বলে? বলে হয়তো| অওয়ধ, আর তারই তাজ এই লখনউ শহর কিন্তু শুধু কতগুলি নাকার নবাবের হাতের খেলনা হয়েই থাকেনি| সাচ্চা নবাব তো এসেছিলো অওয়ধের কিসমতে|

বাদশা ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে, যুদ্ধে যুদ্ধে জেরবার| শিবাজী যতদিন বেঁচে ছিলেন সমানে টক্কর তো দিয়েই এসেছেন| তাঁর মৃত্যুর পর একে একে দুই ছেলে সম্ভাজী ও রাজারাম, রাজারামের স্ত্রী তারাবাঈ, কেউ পিছু হঠতে রাজী ছিলেন না| জীবনের শেষ সাতাশ বছর ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের সাথে লড়াই করেই কাটিয়েছেন| সেসময় পারস্যের খুরাসান থেকে এক ধনী শিয়া ব্যবসায়ী মুহম্মদ নাসির মুসওয়ী বাদশার খায়েমা -তে (তাঁবু) নানা জিনিস বিক্রী করতে যেতেন, সঙ্গে যেতো ছেলে মুহমন্দ আমিন মুসওয়ী| এই ছেলের করিৎকর্মায় খুশী হয়ে বাদশা আলমগীর খেতাব দিলেন, খান বহাদুর | বহাদুরই বটে| ঔরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর যখন মুঘল সাম্রাজ্য টলোমলো, তখন এই খান বাহাদুর মুহম্মদ আমীন মুসওয়ী ঠিক নজরে পড়ে গেলেন বাদশাহ মুহম্মদ শাহের নজরে| আর ঐদিনই অওয়ধের কাহানী খুদার খাতায় সোনার জলে লেখা হয়ে গেলো| সন ১৭২২ এ তিনি অওয়ধের সুবেদার হয়ে এলেন| অওয়ধ তখন সালেমপুরের শেখদের কব্জায়| মুহম্মদ আমীন মুসওয়ী ধীরে ধীরে শেখদের হঠিয়ে দিলেন, নিজে নবাব বুরহান-উল-মুলক-সাদাত-খান হয়ে অওয়ধের রাজপাট সামলাতে লাগলেন| অপদার্থ বাদশাহ মুহম্মদ শাহ পুরো ভরসা করতেন অওয়ধের নবাবের ওপর, কারণ কোটী টাকার ওপর খাজনা আসতো| তখন ঘাগরা নদীর তীরে ফৈজাবাদই ছিলো আদত রাজধানী| ফৈজাবাদকে তখন লোকে "বাংলা" বলতো, কারণ তার পত্তন আলীবর্দী খাঁর হাতে, নবাবের কিলার নামও ছিলো ছোটা কলকাত্তা|

ফৈজাবাদ| অমীরন থেকে বেগম হজরত মহল, নবাবীয়ানার শান এরকম আরো অগুন্তি হুরী-পরীরা বেহেস্ত থেকে এই সরজমিঁতে নেমেছে এই ফৈজাবাদেই| এই পুরানা শহর ফৈজাবাদের পথের ধুলোয় তাই এত মিঠা মেহক আজও পাওয়া যায়|

বুরহান-উল-মুলকের কিসমতে আরাম লেখা ছিলো না| শেখদের সাথে লড়াই, বারেবারে দিল্লী গিয়ে নানাভাবে বাদশাকে ভিজিয়ে রাখা, এসব সামলাতে সামলাতেই ঝোড়ো হাওয়ার ঝোঁকার মতো হিন্দুস্তানে এসে পড়েলেন নাদির শাহ, নবাবের ডাক পড়লো কার্নালে, নাদির শাহকে ঠেকাতে| নাদির শাহকে হারানোর ক্ষমতা হিন্দুস্তানে কারোরই ছিলোনা| বুরহান-উল-মুলক হেরে গিয়ে ধরা পড়লেন, আর দিল্লীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার আগের রাতে নাদির শাহ অওয়ধের প্রথম নবাবের মাথাটি কেটে নিলেন| সেটা ১৭৩৯| অওয়ধ তখন উত্তরে তেরাই, পুবে বিহার, পশ্চিমে কন্নৌজ ও দক্ষিণে মাণিকপুর অবধি বিছানো ছিলো|

নবাব-বাদশাহর কাহানী তো শোনাতে বসিনি| কিন্তু লখনউয়ের রঙ্গীন ইতিহাসে এঁদেরও কদমের নিশান ছিলো| লখনউয়ের ভাঙ্গাগড়া তো এঁদেরই হাতে| আম আদমী নিজের জিন্দগীর বোঝ বইতে বইতে ইতিহাসের রহগুজর (পথ) ধরে চলেছে কাফিলা বানিয়ে, ফুরসতে এসে বসেছে লখনউয়ের শান্ত মারহালায় (সরাইখানা) | খামোশ নজরে দেখেছে নবাবী শান| আবার নিজের কাজে লেগে পড়েছে|

ইক কাহানী হ্যাঁয় কী সদীয়োঁ পর মুহিত
সোচনে মেঁ দোপহর কী বাত হ্যাঁয়
আয়ে, ঠহরে, অওর রওয়ানা হো গয়ে
জিন্দগী ক্যায়া হ্যাঁয়, সফর কী বাত হ্যাঁয়|

এ গল্প তো কয়েকশো বছরের, কিন্তু ভাবতে গেলে এক দুপুরেই ভেবে নিতে পারো| এলে, বসলে আর চলে গেলে, জীবন তো এরকমই এক সফরের গল্প|

৪
লখনউ

জুস্তজু জিসকী থী উসকো তো ন পায়া হমনে
ইস বহানে সে মগর দেখ লী দুনিয়া হামনে

অমীরন কার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করেছিলো তা তো শুধু সেই জানে| কিন্তু উমরাও জানের চোখ দিয়ে সে যে দুনিয়া দেখেছিলো বাইরে থেকে তা খুবই হসীন| নবাবের খাস মহল কাইজারবাগের রুপোয় মোড়া সফেদ বরাদরীর চুড়ার দিকে চাঁদনী রাতে তাকালে চোখ ঝলসে যায়| আসফ-উদ-দৌল্লা নিজের হাতে তাঁর নতুন রাজধানীকে সাজিয়ে ছিলেন দুলহনের মতন|
কিন্তু তার আগেও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে| আবার সেই ইতিহাস বইয়ের পাতা উল্টে দেখি, বুরহান-উল-মুলক গত হয়েছেন, তাঁর ভাতিজা ও জামাই নবাব সফদরজঙ্গ নাদির শাহকে দু কোটী টাকা নজরানা দিয়ে তখতে বসেছেন| এই সফদরজঙ্গের ওপর একটা সময় মুহম্মদ শাহ পুরো দিল্লীর ভার সঁপে দিয়েছিলেন| বোঝাই যাচ্ছে এমন তাকতবর নবাবের হাতে পড়ে অওয়ধের শান কতটা ইজাফা (বৃদ্ধি) পেয়েছিলো| দক্ষিণ দিল্লীতে সফদরজঙ্গের মকবরা তো এখনো এক দিলফরেব (মনোরম) জায়গা|

ততদিনে পলাশীর যুদ্ধ (যুদ্ধ?) হয়ে গেছে, ইংলিশস্তান থেকে গোরা কারোবারীরা স্রোতের মতো ঢুকছে হিন্দুস্তানে| সফরজঙ্গের পর তখতে এলেন তাঁর ছেলে শুজা-উদ-দৌল্লা| কোম্পানীর মতিগতি তাঁর সুবিধার লাগলো না| ১৭৬৪ তে মীরকাশেমের হাতে হাত মিলিয়ে বক্সারের প্রান্তরে জঙ্গ লড়লেন কোম্পানীর সিপাহীদের সাথে| হারলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না, আবার মারাঠাদের সাথে মিলে জাহানাবাদে গোরা ব্যাপারীদের সাথে লড়ে এলেন| আবার হারলেন, আর ঠিক এই সময় থেকেই কোম্পানীর শকুন নজর পড়লো অওয়ধের ওপর| শাম-এ-অওয়ধ চাঁদনী রাতে ঝলমল করতো, এবার পশ্চিমদিকের আসমান থেকে বাদল ছেয়ে আসতে লাগলো| কোম্পানী পয়মান জারী করা শুরু করলো, আলাহাবাদ হাতছাড়া হলো, বুরহান-উল-মুলকের বাইশ লাখী ফৌজ ছোটো হয়ে মাত্র ৩৫ হাজারে এসে দাঁড়ালো| অওয়ধের কিসমত, লখনউয়ের কিসমত আর অওয়ধের রেয়া (প্রজা) র কিসমত বদলাতে লাগলো|

শুজা-উদ-দৌল্লার পর অওয়ধের নবাবী চবুতরা উজালা করে বসলেন মির্জা ইয়াহিয়া খান, ইতিহাস যাকে নবাব আসফ-উদ-দৌল্লা নামে জানে| এঁকে চিনে রাখতে হবে, কারণ এঁর পর থেকেই অওয়ধী শানের নীচের দিকে ঢলান শুরু হয়ে যায় যা শেষ হয় সিপাহী বিদ্রোহের পর| তো আসফ-উদ-দৌল্লা ভালো করে তখতে গুছিয়ে বসতে না বসতেই দেখলেন বনারস, জৌনপুর,গাজীপুর একে একে নবাবী জায়দাদ থেকে হাত বদল হয়ে কোম্পানীর পকেটে চলে গেলো, খাজনা বেড়ে গেলো, কোম্পানীর ফৌজ লখনউয়ের অলিগলিতে টহল দিতে লাগলো, যাদের খরচ আবার নবাবের খাজানা থেকেই বন্দোবস্ত করা হতো| তার ওপর অওয়ধের খাজানার দিকে নজর পড়লো কোম্পানীর এক অতি চালাক বেহায়া শয়তান রেসিডেন্ট সাহাবের, যার নাম ওয়ারেন হেস্টিংস| হেস্টিংস শুজা-উদ-দৌলার সম্পত্তির মালকিন উমৎ-উজ-জোহরা বেগম সাবিবা (বহু বেগম)-র ঘর থেকে লুটপাট করে আনলেন, একবার নয়, বারেবারে| নবাব হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন, নইলে ভাই আলী খানকে তখতে বসিয়ে দেবে কোম্পানী| মা-বেটার মধ্যে রিশ্তাও কড়ুয়া ছিলো| সরকারী খাজানা খালি হতে লাগলো|

(অওয়ধের সম্পত্তির ওপর কোম্পানীর অনেক দিন থেকেই লালচ ছিলো| হেস্টিংস বারাণসীর রাজা চৈত সিংকে দিয়ে মিথ্যা বিদ্রোহ সাজিয়েছিলেন, এবং কু-শাসনের অজুহাতে বহু বেগমকে বন্দী করে রাখেন| এই জুর্মের জন্য ইংল্যান্ডে ফেরার পর হেস্টিংসের বিচার হয়েছিলো)

আল্লাহতলাহ কেন হঠাৎ অওয়ধের ওপর খফা হয়ে উঠলেন জানা নেই| ১৭৮৩-এ এলো এক ভয়ানক শুখা, অওয়ধকে একবারে ঝাঁঝরা করে দিলো| ততদিনে আসফ-উদ-দৌল্লা রাজধানী সরিয়ে এনেছেন লখনউতে, কারণ ফৈজাবাদে বহু বেগম থাকেন, মায়ের সান্নিধ্য ছেলের বেশী পছন্দ নয়, কোথা দিয়ে কি সাজিশ হয়ে যাবে| শুখা তো একদিন শেষ হলো, কিন্তু তারপর? কোরানে ভিক্ষা দেওয়া মানা, তাই শহরবাসীর মুখে খাবার তুলে দিতে আসফ-উদ-দৌল্লা এক ইমামবড়া বানানোর পরিকল্পনা করেন| কাজের বিনিময়ে খাদ্য| জলা জমির ওপর তৈরী হতে থাকে আসফী ইমামবড়া, লোকে যাকে বড়া ইমামবড়া বলে জানে| নরম জমি বলে থাম বানানো মুমকীন ছিলো না, তাই ইমামবড়ার বিশাল ছাদকে সাহারা দেওয়ার জন্য ছাদের ওপর অলি-গলি-সুড়ঙ্গের নকশা তৈরী করা হয়, যা ক্রমে ভুলভুলাইয়ার চেহারা নেয়| নবাব ও তাঁর সাগির্দেরা চতুর্থ রাতে আগের তিন দিনের কাজ ভেঙ্গে দিতেন, যাতে আরো কিছুদিন কাজ চলে, আরো কিছুদিন শহরবাসীকে সাহায্য করা যায়| ভুলভুলাইয়ার প্যাঁচ

কাটিয়ে বেরিয়ে আসার সিধা নিয়ম হলো, নীচ থেকে ওঠার সময় শুধু ওপর দিকে উঠতে হবে, ভুলেও নীচে বা সমান্তরাল কোনো রাস্তায় গেলে চলবে না| নামার সময় উল্টো নিয়ম| ইমামবড়ার পাশে একটা জল সংগ্রহ আর পরিবহণের বাওলী (ইঁটের স্থাপত্য) রয়েছে, যার সাথে সুড়ঙ্গপথে ফৈজাবাদ অবধি সংযুক্ত ছিলো| নবাবের দরিয়াদিলীতে খুশী হয়ে লোকে গান বানালো, জিসকো না দে মউলা (আল্লাহ), উসকো দে আসফ-উদ-দৌল্লা| শুনে নবাব খুব ক্ষুণ্ণ হলেন, আমি সামান্য একজন মানুষ, মউলাকে ইলজামতরাশী (স্পর্ধা) করার আমি কে| তিনি গানের বয়ান বদলে দিলেন, জিসকো দে মউলা, উসীকো দে আসফ-উদ-দৌল্লা| এই বিনয়, এই আজীজি, এই তো লখউভিয়ৎ, এই তো লখনউয়ের তহজীব|

আসফী ইমামবড়া নিয়ে আর একটা ইত্তেলা দিয়ে যাই| মূল ফাটক, যাকে মচ্ছী দরোয়াজা বলা হয়ে থাকে, তাতে দুটো মাছের নিশান আছে| অওয়ধী নবাবদের বাপদাদারা এসেছিলেন পারস্য থেকে, যেখানে তাইগ্রিস নদীর মাছ ছিলো তাঁদের প্রধান খাদ্য| অওয়ধী তুঘ্রা (emblem)-এ তাই মাছের নকশা থাকবেই|

শুধু আসফী ইমামবড়া নয়| আসফ-উদ-দৌল্লার সময় তৈরী হলো তুর্কী দরওয়াজা, শহরে ঢোকার মুখে ষাট ফীট উঁচু অওয়ধী এমারিয়তের (স্থাপত্য) এক চমকদার নমুনা| ত্রয়োদশ শতকের পার্সী কবি ও দার্শনিক রুমির নামে ওয়াকফশুদা (উৎসর্গ) করা হয়েছিলো এই দরোয়াজাকে, বানিয়েছিলেন অবশ্য হিন্দু রাজা টিকায়ৎ রাই, যিনি আবার নবাবের একজন ওয়জীর বা মন্ত্রীও ছিলেন| ইস্তানবুলের বাব-ঈ-হুমায়ুনীর আদলে তৈরী এই দরওয়াজা থেকে ছত্তর মঞ্জিল অবধি রাস্তার শান দেখে কোম্পানীর রেসিডেন্টদের যে মাথা ঘুরে গিয়েছিলো সেটা খুবই স্বাভাবিক| আর আমজনতার জন্য তৈরী হলো বাজার, চক, বাগ, ইমামবড়া, সরাইখানা, প্রতি বছর হোলিতে খরচ হতো পাঁচ লাখ টাকা| অওয়ধে এতোরকম হাঙ্গামাফাসাদ হয়েছে কিন্তু কোনোদিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনোরকম ঝামেলা হয়নি| মজহব নহী শিখাতা, আপস মেঁ বৈর রাখনা| ধর্ম কোনোদিন বৈরিতা শেখায় না| যখন ওয়জিদ আলীশাহের মাতাশ্রী জনাব-ই-আলীয়াহ লন্ডনে রাণীর কাছে গেলেন ইনসাফ চাইতে, তখন অওয়ধের লোক হিন্দু-মুসলমান ভুলে দুয়া চাইলো,হজরৎ যাতে হ্যাঁয় লন্দন, হম পর কৃপা করো রঘুনন্দন|
বহোৎ খুব|

৫
শম-এ-ফরোজাঁ

সন-তারিখের শুখা কাহানী অমীরনকে টানেনা| সে শহর ঘুরে বেড়ায় চোরি-ছুপকে, সামনে যা দেখে সেটাই তার শহরের জিন্দা তারীখ| আমিনাবাদের গলি, রুস্তম দর্জি যেখানে অন্ধকার কামরায় বসে মহীন কাপাসের কাপড়ে জাদু খেলায় উল্টা জালির চিকনকারীতে|

" তোর নামেও একটা ধাগাকারীর নাম দেবো ভাবছি" বুড়ো রুস্তম মিঞা রসিকতা করে অমীরনের সাথে| কখনো বলে, "তোর মাথা থেকে একগোছা রেশমী চুল ছিঁড়ে দে দেখি, কাপাসের ধাগা'র বদলে ইস্তেমাল করি|"

বাটিভর্তি ঘুটোয়া কাবাবে রুটি ডুবিয়ে খেতে খেতে খেতে চোখ বন্ধ করে হাসে অমীরন| রুস্তম দর্জীর তোশামোদটা অন্যরকম, তার অন্য মোয়াকিলরা যেমন ঝুটা তোয়াজ করে সেরকম নয়|

খুলতি জুলফোঁ নে শিখায়ী মৌসমোঁ কো শায়রী...
সেই খোলা চুলের খুবসুরতীর পেছনে অমীরন নিজেই ঢাকা পড়ে যায়|

শহরে অমীরনের রেহনুমা (গাইড) ছিলো দু'জন, গওহর মির্জা আর রুস্তম দর্জি| দিনের আলোয় এক তয়ায়েফ শহর ঘুরে ঘুরে দেখছে সেটা হজম করা সেই কালে একটু মুশকিল ছিলো| তাই ঘোরা হত রাতে, অমীরন তাই শহর দেখেছে চাঁদের আলোয়|

লখনউয়ের শায়র-জোড়ী আতীশ-নাশিখের মধ্যে দ্বিতীয়জন লিখেছিলেন,
আসমাঁ কো ক্যা হ্যাঁয় তাকৎ যো চুরায়েঁ লখনউ
লখনউ মুঝ পর ফিদা হ্যাঁয় ঔর ম্যাঁয় ফিদা-এ-লখনউ|
ফিদা-এ-লখনউ তো অমীরন নিজেও| সে রাতচর পাখী এক| ইস শম-এ-ফরোজাঁ কো আঁধী সে ডরাতে হো| সে অনির্বাণ রাতের প্রদীপ তাকে কি ঝড়ের ভয় দেখিয়ে ঘরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায়| লখনউয়ের দরিয়ায় ডুবে যায় সে, রাতের শহরে শ্বাস নেয় প্রাণভরে।
আসফী ইমামবড়ায় জেনানাদের দাখিল হওয়া না-মুমকিন, কিন্তু বাওলির পাশের সরু গলি দিয়ে রাতের আঁধারে ভুলভুলাইয়াতে তো যেতেই পারে অমীরন| খুপরি খিড়কীতে দিয়া জ্বলে, চবুতরায় পাহারা দেয় সিপাহীর দল, গওহরকে চেনে বলে তারা অমীরনকে কিছু বলে না| ভুলভুলাইয়াতে সন্ধ্যাবেলায় উমরাও জান কিছুক্ষণের জন্য ফৈজাবাদের অমীরন হয়ে যায়| সেখানে সে আর গওহর মির্জা একা,

এক পুরানা মৌসম লৌটা য়াদ ভরি পুর্বাঈ ভী
অ্যায়সা তো কম হী হোতা হ্যাঁয় বো ভী হো তনহাই ভী...
বশিষ্ঠ ঋষির শীর্ণকায়া কন্যা গোমতীর ওপর দিয়ে পুবদিক থেকে ঘগরা নদীর বাতাস ভেসে আসে ফৈজাবাদের ধুলমিট্টির মহক নিয়ে| এমন সন্ধ্যা বারে বারে তো আসেনা, অমীরন গওহর আর একলাপন তিন জন এক অন্যের সাথে মিলে একটা শরীর হয়ে যায়|
রাত হামিলা (গর্ভবতী) অওরতের মত ওজনদার হওয়ার আগে গওহর আর অমীরন নিজেদের আশিয়ানায় ফিরে যায়|

কিন্তু এই হসীন শহরেও কিছু জায়গা ছিলো যেখানে অমীরন যেতে পারতো না| যেমন দিলখুশা, রেসিডেন্সী, কনস্ট্যানশিয়া (পরে লা মার্টিনিয়ার কলেজ), ফিরঙ্গী মহল.... এখানে থাকে গোরা আদমী-অওরতরা, শহরের আসল মালিক তো তারাই|

৬
বরবাদী কী জশন

আসফ-উদ-দৌল্লার বফৎ (দেহান্ত) হলো তখনো বহু বেগম বেঁচে| আসফ-উদ-দৌলা দেহান্তের আগে নিজের নাজায়েজ সন্তান ওয়জীর আলী খানকে তখতে বসিয়ে যান, কারণ মাতাজী ও ভাই সাদাৎ আলী খানকে তিনি বিশেষ পসন্দ করতেন না| কিন্তু ততদিনে অওয়ধের আসল হুকুমৎ তো কোম্পানীর হাতে| তারা যাকে চাইবে

সেই নবাব| আগেই বলেছি তো, এই নবাবীর কোনো কদর নেই, ঝুটা নবাবী| তো বহু বেগমের ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে এক বছরের মধ্যেই ওয়জীর আলী খানকে সরিয়ে দেওয়া হলো, সাদাৎ আলী খান সাহেবী স্যুটবুট পরে সাহেব নবাব সেজে বসলেন| তখন ফরাসী ব্যাপারীদের ভিড় লখনউতে, থাকাতো তারা ফিরঙ্গী মহলের আশেপাশে| ক্লদ মার্টিন নামে এক ফরাসী সেনা অফিসার, পরে কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলেন ও মেজর-জেনারেল অবধি হয়েছিলেন, তিনি আসফ-উদ-দৌল্লার ইজাজৎ নিয়ে বিশাল এক মার্বেলের মহল বানিয়েছিলেন, নাম দিলেন কনস্ট্যানশিয়া| কনস্ট্যান্স নামে তাঁর কোনো আশানা ছিলো কিনা জানা নেই, আর মার্টিন কোনোদিন বিয়েই করেন নি, মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছায় কনস্ট্যানশিয়াতে লা মার্টিনিয়ের কলেজ খোলা হয়। কনস্ট্যানশিয়ার পাশেই আর এক সাহেবী ধাঁচে গড়া ইমারৎ হলো দিলখুশা কোঠী, যেখানে সাদৎ আলী খান শিকার করে এসে বিশ্রাম নিতেন| পরে এখানে ইংরেজরা থাকতে শুরু করে| বঘাওয়তের সময় দেশী সিপাহীর গোলায় রেসিডেন্সীর সাথে সাথে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো দিলখুশা আর কনস্ট্যানশিয়াও| আজ দিলখুশা কোঠী এক সুনসান উজাড় ধংসস্তুপ, কেউ ফিরেও তাকায় না|

ফরাসী ব্যাপারীদের নজরানা দেওয়া মহার্ঘ সুরায় মজলেন নবাবসাহিব| সঙ্গে চললো শিকার, নারীসঙ্গ, শায়রানা আন্দাজ (কবিতাপ্রেম)| দবীস্তান-এ-লখনউ বা লখনউ স্কুলের শায়রী ছিলো ঝুটী নবাবী শানের মতই, বাইরে থেকে চকচকে, মজীন, তাতে শুধু লফ্জ বা শব্দের খেলা, ভাবনার গভীরতা না থাকায় শায়রীর খানদানী ওয়াকীফকারেরা (কনয়সীয়র) লখনউভী শায়রীকে জেনানা-আন্দাজী বা মেয়েলী বলে থাকেন| ঘালিবও বলে গেছেন, শায়র হবে তো এমন হও যে দিল্লীর খয়াল আর লখনউয়ের জবান মিশিয়ে লিখতে পারে| দিল্লীর মীর-সৌদা শায়র জোড়ীর মতো লখনউতেও খালিক-জমীর, সাবা-ভাজীর, আনীস-দবীর, আতীশ-নাসীখের মতো মশহুর শায়র-জোড়ী মৌজুদ ছিলেন| আর লখউভী শায়রীতে কিছু বদ-লিহাজী (অশ্লীলতা) থাকলেও লখনউভী মরসিয়াঁ বা কারবালার বিষাদসঙ্গীতের জজবীয়ৎ (আকর্ষণ)-ও কি কম!

সাদৎ আলী খানের সময় অর্ধেক অওয়ধ সাহেবদের দখলে এসে গেলো, নবাবের হিম্মৎ কোথায় যে বাধা দেবেন|লখনউকে সরকারীভাবে দখলের জন্য শুধু একটা মৌকার ইন্তেজার ছিলো কোম্পানীর, কারণ জবরদখলের জবাব দিতে হত রাণীর কাছে| সাদৎ আলী খান তবু কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলেন, অন্তত অওয়ধে শান্তি ছিলো |কিন্তু গদিচ্যুত নবাব ওয়জীর আলী বারাণসীতে এক ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে খুন করে বসলেন| ওয়েলেসলী শিকারী কুত্তার মত লাফ দিয়ে পড়লেন, ১৮০১ থেকে সাদৎ আলী খান নিজের ফৌজ রাখার অধিকার হারালেন| তবে লখনউয়ের নবাবেরা কখনো প্রজাদের ওপর জোর করে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেননি যেটা ঔরঙ্গজেবের পর থেকেই মুঘল বাদশাহেরা খুব করেছিলেন| তাই অওয়ধের দখলদারীর সময়ও রেয়াই বা প্রজারা খুশ ছিলো, সাহেব বিবি গোলামের খেলায় তাদের কোনো শওখ ছিলো না|

৭
অদা

উমরাও জানের কি হলো?

কোঠীতে ভালই ছিলো উমরাও, রইস আদমীর ঘরে মুজরা করে পঞ্চাশ টাকা নেয় সে, খুব নামডাক| কিন্তু রন্ডীর নসীব, সুখ সইবে কেন| ফয়েজ আলী নামে এক বড়মানুষের সাথে খানম সাহিবার কোঠী ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালায় সে| হয়তো ভালোবাসার অভাবে হাঁফিয়ে উঠছিলো, ফয়েজ আলীর চোখে মুহব্বতের নিশানা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি| কোঠীর পাঁক থেকে বেরিয়ে ফর্রুখাবাদে ফয়েজ আলীর ঘরে গিয়ে থাকবে, এমন হসীন খয়াব দেখতে কোন রন্ডী না চায়| কিন্তু তা হলো না, ফয়েজ আলীকে সরকারী কোতোয়াল কোনো পুরানো জুর্মের জন্য ধরে নিয়ে গেলো| উমরাও জান এক মৌলভীর কৃপায় কানপুরে আশ্রয় পেলো, সেখানের কোঠীতেই রইলো কয়েক মাস| এক কোঠী থেকে আরেক কোঠী, কীই বা ফর্ক পড়লো উমরাও খানের জীবনে|
হ্যাঁ, একটা ফর্ক এলো| হঠাৎ করে দুনিয়াদারীর সামনা করতে করতে উমরাও জানের চন্দ্রকিরণের মতো আঙ্গুলে উঠে এলো কলম, আর উমরাও জান "অদা" নামের এক নতুন শায়রের পয়দায়ীশ (জন্ম) হলো|

কৈদী উলফতে-সৈয়াদ রিহা হোতে হ্যাঁয়
আজ হম বাদিলে-নাশাদ রিহা হোতে হ্যাঁয় ....
এ "অদা" কৈদে মুহব্বৎ সে রিহাই মালুম
কব অসীরে-গমেঁ-সৈয়াদ রিহা হোতে হ্যাঁয়

শিকারী তো ফাঁদে পড়া বন্দীকে ভালোবেসে ছেড়ে দেয়, কিন্তু বন্দীর তো ছাড়া পেয়েও মনে সুখ নেই| এ অদা, জানিস কি, বন্দী যখন ভালোবাসার ফাঁদ থেকে মুক্তি পায়, তখনো শিকারীর বিষাদ তার পিছু ছাড়ে না| ("অদা" বা "ঘালিব" বা "আসাদ", ঘজলের শেষে এই উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে থাকে শায়রের তখল্লুশ বা pet-name) উমরাও জান শায়রের তখল্লুশ হলো অদা| এর মানে কি হয়, ঠিক করে কি বলবো| ঠমক? ব্যাঞ্জনা? উমরাও জানের যে চতুর বিভঙ্গে শহরের হাজার পতঙ্গ জ্বলন্ত আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? হয়তো|

কানপুর আসলে ছিলো কোম্পানীর ফৌজের ছাওনী বা ব্যারাক, আর চামড়ার কারখানা| সে শহরে না আছে লখনউয়ের শান, না আছে জান| উমরাওকে লখনউ ডাকে| কিন্তু লখনউও বদলে গেছে অনেক| বঘাওয়ৎ (বিদ্রোহ) এসে গেছে, কোম্পানীর হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা জায়গায় জায়গায় ক্ষেপে উঠছে| রুটির টুকরোর সঙ্কেত নি:শব্দে পৌঁছে যাচ্ছে ছাওনী থেকে ছাওনীতে| গরু আর শুয়োর, দুটো নিরীহ গৃহপালিত প্রাণীর শরীরের চর্বিতে চর্বিতে আগুন ছড়াচ্ছে হিন্দুস্তানে| লখনউও পুড়বে সেই আগুনে| উমরাও গওহর রুস্তম দর্জী খানম হুসৈনী বিসমিল্লাজান তো সাধারন লোক সব, নবাব বেগম নবাবজাদা কে না পুড়ে খাক হলো সেই আগুনে|

৮
আখতার পিয়া

লখনউয়ের শায়ররা তবাইফের খুবসুরতী, নবাবের ঝুটা তারিফ, নিশাত খানার মস্তিতে এতই মজে ছিলেন যে ফলসফি (দার্শনিক) মরসিঁয়া ধীরে ধীরে বদলে গেলো মনসভী আর বশোক্তের মত যৌন ইঙ্গিতময় নজমের চেহারায়| লেখা শুরু হল রেখতী নামে আরো একরকম শের, যাতে পুরুষ গাইছে নারীর কথা, নারীর ভাষায়, পুরুষের কন্ঠে| এই আজীব ঢঙের জন্ম লখনউয়ের নবাবের বরাদরীতেই, যেখানে শুজা-উদ-দৌলার মত যোদ্ধা, আসফ-উদ-দোল্লার মত উদার, সাদৎ আলী খানের মত ধুরন্ধর নবাবের নালায়েক ওয়ারিশেরা কবুতরবাজী, কানকওয়েবাজীতে মেতে রইলেন, বাইজীদের পায়ের নীচে লুটোতে লাগলো লখনউয়ের শানদার ইতিহাস| লখনউয়ের শেষ নবাব (নবাব! শুধু মাথায় তাজ পরে তখতে বসলেই যদি নবাব হওয়া যেতো!) ওয়াজ্জীদ আলী শাহ তো নিজেই একটি মূর্তিমান রেখতী|

ইনসান-এ-মুতাজাদ| বৈপরীত্যের মানুষ| ওয়াজিদ আলী শাহ ছিলেন তাই| ধর্মভীরু পিতা আমজাদ আলী শাহের হাত থেকে যখন তাঁর হাতে নবাবী এলো, তখন লখনউ তার অতীতের অসুস্থ ছায়ামাত্র| সমস্ত নবাবী কাজেই কোম্পানী দখল-আন্দাজ করছে| ব্রিটিশ রেসিডেন্ট উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান, যিনি এককালে সুবে বাংলায় ঠগীদের খতম করেছিলেন এবং ভারতবর্ষে প্রথম ডাইনোসরের ফসিল খুঁজে বের করেছিলেন, ওয়জিদ আলী শাহের বিচিত্র জীবনযাত্রায় স্তম্ভিত হয়ে কোম্পানীর কাছে একটি দস্তাবেজ লিখে পাঠান, যাতে অনেক বাড়িয়ে বলা মিথ্যার সাথে কিছু সত্যি কথাও ছিলো| কু-শাসনের অভিযোগ যেমন কিছুটা সত্যি, কিন্তু নবাবের হাতে শাসনই নেই তো কু-শাসন| প্রজাদের অসন্তোষের গল্প কিন্তু সত্যি ছিলো না| দুবেলা দুমুঠো খেতে পেয়েই প্রজারা খুশী, নবাব-বাদশা দিয়ে তাদের কি কাজ| নবাব বাহাদুরের রেজিমেন্টের সমান মাপের হারেমের গল্পটাও কিন্তু পুরো গালগল্প নয়| অওধের নবাবদের শিকড় ছিলো পারস্যে, ওঁরা ছিলেন শিয়া মুসলমান| শিয়াদের মধ্যে নিকাহ-অল-মুখা জায়েজ ছিলো, কিন্তু সেসব কানুনী জটিলতায় যাচ্ছি না| নবাব বাহাদুর এই নিকাহ-অল-মুখায় নিজের আলীশান কাইজারবাগ ভরিয়ে ফেললেন, এ তো মিথ্যা নয়| তিনশো পরীর খিদমত পেয়ে তিনি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে লখনউ নগরী ছেড়ে কলকাতা যাওয়ার সময়েও এই পরীদের যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন| অবশ্য একজন যাননি| তাঁর কথা পরে|

স্লীম্যানের আরো একটা জিনিস চোখে পড়েছিলো| নবাব বাহাদুর দরবারে বসতেন, আচকান এমনভাবে পরতেন যে বুকের বাঁদিকের কিছুটা অংশ খোলা থাকে| নবাব অবশ্য সাফাই দিয়েছিলেন, তিনি শায়র, কবি, কবির কাজ সব সময় নিজের হৃদয় খুলে রাখা| কিন্তু খুলে রাখা মানে কি এমনিভাবে? সেসময়কার ব্রিটিশ এটিকেটে নবাবের এমন ভাব আজীব তো লাগবেই|

তবে কত্থক নাচ, রহস (রাসলীলা), ঠুমরী, রাগে-অনুরাগে ওয়জিদ আলী শাহ সুখেই ছিলেন| "আখতার পিয়া" তখল্লুশ নিয়ে শেরোশায়রী করছেন, পরীখানায় আয়েশ করছেন|

আজকাল লখনউ মেঁ আয়ী "আখতার"
ধুম হ্যায় তেরী খুশ-বয়ানী কী|

নবাব সেজে প্রথমে অবশ্য ওয়জিদ আলী শাহ কিছু কাজ করেছিলেন| রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিকায়তের বাক্স বসিয়েছিলেন, প্রতিটি দস্তাবেজ নিজে পড়তেন| ৫০০ চিকিৎসক, দেড় হাজার কেরাণী রেখেছিলেন রাজকার্যের জন্য| লখনউ থেকে কানপুরের পাকা রাস্তা বানালেন| তারপর আস্তে আস্তে তাঁর ক্ষমতায় থাবা বসাতে শুরু করলো কোম্পানী| নবাব নিজের মত খাজানার তহবিল খরচ করে যাবেন, সে কি হয়? স্লীম্যান, আউট্রামরা নবাবের নামে পাতার পর পাতা লিখে ইংল্যান্ডে পাঠালেন| নবাব অপদার্থ, নবাব বাজে খরচ করেন, নবাব দো-নসলা, মেয়ে-মস্তি-শায়রী নিয়ে মজে থাকেন| নবাব কিন্তু নিজের তেজ বজায় রেখেছিলেন, রাণীকে চিঠি লিখে জবাবদিহি করেছিলেন| এতই যদি আমার রাজত্বে লোকেরা অখুশী, তাহলে আমার নবাবীর সীমা পেরিয়ে তারা সবাই কোম্পানীর ইলাকাতে চলে কেন যাচ্ছে না? আমি মুহরম মানাচ্ছি ধুম ধামের সাথে, তেমনি দশেরার দিন আয়েশবাগের রামলীলা শুনতে যাচ্ছি| আউট্রামকে বলেছিলেন, তোমার রাণীর লেখা নজম কি তোমার দেশের লোক পড়ে? আমার লেখা পড়ে| তারা আমায় ভালোবাসে| আমি রাজসভার ভাষা উর্দু ছেড়ে আমার লোকেদের ভাষা খারী বোলিতে শের লিখেছি|

কিন্তু এসব কথা শোনার সময় ছিলো না কোম্পানীর কাছে| তারা তখন দিশাহারা| সেটা ১৮৫৭|

৯
বঘাওয়ৎ-এ-জঙ

বিঠুরের (কানপুর শহর থেকে একটু দূরে) পেশোয়া ঢোন্ডু পন্ত (নানা সাহিব), ঝাঁসীর রাণী মণিকর্ণিকা (লক্ষ্মীবাঈ), অওয়ধের বেগম মুহম্মদী খানম (হজরত মহল) এঁরা সবাই বঘাওয়তে শামিল হয়েছিলেন নিজের নিজের ফায়দার জন্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই| কোম্পানীর প্রতি নফরৎ ছিলো, কিন্তু সেটাও নিজের সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয় থেকেই| দেশপ্রেম বলে কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না, কারণ হিন্দুস্তান বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা কারুরই ধারনা ছিলো না| আর মিউটিনী ছিলো এক কথায় দুপক্ষেরই নৃশংশতার উৎসব| নানাসাহিব আর তাঁর সঙ্গী তাঁতিয়া তোপে কানপুরের সতিচৌরার ঘাটে ব্রিটিশ নারী ও শিশুদের হত্যা করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন| সেই খুশীতে নানাসাহিব যখন হুসৈনী খানম নামে এক সুন্দরী তয়ায়েফের সাহিরী (জাদু)-তে মজে আছেন, তখন কাছেই বিবিঘরে বন্দী ব্রিটিশ নারী ও শিশুরা কলেরায় পোকার মতো মরছে| আজাদীর প্রথম লড়াই যার নাম, তার শুরুয়াৎ হলো নারী ও শিশুর শবদেহের ওপর, তা তারা যে জাতিরই হোক না কেন| এর নাম কি ইনকিলাব? বিপ্লব?

১৮৫৭, ৩০ মে রাত ন'টার তোপের আওয়াজের একটু পরেই লখনউ শহরে শুরু হয়ে গেলো বঘাওয়ৎ-এ-জঙ| উমরাও জান তখন কানপুরের তনহাই ছেড়ে ফিরে এসেছে খানমজানের কোঠীতে| শহরে দাঙ্গা লেগে গেলো| ওদিকে কাতারে কাতারে ইওরোপীয়ান আশেপাশের ছোটো ছোটো জায়গা থেকে পালিয়ে জমা হচ্ছে লখনউতে| মাছি বসারও জায়গা নেই রেসিডেন্সীর আশেপাশে| ছাত্তার মঞ্জীল শাহনজাফ কাইজারবাগ সিকন্দরবাগ মোতী মহলে ঘেরা রেসিডেন্সী গোমতীর তীরে এক বিশাল ইঁটের কেল্লা| দক্ষিণ দিকে একটু দূরেই লা মার্টিনিয়ের আর দিলখুশা| রেসিডেন্সীকে ঘিরে গোরা আদমীদের আস্তানা| তো দোর্দন্ডপ্রতাপ কোম্পানীর তাবড় ফৌজী অফসরেরা লুকিয়েছে ইঁদুরের গর্তে| বাঘী সিপাহীরা ঠিক করে নিয়েছে, পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর, ২৩ জুন ১৮৫৭, হিন্দুস্তান থেকে ফিরিঙ্গীদের উখড়ে কালাপানি পার করাবে| এই টালমাটালে অওয়ধের চীফ কমিশনার লরেন্স বুদ্ধি খোয়ালেন,

প্রবল বৃষ্টির রাতে লখনউ ছেড়ে চিনহাটের দিকে দলবল নিয়ে পালাতে গিয়ে সিপাহীদের কাছে বেদম মার খেয়ে আবার লখনউতেই ফিরে এলেন| আর তারপরই শহরের দখল নিয়ে নিলো সিপাহীরা, যার ইতিহাস রেসিডেন্সী দিলখুশা লা মার্টিনিয়ারের দেওয়ালের প্রতিটি ইঁট এখনো বহন করছে| তিন মাসের ওপর চললো এই Siege of Lucknow, 13th Native Infantry-র বফাদার শিখ সিপাহীরা তাদের সাহেবদের সাথ ছেড়ে চলে গেলে বোধ হয় রেসিডেন্সীর একটা ইঁটও আস্ত থাকতো না| বাঘী সিপাহীদের বিদ্রোহের কোনো স্থির নকশা ছিলো না, কয়েক মাস গোলাবারুদ দিয়ে রেসিডেন্সীকে বদসুরত করে দিয়ে তারা অন্যদিকে চলে গেলো|

একটা কবিতা শোনাই এবার, গল্প শুনে শুনে বোধ হয় উকতাহৎ (একঘেয়েমি) এসে গেলো আপনাদের| ফিরাঙ্গী কবিতা, জন গ্রীনলীফ হুইটিয়ার নামে এক আমেরিকান কবির লেখা|

The Pipes at Lucknow
Pipes of the misty moorlands,
Voice of the glens and hills;
The droning of the torrents,
The treble of the rills!
Not the braes of broom and heather,
Nor the mountains dark with rain,
Nor maiden bower, nor border tower,
Have heard your sweetest strain!

Dear to the Lowland reaper,
And plaided mountaineer -
To the cottage and the castle
The Scottish pipes are dear -
Sweet sounds the ancient pibroch
O'er mountain, loch, and glade;
But the sweetest of all music
The pipes at Lucknow played.
Day by day the Indian tiger
Louder yelled, and nearer crept;
Round and round the jungle-serpent
Near and nearer circles swept.
"Pray to-day!" the soldier said;
"To-morrow, death's between us
And the wrong and shame we dread,"

Oh, they listened, looked, and waited,
Till their hope became despair;
And the sobs of low bewailing
Filled the pauses of their prayer.
Then up spake a Scottish maiden,
With her ear unto the ground:
"Dinna ye hear it?-dinna ye hear it"
The pipes o'Havelock sound!"

Hushed the wounded man his groaning;
Hushed the wife her little ones;
Alone they heard the drum-roll
And the roar of Sepoy guns,
But to sounds of home and childhood
The Highland ear was true -
As her mother's cradle crooning
The mountain pipes she knew.

Like the march of soundless music
Through the vision of the seer,
More of feeling than of hearing,
Of the heart than of the ear,
She knew the droning pibroch,
She knew the Campbell's call:
"Hark! Hear ye no' MacGregor's -
The grandest of o' them all!"

Oh, they listened, dumb and breathless,
And they caught the sound at last;
Faint and far beyond the Goomtee
Rose and fell the piper's blast!
Then a burst of wild thanksgiving
Mingled woman's voice and man's;
"God be praised!-the march of Havelock!
The piping of the clans!"

Louder, nearer, fierce as vengeance,
Sharp and shrill as swords at strife,
Came the wild MacGregor's clan-call,
Stinging all the air to life.
But when the far-off dust-cloud
To plaided legions grew,
Full tenderly and blithesomely
The pipes of rescue blew!

Round the silver domes of Lucknow,
Moslem mosque and Pagan shrine,
Breathed the air to Britons dearest,
The air of "Auld Lang Syne."
O'er the cruel roll of war-drums
Rose that sweet and homelike strain;
And the tartan clove the turban,
As the Goomtee cleaves the plain.

Dear to the corn-land reaper
And plaided mountaineer -
To the cottage and the castle
The piper's song is dear.
Sweet sounds the Gaelic pibroch
O'er mountain, glen, and glade;
But the sweetest of all music
The pipes at Lucknow played!

হ্যাভেলক কিন্তু নানাসাহিবকে হারিয়ে, লখনউকে সিপাহীদের কবলমুক্ত করেও প্রাপ্য সম্মান পাননি, মিউটিনীর মাঝপথে তাঁকে সরিয়ে মেজর জেনারেল করা হয় স্যার জেমস আউট্রামকে| ২৫ সেপ্টেম্বর যখন রেসিডেন্সীর সদর দরওয়াজা বেইলীগার্দ খুলে আউট্রাম আধমরা রেসিডেন্সীর পাথরের রাস্তায় পা রাখলেন, ডক্টর ফেরারের ঘরে লুকিয়ে থাকা মিসেস বেইল্যু কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেন, কুইন বেঁচে আছেন তো? সিপাহীরা একটু গুছিয়ে নিলে, একজন ভালো রাহনুমা পেলে মলকা-এ-ইঙ্গলিস্তানের গদিও টলে যেতো, এই প্রশ্ন তারই সুবুৎ|

১০
কৌন দেস গয়ো সাঁবরীয়া

১৮৫৬-র ১১ ফেব্রুয়ারী অওয়ধের মুত্তালিখ (annexation) হয়ে গেলো আউট্রামের হাতে। নবাব তাঁর মাথার তাজ নামিয়ে রেখে চললেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। কাইজারবাগ ছেড়ে বেরোনোর সময় নাকি নবাবের পায়ে জুতো পরানোর মতো-ও কেউ ছিলো না আশেপাশে, নবাবের আর্তনাদ কেউ শোনে নি, আরে কোঈ মুঝে জুতী তো পহনা দো..... সিরাজকেও নাকি ধরিয়ে দেয় তাঁর পায়ের নকশাকাটা জুতী।

ঠুমরী আর ঘজল মিলে যায় নবাবের কলমে, ঘর ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায়...

তড়প তড়প সগরী রৈন গুজরী, কৌন দেস গয়ো সাঁবরীয়া
ভর আয়ী অঁখীয়াঁ মদবারী, তরস তরস গয়ী চুনরীয়া
তুমহরে ঘরন মোরে দ্বার সে যো নিকসে, সুধ ভুল গয়ী মেঁ বাঁবরীয়া
তড়প তড়প সগরী রৈন গুজরী....
রাধার চুনরী ভেজে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়, নবাবের ভেজে চোখ।

শিকয়া কিসসে করুঁ ইয়া দোস্ত নে মারা মুঝকো
জুজ খুদা কে নহী অব কোঈ সাহারা মুঝকো
নজর আতা নহী বিন জায়ে গুজারা মুঝকো
দর-ও-দীবার পর হসরৎ সে নজর করতেঁ হ্যাঁয়
রুখসৎ অ্যায় আহল-এ-বতন, হম তো সফর করতেঁ হ্যাঁয়
(বন্ধুরাই বেইমানী করলো, আমি কাকে নালিশ করবো?খুদা ছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই।
ঘর ছেড়ে তো যেতেই হবে বুঝতে পারছি, যাবার আগে ঘরের দেওয়াল দরজায় একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখি, বিদায় আমার দেশের লোক, আমি চল্লাম বহু দূর)

ওয়জিদ আলী শাহের প্রথম বেগম, তিনি কিন্তু রয়ে গেলেন লখনউতে। বঘাওয়তের সময় ছাত্তার মঞ্জীলের ঝরোখায় বসে শুনতে লাগলেন বাঘী সিপাহীদের গর্জন। মুহম্মদী খানম ফৈজাবাদের মেয়ে, অমীরনের মতই। তার চলার পথ অমীরনের চেয়েও অনেক বেশী উথালপাথাল ছিলো, কিন্তু নসীব কাউকে নিয়ে যায় খানমজানের কোঠীতে, আর কারোর আব্বা তাকে বাজারে বিক্রী করে দিলেও তার ঠাঁই হয় নবাবের মহলে। সেদিক থেকে দেখলে শহ-মুখার নিয়মের জোরেই বদলে যায় মুহম্মদী খানমের নসীব। নবাব তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পরীখানা থেকে সোজা তুলে আনেন নিজের নরম পালঙে, গর্ভধারণের পর নিকাহ হয়ে গেলো চোদ্দো বছরের পরীর। নবাবের শখ ছিলো নামকরণের। পেয়ারী বেগমকে কখনো মহক পরী, কখনো ইফতিকার-উন-নিসা, কখনো বা হজরত মহল নামের মধুতে মাখিয়ে রেখেছিলেন।

নবাবের বিদায়ের পর হজরৎ মহল অন্য পরীদের মতো তাঁর পিছুপিছু রওয়ানা হন নি। বরং কিছু জমিহারা তালুকদারদের সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নামলেন। কিসের জোরে তিনি এমন ফয়সলা

নিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু সরাফদ্দুলাহ, মহরাজ বালকৃষ্ণ, রাজা জয়লাল আর মম্মোন খাঁয়ের মতো হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের দলপতিদের নিয়ে যেভবে তিনি ময়দান-এ-জঙে হাজির হলেন সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা। তাঁর শকশিয়তে (ব্যক্তিত্ব) মুগ্ধ হয়ে দেড় লাখ সিপাহী তাঁকেই সরতাজ হিসেবে বরণ করে নিলো।

৫ জুলাই ১৮৫৭। কাইজারবাগের বরাদরীতে শেহনাই বাজলো, অন্ধকার শহরে রোশনী ছেয়ে গেলো, চোদ্দো বছরের নবাবজাদা বির্জিস কদর শান-এ-জমন-পাদশাহ-এ-অওয়ধ হয়ে বসলেন। সিপাহীরা জয়ধ্বনি দিলো, আর ফৈজাবাদী বেগম হজরৎ মহলের ডাকে ফৈজাবাদী তয়ায়েফ উমরাও জান অদা এসে গান শুনিয়ে গেলো,

দিল হজারোঁ কে তেরী ভোলী অদায়েঁ লেঙ্গী
হসরতে চাহনে বালোঁ কী বলায়েঁ লেঙ্গী

তকদীরে অন্যরকম কিছু লেখা থাকলে উমরাও জানেরও হয়তো বির্জিস কদরের মতো এমন চাঁদপানা ভোলী সুরতের কোনো ছেলে কি মেয়ে থাকতো, তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতো উমরাও । কিন্তু উমরাও জান অদা তো বে-ঔলাদ তয়ায়েফ একজন, তার এসব খয়ালী দুনিয়ায় সফর করা মানায় না।

১১
বেগমসাহিবা

দশ মাসের রাজপাটে বেগম হজরত মহল বাকায়দা দরবার বসাতেন, আমজনতার কথা শুনতেন, যুদ্ধ নিয়ে রীতিমত সলাহকারদের সাথে গুফত্গু (আলোচনা) করতেন| সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে থাকা বাঘী নেতাদের এক ছাতার তলায় এনে সত্যিকারের "স্বাধীনতার প্রথম লড়াই" যদি কেউ লড়ে থাকেন তো তিনি হজরত মহল| মনে রাখতে হবে নানাসাহিব-তাঁতিয়া তোপে, কুঁয়ার সিং, মৌলভী আমানুল্লাহ, বেণীমাধো, ফিরুজ শাহ কেউই একে অন্যের পরোয়া করতেন না, নিজের নিজের অঞ্চলে আলাদা ভাবে লড়াই করছিলেন| কিন্তু হজরৎ মহল রূপে নয়, নিজের কবুলিয়তেই এঁদের একসাথে করতে পেরেছিলেন| শুধু তাই-ই নয়, মুসাবাগের জঙে তিনি নয় হাজার সিপাহীকে একেবারে সামনে থেকে চালনা করেছিলেন, বন্দুক চালিয়েছেন| আউট্রাম তাঁকে রীতিমত ঘুষ দিয়ে শান্ত করতে চেয়েছিলেন| কিন্তু বাপ-মায়ের হাতে বিক্রী হয়ে যাওয়া গরীব অভাগী মেয়ে প্রবল অহঙ্কারে সে অনুরোধ ফিরিয়ে দেন|

কলকাতায় মাটির কেল্লায় বসে নবাব বহাদুর তখন সেখানেই ছোটা লখনউ বানানোর তদবীর (পরিকল্পনা) করছেন, আর চোখের জলে সাদা কাগজ ভিজিয়ে লিখছেন,
কভী সর পে রাখতা থা ম্যাঁ কজ কুলহ
অওয়ধ কা কভী ম্যাঁ ভী থা বাদশাহ
মুলাজিম কভী থে মেরে সও হাজার
মেরে হুকম মেঁ থে পিয়াদা সওয়ার
হুয়ে কৈদ ইস তরহ ম্যাঁয় বে-গুণহ
অসীরোঁ মেঁ হুঁ, নাম হ্যাঁয় বাদশাহ

(এক সময় আমিও ছিলাম বাদশাহ, কতো লোক জন পিয়াদা বরকন্দাজ আমায় ঘিরে থাকতো, আজ আমি বিনাদোষে জেলখানায়, কিন্তু নাম এখনো বাদশাহ!)

মাথায় কজ কুলহ নিয়ে তখতে বসলেই বাদশা হওয়া যায় না| তাঁর পর্দানশীন মহক পরী যখন ময়দানে নেমে পড়েছেন বন্দুক হাতে, তখন বুরহান-উল-মুলকের বংশধর কলকাতায় কথকের আসর বসান, বিরিয়ানীর রহস্যে মজে থাকেন| অথচ লখনউতে রাজ করার সময় তিনি বিরিয়ানী ছুঁতেনও না, ও তো গরীবের খানা| নবাবী ভোজে থাকতো পিলাফ (পোলাও), বিশেষত:, মোতী পিলাফ, যাতে সোনারূপোর তবক দেওয়া থাকতো| আর নবাবী দস্তরখয়াঁতে (ভোজ) থাকতো মাছ| খট্টী মছলী, মছলী চাঁপ....

(বিরিয়ানী আর পিলাফ দুটো-ই পার্শী ঘরের| বিরিয়ানীর মাংস একটু শস্তা, তাই তাকে আগে ভাজতে হয়| নবাবী পোলাও-এর মাংসের গুণই আলাদা, তাকে মশলা-মেশানো জলে হালকা সিদ্ধ করে নিলেই হয়| আসলী নবাবী খানা ছিলো য়খনী পিলাফ, যেখানে ভাজার কোনো ব্যাপারই নেই, য়খনী, মানে মাংস থেকে বেরোনো জলে দই আর মশলা মিশিয়ে যে শোরবা, তাতেই তৈরী হয়ে যাচ্ছে পিলাফ .... মাশাল্লাহ!)

নবাব বহাদুরের করুণ পরিণতির গল্প থাক| কিন্তু বেগমসাহিবা, কোথা থেকে তিনি এই জেহনী তাকত (মানসিক শক্তি) পেয়েছিলেন জানা নেই| নিজের শোহর ওয়জীদ আলী শাহের থেকে নয় নিশ্চয়ই| এক তীব্র অদায়ৎ (ঘৃণা) ছিলো তাঁর গোরা বান্দাদের প্রতি| আর ছিলো এক মজবুত অজমৎ (মর্যাদা), যা কিনা তাঁর মতো ইফতিকার-উন-নিসা (নারীজাতির গর্ব)-কেই মানায়| ১৮৫৮-র ১৮ মে, বলা যেতে পারে বঘাওয়তের আখিরী দিনে, লখনউকে মালকা-এ-ইঙ্গলিশ্তানের হিফাজতে তুলে দিয়ে যখন বেগমসাহিবা নেপালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, তখন হয়তো তিনি কোনো শের-ও-শায়রী লিখে যাননি| কিন্তু নেপালের রাণাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের ভাই মির্জা কোশাক, নানাসাহিব, বালারাও পেশওয়ারের মতো মশহুর ইনকিলাবীদের নেপালে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন| এই রাজাবাদশাহদের সাথে এসেছিলেন বেশুমার বেঘর জনতা| যে কোটী কোটী টাকা তিনি নবাবী খাজানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রায় পুরোটাই খরচ হয়ে যায় নেপালে থাকার সময় এই এতোজনের খোরাকী জোটাতে| দরাজ হাতে বেগমসাহিবা নিজের ওয়ারিশী দৌলত আমজনতার জন্য খরচ করে দিলেন, প্রাণপ্রতিম ছেলে বির্জিস কদরের জন্যও কিছু রাখেন নি| আর নিজের জন্য বানাতে পেরেছিলেন সামান্য এক বে-রঙ মকবরা|

মায়ের ইন্তেকালের অনেক দিন পর, ব্রিটিশ সরকারের ইজাজত নিয়ে রনজীদাহ (দু:খী) বির্জিস কদর কলকাতায় ফিরে যান| নিকাহ করেছিলেন দিল্লীর শেষ বাদশা বহাদুর শাহ জাফরের নাতনী মহতাব আরা বেগমকে| বির্জিসের না-কামিয়াব পিতা ততদিনে জিন্দগীর সাথে মুলাকাৎ করতে চলে গেছেন বেহস্তের গুলশনে| মেটিয়াবুর্জের সিবতেইনাবাদ ইমামবাড়ায় ঠান্ডা মার্বেলের নীচে শুধু পড়ে আছে তাঁর বেহায়াৎ দিল|

কিতনী রাহৎ হ্যাঁয় দিল টুট জানে কে বাদ
জিন্দগী সে মিলে মওত আনে কে বাদ|

কলকাতায় আসার এক বছর পরই বির্জিস কদর নিজের দুই সন্তানের সাথে কোনো রিশ্তেদারের দাওয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁদের সবাইকে জহর খাইয়ে মেরে ফেলা হয়| কেন, কেউ জানে না|

১২
কাফিলা সাথ অওর সফর তনহা

আইদানের যখন চোখ খুললো তখন রাত| মকবরার ঠান্ডা চবুতরায় শুয়ে শুয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে| পরিত্যক্ত মকবরা তখন শুনশান, মাথার ওপর মখমলী আসমানের গায়ে গায়ে ঝিলমিল তারার জারদৌসী কারিগরী| যে আলী মর্তবা অওরতের (মহিয়সী) সমাধির ওপর সে আজ শুয়ে আছে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন আইদানের পুর্বপুরুষ কর্ণেল সার্জেন্ট উইলিয়াম ম্যাকগ্রেগর, ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন স্কটস ফুইজিলিয়ার গার্ডস| আর আউট্রামের মতোই কর্ণেল ম্যাকগ্রেগরও বেগামসাহিবার বাহাদুরানায় হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন|

হ্যাঁয় কোঈ যো বতায়েঁ শব কে মুসাফীরোঁ কো (রাতের পথিক)
কিতনা সফর হুয়া হ্যাঁয় কিতনা সফর রহা হ্যাঁয়

আইদান ম্যাকগ্রেগর, অওয়ধের সাথে মিল রেখে নামকরণ যার, সেই হয়রাতির (বিস্ময়) উত্তরাধিকার বহন করে এই ছোট্টো সফরে শামিল হয়| আরো কতো আশকবার (অশ্রুসজল) কাহানী, আরো কতো দিলশাদ আফসানা (খুশীর গল্প) পড়ে রইলো তার রহগুজরের (পথ) ধারে ধারে| একলা শহর লখনউ তার আলোআঁধারী অলিগলিতে আইদানকে সফর করাতে করাতে সেসব গল্প শোনাবে হয়তো কোনোদিন|

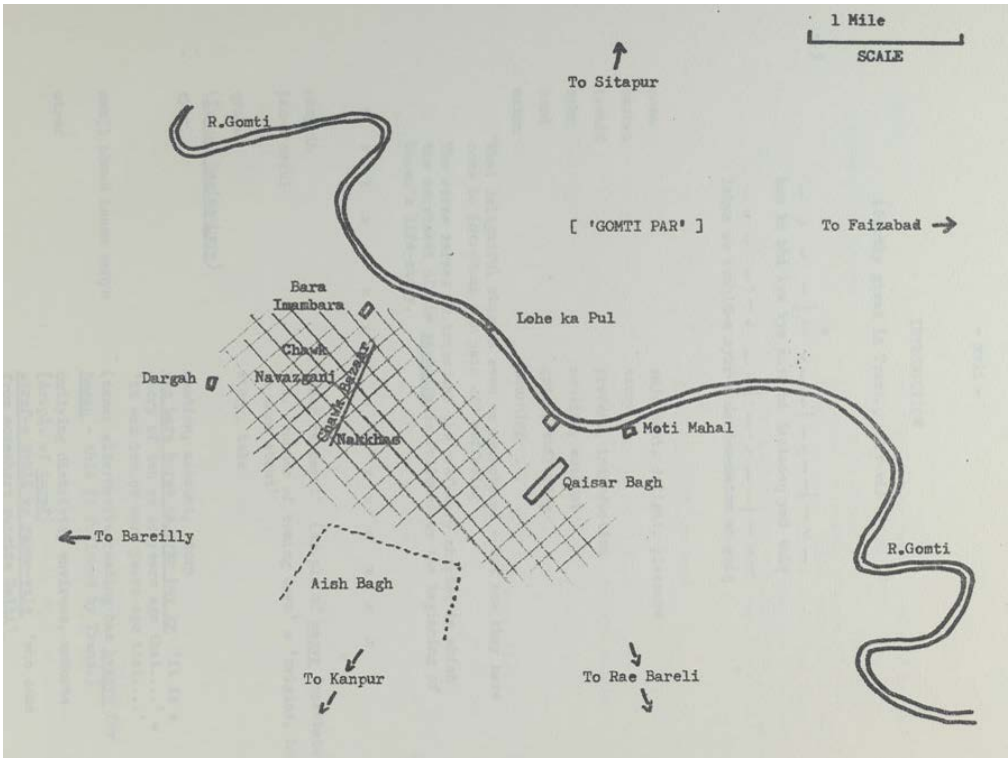

[মির্জা হাদী রুসোয়া-র উপন্যাস "উমরাও জান অদা"-তে লখনউয়ের এমনই এক মানচিত্র ছাপা হয়েছিলো|]